# প্রতিনায়ক

## সিরাজুল আলম খান

নিউক্লিয়াস • মুজিববাহিনী • জাসদ

মহিউদ্দিন আহমদ

# প্রতিনায়ক

সিরাজুল আলম খান

উৎসর্গ

কাজী আরেফ আহমদ
শাজাহান সিরাজ
স্বপন কুমার চৌধুরী
আ ফ ম মাহবুবুল হক
মাসুদ আহমেদ রুমি
আবদুল বাতেন চৌধুরী
মমতাজ বেগম
চিশতি শাহ্ হেলালুর রহমান
নিখিল চন্দ্র সাহা
আফতাব আহমাদ
সুমন মাহমুদ
একরামুল হক

## সূচি

## পরিশিষ্ট

# ইতিহাসের সত্যি কথা

জীবনের একটা সুন্দর সময় পেরিয়ে এসেছি, যার নাম শৈশব। যা শুনতাম বা পড়তাম, তা মনের মধ্যে গেঁথে যেত। রূপকথা, পুরাণ আর ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতাম না। পৌরাণিক চরিত্রগুলো খুব আকর্ষণ করত। কাউকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসতাম, কাউকে করতাম ঘৃণা। ওই সময় *রামায়ণ, মহাভারত* আর *ইলিয়াড*-এর শিশুতোষ পাঠের সুযোগ হয়েছিল। এগুলো আমার পড়া প্রথম মহাকাব্য। সেখানে কেউ নায়ক, কেউ প্রতিনায়ক, কেউবা খলনায়ক। আছে দ্বন্দ্ব, আছে যুদ্ধ, আছে মৃত্যু। সে এক বিশাল ক্যানভাস।

এখন চারপাশে জান্তব পৃথিবী, ঘোর বাস্তবতা, সবকিছু গদ্যময়। কাব্যের ছিটেফোঁটাও নেই। ভালোবাসার মানুষগুলোকেও অনেক সময় অচেনা মনে হয়, মনে হয় প্রতারক। তারপরও কেউ কেউ আছেন, যাঁদের খুব বেশি রকম মনে পড়ে। আমরা তাঁদের জন্য নৈবেদ্য সাজাই, গুণকীর্তন করি। এসব করতে করতে অজান্তেই তৈরি করি মিথ। এর আড়ালে ইতিহাসের সত্য চাপা পড়ে যায়।

আমাদের জীবনের দুটি দিক আছে। একটি আলোয় ভরা, অন্যটি অন্ধকারে ঘেরা। আমরা যখন জীবনের গল্প বলি, অন্ধকার দিকটি এড়িয়ে যাই। আলোময় দিকটা নানান মসলা মেখে পরিবেশন করি। ফলে গল্প হয়ে যায় একপেশে। একপেশে গল্প শুনতে শুনতে একসময় এটি হয়ে যায় ইতিহাস, যদি না তার বিপরীতে অন্য কেউ অন্য গল্প দাঁড় করান।

সমাজে চিন্তার পাশাপাশি প্রতিচিন্তা বা বিকল্প ভাবনার জায়গাটি এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সমাজ তো বদ্ধ পুকুর নয়। সেখানে ঢিল ছুড়লে এখনো তরঙ্গ তৈরি হয়।

ইংরেজ লেখক হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬) *দ্য টাইম মেশিন* নামে একটি কল্পকাহিনি লিখেছিলেন। এটি প্রথম ছাপা হয় ১৮৯৫ সালে। তিনি তাঁর জীবনকালে দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন। বড় লেখকদের লেখায় অনাগত সময়ের ছাপ থাকে। *টাইম মেশিন* তার ব্যতিক্রম নয়। সেখানে

ভবিষ্যতের এক ভয়ংকর সময়ের ছবি ফুটে উঠেছে, যেখানে মানুষ বই পড়ে না, চিন্তা করে না। মানুষগুলো সব যন্ত্রের মতো।

আমাদের মধ্যে এমন সমাজপতি আছেন, যাঁরা সব সময় চোখ রাঙিয়ে কথা বলেন—এটা বলা যাবে না, ওটা করা যাবে না। তাঁরা ঠিক করে দেন মানুষ কী লিখবে, কী পড়বে, কী শিখবে, কী জানবে, কী ভাববে, কী বলবে। পান থেকে চুন খসলেই তাঁরা সর্বনাশের গন্ধ পান। তাঁদের শিখিয়ে দেওয়া কথা কিংবা দেখিয়ে দেওয়া পথের বাইরে গেলেই রব ওঠে, সব বুঝি উচ্ছন্নে গেল।

সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা বহুত্ববাদের বিপরীতে এককেন্দ্রিকতার লড়াই অনেক দিনের। একদিকে বৈচিত্র্যের আবাহন, অন্যদিকে সামাজিক শৃঙ্খলা ও কর্তৃত্বের দর্শন। এই দুই পথের লড়াই থেকে তৈরি হয় নানান ডিসকোর্স বা তত্ত্ব। সবাই সব ব্যাপারে একমত হবেন না। এর প্রয়োজনও নেই। 'ঐকমত্য' শব্দটি আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে ব্যবহার করি। মনে করি এটা বুঝি খুবই দরকারি। তখন দরকারি জিনিসটা সমাজে চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা তৈরি হয়। ফলে তৈরি হয় সংকট। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর মত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> রুচিভেদে অভিজ্ঞতাভেদে আমাদের কোনো জিনিস ভালো লাগে কোনো জিনিস মন্দ লাগে, সকল সময়ে তাহার কারণ নির্দেশ করিতে পারি না। তাহার যেটুকু কারণ তাহা আমাদের সমস্ত জীবনের সহিত জড়িত, সেটাকে টানিয়া বাহির করা ভারি দুরূহ। মনের বিশেষ গতি অনুসারে অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপরেও আমরা অনেক মত গ্রহণ করিয়া থাকি; এইরূপ ভূরি ভূরি অপ্রমাণিত বিশ্বাস লইয়া আমরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাই। সেইরূপ মত ও বিশ্বাস যদি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা হয় তবে তাহা বলিবার একটা বিশেষ ধরন আছে। একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণা করিয়া বিশ্বসাধারণের উপর নিজের মতকে বেদবাক্য স্বরূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনো হাস্যকর, কখনো উৎপাতজনক।

আমরা পছন্দ করি বা না করি, আমরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি। রাষ্ট্রের নিজস্ব একটি ধর্ম আছে। এর চরিত্র আপাত-নৈর্ব্যক্তিক হলেও এটি যাঁরা চালান, তাঁদের ইচ্ছা ও দর্শন রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র ঢেকে দেয়। ফলে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে শ্রেণি, গোষ্ঠী বা পরিবারের সম্পত্তি। এ অতি পুরোনো কথা। এ অবস্থায় রাষ্ট্র তার সর্বজনীন মালিকানা হারায়। অথবা বলা যায়, রাষ্ট্রের সর্বজনীন মালিকানা কখনোই ছিল না। এটাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা ছিল এবং আছে।

আমরা যখন পুরাণের যুগ থেকে ইতিহাসের যুগে প্রবেশ করলাম, তখন থেকেই রাষ্ট্র আমাদের সামনে নানারূপে দেখা দিয়েছে। রূপান্তর ঘটেছে রাজনীতিশাস্ত্রে। রাষ্ট্রীয় দর্শন জটিলতর হচ্ছে, রাষ্ট্র হচ্ছে ক্রমাগত শক্তিশালী। রাষ্ট্র একপর্যায়ে ইতিহাসের ওপরও দখলদারি চাপিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে কোনটি ইতিহাস আর কোনটি কেচ্ছা। ফলে যখন রাষ্ট্রের দখল এক গোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়, তখন ইতিহাসও যায় পাল্টে। এ এক মজার খেলা। কাল শুনেছি অমুক হলো নায়ক আর তমুক হলো খলনায়ক, আজ শুনছি খলনায়ক হয়ে গেছে নায়ক আর নায়ক হয়ে গেছে খলনায়ক। ইতিহাস এখানে হয়ে গেছে ইচ্ছাপূরণের গল্প।

অতীতকে কীভাবে দেখা হবে, কোন ঘটনার কার্যকারণ কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, পরবর্তী ঘটনার ওপর তার অভিঘাত কেমন হবে বা হয়েছে, এর ব্যবচ্ছেদের তরিকা নিয়ে শাস্ত্র আছে। কিন্তু শাস্ত্রচর্চায়ও সমস্যা আছে। ঘটনা একটি। কিন্তু তার ব্যাখ্যা তো নানা রকম হতে পারে। কে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন, তা অনেকটাই নির্ভর করে তাঁর ইচ্ছার ওপর। আমাদের সমাজে ইতিহাসচর্চা সব সময় একাডেমিক পদ্ধতি ব্যবহার করে হয় না। নানান উদ্দেশ্য থেকেও ইতিহাস তৈরির চেষ্টা হয়। ফলে তৈরি হয় মিথ বা অপ-ইতিহাস। ইতিহাসের নানান বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কোনোটি রাষ্ট্রের আনুকূল্য পায়, কোনোটি পায় না। রাষ্ট্রীয় তরিকার বাইরে গিয়ে ইতিহাসচর্চার চ্যালেঞ্জ অনেক, ঝুঁকিও প্রবল।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল। এটি নিয়ে জোসেফ স্তালিন একটি বই লিখেছেন। আরেকটি লিখেছেন লিও ট্রটস্কি। দুজনের রাজনীতি ও চিন্তায় বিস্তর ফারাক। ভিন্ন স্বাদের একটি বই লিখেছেন জর্জ অরওয়েল—*অ্যানিমেল ফার্ম*। ট্রটস্কি পরে আরেকটি বই লিখেছিলেন—*রেভল্যুশন বিট্রেইড*। ওই সময়কে কলমের আঁচড়ে তুলে এনেছেন উপন্যাসের মাধ্যমে মিখাইল শলোকভ—*অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোওজ দ্য ডন*। একই ধারার ভিন্ন একটি উপন্যাস লিখেছেন বরিস পাস্তারনাক—*ডক্টর জিভাগো*। কোন বইয়ে সত্য চাপা পড়েছে, কোনটাতে বিকৃতি ঘটেছে, তার বিচার কে করবে? পার্টি, সরকার না পাঠক? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ার সময় আমার শিক্ষক মো. আনিসুর রহমান একটি বই পড়তে দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে, মোশে লেউইনের লেখা। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন আইরিন নোভ। বইটির নাম *রাশান পিজেন্টস অ্যান্ড সোভিয়েট পাওয়ার: আ স্টাডি অব কালেকটিভাইজেশন*। স্তালিনের সময়টিকে বোঝার জন্য এটি একটি ভালো বই। বইটি পড়ার মুগ্ধতা আমার মধ্যে এখনো রয়ে গেছে।

একটি সময়কে নানান আঙ্গিকে দেখা যায়। যিনি লিখবেন তাঁর ইচ্ছা, রুচি ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে তিনি কী লিখবেন, কতটুকু গভীরে যাবেন। লেখা অনেক সময় পারিপার্শ্বিকতার ওপরও নির্ভর করে। অর্থাৎ কতটুকু লিখলে লেখক ঝুঁকির মধ্যে পড়বেন কিংবা পড়বেন না, তিনি আপস করবেন কি করবেন না, এটা বিবেচনায় আসবে। লেখক যদি কাউকে খুশি করার জন্য লেখেন বা কাউকে অখুশি করতে না চান, তাহলে নানাজনের পিঠ চুলকে একধরনের বই দাঁড় করানো যায়। সেটা কি ইতিহাস হবে?

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়—ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, ইতিহাস কি সম্পূর্ণ লেখা হয়ে গেছে? এটা কি এক রাতে, এক বছরে কিংবা একটি সরকারের মেয়াদে সম্পন্ন করার বিষয়? ইতিহাসচর্চা কি প্রজেক্ট ওয়ার্ক?

আমি অনেক দিন ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর আদি-অন্ত ঘাঁটাঘাঁটি করছি। একটি বিষয় বুঝতে পেরেছি, ইতিহাসের কোনো সরল পাঠ নেই। তাহলে ইতিহাস জানব কেমন করে? মস্কোয় তৈরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে বানানো সিনেমা *লিবারেশন* দেখেছিলাম ঢাকায় ১৯৭৩ সালে। এর প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে আছেন স্তালিন ও হিটলার। ছবি দেখে মনে হয় স্তালিন নিতান্তই একজন মার্শাল এবং হিটলার একজন উন্মাদ। ছবি দেখার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এ 'ইতিহাসের সত্যি কথা কেমন করে জানব' শিরোনামে একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছিলাম দুই কিস্তিতে। আমি এই সিনেমায় নির্মাতার মধ্যে সূক্ষ্ম রাজনীতির ছোঁয়া দেখেছিলাম। সিনেমার চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে নির্মাতা অনেক সময় তাঁর ভালো লাগা বা মন্দ লাগা মিশিয়ে ফেলেন।

একটা কথা প্রায়ই শুনি—বিচারের ভার ইতিহাসের ওপর ছেড়ে দিলাম। মুশকিল হলো, ইতিহাস জিনিসটা কী? কে বা কারা কবে এটা লিখে গেছেন? ইতিহাস তো আসমানি কিতাব নয় যে এটা বদলানো যাবে না? যত দিন যাবে, আমরা ততই নতুন নতুন তথ্যের খোঁজ পাব, নানান মাত্রার বিশ্লেষণ চোখে পড়বে। ফলে আমাদের জানার পরিধি বাড়বে, জ্ঞানের ভান্ডার আরও বিস্তৃত হবে।

ইতিহাসচর্চা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া, এর অধিকার পাওয়ার জন্য ইতিহাসশাস্ত্রের ডিগ্রি থাকা খুব জরুরি নয়, পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। যে কেউ তাঁর অনুসন্ধানী মন এবং বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। গণ-আদালত বলে একটা বস্তু যেমন আছে, গণ-ইতিহাস তাহলে কেন নয়। আবারও রবীন্দ্রনাথে শরণ নিতে হয়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'প্রসঙ্গকথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

> অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের দ্বারা তাহা কিরূপ ঠেকিয়াছিল সে-ও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানব মন মিশ্রিত হইয়া যে পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের এ অঞ্চলের হাজার বছরের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। ওই সময় যে প্রচণ্ড ওলটপালট হয়েছে, তা এ দেশের মানুষকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এত রক্ত, এত মৃত্যু এর আগে আমরা দেখিনি। একাত্তর নিয়ে তাই আমরা গভীর কষ্ট ও আবেগ অনুভব করি। আবেগের চাদরটা গায়ে জড়ানো থাকলে অনেক সময় সহজ-সরল সত্য চোখে ধরা পড়ে না। সময় যত বয়ে যায়, আবেগ যত থিতিয়ে আসে, ততই আমরা নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক চোখে ফেলে আসা সময়কে বিচার করতে, সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি। মুক্তিযুদ্ধের পর এতগুলো দশক পেরিয়ে এসে আমরা কি সেই সামর্থ্য অর্জন করতে পেরেছি?

কিছুদিন আগে লেখক-সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীনের *আত্মস্মৃতি* পড়ছিলাম। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করে একাত্তর সালে সরকার গঠন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। ঘটনাটি তিনি *আত্মস্মৃতি*তে উল্লেখ করেছেন। জবাবে তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'আমি, আপনি এবং কামরুদ্দীন সাহেব একত্রে বসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে পারি।' পরে বললেন, 'এখন সত্য ইতিহাস লেখা যাবে না। লিখবেন না, লিখলে মেরে ফেলবে।' বোঝা যায়, একাত্তরের পূর্বাপর নিয়ে অনেক রহস্য, প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন আছে। অনেক সত্য চাপা পড়েছে বা চাপা দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা ইতিহাসের সাক্ষী কিংবা নির্মাতা, তাঁদের একেকজনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও মৃত্যু হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, অনেক কিছু লেখার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি। কাজ করতে গিয়ে আমি অনেকের শরণাপন্ন হয়েছি। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছি। আলাপের একপর্যায়ে এসে কেউ কেউ বলেছেন, 'রেকর্ডিং বন্ধ করুন।' অথবা বলেছেন, 'এটা ক্ল্যাসিফায়েড, আমাকে কোট করবেন না।' তাঁদের শুধু বিব্রত বোধ করতে দেখিনি, তাঁদের মধ্যে ভীতিও লক্ষ করেছি।

আরও সমস্যা আছে। সবাই ইতিহাসের নায়ক হতে চান। তাঁরা যখন কোনো ঘটনা বা সময়ের বিবরণ দেন, তাতে অনেক সময় কিছুটা খাদ মেশানো থাকে। মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁরা অনেক কিছু বলেন। নিজের

ভূমিকা একটু বাড়িয়ে বলা, অন্যের ভূমিকা খাটো করে দেখা, তথ্য লুকানো—এসব আছে। কেউ কেউ অবলীলায় মিথ্যা বলেন। একই ঘটনার পাল্টাপাল্টি বিবরণ পাওয়া যায় দুজনের কাছ থেকে। দুটোই তো সত্য হতে পারে না। হয় দুটোই অর্ধসত্য কিংবা একটি অসত্য। আবার একই ব্যক্তিকে দেখা যায় সময়ের ব্যবধানে তথ্য আমূল বদলে দিতে। ৪০ বছর আগে তিনি যা বলেছিলেন, এখন বলছেন ঠিক তার উল্টো। এসবের মধ্য দিয়ে সত্যের নির্যাসটুকু ছেঁকে তোলা খুবই কঠিন। যে যা-ই বলুন না কেন, তা হুবহু উদ্ধৃত করে দিলে তা সত্যিকারের ইতিহাস না-ও হতে পারে। একজনের দেওয়া তথ্য আরেকজনের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। তা সত্ত্বেও কোনো মীমাংসায় আসতে না পারলে উভয়ের মত তুলে ধরাটাই যুক্তিযুক্ত। তাতে পাঠক চিন্তার খোরাক পাবেন, নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। এ ক্ষেত্রে লেখকের নিজের মতামত পাঠককে গেলানো ঠিক হবে না।

ইতিহাসের বই সরকারের প্রেসনোট নয়। ইতিহাসের নামে অনেকেই প্রেসনোটের কাঠামো ও ভাষা ব্যবহার করেন। এ ধরনের সরকারি লেখক আছেন ভূরি ভূরি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজকবি, সভাকবি এই সব ছিল। তাঁরা রাজার মনোরঞ্জনের জন্য প্রশস্তিগাথা লিখতেন। এই প্রবণতা এখনো আছে। *নবাব সিরাজউদ্দৌলা* নাটকে গোলাম হোসেন নামের একটি চরিত্র আছে। গোলাম হোসেনরা সব সময় ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তারপরও কাউকে না কাউকে রাজশক্তির মুখের ওপর 'না' বলার সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করতে হয়।

পাঠককে নিয়েও সমস্যা আছে। অতীত নিয়ে অনেকের মধ্যে একটা ছবি তৈরি হয়ে আছে। তিনি হয়তো একধরনের তথ্য পেয়ে এবং জেনে অভ্যস্ত, যার ভিত্তিতে একধরনের মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়। তিনি যদি নতুন কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ পান, যেটি তাঁর পূর্বধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তিনি সেটি সহজে গ্রহণ করতে চান না। অনেক পাঠক আবেগাশ্রয়ী এবং পূর্বধারণার ঘেরাটোপে বন্দী। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। লেখককে যেমন নির্মোহ হতে হয়, পাঠককেরও নির্মোহ হওয়া দরকার। পাঠকের মনে বিশেষ রাজনৈতিক মত বা ধারার প্রতি পক্ষপাত এবং তার বিপরীত মত বা ধারার ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি থাকতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধরনের পক্ষপাত বা আপত্তি মাথায় রেখে কোনো বই পাঠ করলে তিনি ওই লেখকের ওপর পুরোপুরি সুবিচার করতে পারবেন না।

ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সব সময়ই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। সবটা জানা সম্ভব হয় না। এ দেশে প্রকাশ্য রাজনীতির পাশাপাশি একাধিক গোপন প্রক্রিয়া সব সময়ই ছিল। তার সবটা লিখিত আকারে পাওয়া

যায় না। সম্ভবও নয়। এ জন্য ইতিহাসের চরিত্রগুলোর শরণাপন্ন হতে হয়। দরকার হয় সাক্ষাৎকারের। আমি চেষ্টা করেছি প্রাসঙ্গিক অনেকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে। অনেকেই মন খুলে কথা বলেছেন। তাঁদের অনুমতি নিয়েই রেকর্ড করেছি আমাদের কথোপকথন। তাঁরা যদি কথা না বলতেন, এ বই লেখা সম্ভব হতো না। কিন্তু কাজটি করতে আমাকে অনেক সময় দিতে হয়েছে। তাঁরাও তাঁদের মূল্যবান সময় এ কাজে খরচ করেছেন। এটি ছিল একটি কষ্টকর, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

এ বইয়ে যা লিখেছি, তার কিছু কিছু আমার আগের প্রকাশিত বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আগের তথ্যের সঙ্গে এ বইয়ে দেওয়া তথ্যের কিছু গরমিল থাকতে পারে। দেখা গেছে, একই ব্যক্তি একেক সময় একেক ধরনের তথ্য দিয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই, লেখাজোকার ব্যাপারে আমি আগের চেয়ে বেশি সতর্ক। চেষ্টা করেছি যত দূর সম্ভব তথ্য যাচাই-বাছাই করে ব্যবহার করতে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক তথ্য নিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে। কোনো মীমাংসায় আসতে পারিনি।

বইটি লিখতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি। আমার অনেক বন্ধু ও পাঠকের একটা চাহিদা ও দাবি ছিল, ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনীতির অজানা ছবিগুলো তুলে ধরি। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। পাণ্ডুলিপি গোছাতে সাহায্য করেছেন অরুণ বসু। যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাঁদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বইয়ের শেষে দেওয়া আছে। এখানে ব্যবহৃত ছবিগুলো বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং ইন্টারনেট থেকে নেওয়া। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com

# পর্ব ১

# নিউক্লিয়াস

# নিউক্লিয়াসের খোঁজে

শ্রাবণ মাসের ৬ তারিখ শুক্রবার, ২১ জুলাই ১৯৭২। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি হবে অঝোরে। কিন্তু অবাক করা সকাল। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, কোথাও সাদা, কোথাও ধূসর। কিন্তু রোদ আছে।

মাত্র সাত মাস হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে। মনটা ফুরফুরে থাকার কথা। ভোর থেকেই মুহসীন হলে উত্তেজনা। ছাত্রলীগের তিন দিনের সম্মেলন শুরু হবে। কয়েকজন সঙ্গীসাথি নিয়ে রওনা দিলাম। পল্টন ময়দানে হাজি চান মিয়া ডেকোরেটরের বানানো বিশাল শামিয়ানার নিচে শুরু হলো সম্মেলন কাঁটায় কাঁটায় ১০টায়। শুরুতে ছিল কিছু আনুষ্ঠানিকতা। উদ্বোধন করার কথা ছিল মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরীর বাবার। তিনি আসেননি। তাঁর বড় ভাই অধ্যাপক রূপেন চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছেন। কিন্তু তিনি পল্টনে না এসে চলে গেছেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ওখানে সম্মেলন চলছে ছাত্রলীগের আরেক গ্রুপের। উদ্বোধন ছাড়াই শুরু হলো আমাদের সম্মেলন।

আ স ম আবদুর রব আর শাজাহান সিরাজ ছাত্রলীগ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তাঁরা কিছু কথাবার্তা বললেন। তারপর ঘণ্টাখানেকের বিরতি। ওই সময় লাল মলাটের একটা বুকলেট বিলি করা হলো। রাজনৈতিক রিপোর্ট। আমরা তখন দিল্লি-মস্কোর চোখ দিয়ে দুনিয়া দেখার চেষ্টা করছি। পুস্তিকায় তার ছাপ আছে। এক জায়গায় মন্তব্য ছিল, 'পীত সাম্রাজ্যবাদী চীন।' এই শব্দচয়ন আমাদের অনেকেরই ভালো লাগেনি। কিন্তু চোখ আটকে গেল অন্য একটি বাক্যে, '১৯৬২ সাল থেকেই ছাত্রলীগের ভেতরে একটি নিউক্লিয়াস বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল।'

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই দেখেছি, ছাত্রলীগের মধ্যে দুটি স্রোতোধারা। একটির কেন্দ্রে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, অন্যটির মধ্যমণি ছাত্রলীগের আরেক সাবেক নেতা সিরাজুল আলম খান। আমি কেমন করে জানি সিরাজুল আলম খানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ঘরানার মধ্যে ঢুকে গেছি। আমি জানতাম এমন একটা

প্রক্রিয়ার কথা, যেখানে আমরা সরাসরি স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের কথা বলতাম। অন্য গ্রুপের বন্ধুরা আমাদের নিয়ে মশকরা করত। বলত, পাতিবিপ্লবী।

বিজ্ঞানে নিউক্লিয়াস বলতে যা বোঝায়, রাজনীতিতে তার রূপ হয়তো আলাদা। এটা এমন একটা প্রক্রিয়া, যাকে একজন বা একটি ছোট গ্রুপ সঞ্চালন করে, নিয়ন্ত্রণ করে। তখন থেকেই জানি, শেখ মুজিব হলেন আসল নেতা। তাঁর সবচেয়ে আস্থাভাজন শিষ্য হলেন সিরাজুল আলম খান। আমরা শেখ মুজিবকে বলি বঙ্গবন্ধু আর সিরাজুল আলম খানকে বলি সিরাজ ভাই। স্বাধীনতার পর তিনি কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। তখন লক্ষ করলাম, অনেকেই তাঁকে 'দাদা' বলতে শুরু করেছে। 'দাদা' শব্দটির ব্যাপারে আমার অ্যালার্জি ছিল। উগান্ডার স্বৈরশাসক ইদি আমিনকে দাদা নামে সম্বোধন করা হতো।

আমার ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য গোপনে কাজ করে যাচ্ছেন। তবে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করেন, অন্তত প্রকাশ্যে। কিন্তু সিরাজুল আলম খানকে দিয়ে তিনি অনেক কাজ করান। সিরাজ হলেন বঙ্গবন্ধুর ডান হাত। কিন্তু যখন শুনলাম বঙ্গবন্ধু পল্টনের সম্মেলনে অতিথি হিসেবে না এসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলে গেছেন, তখন বিষম ধাক্কা খেলাম মনে। এটা কী হলো? এমনটা হবে তা তো আগে কেউ বলেনি?

দিন যায়, মাস যায়, বছর গড়ায়। ছাত্রলীগের এই সিরাজপন্থী গ্রুপ থেকে তৈরি হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। সংক্ষেপে জাসদ। জাতীয় সমাজতন্ত্র তো হিটলারের আদর্শ ছিল! এই নামের ভূত আমাদের ঘাড়ে চাপল কেন? এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। কিন্তু নিউক্লিয়াস শব্দটি চাউর হতে থাকল। জানতে পারলাম, এটি ছিল তিনজনের একটি চক্র বা সেল। সিরাজুল আলম খান ছাড়াও আরও ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমদ। বাহাত্তর সালেই এই নিউক্লিয়াস ভেঙে যায়। আবদুর রাজ্জাক থেকে যান আওয়ামী লীগে। কাজী আরেফের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটে ১৯৮৪ সালের দিকে।

## ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রত্ব শেষ হলো ১৯৭৫ সালে এমএ পরীক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তার বছরখানেকের মধ্যেই আমি রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিই। আমি বুঝলাম, এটা আমার পথ নয়। কিন্তু রাজনীতির প্রতি আগ্রহ রয়েই গেল। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে। তাঁকে আমি অনেকবার বলেছি,

'আপনার কাজ, আপনার অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। সবাই জানুক।' তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো লিখতে পারি না।' আসলেও তাই। তিনি বলেন, অন্যেরা লেখে। অথবা অন্যেরা লেখে, তিনি দেখে দেন কখনো-সখনো।

১৯৬৭-৬৯ সালে আমি ঢাকা কলেজে পড়েছি। আমার ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে যারা বেশি রকম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, তারা হলো শেখ কামালউদ্দিন, রেজাউল হক মুশতাক ও নিজামুদ্দিন আজাদ। মুশতাক ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিল। আজাদ ছিল কলেজ শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। কামাল ছাত্রলীগের হলেও সে কোনো পদে ছিল না। শেখ মুজিবের ছেলে হিসেবে তার অন্য রকম একটি পরিচিতি দাঁড়িয়ে যায়। ওই সময় শেখ মুজিব কারাবন্দী থাকায় কামালের ওপর আমাদের সবার মমতা ছিল।

আজাদের সঙ্গে সখ্যের কারণে আমি ছাত্র ইউনিয়নে ভিড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু উনসত্তরের গণ-আন্দোলন আমাকে অনেক বদলে দিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই ১৯৭০ সালে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আজাদ শহীদ হয়। পঁচাত্তরের নির্মম হত্যাকাণ্ডে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে কামালকেও আমরা হারাই। মুশতাক তত দিনে রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি আর যুক্ত ছিল না। তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল বরাবর।

১৯৮৩ সালে আমি জাসদকে নিয়ে একটি গবেষণার কাজ শুরু করি। অক্টোবরের এক সকালে মুশতাককে সঙ্গে নিয়ে আবদুর রাজ্জাকের ধানমন্ডির বাসায় যাই। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন বড় নেতা, সাধারণ সম্পাদক। শেখ হাসিনা দলের সভাপতি। তাঁদের মধ্যকার রসায়নটি কাজ করেনি। তিনি আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। আরেক বহিষ্কৃত নেতা মহিউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বাকশাল নামে আরেকটি দল। রাজ্জাক সাহেবের বাসায় লোকজনের ভিড়। একজনের পর একজন আসছেন আর যাচ্ছেন। জননেতাদের বোধ হয় এমনই জীবন। আমি দেখলাম, যে উদ্দেশ্যে আসা, অর্থাৎ তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া, সেটি এই হট্টগোলের মধ্যে সম্ভব নয়। তাঁকে নিয়ে চলে এলাম মুশতাকের ভূতের গলির বাসায়। সেখানে তাঁর সঙ্গে কথা হলো চার-পাঁচ ঘণ্টা। তিনি মেলে ধরলেন নিউক্লিয়াস-বৃত্তান্ত :

> এটা ঠিক যে আমরা নিউক্লিয়াস তৈরি করেছিলাম। চিন্তাটা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। ১৯৬৪ সালে তার একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করানো হয়। সিরাজ ভাই রূপকার, বিষয়টা এমন নয়। আমাদের মধ্যে কাজ ভাগ করা ছিল। সিরাজ ভাই ছিলেন আমাদের থিওরেটিশিয়ান। আমি

রিক্রুটিংয়ের কাজ দেখতাম। আরেফ ছাত্রলীগের মধ্যে আমাদের চিন্তার প্রসার ঘটাত। এরপর চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় আবুল কালাম আজাদ। আমরা আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে শপথ নিই, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার পেছনে ছুটব না। বিয়ে করব না। আমাদের না জানিয়ে আবুল কালাম আজাদ স্কুলপড়ুয়া একটা নাবালিকাকে বিয়ে করলে আমরা তাকে বহিষ্কার করি। মুজিব ভাইকে সামনে রেখেই আমরা এটা শুরু করি। তিনিই আমাদের নেতা। এ ব্যাপারে তাঁকে আমরা কিছুটা জানিয়েছিলাম ১৯৬৬ সালে। ১৯৬৯ সালে তাঁকে ডিটেইল জানানো হয়।

আমাদের সেলটির নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'। নামটি গোপন ছিল। কাজকর্ম হতো খুবই গোপনে।

আমরা 'বিপ্লবী বাংলা' নামে হাতে লেখা একটা বুলেটিন বের করি সাইক্লোস্টাইল করে এর কপি করা হতো। দুটো সংখ্যা বেরিয়েছিল।

সিরাজ ভাইকে আমরা নেতা মানতাম। তবে তাঁর পারসোনাল লাইফের অ্যানার্কি আমরা পছন্দ করতাম না।[১]

১৯৬৪ সালের পুরো সময়টা সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক কাটিয়েছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। আবুল কালাম আজাদও তখন কারাগারে। তাঁরা কী ধরনের স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা কেউই মুখ খোলেননি। যত দূর জানা যায়, তাঁদের মধ্যে একটা 'ককাস' গড়ে উঠেছিল। এটাকেই ১৯৭১ সালের পর তাঁরা নাম দিয়েছেন 'নিউক্লিয়াস'।

'নিউক্লিয়াস' শব্দটি একাত্তরের আগে কখনো শোনা যায়নি বা আলোচনায় আসেনি। কাজী আরেফ আহমদের সাংগঠনিক কার্যক্রম ছিল ঢাকা শহরের মধ্যেই, প্রধানত জগন্নাথ কলেজকে কেন্দ্র করে। বৃহত্তর পরিসরে অন্যান্য জেলা শহরের ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সুযোগ তখন ছিল না। তবে এটা ঠিক যে এই 'ককাস' পরে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে একটি প্রভাববলয় তৈরি করতে পেরেছিল।

## ৩

সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিগত জীবনের 'অ্যানার্কি' বলতে আবদুর রাজ্জাক কী বোঝাতে চেয়েছেন, তার ব্যাখ্যা দেননি। আমিও জানতে চাইনি। তবে তাঁকে নিয়ে অনেক মুখরোচক গল্প চালু ছিল। মোদ্দা কথা, তাঁর চালচলন আর দশজনের মতো ছিল না। তাঁকে অনেকেই আড়ালে-আবডালে 'কাপালিক'

নামে ডাকতেন। কীভাবে এ নাম চালু হয়েছিল, তা জানার জন্য একদিন তাঁকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

আপনাকে তো অনেকেই 'কাপালিক' বলে। এটা কেন বলে?

'ওই যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছে না? ওই নিয়েই বোধ হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাসে 'কাপালিক' নামে একটি চরিত্র আছে। সে শবসাধনা করে। মানে, লাশ নিয়ে জীবনযাপন। তার সঙ্গে আপনার মিল কোথায়?

সিরাজুল আলম খান আর কথা বাড়াননি।[২]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ হিসেবে মনে করা হয়। তাঁর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস হলো *কপালকুণ্ডলা*। এ উপন্যাসের একটি চরিত্র হলো 'কাপালিক'। কাপালিক আর দশজন মানুষের মতো নয়। সে মৃতদেহ নিয়ে তান্ত্রিক সাধনা করে। তবে তার আছে প্রচণ্ড আকর্ষণশক্তি। এ উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো নবকুমার। প্রথমবার কাপালিক-দর্শনে নবকুমারের মনের ভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন :

> ...কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিরাট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের ওপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থান ত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।[৩]

এ অঞ্চলে কাপালিক নামে একটি সম্প্রদায় আছে। তারা মহাদেব বা শিবকে আদর্শ মনে করে। তাদের জীবনযাত্রা অন্যদের থেকে আলাদা। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনই জীবনের ব্রত। তারা গৃহী নয়, সন্ন্যাসী। তারা অনেকেই শ্মশানচারী।

সিরাজুল আলম খানের কাপালিক নাম হওয়ার একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় ঢাকা কলেজে তাঁর সতীর্থ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কাছ থেকে। ওই সময় কলেজে *কপালকুণ্ডলা* নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। নারী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য কোনো নারী পাওয়া যায়নি বা আনা হয়নি। ছেলেদের কলেজ।

'কপালকুণ্ডলা' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সিরাজুল আলম খান। যদিও 'কাপালিক' ওই নাটকের আলাদা একটি চরিত্র, অনেকে তখন থেকেই সিরাজকে কাপালিক নামে ডাকা শুরু করে।[৪]

সিরাজুল আলম খান কখন খান, কখন ঘুমান, তার ঠিকঠিকানা নেই। চালচলনে খ্যাপাটে, বোহিমিয়ান, লম্বা চুল-দাড়ি-গোঁফ, অতি সাধারণ বেশভূষা, কম কথা বলা—এসব তাঁকে একধরনের বিশিষ্টতা দিয়েছিল। এর আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি দুই-ই ছিল। অনেকেই তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। আবার অনেকেই সম্মোহিত হতেন।

সিরাজুল আলম খানের চালচলন অনেকেই পছন্দ করতেন না। উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর ১৯৫৭ সালে ঢাকা কলেজের হোস্টেল পুরান ঢাকার বান্ধব কুটির থেকে নিউমার্কেটের কাছে কলেজ চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে কেউ তাঁর রুমমেট হতে রাজি হচ্ছিল না। শেষমেশ এগিয়ে আসেন মাগুরার মাহফুজুল হক (নিরো)। তিনি সিরাজকে তাঁর কামরায় থাকতে বলেন। নিরো ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন।[৫]

সিরাজুল আলম খান ছিলেন অন্তর্মুখী। সাধারণ মানুষকে একটা ধারণা দেওয়া হতো, তিনি প্রচারবিমুখ। এখন অবস্থা পাল্টেছে। অনেক বছর ধরেই তিনি তাঁর নিউক্লিয়াস-তত্ত্ব প্রচার করছেন, নিজে লিখছেন না। তবে ডিকটেশন দিয়ে অন্যদের দিয়ে লেখাচ্ছেন। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে তাঁর উদ্যোগে ও প্রশ্রয়ে ছাপা হয়েছে অগুনতি বই, বেশির ভাগই আধা ফর্মা বা এক ফর্মার, সেখানে তুলে ধরা হচ্ছে 'নিউক্লিয়াসের' বিবরণ। তিনি দাবি করছেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত-লেখক কামরুদ্দীন আহমদ ও অধ্যাপক আহমদ শরীফ নিউক্লিয়াসের পরামর্শদাতা ছিলেন। ঢাকা ছাড়িয়ে তাঁদের এই নেটওয়ার্ক জেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছিল।[৬]

তথ্যসূত্র

১. আবদুর রাজ্জাক
২. সিরাজুল আলম খান
৩. *বঙ্কিম রচনাবলী : উপন্যাস সমগ্র*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৬
৪. জাফরুল্লাহ চৌধুরী
৫. সিরাজুল আলম খান
৬. ওই

# অপূর্ব সংসদ

অধ্যাপক আহমদ শরীফের নানান লেখা ও চিঠিতে শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুল আজিজ বাগমার, আল মুজাহিদী প্রমুখ ছাত্রলীগ নেতার উল্লেখ থাকলেও সিরাজুল আলম খানের প্রসঙ্গ নেই। বরং আহমদ শরীফের লেখা থেকে জানা যায়, ঢাকা জেলা ছাত্রলীগের একসময়ের সভাপতি আবদুল আজিজ বাগমার স্বাধীন বাংলাদেশের কথা ভাবতেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে বাগমার স্বাধীনতার তিনটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন। তৈরি করেছিলেন 'অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার'। সংক্ষেপে 'অপূর্ব সংসদ'। এর জন্মকাহিনি বেশ চমকপ্রদ।

পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা 'যুগোপযোগী' করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের দুই মাসের মধ্যেই একটি বড় কাজে হাত দেন। সরকারের শিক্ষাসচিব এস এম শরিফের নেতৃত্বে 'কমিশন অন ন্যাশনাল এডুকেশন' নিয়োগ দেওয়া হলো ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮। দেশের সেরা শিক্ষাবিদদের অনেকেই কমিশনের সদস্য হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজিউদ্দিন সিদ্দিকী (সদস্য, পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশন), কর্নেল এম কে আফ্রিদি (উপাচার্য, পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়), বি এ হাশমি (উপাচার্য, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়), মমতাজ উদ্দিন আহমদ (উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), এ এফ এম আবদুল হক (চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড), এ এফ এ হুসেন (অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এ রশিদ (অধ্যক্ষ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা), আর এম ইউয়িং (ফোরম্যান, ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, লাহোর), কর্নেল মোহাম্মদ খান (পরিচালক, আর্মি এডুকেশন কোর) এবং ব্রিগেডিয়ার এস হামিদ শাহ (ডাইরেক্টর অব অর্গানাইজেশন, সেনাসদর)। এটিই পরে শরিফ কমিশন নামে পরিচিতি পায়।[১]

শরিফ কমিশনের খসড়া প্রতিবেদন প্রেসিডেন্টের দপ্তরে জমা পড়ে ২৬ আগস্ট ১৯৫৯। প্রায় সাড়ে তিন শ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল বিএ পাস কোর্স দুই বছরের পরিবর্তে তিন বছর করা,

কোনো একটি বিষয়ে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ এবং সব বিষয় মিলিয়ে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে পরীক্ষায় পাস হওয়া, প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত, কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া ইত্যাদি।[২]

শরিফ কমিশনের প্রতিবেদন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ দেশ থেকে সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হয়। শুরু হয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন। রাজনৈতিক দলগুলো তখন অনেকটাই হতোদ্যম এবং নিষ্ক্রিয়। অনেকেই মামলা এড়াতে স্বেচ্ছানির্বাসনে গেছেন। আন্দোলনের নেতৃত্বে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা। অনুঘটকের ভূমিকায় ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। তাদের যৌথ নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছিল 'শিক্ষা আন্দোলন'।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রনেতাদের নিয়ে ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৈরি হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরাম। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম এবং নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের ছাত্রনেতা আবদুল আজিজ বাগমার ছিলেন যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। নারায়ণগঞ্জের একটি ছাত্রসভায় সমবেত সবাই শপথ নেন যে বিজয় ছাড়া কেউ নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যাবেন না। তাঁরা আরও শপথ নেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে এ ধরনের উচ্চারণ এর আগে শোনা যায়নি। আবদুল আজিজ বাগমারের ভাষ্যমতে :

> ১৯৬২ সালে এ ধ্বনিটি বা স্লোগানটি আমিই উচ্চারণ করেছিলাম। আমি ছিলাম সভার শেষ বক্তা। সবাই উচ্চ কণ্ঠে স্বাধীনতার পক্ষে ধ্বনি প্রদান করে।
>
> তখনকার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের মৌলিক গণতন্ত্রী চিফ হুইপ এম এ জাহের তাদের নেতাদের সঙ্গে আট দিন সলাপরামর্শ করে আবিষ্কার করল, আবদুল আজিজ বাগমার দেশদ্রোহের ধ্বনি উচ্চারণ করেছে।...অতএব ঘটনার ৯ দিন পর দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে জঘন্য অভিযোগ উত্থাপন করল—বাগমার *বন্দে মাতরম* ধ্বনি দিয়েছে, *আল্লাহু আকবর* দেয়নি। আমি তার প্রতিবাদ করলাম। দৈনিক *ইত্তেফাক* আমার বক্তব্য সম্পূর্ণটা ছেপেছিল ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালে।[৩]

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৬২) প্রদেশব্যাপী হরতাল ডাকা হয়। ওই সময় 'দেশবাসীর প্রতি ছাত্রসমাজের

১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পল্টনের জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। পেছনে প্রথম সারিতে আবুল হাসনাত ও কাজী জাফর আহমদ, দ্বিতীয় সারিতে সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, পেছনে দাঁড়ানো সিরাজুল আলম খান

আহ্বান' শিরোনামে 'পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ'-এর নামে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়।[৪]

আন্দোলনের পক্ষে কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়ে এক বিবৃতিতে সই দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক এনায়েতুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরামের সভাপতি ও জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এবং তোলারাম কলেজের সংসদপ্রধান আবদুল আজিজ বাগমার, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরামের সহসম্পাদক ও ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমা রহমান, কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক এম এ সাত্তার, পি সি কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক এস এম এ সবুর, কারমাইকেল কলেজের আনিসুর রহমান, ভিক্টোরিয়া কলেজের মো. রফিকুল ইসলাম, ঢাকা সিটি নাইট কলেজের সাখাওয়াত হোসেন, কুষ্টিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আমিনুল হক, পাবনা কলেজের কাজী আবদুস শহীদ, মহিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ।[৫]

বাষট্টির আন্দোলন শেষ হওয়ার পর ছাত্র ফোরামের নেতারা ইডেন কলেজের নাজমা রহমানের বাবার বাসায় এক গোপন বৈঠকে 'জাতীয়

প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের' বিষয়ে আলোচনা করেন ও সিদ্ধান্ত নেন। 'কেউ কেউ শপথনামায় রক্তস্বাক্ষর প্রদান করেন। একজন শুধু ওয়াকআউট করেন। তিনি মতিয়া চৌধুরী।' এভাবেই জন্ম হলো নতুন সংগঠন—'অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার', সংক্ষেপে 'অপূর্ব সংসদ'। দিনটি ছিল ১ অক্টোবর ১৯৬২। তাঁদের লেখা বিভিন্ন ইশতেহার ও পুস্তিকায় সংগঠনের নাম হিসেবে সংক্ষেপে লেখা হতো 'অপু'। তাঁরা একটি সরকারকাঠামোও ঠিক করেছিলেন, যেমন :

রাষ্ট্রপতি : বেগম সুফিয়া কামাল
প্রধানমন্ত্রী : আবদুল আজিজ বাগমার
উপদেষ্টা : অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই
অধ্যাপক শওকত ওসমান
অধ্যাপক আহমদ শরীফ
অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী[৬]

অপূর্ব সংসদের মনোগ্রাম এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পী প্রাণেশ কুমার মন্ডল। বাগমারের দাবি, বিষয়টি যাঁরা জানতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এ ছাড়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ বিষয়টি জানতেন। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলগাড়িতে ইন্টার ক্লাসে স্বাধীনতার প্রচারকাজে অংশ নিতেন হাবিবুর রহমান, বাবু সারওয়ার, এ কে এম এ রফিক, নজরুল ইসলাম (মিনা), ফরিদা আক্তার, মনিরুল ইসলাম, আবদুল আউয়াল, লাল মিয়া, শহীদ, মেঘনাদ চন্দ, শান্তিনারায়ণ ঘোষ, কমরউদ্দিন (মন্টু), কামালউদ্দিন আহমদ, আখতারুজ্জামান (মনু), খাজা মহিউদ্দিন, এম এ খালেক, মুক্তা, মতি, মো. আলী, কুতুবউদ্দিন আকসির প্রমুখ।[৭]

বাগমার ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। তাঁর রুমমেট ছিলেন শেখ রিয়াজউদ্দিন, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ও খন্দকার মোশারফ হোসেন। এ ছাড়া সিরাজুল আলম খান, আল মুজাহিদী, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুস সোবহান এবং রকিবউদ্দিন আহমদ মাঝেমধ্যে ওই কামরায় আসতেন এবং থাকতেন। তাঁরা সবাই বাগমারের গোপন কার্যকলাপের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন বলে বাগমারের ভাষ্যে জানা যায়। এ সময় বাগমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও অপূর্ব সংসদের উপদেষ্টা মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকারের জন্য স্বাধীনতার পক্ষে কিছু লিখে দেওয়ার অনুরোধ করলে তিনি 'বাঙালী কি চায়? স্বাধীনতা' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখে দেন। লেখাটি 'অপু-১' ইশতেহার হিসেবে ২১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ প্রচার করা হয়। এই লেখার একটি অংশ ছিল এ রকম :

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য, সর্বনাশা প্যারিটি, স্থানান্তরিত রাজধানী ঢাকায় না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ, ক্ষমতার সকল উৎস পিন্ডিতে কেন্দ্রীভূত করা, সরকারি চাকরি ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিকে দাসের মর্যাদা প্রদান প্রভৃতি কারণে বাঙালি স্বাধীনতা দাবি করবে এটাই যুক্তিসঙ্গত। বাঙালি চায় স্বাধীনতা।[৮]
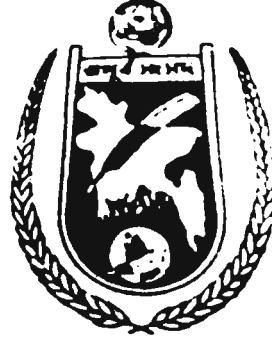
অপূর্ব সংসদের মনোগ্রাম

১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারি বাগমার নিজেই লেখেন অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকারের দ্বিতীয় ইশতেহার, 'অপু-২'। শিরোনাম দেন 'শকুন-শৃগালের আবার বাংলা আক্রমণ'। ছদ্মনামে এটি প্রকাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আহমদ শরীফ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপূর্ব সংসদের অন্যতম সমন্বয়কারী শান্তিনারায়ণ ঘোষ। ঢাকার ৫৫ পাতলা খান লেনে অবস্থিত কাজী হারুন-অর-রশিদের মালিকানাধীন মোনালিসা প্রেসে এটি ছাপানো হয়। ইশতেহারের শুরুতে বলা হয় :

> বাংলার ওপর অত্যাচার করে সবাই আনন্দ পায়। কারণ এতে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। শক, হুন, মোগল, পাঠান, পাল, সেন এবং ইংরেজ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাংলার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। বাংলাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু পারেনি। বাংলা নিজেকে বিসর্জন দিয়ে দানের আনন্দ পেয়েছে বারবার। কিন্তু আর কত দিন?[৯]

অপূর্ব সংসদের তৃতীয় ও শেষ ইশতেহারটি ১ অক্টোবর ১৯৬৫ প্রকাশ করা হয়। এটি লিখে দিয়েছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। বাগমার এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> ড. আহমদ শরীফ সাহেবের নিকট নিয়মিত অনুরোধ করতে থাকি। অতঃপর মে মাসে 'অপু-৩ ইতিহাসের ধারায় বাঙালী' স্বাধীনতার তৃতীয় ও চূড়ান্ত ইশতেহারের মূল কপি আমার নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, দ্রুত কপি করে মূল কপি ফেরত দেওয়ার জন্য।...
>
> ড. আহমদ শরীফ ওই দুঃসময়ে শতভাগ বিশ্বাস করেছিলেন। এর সকল কৃতিত্ব কেবল তাঁর। তবে ওই বিশ্বাসে কখনো ফাটল ধরেনি। অটুট ছিল।

> সুলতানা কামালকে দিয়ে দ্রুত কপি করালাম। অন্যদের দেখতে দিলাম।...ইতিমধ্যে উপাদেষ্টামণ্ডলী দেখা সম্পন্ন করলেন।
>
> মুদ্রণের জন্য একজন বিশ্বস্ত প্রেস মালিককে দেওয়া হলো। নাম কাজী হারুন-অর-রশিদ। মোনালিসা ফাইন আর্ট অ্যান্ড প্রিন্টিং প্রেস, ৫৫ পাতলা খান লেন, ঢাকা।...
>
> অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার (অপূর্ব সংসদ) আর বিলম্ব করেনি। ১ অক্টোবর ১৯৬৫ সাল আমাদের 'অপু-৩ ইতিহাসের ধারায় বাঙালী' বাংলাদেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রকাশিত হলো। রাষ্ট্রপতি কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও প্রধানমন্ত্রী আবদুল আজিজ বাগমারের সংক্ষিপ্ত নামে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়।
>
> দ্রুত প্রেসক্লাবের নিচের তলায় উত্তর-পূর্ব কক্ষে যেখানে সকল পত্রিকার ফাইল পড়ার জন্য ছিল, তাতে বেশ কিছু কপি রাত ১১টায় রেখে আসা হলো। ওখানে তখন কেউ ছিল না। *ইত্তেফাক*-এর প্রধান সাংবাদিকদের কপি দেওয়া হলো। হাইকোর্ট বারে পৌঁছানো হলো।...ঢাকাস্থ আদমজী কোর্টে অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেট অফিসে কপি দেওয়া হলো। তবে দুই ঘণ্টার মধ্যে পাক গোয়েন্দারা এই কপি পেয়ে যায়। এমনটা হতে পারে, এ আশঙ্কা আমাদের ছিল।
>
> দেওয়া হলো সেগুনবাগিচায় অবস্থিত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনে। সম্ভবত ক্ষিতীশ সেন বা সেন বলে একজন ছিলেন। চীনসহ অন্যদের কপি দেওয়া হলো।[১০]

অপু-৩ ইশতেহারটি ছিল পাঁচ পর্বে বিভক্ত। সূচনাপর্বে আহমদ শরীফ লিখলেন, 'আমরা এ দেশেরই জলবায়ু ও মাটির সন্তান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এ দেশের মাটির পোষণে, প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্যধারায় আমাদের দেহ-মন গঠিত ও পুষ্ট। আমরা আর্য নই, আরবি, ইরানি কিংবা তুর্কিস্তানিও আমরা নই। আমরা এ দেশেরই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশধর। আমাদের জাত আলাদা, আমাদের মনন স্বতন্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য ভিন্ন, আমাদের সংস্কৃতি অনন্য। আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। ভাষার নাম বাংলা। তাই আমরা বাঙালী।' ইশতেহারটি শেষ করা হয়েছিল জাতীয় সংগীত কী হবে, তার ইঙ্গিত দিয়ে। শেষ অনুচ্ছেদটি ছিল এ রকম :

> অতএব যে অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুবিদ্বেষ জেগেছিল এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের জিগির তুলে আর্থিক সুবিধার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত, আজ আবার সেই অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ শোষণের ফলেই বাঙালী স্থানিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক

স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দাবি করবে এ-ই তো স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাস তো তাই বলে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে।[১১]

'ইতিহাসের ধারায় বাঙালী' নিবন্ধটি ১৯৭০ সালে আহমদ শরীফ সংকলিত *স্বদেশ অন্বেষা* গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল। ২০১৩ সালে *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ* গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের একটি সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় আহমদ শরীফের লেখা 'বিশ শতকে বাঙালী' নামক আরেকটি প্রবন্ধে। এখানে তিনি লেখেন :

> উঠতি শিক্ষিত বাঙালী আশাভঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ১৯৫৭-৫৮ সনেই; কোনো কোনো সাংসদ রাজনীতিক স্বায়ত্তশাসন দাবির স্বপ্নও দেখেছিলেন। ভাষার দাবিতে প্রগতিশীলদের আন্দোলন ও ক্ষোভ-ক্রোধ ক্রমেই শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তাল রেখে তীব্র হতে থাকল। এ সময় ১৯৬৫ সনে আবদুল আজিজ বাগমার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক ছাত্র স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাধ বাস্তবায়নের জন্যে ছাত্র ও নেতা হিসেবে পন্থা আবিষ্কারে ও উপায় উদ্ভাবনে সক্রিয়ভাবে গোপনে কাজ শুরু করলেন। ঢাকার কিছু শিক্ষককে করলেন উপদেষ্টা। পরে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি হয়েই শেখ মুজিবুর রহমান দাবি জানালেন অভীকচিত্তে ছয় দফা পূরণের। এর কিছু পরে মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ কিছু সামরিক বিভাগের বাঙালী সেনানী আগরতলা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কিংবা অন্যভাবে স্বাধীনতা অর্জনে প্রয়াসী হলেন।[১২]

## ২

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক (১৯৬১-৬৩) শেখ ফজলুল হক মনি 'অপু-৩ ইতিহাসের ধারায় বাঙালী'র ভাষ্য নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। ওই নিবন্ধে দুজন নেতার সমালোচনা ছিল। যে নাম দুটি নিয়ে শেখ মনির আপত্তি ছিল, তাঁরা হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা ফজলুল হক। এর একটি অংশ ছিল এ রকম, 'বাঙালীর থেকে সংখ্যাসাম্য নীতির স্বীকৃতি

আদায় করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একক প্রদেশ গঠন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙালীর যে ক্ষতি করেছেন তার তুলনা বিরল।' অন্য অংশটি ছিল : 'রাজনীতি ক্ষেত্রে ফজলুল হকের সুবিধাবাদ নীতি বাঙালী রাজনৈতিক কর্মীদের করেছে আদর্শভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন। স্বার্থান্বেষী জনপ্রতিনিধিরা আজ এ দলে, কাল ও দলে থেকে দেশের গণমানুষের ও গণচরিত্রের যে ক্ষতিসাধন করেছেন, তা আমাদের উত্তরপুরুষের কালেও পূরণ হবে কি না সন্দেহ।'[১৩]

পরে ইশতেহার থেকে ওই দুটি অংশ বাদ দেওয়া হয়। অধ্যাপক আহমদ শরীফও এটা মেনে নেন। তিনি শেখ মনির আপত্তি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও পুরো লেখাটিই পরে তাঁর *স্বদেশ অন্বেষা* এবং *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ* বইয়ে সংকলিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, বাগমারের মতো মনিও সরাসরি তাঁর ছাত্র ছিলেন। মনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালে আহমদ শরীফকে একাধিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং এগুলোর জবাবও পেয়েছিলেন। চিঠির ভাষা পড়লে বোঝা যায়, তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক কত গভীর ছিল। এখানে একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হলো :

> শ্রদ্ধাস্পদেষু
>
> আমার সালাম জানবেন। আপনার ২১.৪.৬৭ তারিখে লেখা চিঠিখানা পেয়েছিলাম। ইচ্ছে করেই আর লিখিনি। এবার পরীক্ষা দিয়েছিলাম আইনের। উত্তীর্ণ হয়েছি। আশীর্বাদ করবেন। এখানে কোনো কিছুরই অভাব বোধ করি না। জীবনটা সহনীয় হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু বই খাতার অভাবই বিপদে ফেলে দেয়। কারও কাছেই চাইতে ইচ্ছে করে না। ভয় হয়, যদি অস্বীকার করে বসে। তাই আপনার কাছে লিখলাম। পছন্দমতো কয়েকখানা বই পাঠাবেন।
>
> ইতি
>
> স্নেহধন্য মনি
>
> পুনশ্চ : ডাকযোগে পাঠালেই আমি পাব।[১৪]
>
> শেখ ফজলুল হক মনি
>
> ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
>
> ২১.৪.১৯৬৮

অপু-৩ ইশতেহারে পূর্ব পাকিস্তানের 'বাংলাদেশ' নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অধ্যাপক আহমদ শরীফকে এর কৃতিত্ব দিতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে উল্লেখ করার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে একটি দূরবর্তী রূপকল্পের আভাস পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (সাবেক প্রধান বিচারপতি) বলেন :
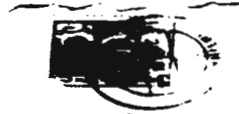
আহমদ শরীফকে লেখা শেখ ফজলুল হক মনির চিঠি

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ অপুর তৃতীয় ইশতেহার 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালী'তে বলেন, 'জাতীয় সংগীত হচ্ছে বল, বীর্য, প্রেরণা ও আদর্শের উৎস। আমাদের সেই জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছে জনগণের অবোধ্য ফারসী ভাষায়। অধিকাংশ পাকিস্তানিদের প্রাণের যোগ নেই যে-কওমী সংগীতের সঙ্গে।' ইশতেহারের শেষাংশ ছিল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।' অপূর্ব সংসদের প্রচেষ্টায় গানটির প্রচারে ব্যাপ্তি ঘটে।[১৫]

অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগমারের ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাগমার ২ নভেম্বর ১৯৬৭ লন্ডনের পথে ঢাকা ছাড়েন। আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা ও সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে। তাঁকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় জড়ানো হয়। লন্ডনে বাঙালি

ছাত্ররা 'শেখ মুজিব ডিফেন্স ফান্ড' তৈরি করেন। বাগমার এর সঙ্গে যুক্ত হন। এর উদ্যোক্তা ছিলেন জাকারিয়া খান চৌধুরী ও সুলতান মোহাম্মদ শরীফ। ৭ এপ্রিল ১৯৬৯ লন্ডনের *দ্য টাইমস*-এর প্রথম পাতায় তাঁদের একটি মিছিলের ছবি ছাপা হয়েছিল। মিছিলে বাগমারের হাতে ছিল একটি সচিত্র পোস্টার। তাতে লেখা ছিল, 'ইস্ট পাকিস্তান ফর ইস্ট পাকিস্তানিজ'।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব কারামুক্ত হন। অক্টোবরে তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন। বাগমারকে টেলিগ্রাম করে তিনি তাঁর সফরসূচি জানিয়েছিলেন। টেলিগ্রামে লেখা ছিল :

> ABDUL AZIZ BAGMAR, EAST PAKISTAN HOUSE
> 91 HIGHBURY HILL LONDON N5
> REACHING LONDON SUNDAY TWENTY SIXTH BY
> PK 719 INFORM OTHER FRIENDS
> SHEIKH MUJIBUR RAHMAN[১৬]

শেখ মুজিব লন্ডন পৌঁছান ২৬ অক্টোবর ১৯৬৯। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেয়ে শেখ হাসিনা ও জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়া। বিমানবন্দরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ শরীফ, জাকারিয়া চৌধুরী, আবদুল আজিজ বাগমার ও তাঁর হবু স্ত্রী আতিয়া।

বাগমার লন্ডনেই ছিলেন বেশ কিছুদিন। তিনি আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য কমিটিতে যুক্ত হন। পরে সস্ত্রীক ঢাকায় ফিরে আসেন। তাঁরা তাজউদ্দীন আহমদের ধানমন্ডির বাসার দোতলা ভাড়া নিয়ে সেখানে থাকতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে ৯ মাস কারাগারে ছিলেন। বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর তিনি আবার লন্ডনে চলে যান।[১৭] পরে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ২০১১ সালের ১৭ এপ্রিল তিনি প্রয়াত হয়েছেন।

## ৩

আবদুল আজিজ বাগমার ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফের স্নেহধন্য। আহমদ শরীফকে তাঁর মেন্টর বা গুরু বলা যায়। লন্ডন চলে যাওয়ার পরও চিঠিপত্রের মাধ্যমে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। চিঠির মাধ্যমে আহমদ শরীফ তাঁকে নানান পরামর্শ দিতেন।

১৯৬৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে যাওয়ার পর বাগমার আহমদ শরীফকে দুটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার করে আহমদ শরীফ তাঁর

আবদুল আজিজ বাগমার

ফুলার রোডের বাসা থেকে ২৩ নভেম্বর বাগমারকে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি বলেন, 'তুমি ওদেশের লোকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছ, টিলা ও নদী দেখতে অভ্যস্ত মানুষ যখন পর্বত ও সমুদ্র দেখে, তখন তার বিস্ময় না জেগে পারে না। আমাদের দেশি লোকের রুচি, সংস্কৃতি ও চরিত্র টিলা ও নদীর মতোই সীমিত। চিন্তা ও মননের বিকাশেই মানুষ বড় হয়। ওরা মানুষ হিসেবে জ্ঞানে, কর্মে ও চিন্তায় বড় হয়েছিল, তাই জাতি হিসেবেও বিশ্ববন্দ্য ও জগজ্জয়ী হয়েছিল। তাদের যেসব মানস-ঐশ্বর্যের কিছু আজও আছে—আমাদের মধ্যে আজও যা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি জাগেনি।'[১৮]

কয়েক দিনের মধ্যে বাগমার তাঁর প্রিয় শিক্ষককে আরেকটি চিঠি লেখেন। চিঠির ভাষ্য ছিল এ রকম :

২৯.১১.১৯৬৭

শ্রদ্ধেয় স্যার

আমার সালাম নেবেন। গতকাল আপনার 'প্রীতি ও শুভেচ্ছা'র প্রতীক আদর এবং স্নেহে সমৃদ্ধ লিপিখানা পেয়েছি। এবং গতকালই আমি নতুন বাড়িতে উঠেছি। তাই আর লিখতে পারিনি। এত দিন আমার এক শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ছিলুম। গ্রেট বা নোবেলম্যান সর্বদাই, সব কালেই ছোটদের বা তরুণদের প্রেরণা এবং উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আপনার পত্রেও তাই আছে। আশা করি ভবিষ্যতেও এমন পাওনা থেকে বঞ্চিত হব না। আপনার উপমা শুধু আমাকে নয়, সব কালের অধিবাসীকেই মুগ্ধ করবে।

আপনার বাণী 'চিত্ত ও মননের বিকাশেই মানুষ বড় হয়।' 'সেয়িংস অব গ্রেটম্যান' হয়েই বেঁচে থাকবেন। আপনার 'টিলা ও নদী' একদিকে আমাদের দেশের দৈন্যতার চিত্র উজ্জ্বল করেছে, অন্যদিকে তেমনি 'মানস-ঐশ্বর্য' অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবলভাবে প্রেরণা যোগাচ্ছে। আশীর্বাদ করুন আমাদের দেশি লোকের রুচি, সংস্কৃতি ও চরিত্র 'টিলা ও নদীর' মধ্যে সীমিত না থেকে 'পর্বত ও সমুদ্রের' মতো হয়ে যেন 'বিশ্ববন্দ্য ও জগজ্জয়ী' হয়। আপনার এবং আমাদের জীবৎকালে কি সেই সোনার বাংলা দেখতে পাব? আপনার

সহানুভূতি কামনা করছি।...

আমরা এখানে বেশ ভালোভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করব (লন্ডনে)। 'বাঙালি' কেন স্বায়ত্তশাসন চায়—এর উপর আপনার একখানা ছোট প্রবন্ধ হলে খুব ভালো হয়। আপনার ইচ্ছে অনুসারে প্রবন্ধটা আপনার নামে অথবা বেনামে পঠিত হবে। ওপারের বাঙালি ছেলেরাও থাকবে। প্রবন্ধখানা অবনী কুমার বর্মনকে দিয়ে কপি করিয়ে নেওয়া যাবে।...

আপনার স্নেহের
আজিজ[১৯]

আহমদ শরীফের কথাবার্তা এবং লেখাজোকায় বোঝা যায়, ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি চাইতেন বাংলার স্বাধীনতা। একই সঙ্গে তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বাগমারের চিঠির জবাবে ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৭ তারিখে তিনি লেখেন—

'আমার পক্ষে প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হবে না। তুমি EPSU (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন)-এর কোনো কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করো। তারা সেদিন যে সেমিনার করেছে তাতে এবং তাদের আয়োজিত প্রদর্শনীতে বৈষম্যের নানা তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরলেই তোমার বক্তব্য স্পষ্ট ও সুপ্রমাণ হবে।'

কমিউনিজমের প্রতি আস্থা এবং এ ব্যাপারে বাগমারকে প্রণোদনা দিয়ে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন মাস ছয়েক পর। চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

১৮ সি, ফুলার রোড
২.৬.৬৮
প্রিয়বরেষু,

তোমার পত্র পেলাম সুদীর্ঘ বিরতির পর। তোমার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে তোমার পাশের খবর তোমাকে জানাতে পারিনি। তোমার এ পত্র বহু তথ্য সমন্বিত। পড়ে খুশি হলাম।

আজকের পৃথিবী বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী। যুগের চাহিদা মিটাতে অর্থাৎ মানুষের অন্ন ও আনন্দের ভারসাম্য রক্ষা করতে যেসব রাষ্ট্র পারছে না বা পারবে না, সেসব রাষ্ট্রের জনগণ টাইম বম্ব বা আগ্নেয়গিরির মতো হয়ে আছে। যোগ্য নেতৃত্বে সামান্য কারণে আগুন জ্বলে উঠবে। যেমন দেখছ আজকের ফ্রান্সকে। ইংল্যান্ডেও বছর দু' বছরের মধ্যে লাগবে রেস-রায়ট। যদি আর্থিক অবস্থা আজকের মতোই থাকে অথবা আরো অবনতি ঘটে—সব

বহিরাগতকে তাড়াবে, যেতে না চাইলে মেরে-কেটে ইংলিশ চ্যানেলে ফেলবে। সমাজতন্ত্র ছাড়া কোনো গরীব দেশেই আজকের দিনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। যদিও কমিউনিজম কোনোমতেই স্থায়ী সমাধান নয়, কেবল কালের ধারায় বিবর্তনের একটি স্তর মাত্র। সেজন্যেই গরীব দেশে কমিউনিজম ইজ আ মাস্ট।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ

যোগাযোগের ব্যাপারে সুবিবেচনার সঙ্গে এগোতে হবে। ফ্রান্সেও এর হাত আছে বলে মনে করি। ঢাকায় তুমি কাজে সফল হওনি। ওখানেও কোনো সুবিধে হবে বলে মনে করিনে, কেননা সর্বত্রই রীতি-নীতি দ্রুত বদলাচ্ছে। তবু চেষ্টা করে দেখতে পার। এ ব্যাপারে সেখানকার কারো পরামর্শ নিতে পার কিনা দেখ।

আমার প্রবন্ধের বই *বিচিত চিন্তা* বেরিয়েছে। খুব বিক্রি হচ্ছে—এটা আমি আশা করবার সাহসও পাইনি। অনেকেই তারিফ করেছেন—নিন্দাও করবেন অনেকে।...

শুভার্থী

শরীফ

জনাব আবদুল আজিজ বাগমার প্রিয়বরেষু[২০]

বাগমারের ব্যাপারে অধ্যাপক আহমদ শরীফের স্নেহ ও আন্তরিকতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো *বিশ শতকে বাঙালি* বইটি তাঁর নামে উৎসর্গ করা। উৎসর্গলিপিতে তিনি লেখেন, 'স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রয়াসে পথিকৃৎ আবদুল আজিজ বাগমার প্রিয়বরেষু।' বাগমারকে তিনি সম্বোধন করেছেন 'স্বাধীনতার স্বাপ্নিক' বলে।[২১]

## ৪

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (পরে সাংবাদিক) একসময় নরসিংদী কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি ছাত্রলীগ করতেন। তখন থেকেই তিনি বাগমারকে জানতেন। বাগমার তখন নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের

ছাত্রনেতা। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তাঁরা এক কামরায় থাকতেন। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে রিয়াজ উদ্দিন ওই সময়ের একটি বিবরণ দিয়েছেন :

> আমি নরসিংদী কলেজে ভর্তি হলাম ১৯৬১ সালে। তখন ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়ন, এগুলি কিছুই হয় নাই। মার্শাল লর পর সব বিলুপ্ত। কলেজে মাঝেমধ্যে মিছিল হতো। বাষট্টিতে মার্শাল লর বিরুদ্ধে আন্দোলন। নরসিংদী তখন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একটা থানা। নারায়ণগঞ্জে তখন বাগমারের নেতৃত্বে একটা মিছিল হয়। সে তখন নারায়ণগঞ্জে ওয়েল এস্টাবলিশড। জোহা সাহেব, শামীম ওসমানের বাবা—উনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা। জোহা সাহেবকে কেন্দ্র করেই বাগমার পলিটিকস শুরু করে। তার সঙ্গে ছিল হাবিবুর রহমান, বাবু সারওয়ার। এদেরকে নিয়ে বাগমার নারায়ণগঞ্জে একটা মিটিং ডাকে। শিক্ষা আন্দোলনের সময় আমরা একসঙ্গে বসি, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে যাই।
>
> বাষট্টি সনের শেষ দিকে হাতিরদিয়ায় একটা মিটিং দিল রাজিউদ্দিন ভূঁইয়া, ওইখানকার জমিদার, মুসলিম লীগের নেতা। সেখানে যাবে সবুর খান, ওয়াহিদুজ্জামান, বশিরউদ্দিন মাজমাদার আর নারায়ণগঞ্জের এসডিও ড. সাত্তার। ওরা নরসিংদী আসার সাথে সাথে আমরা কালো পতাকা দেখিয়ে, ইট-পাটকেল, মারামারি শুরু হয়ে গেল। মুসলিম লীগের লোকেরা আমাদের লোকজনকে দিল এমন পিটুনি! ওরা হাতিরদিয়া চলে গেল।
>
> আপেল মাহমুদ তখন নরসিংদী কলেজে পড়ে। ওর বাড়ি কুমিল্লা। কিন্তু ওর মা চাকরি করতেন নরসিংদীতে, ওখানেই সেটেল করেন। ওর ভাই শাহ আলম নরসিংদী কলেজে পড়ান। আমি আর আপেল নরসিংদী থেকে পালিয়ে বাবুরহাটের কাছে এসে মমিন কোম্পানির লাস্ট বাসে ঢাকায় গেলাম। *ইত্তেফাক*-এর সিরাজুদ্দীন হোসেনের সামনে বসলাম। আমাদের কাছ থেকে সারা দিনের ঘটনার বিবরণ নিল। আমাদেরকে চিঠি লিখে দিল, তোমরা ঢাকা হলে চলে যাও। ওখানে গিয়ে দেখি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, ওবায়দুর রহমান—মানে ছাত্রলীগের টপ লিডারশিপ, পুরোটাই। ঢাকা হলে আসমত আলী সিকদার ছিল ভিপি। উনি আবার নরসিংদী কলেজের পার্টটাইম লেকচারার। আমরা ছাত্রলীগের মধ্যে ঢুকে গেলাম। আদর্শ-টাদর্শ না। আইসা গেছি, নেতা পেয়ে গেছি, আর কি।

তখন আমরা বাগমারের সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেলাম। বাগমার বোধ হয় নারায়ণগঞ্জ ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। পরে তো আমরা ইউনিভার্সিটিতে চলে আসি। আমি আর বাগমার এস এম হলে থাকতাম। ওইখানে বাগমার পরে কেন যেন আর অ্যাকটিভ থাকল না। একদিন শুনলাম সে ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন চলে গেছে। ছাত্ররাজনীতি থেকে তার ডিসট্যান্স হয়ে গেল। পরে সে রাজনীতিতে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে অ্যাকটিভ হলো। তখনই সে মার্জিনালাইজড হয়ে গেল। মাঝে মাঝে দেখা হতো।[২২]

আবদুল আজিজ বাগমার সুধীজনের স্নেহ, ভালোবাসা ও সাহচর্য পেয়েছেন। তাঁরা সমাজে অতি পরিচিত এবং দেশের চিন্তা ও মননের জগতে পুরোধা ব্যক্তিত্ব। বাগমারকে লেখা তাঁদের কয়েকজনের চিঠি ও নিবন্ধ থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

**মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

একালের ছেলেরা যদি ভবিষ্যতের নেতৃত্বদান করার মতো যোগ্যতা অর্জন না করে তা হলে আমাদের সমগ্র দেশের এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তুমি বিলেত গিয়েছ ভালোই করেছ। এইটুকু মনে রেখো, এটা তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ গতিপথের প্রস্তুতির কাল। এ ক'বছরে নিজেকে যেমনভাবে গড়ে তুলতে পারবে, তার ওপর নির্ভর করছে তোমার নিজের ভবিষ্যৎ এবং কিয়দংশে আমাদেরও ভবিষ্যৎ।

**আল মুজাহিদী, কবি-সাংবাদিক**

আমরা ভালোবাসি এই মাটি, মর্ত্য, মৃত্তিকা। আমরা আগুনের ভাষা দিয়ে লিখেছিলাম আগুনের ইস্তেহার। আমাদের শব্দপুঞ্জে উৎকীর্ণ হয়েছিল প্রথম রক্তিম পতাকাটি—স্বাধীনতার। আমার সুহৃদতম স্বাধীনতার সাগ্নিক পুরুষ আবদুল আজিজ বাগমার প্রকাশ করেছিলেন বাঙালির স্বাধীনতার অস্তিত্বের রসকীর্ণ পাণ্ডুলিপি। বাগমার আত্মগোপন করে থাকলেন, কারাবরণ করলেন দীর্ঘ সময়। কালের ধারায় কি এসব হারিয়ে যাবে? ইতিহাস পত্রে কি কোনো চিহ্ন থাকবে না? ডামাডোলে শুধু কেটে পড়বে কৃত্রিম, ভঙ্গুর, ঠুনকো, পলকা উপসর্গগুলো? না, ইতিহাস তো কেবল সত্যের মুখোমুখিই করে নিজেকে।

**খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক**
**বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান**

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। থাকতাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। হলজীবনের শুরুতে বাস করতাম পশ্চিম ভবনের ৮৯ নম্বর কক্ষে। আমার রুমমেট ছিল তুখোড় ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ এবং খান আবদুস সোবহান। হলজীবনে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত লক্ষ করেছি বাগমারের সদাব্যস্ত জীবন। বাগমারের নিয়মিত কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল সেসব বরেণ্য রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও বন্ধু সহযোদ্ধাদের সাথে দেখা করা এবং পরামর্শ গ্রহণ করা যারা তাকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যারা তাকে সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যারা তাকে সেই লক্ষ্যে কাজ করতে সাহায্য আর সাহস যোগাত। সম্ভবত তার সেই লক্ষ্য অর্জনের দুঃসাহসী অভিযানে নতুন অভিযাত্রীর সন্ধান লাভ করাও ছিল তার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ।

**প্রাণেশ কুমার মন্ডল, শিল্পী**

আমার শৈশব কেটেছে নারায়ণগঞ্জ শহরে। তখন থেকেই আবদুল আজিজ বাগমারের সঙ্গে পরিচয়। পরে ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে বাগমারের সাথে পুনরায় কচি-কাঁচার সদস্য হওয়ার সুবাদে সাক্ষাৎ হয়। ওই সময়েই বাগমার তাদের পরিকল্পিত একটি প্রতীক নকশা ভালোভাবে এঁকে দেওয়ার জন্যে বললে তখন আমার অপরিণত হাতে একটি প্রতীক নকশা করে দিই। যার নকশাটি করেছিলাম তার নাম ছিল অপূর্ব সংসদ।

**শান্তিনারায়ণ ঘোষ, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

দিন তারিখ আমার এখন মনে নেই। তবে বাগমার সাহেবের বিশ্লেষণ এখনো আমার মনে পড়ে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত অপূর্ব সংসদ পর পর তিনটি রিলিজ বের করে। প্রথম রিলিজ অনুযায়ী 'বাঙালি চায় স্বাধীনতা।' প্রশ্ন ছিল এটা কীভাবে আসবে। জনগণকেই এ সংগ্রামে সম্পৃক্ত করতে হবে। তার জন্য আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও যোগাযোগ রাখতে হবে। ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও', ১৯৬৫তে অরক্ষিত পূর্ব বাংলা, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি, সব মিলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মাঝে এক নতুন আশার সঞ্চার হলো। এ

আশাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্য অপূর্ব সংসদ কিছু পদক্ষেপ নেয়। এর মাঝে ছিল বিদেশি দূতাবাসগুলোর সাথে যোগাযোগ করে পূর্ব বাংলার দাবির পক্ষে সমর্থন আদায় করা। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতি বছর কিছু ছাত্রছাত্রী পাকিস্তানে বেড়াতে আসত। অপূর্ব সংসদ এসব ছাত্রছাত্রীদের কাছে সংসদের দাবি-দাওয়া বিশ্লেষণ করত। এ রকম দুটো সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। বনগ্রাম লেনের এক বাড়িতে গোপনে এ বৈঠক হতো।

**রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

ষাটের দশকের সেই অন্ধকার দিনগুলিতে যেসব অকুতোভয় নিরস্ত্র ছাত্র সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, আমার স্নেহভাজন ছাত্র আবদুল আজিজ বাগমার তাদের অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ শিক্ষকরূপে ষাটের দশকজুড়ে দলমত নির্বিশেষে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে যেসব ছাত্র বা ছাত্রনেতা প্রকাশ্যে বা গোপনে, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় ছিলেন, তাদের প্রায় সকলকেই ব্যক্তিগতভাবে জানার ও তাদের কার্যক্রম লক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে। যারা প্রথম আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, স্বাধীনতার কথা ভেবেছিলেন, তাদের অনেকেই ঝরে গেছেন, অনেকের কথাই আমরা ভুলে গেছি।

**বেগম সুফিয়া কামাল**

স্বাধীনতার প্রচারের কাজ আমরা শুরু করেছিলাম। অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকারের (অপূর্ব সংসদ) অপু-৩ ইতিহাসের ধারায় বাঙালি স্বাধীনতার ৩য় ইস্তেহার আমার সংক্ষিপ্ত নামে প্রচার করেছিল ১৯৬৫ সালের ১লা অক্টোবর। এ কাজে ছেলেদের কঠিন ত্যাগ, কষ্ট স্বীকার আমাকে আনন্দ দিয়েছে। ওদের সঙ্গে কাজের প্রয়োজনে দেশের অনেক স্থানে সভা করেছি।[২৩]

## ৫

অপূর্ব সংসদের কার্যক্রম চলাকালে ছাত্রদের মধ্যে একটি সমান্তরাল চক্রের কথা জানা যায়। এটি হলো সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমদের নেতৃত্বে একটি গোপন তৎপরতা, যাকে তাঁরা পরে

'নিউক্লিয়াস' নাম দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হলো, দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল কি না এবং তাঁরা একে অপরের কাজ সম্পর্কে জানতেন কি না। আবদুল আজিজ বাগমারের ভাষ্যে জানা যায়, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ ছাত্রনেতারা এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। অপু-৩ ইস্তেহারটি শেখ মনির পরামর্শে পরিমার্জন করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে আমি সিরাজুল আলম খানের মুখোমুখি হয়েছিলাম। বাগমারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সিরাজুল আলম খানকে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে বলেন :

> শুনেছি পরে। সে তো আমারে ধরায়া দিছে। এসবির এজেন্ট ছিল। রাজ্জাককেও সে ধরিয়ে দিয়েছিল। আই ওয়াজ দ্য লাস্ট ম্যান টু বি অ্যারেস্টেড ইন নাইনটিন সিক্সটি থ্রি। একসঙ্গে নিয়ে গেল হলে। ইঞ্জিনিয়ারিং হলে। ইঞ্জিনিয়ারিং হলগুলো তখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন। সেখানে তার পরিচিত এক রুমে থাকলাম। অন ফোর্থ ডে...বুঝলাম সে কাজটা করিয়েছে। ভুল বোঝার কোনো কারণ নাই—করিয়েছে। আবার ভুলও হতে পারে। অন্য কোনোভাবে সে হয়তো, কেউ হয়তো তাকে ফলো করেছে। তারপর এখানে এসে আমাকে ধরল। এটা হতে পারে। এমনি খারাপ ছিল না। খুব সোশ্যাল, অ্যাকটিভ ছিল।[২৪]

অপূর্ব সংসদের ব্যাপারে সিরাজুল আলম খান পরে শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। অপূর্ব সংসদের তিনটি ইশতেহার বেরিয়েছিল ২১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ থেকে ১ অক্টোবর ১৯৬৫। এ সময়টির বেশির ভাগ অংশজুড়ে সিরাজুল আলম খান ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। সিরাজুল আলম খানদের গোপন উদ্যোগের কথা যেমন এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বাইরে কেউ জানতেন না, তেমনি বাগমারের উদ্যোগের ব্যাপারেও এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকদের জানার কথা নয়। অপূর্ব সংসদ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সিরাজুল আলম খান বিরক্তি ও ক্ষোভ জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি বাগমারের বিরুদ্ধে তাঁকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। বিষয়টিকে হালকা করে দেখা যায় না। আবার তিনি এ-ও বলেছেন যে, এটা একটি সম্ভাবনা, 'হতে পারে।' এটি এমন একটি মনস্তত্ত্ব, যা বাইরে থেকে বোঝা কিংবা ব্যাখ্যা করা কঠিন, যদি না অভিযোগকারী সুনিশ্চিত প্রমাণ উপস্থাপন করেন। অনুমানের ওপর নির্ভর করে একজনের ওপর এ ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য ওই ব্যক্তিকে জনসমক্ষে হেয়, এমনকি ধ্বংস করে দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক এবং বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপকদের অন্যতম আবদুর রাজ্জাক

ভাষাশহীদ আবুল বরকত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর সহকর্মী শিক্ষক সরদার ফজলুল করিমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আবুল বরকত পুলিশের চর (ইনফর্মার) ছিলেন। তিনি অবশ্য সরদার ফজলুল করিমকে এটি ছাপাতে নিষেধ করেছিলেন। নিষেধ না মেনে সরদার এটি সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* ছেপে দেন। এ নিয়ে বেশ টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি যখন পরে গ্রন্থাকারে বের হয়, তখন এ 'তথ্য'টি বাদ দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, অধ্যাপক রাজ্জাকের দেওয়া এই তথ্যের কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল কি না। সাক্ষাৎকারে তিনি এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির করেননি এবং সরদারও এ বিষয়ে জানতে চাননি। অধ্যাপক রাজ্জাকও একটি মিথ, এটি অনেকেই মনে করেন। এ বিষয়ে খোলাখুলি লিখেছেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, অধ্যাপক রাজ্জাক যা বলবেন, তা-ই সত্য বলে মেনে নিতে হবে কি না। এ দেশে যে গুরুমুখী বা গুরুবাদী জ্ঞানচর্চা হয়, সেখানে গুরুর বচন শিষ্যরা বিনা প্রশ্নে মেনে নেন।

সিরাজুল আলম খানের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে বাগমারের নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা আছে। যত দূর জানা যায়, ১৯৭১ সালের আগে সিরাজ শুধু একবারই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে। বাগমারও ওই সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বাগমার অবশ্য একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আটক ছিলেন।

সিরাজুল আলম খানের গ্রেপ্তার সম্পর্কে বাগমার বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। ওই সময় তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলী সাইদুর রহমানের বাসায় থাকতেন। তখন তিনি এবং আরও অনেকেই পলাতক জীবন যাপন করতেন। সবার নামেই হুলিয়া। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার মাঠে রাতের অন্ধকারে গোপন সভা করতেন। বাগমার গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে বলেন :

> এই অবস্থায় সিরাজুল আলম খান আমার গোপন আস্তানায় আসার সংকেত পাঠালেন। তিনি আবু হেনা ভাইকে সাথে নিয়ে নিশীথে এসে উপস্থিত।
>
> আমরা তখন ঘুমুচ্ছি। পাশের রাস্তায় ঠেলাগাড়ির স্ট্যান্ড ছিল। ঠেলাগাড়িওয়ালারা ঝগড়া করছে। হঠাৎ করে সব শান্ত হয়ে গেল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভাবলাম এবার ঘুমুতে পারব।
>
> বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্নে যখন কোনো আলাপ-আলোচনা হতো, লক্ষ করে দেখেছি সিরাজুল আলম খানের স্পষ্ট মৌন সমর্থন উপস্থিত। এই দুর্বলতা ছিল আবদুর রাজ্জাকেরও।

ভোর রাতের কিছু পূর্বে হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে। ফ্ল্যাটের দরজা ছিল একটি। আমরা সবচেয়ে উপরের তলায়। রান্নার একটি ছেলে ছিল। সে দরজা খুলে দিল। সামনে পুলিশ। ছেলে হতভম্ব। সে কোনো কথা বলছে না। পুলিশ জিজ্ঞেস করল, সাহেব কোথায়? কাজের ছেলেটি জবাব দিল, 'নাই'। ঘরে কে আছেন? 'মেহমান'। তোমার মেহমানের সঙ্গে আমরা দেখা করব—বলেই পুলিশ দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করল। আমার ও সিরাজুল আলম খানের ঘরে নক করতে থাকে। বিরামহীন নক। উভয়ে দরজা খুলে দিলাম। একাধিক পুলিশের লোক ঘরে প্রবেশ করল। একজন বললেন, এবার আমাদের মেহমান, চলুন। অনেক কষ্ট পেয়েছি। সবাইকে মেহমান বানিয়েছি। কেবল আপনারা দূরে ছিলেন। অগত্যা নিচে এসে দেখি সে কী কাণ্ড! পুরো এলাকা ঘেরাও দেওয়া। শত শত পুলিশ, সর্বত্র পুলিশ।

আমাদের দুজনকে আলাদা গাড়িতে উঠিয়ে রওয়ানা হলো। সকাল হওয়ার পূর্বেই গোয়েন্দা দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। আলাদা কক্ষে আমাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিন তিনেক জিজ্ঞাসাবাদ চলে। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন। সব প্রশ্নের জবাব এমনভাবে দিয়েছি যে আসলে কিছুই জানি না। অগত্যা জিজ্ঞেস করল, 'পল্টন ময়দানে (আউটার স্টেডিয়াম) শেখ মুজিব কেবল বাংলা বাংলা বলে কেন?' বললাম, 'এই প্রদেশের আদি ও আসল নাম ছিল বাংলা। তাই হয়তো উনি ওই নামে ডাকেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট হবার পর নাম পরিবর্তন হয় পূর্ব পাকিস্তান।' আমাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করেনি। তবে শরীরের ওপর ধকল ছিল অসহনীয়। তিন দিন ঘুমাতে দেয়নি। শুতে দেয়নি। একটি চেয়ার। দাঁড়িতে থাকতে হয়েছে। বেশির ভাগ সময় চেয়ার বাইরে সরিয়ে রাখা হতো। এক পাতা করে ইংরেজি ও বাংলা হাতের লেখা আদায় করে। ছোট ও বড় হাতের লেখা। হাজারো প্রশ্ন।

অতঃপর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২ নং খাতায় ভর্তি হলাম। নিরাপত্তা বন্দী। জনগণের নাম রাজবন্দী। এক দিন পর অসুস্থ হয়ে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলাম। ওখানে সাক্ষাৎ হলো শেখ ফজলুল হক মনি, মোশারফ হোসেন, হাবিবুর রহমান, কাজী জাফর আহমদের সঙ্গে।...

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (১ জানুয়ারি ১৯৬৫) সাত দিন পূর্বে আমাকে ও আসমত আলী সিকদারকে মুক্তি দেওয়া হলো। কিন্তু

মামলা থাকায় এবং জামিন না থাকায় ওল্ড ২০ সেলে পাঠানো হলো। এটা ছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্যতম আটককেন্দ্র। সেলে একা থাকার বিড়ম্বনা। জেলে থাকা সত্ত্বেও জামিন বাতিল করা দুঃখজনক পদ্ধতি।

দু' নম্বরে আমাদের সঙ্গে যাঁরা বন্দী ছিলেন এবং যাঁদের কথা স্মরণে আছে তাঁরা হচ্ছেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি, ওবায়দুর রহমান, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শহীদুল হক মুন্সী, সওগাতুল আলম সগির, এনায়েতুর রহমান, আল মুজাহিদী, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, এম এ রেজা, আসমত আলী সিকদার, কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, বদরুল হক, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, রেজা আলী, আলী হায়দার, বদিউজ্জামান বড় লস্কর, আবদুর রহিম আজাদ, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, গিয়াস কামাল চৌধুরী প্রমুখ।[২৫]

বাগমারের ব্যাপারে সিরাজুল আলম খান যে অভিযোগ করেছেন, তার পেছনে কি কোনো সত্যতা আছে, নাকি তা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা ঈর্ষার প্রতিফলন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সিরাজুল আলম খান আমাকে বলেছিলেন, আবদুর রাজ্জাকের গ্রেপ্তারের পেছনেও বাগমারের হাত আছে।

১৯৬৪-৬৫ সালের কোনো এক ঈদের দিনে রাজ্জাক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বাগমারকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে কোনো তারিখ ছিল না। বোঝা যায়, চিঠিটি জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। চিঠির বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে বাগমারের প্রতি রাজ্জাকের বিশ্বাস ছিল অটুট।

আজিজ,

শুভেচ্ছা রইল—সেই তথাকথিত আনন্দের দিনের। কয়েক দিন আগে তোর চিঠি পেয়েছি। এমনি দু'একখানা চিঠি পেলে যে কতটুকু আনন্দ পাই তা ভুক্তভোগীদের নিকট ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করি না। তুই এখান থেকে যাওয়ার পর অনেক কিছুই ঘটেছে—সাক্ষাতে বলব।

তোর প্রতি যে আমার কতটুকু বিশ্বাস আছে তা তোকে অনেক আগেই বলেছি। কারও কথায় কিছু মনে না করে কাজ করে গেলে সুখী হব। নিজের দায়িত্ব পালন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর একটা কথা সব সময় মনে করি, সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে যে

কাজ চালিয়ে যায় সে সত্যিকারের মানুষ।

তোর আব্বা ও আম্মার অসুখের খবর শুনে আমরা উদ্বিগ্ন আছি। আশা খোদার ইচ্ছায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবে। ওনাদের সুস্থতার খবর জানাস।

আমরা কেউ মানসিক দিকে ভাল নাই। অবশ্য শারীরিক দিক দিয়ে কেউ কেউ ভাল। তোর বন্ধুবান্ধবদের জন্য আমার ঈদ মোবারক,—কুশলান্তে

ইতি

রাজ্জাক ভাই[২৬]

৬

অপূর্ব সংসদ সম্পর্কে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার ব্যাপারে এটি ছিল একটি উদ্যোগ। প্রক্রিয়াটি গোপন হলেও অনেকেই এর সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে জানতেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ভেতরেই এ উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল। এর কেন্দ্রে ছিলেন আবদুল আজিজ বাগমার। তিনি বিদ্বজ্জনের সঙ্গে একটি সাংগঠনিক ও আদর্শিক যোগাযোগ তৈরি করতে পেরেছিলেন।

সমসাময়িক রাজনীতিতে খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারে ঝুঁকি ছিল অনেক। তারপরও তিনি অনেকের সমর্থন, বিশেষ করে তাঁর শিক্ষকদের সহানুভূতি ও আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি কখনোই দাবি করেননি যে তিনি একাই সবকিছু করেছেন। অনেক বিদ্বজ্জন এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। অপু-৩ ইশতেহারে নতুন দেশের নাম 'বাংলাদেশ' এবং জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নির্বাচন করার বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ছয় বছরের ব্যবধানে এটি বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

বাগমার ছাত্রলীগের মধ্যে কোনো উপদল তৈরির চেষ্টা করেননি। ফলে এটিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘমেয়াদি কোনো চক্র গড়ে ওঠেনি। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস কিংবা রোমান্টিকতার সারল্যে মাখা ছিল এ উদ্যোগ। বড় পরিসরে এটি সাড়া জাগাতে না পারলেও এ উদ্যোগের তথ্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবির মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পথ ধরে স্বাধীনতার একটি আগাম পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। বাগমার এর সঙ্গে নিজেকে বিলীন করে দেন। তখনই বাগমারের উদ্যোগটি চাপা পড়ে যায়। বিষয়টি হয়তো কখনোই জনসমক্ষে আসত না, যদি না

১৯৯৯ সালের অক্টোবরে তিনি *স্বাধীনতার স্বপ্ন: উন্মেষ ও অর্জন* নামে একটি বই লিখে প্রকাশ করতেন। বইটির মুখবন্ধে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান চমৎকার একটি মন্তব্য করেছিলেন—'স্বাধীনতা শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো তা জানতে হলে এ বইটি পড়তে হবে।' বইটি প্রকাশিত হওয়ার সময় 'অপূর্ব সংসদের' অনেকেই জীবিত ছিলেন। মৃত ব্যক্তিদের ঢালাওভাবে উদ্ধৃত করে যা খুশি লিখে দেওয়ার প্রবণতা তিনি সযত্নে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র

১. *Commission on National Education*, Government of Pakistan Press, Karachi, 1959
২. Ibid
৩. বাগমার, আবদুল আজিজ (২০০৬), *স্বাধীনতার স্বপ্ন: উন্মেষ ও অর্জন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৩০-৩১
৪. ওই, পৃ. ৩২-৩৩
৫. ওই, পৃ. ৩৪-৩৫
৬. ওই
৭. ওই, পৃ. ৩৭
৮. ওই, পৃ. ৫৬
৯. ওই, পৃ. ৬৩-৬৪
১০. ওই, পৃ. ৭২-৭৩
১১. শরীফ, আহমদ (১৯৭০), *স্বদেশ অন্বেষা*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা; শরীফ, আহমদ (২০১৩), *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, সংকলক: নেহাল করিম, মহাকাল, ঢাকা, পৃ. ১১৬, ১২৪; বাগমার, পৃ. ৮৪-৮৫
১২. ওই
১৩. শরীফ (২০১৩), পৃ. ১২২-১২৩
১৪. *আহমদ শরীফকে লেখা নির্বাচিত পত্রাবলি-১*, প্রথম খণ্ড ১৯৩৯-১৯৭৯ (২০১৭), সংকলন ও সম্পাদনা: নেহাল করিম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৫৪
১৫. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *অপূর্ব সংসদ-এর কথা*, *প্রথম আলো*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০
১৬. বাগমার, পৃ. ১১৩-১৩৯
১৭. ওই

১৮. ওই, পৃ. ৩৯৪
১৯. *আহমদ শরীফকে লেখা নির্বাচিত পত্রাবলি-১*, পৃ. ১৫২
২০. বাগমার, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬
২১. শরীফ, আহমদ (১৯৯৮), *বিশ শতকে বাঙালী*, ঈক্ষণ, ঢাকা; নবজাতক (কলকাতা), ১৯৯৯; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১
২২. রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ
২৩. বাগমার, পৃ. ৩১৭-৩১৮
২৪. সিরাজুল আলম খান
২৫. বাগমার, পৃ. ৬৮-৭০
২৬. ওই, পৃ. ৪০০


www.amarboi.com

# পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্ট

ষাটের দশকের শুরুতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি গোপন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে কথা না বললে আমি হয়তো বিষয়টি জানতেই পারতাম না। কেননা, এ ঘটনার উল্লেখ সিরাজুল আলম খান কিংবা আবদুর রাজ্জাকের মুখে কখনো শুনিনি।

আমি শুনেছিলাম, ছাত্ররাজনীতিতে সিরাজুল আলম খানের উত্থান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাত ধরে। পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের শুরুতে আওয়ামী বৃত্তের তরুণদের মধ্যে শেখ মুজিবের পরই জনপ্রিয়তায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন তুঙ্গে। ২০১৪ সালে আমি আওয়ামী লীগ নিয়ে একটি গবেষণামূলক কাজে হাত দিই। তো ওই সময়ের ইতিহাসের সন্ধানে ২০১৫ সালের ৯ অক্টোবর আমি একদিন হাজির হই তাঁর গুলশানের বাসায়। আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাহ মোয়াজ্জেম ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায় তুলে ধরেন।

পূর্ব বাংলা স্বাধীন করার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান যে কত বেপরোয়া ছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের ভাষ্যে। দিন-তারিখ মনে নেই শাহ মোয়াজ্জেমের। এতটুকু স্মরণ আছে যে তখন আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

> মহিউদ্দিন আহমদ : শেখ মুজিবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল? তিনি কী চোখে দেখতেন আপনাকে?
>
> শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন : আমি থাকতাম নিমতলী, নিম ভিলায়। ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোয়াজ্জেম হোসেন একসময় ওখানে একটা হোটেল দিয়েছিলেন। ওটা ছেড়ে দিলেন আমাদেরকে। ওই যারা সিএসপি হওয়ার জন্য পরীক্ষা দেবে, ল পড়বে, হোস্টেলে জায়গা পায়

না। বাড়ির অবস্থা ভালো, নিম ভিলায় একেকজন একেকটা রুম নিয়ে থাকে। থাকার ব্যবস্থা আছে, খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। নাজিমউদ্দিন রোডে একটা ভালো খাবার দোকান ছিল। ওখানে গিয়ে বা ওখান থেকে খাবার আনিয়ে খেতাম। তখন আমি ছাত্রলীগের সেক্রেটারি, রফিকুল্লাহ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট। রফিকুল্লাহ সিএসপি হয়ে গেল। আমি প্রেসিডেন্ট হলাম।

মুজিব ভাই তখন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি, আমার নেতা। উনি আমাকে এমএ পড়তে না করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুই ল পড়বি, আমার সঙ্গে রাজনীতি করবি। এমএ পড়ে লাভ কী?' তো আমার এমএ পড়ার শখ। ওনাকে না জানিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। জেনারেল হিস্ট্রি। এমএ পরীক্ষায় থার্ড হয়েছিলাম।

একদিন সকালে, কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে। মওলা ছিল আমার খেদমতগার। বললাম, মওলা, দেখ তো, এত সকালে কে। পরে আসতে বল। মওলা দরজা খুলেই বলে, 'নেতা, লিডার।' তাকিয়ে দেখি মুজিব ভাই। পেছনে গাজী গোলাম মোস্তফা। সঙ্গে একটা গ্রিন মডেল র‍্যালি সাইকেল। লিডার, আপনি এ সময়? উনি আমার কান চেপে ধরে বললেন, 'তুই না জানায়া এমএতে ভর্তি হইছস, পরীক্ষা দিছস, আমি জানব না?' আমি পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম। বললাম, মাফ করে দেন। মুজিব ভাই বললেন, 'তুই খুব ভালো রেজাল্ট করছস। এই দেখ আমি তোর জন্য প্রেজেন্টেশন নিয়া আসছি, সাইকেল।' আই ওয়াজ মোর দ্যান হ্যাপি।

মহি: আমরা শুনেছি ওই সময় দেশ স্বাধীন করার জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে আপনি যতটুকু জানেন, বলবেন কি?

মোয়াজ্জেম: মুজিব ভাই একটা লিফলেট ড্রাফট করেছেন 'পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্ট' নাম দিয়ে। সাইকেল চালিয়ে নিজেই প্রেসে গিয়ে ছেপেছেন। আমাকে ডাকলেন। আমি ওই সাইকেল চালিয়েই গেলাম। উনি আমার হাতে এক বান্ডিল লিফলেট দিয়ে বললেন, 'তোর বিশ্বস্ত লোক নিয়া এগুলি ডিস্ট্রিবিউট করবি।' লিফলেটটি লেখা হয়েছিল ইংরেজিতে। আমি এটা দেখালাম রফিকুল্লাহ চৌধুরীকে। উনি লিফলেটটা দেখলেন। বললেন, 'বানান ভুল আছে, টেনস কয়েক জায়গায় ভুল। বাট ইট ক্যারিজ দ্য মিনিং।'

আমি পাঁচজনের একটা টিম করলাম। কে এম ওবায়দুর রহমান, সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, ফরিদপুরের আনিস

আর আমি নিজে। রাত ১২টার পর বের হতাম। ধরা পড়লে স্ট্রেট ফাঁসি। কিন্তু নেতার নির্দেশে আমরা এটা করেছি। চাদর গায়ে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বিভিন্ন এমবাসির গেটের সামনে ফেলে দিয়ে চলে আসতাম।

এখন অনেকেই স্বাধীনতার কথা নানাভাবে মনের মাধুরী মিশিয়ে বলে। বাট দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। বাংলাদেশপন্থী কেউ ছিল না, আমরাই ছিলাম। শেখ সাহেবের অনুসারীরাই ছিলাম। বামপন্থীরা আমাদের বলত ইললিটারেট গ্র্যাজুয়েটের শিষ্য।

মহি : সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আপনার পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা হলো কীভাবে?

মোয়াজ্জেম : একদিন খবর পেলাম ফজলুল হক হলে নতুন একটা ছেলে এসেছে। সারা দিন তাস খেলে। তার পার্টনার বদল হয়। কিন্তু তার বদল হয় না। কী ব্যাপার? আমার কৌতূহল হলো। তাকে ডেকে পাঠালাম এবং মুহূর্তেই তাকে পছন্দ করে ফেললাম। তাকে রিক্রুট করলাম। এভাবেই সিরাজুল আলম খান আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হলো। ও ছিল খুব ভালো, হার্ডওয়ার্কিং। দিন-রাত কাজ করত।

মহি : উনি তো বলছেন, উনি ছাত্রলীগের মধ্যে স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস তৈরি করেছেন ১৯৬২ সালে। তো আপনারা শেখ মুজিবের দেওয়া স্বাধীনতার লিফলেট একসঙ্গে বিলি করলেন তারও আগে। এদিকে উনি বলছেন, উনি এটা শুরু করেছেন। উনি তো আপনার কথা বলেন না। এটা কি ওনার মনের সংকীর্ণতা?

মোয়াজ্জেম : তা বলতে পারব না। হয়তো তার মেমোরিতে এটা নেই। মনের সংকীর্ণতাও হতে পারে। তবে ও আমার খুব আস্থাভাজন ছিল। আমিই তো ওকে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি বানিয়েছিলাম।[১]

তারিখটি শাহ মোয়াজ্জেমের মনে না থাকলেও এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পাওয়া যায় আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে। ওই সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। থাকেন ফজলুল হক মুসলিম হলে। চট্টগ্রামের ইতিহাস গবেষক মুহাম্মদ শামসুল হককে ২০০৭ সালের ২২ মার্চ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি সময়টির উল্লেখ করে বলেন :

> ১৯৬১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের কথা। একদিন মনি ভাই (শেখ ফজলুল হক মনি) আমাকে ডেকে কাগজে মোড়ানো কতগুলো প্রচারপত্র দিয়ে বললেন, 'এগুলো রাত তিনটার দিকে ভার্সিটি এলাকার হলে হলে, ঘরে ঘরে খুবই সাবধানে বিলি করতে হবে।' তিনি চলে যাওয়ার পর সেগুলো খুলে দেখে প্রথমে আমি ঘাবড়ে

যাই। কারণ সেখানে যা লেখা—ধরা পড়লে ১৪ বছর জেল নির্ঘাত। শিরোনাম ছিল 'স্বাধীন-পূর্ব পাকিস্তান কায়েম কর।' নিচে লেখা 'সংগ্রামী জনতা'। সেখানে বাঙালিদের ওপর পশ্চিমাদের শাসন-শোষণ এবং সশস্ত্র বাহিনী ও রাজনীতিতে কীভাবে বাঙালিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে তাঁর বিবরণ দেওয়া ছিল। এসব শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য বাঙালি ছাত্র-জনতাকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানানো হয় ওই প্রচারপত্রে। আমার মনের ভেতর যেহেতু স্বাধীনতার চেতনাটা ছিল, তাই সাহস করে রাতের মধ্যে ফজলুল হক হলের বিভিন্ন ঘরে গিয়ে দরজার নিচ দিয়ে প্রচারপত্র ঢুকিয়ে দিয়ে চলে আসি। বাকিটুকু একটি টয়লেটের বেসিনের ওপর রেখে রুমে এসে শুয়ে থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। সকালে আমার রুমমেট বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বলল, বাইরে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের লিফলেট পাওয়া গেছে। আমি কিছু না জানার ভান করে বললাম, এগুলো বিপজ্জনক, বাইরে ফেলে দে, কাউকে কিছু বলিস না।[২]

## ২

১৯৬১ সালের শেষের দিকে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতার মধ্যে কয়েকটি গোপন বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মণি সিংহ ও খোকা রায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বৈঠকে তাঁরা জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হন। এসব বৈঠক সম্বন্ধে খোকা রায় বলেছেন :

> শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলেছিলেন যে পাঞ্জাবের 'বিগ বিজনেস' যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছিল ও দাবিয়ে রাখছিল, তাতে 'ওদের সাথে আমাদের থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগ্রামে ওই দাবি রাখতে হবে', ইত্যাদি।
>
> তখন আমরা (আমি ও মণিদা) শেখ মুজিবকে বুঝিয়েছিলাম যে কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করে, কিন্তু সে দাবি নিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পরিস্থিতি তখনো ছিল না।

> 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি নিয়ে ওই সব আলোচনার পরের বৈঠকে শেখ মুজিব আমাদের বলেছিলেন, 'ভাই, এবার আপনাদের কথা মেনে নিলাম। আমাদের নেতাও (অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী সাহেব) আপনাদের বক্তব্য সমর্থন করেন। তাই এখনকার মতো সেটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কথাটা থাকল।'[৩]

'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ' নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আলোচনা ছিল। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত 'কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট ও প্রস্তাবাবলি'তে বিষয়টির উল্লেখ আছে।

বিষয়টি নিয়ে আমি সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। এত দিন শুনে এসেছি, তাঁরা তিনজন বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য নিজেদের মধ্যে একটি প্রক্রিয়া চালু করেছিলেন ১৯৬২ সালে। অথচ এর আগের বছর তিনি নিজেই স্বাধীনতার দাবিতে লেখা একটা লিফলেট প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন, যা ছিল মুজিবের লেখা। বিষয়টি আমি ইতিমধ্যে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে জেনেছি বলে তাঁকে জানালাম। এবার তিনি মুখ খুললেন।

> সিরাজুল আলম খান: ঘটনা একটা আছে। একদিন দুপুরে মোয়াজ্জেম ভাই বললেন যে, রাত আটটার দিকে সেন্ট্রাল পার্কে তুই আর রাজ্জাক আসবি। মনিকেও আসতে বলেছি।
>
> মহিউদ্দিন আহমদ: সেন্ট্রাল পার্ক কোনটা?
>
> সিরাজ: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে।
>
> মহি: আচ্ছা, রমনা পার্ক।
>
> সিরাজ: হ্যাঁ। রমনা পার্ক। সেখানে আসবি। গেলাম। আমরা পাঁচজন। আমাদের একটা লিফলেট দিল। বললেন, দেখো একটু। ল্যাম্পপোস্টের নিচে গিয়ে দেখলাম। বানান ভুল। পড়লাম। একেক হলের জন্য একেকজনকে দায়িত্ব দিল। আমি ঢাকা হল। ফজলুল হক হল হলো রাজ্জাকের। জগন্নাথ কলেজ হলো মনির। রাতেই বিলি করে দিয়েছি। বিলি মানে রুমে রুমে। সামনে দেওয়ার মতো অত সাহস ছিল না।
>
> মহি: এটা তো মার্শাল ল থাকার সময়?
>
> সিরাজ: হ্যাঁ। ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট। একটা লিফলেট, ওয়ান-সিক্সটিনথ সাইজ।
>
> মহি: আমি মোয়াজ্জেম ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওনার বইয়ে উনি এটা লিখেছেন। উনি লিখেছেন—পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্ট।
>
> সিরাজ: হতে পারে।

মহি : একটা লিফলেট। শেখ মুজিব তাঁকে দিয়েছেন। উনি আমাকে বলেছেন—আমি পাঁচজনের টিম করলাম—আমি, মনি, ওবায়েদ, সিরাজ আর ফরিদপুরের একজন, ছাত্রলীগের আনিস। এই পাঁচজন মিলে আপনারা বিভিন্ন এমব্যাসির সামনে ফেলে এসেছেন।

সিরাজ : এমবাসি না, হলে হলে।

মহি : কিন্তু লিফলেটটা তো তাঁকে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব। আমি ডেটগুলো চেক করেছি। এর আগে এবং পরে শেখ মুজিব ওয়াজ ইন দ্য প্রিজন। মাঝখানে দেড়-দুই মাসের একটা ফাঁক আছে। ওই সময় এদের সঙ্গেও শেখ মুজিবের একটা ডায়ালগ হয়েছিল। মণি সিংহ এবং খোকা রায়, মানিক মিয়াসহ।

সিরাজ : মানিক মিয়া কি না জানি না। কমিউনিস্টদের সঙ্গে...

মহি : শেখ মুজিব আর মানিক মিয়া, অন্যদিকে মণি সিংহ আর খোকা রায়, এই চারজন। এদের মিটিং হয়েছে কয়েক দিন।

সিরাজ : অ্যাবাউট...

মহি : খোকা রায়ের বইতে এ প্রসঙ্গটি আছে।

সিরাজ : আমাদের যেদিন লিফলেটটা দিলেন। এই পার্কে, সেন্ট্রাল পার্কে, রাত আটটার দিকে। মোয়াজ্জেম ভাই তো আছেনই—আমি, রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি...

মহি : ওবায়দুর রহমান?

সিরাজ : না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন, সৈয়দ আকবর। তাকে মেরে ফেলেছে একাত্তরে, মার্চের ২৬ বা ২৭ তারিখে। ছাত্রলীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিল। আমি তো তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি।

মহি : সৈয়দ আকবর আপনার ব্যাচমেট?

সিরাজ : কনটেম্পোরারি। মনি, ওবায়দুর রহমান, সৈয়দ আকবর, আমি, আসমত আলী শিকদার—আমরা ব্যাচমেট।

মহি : এটা ইন্টারেস্টিং। আপনি আগে বলেননি।

সিরাজ : আমাদের এই সাক্ষাৎটা আধা ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়েছিল। লিফলেটটা ছিল পরিষ্কারভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার আহ্বান জানিয়ে লেখা। মোয়াজ্জেম ভাই বললেন, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে হবে।

আমরা চার ভাগে ভাগ হয়ে রমনা পার্ক থেকে চলে গেলাম। যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী লিফলেট নিলাম। আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। পরদিন ছাত্ররা ক্যানটিনে নাশতা খেতে যাওয়ার সময় একটা করে লিফলেট পড়তে পড়তে যাচ্ছে।

এর কয়েক দিন পর মোয়াজ্জেম ভাই, মনি এবং আমাকে মুজিব ভাইয়ের বাসায় রাত ১১টার দিকে আসতে বললেন। দেখলাম বাসায় একটা জিপগাড়ি। মুজিব ভাই শার্ট-প্যান্ট পরা। আমাদের তিনজনের গলায় হাত দিয়ে বললেন, ভালো থাকিস। উনি জিপে উঠে চলে গেলেন।

আমাদের বুঝতে বাকি রইল না, মুজিব ভাই কিছু একটা করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুজিব ভাইয়ের আগরতলা যাওয়ার ঘটনাটিতে আমি কাজের একটা লিংক খুঁজে পাই। তখন থেকে ভারত মুজিব ভাইকে একধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া শুরু করে।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধকালে আমাদের প্রধান কার্যালয় ছিল কলকাতার ভবানীপুরে ২১ রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড, অর্থাৎ চিত্তদার (চিত্তরঞ্জন সুতার) বাড়ি। আমরা ওখানেই থাকতাম। সে সময় একদিন আলোচনাকালে চিত্তদা বলেছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধুকে ১৯৬১-৬২ সাল থেকেই আর্থিক সহযোগিতা দিতেন। সে সহযোগিতা স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৪]

## ৩

শাহ মোয়াজ্জেমের কথায় বোঝা যায়, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা নিয়ে শেখ মুজিবের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা ছিল। এ জন্য তিনি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। এর একটি বিস্ময়কর বিবরণ পাওয়া যায় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের তৎকালীন উপহাইকমিশনের পলিটিক্যাল অফিসার শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জির কাছ থেকে। ব্যানার্জি পুরান ঢাকায় চক্রবর্তী ভিলায় থাকতেন। পাশের বাড়িতেই ছিল *ইত্তেফাক* অফিস। ১৯৬২ সালের ২৪ ডিসেম্বর মাঝরাতে *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়া একটি ছেলেকে পাঠিয়ে ব্যানার্জিকে *ইত্তেফাক* অফিসে ডেকে আনেন। মানিক মিয়ার সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিব। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তাঁরা কথা বলেন। ব্যানার্জি দেখলেন, একপর্যায়ে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়ার কথাবার্তার ধরন বদলে গেল। তাঁরা কিছু একটা বলতে বা দেখাতে চাইছেন। ব্যানার্জি জানতে চান তাঁরা উঁচুপর্যায়ের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছাতে চাচ্ছেন কি না। মুজিব মুখ খুললেন। বললেন, এই বৈঠক ডাকার উদ্দেশ্য হলো, তাঁরা ব্যানার্জির মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা গোপন চিঠি পাঠাতে চান। মুজিব চিঠিটা ব্যানার্জির

হাতে দিলেন। তাঁর মধ্যে তাড়াহুড়ো ছিল। চিঠিটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ব্যক্তিগতভাবে সম্বোধন করে লেখা। ভূমিকার পর সরাসরি একটা কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। মুজিব বললেন, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করবেন। মানিক মিয়া *ইত্তেফাক*-এ লেখার মাধ্যমে প্রচারকাজ চালাবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চের মধ্যে মুজিব লন্ডনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রবাসী সরকার গঠন করবেন। চিঠির শেষ প্যারাগ্রাফে নৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন এবং সাজসরঞ্জাম চেয়ে নেহরুকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মুজিব গোপনে নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে চান।[৫]

চিঠি পাঠানো হলো। ভারত তখন চীনের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত। দিল্লি থেকে খবর এল, মুজিবকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। মুজিব ভাবলেন, ঢাকায় ভারতীয় উপহাইকমিশনের আমলাদের কারণেই দেরি হচ্ছে। ধৈর্য হারিয়ে তিনি কৌশল পাল্টালেন। গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে আগরতলায় গেলেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। আগরতলায় মুজিবকে রেখে শচীন্দ্রলাল সিংহ দিল্লি যান এবং নেহরুর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন। চীনের সঙ্গে যুদ্ধের পর নেহরু আরেকটি ফ্রন্ট খুলতে চাননি। শচীন্দ্রলাল সিংহ আগরতলা ফিরে এসে মুজিবকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তা ভারতের ঢাকা উপহাইকমিশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেহরুর পরামর্শ ছিল, এরপর থেকে মুজিব যেন ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমেই যোগাযোগ করেন, আগরতলার মাধ্যমে নয়।[৬]

শচীন্দ্রলাল সিংহের ভাষ্যে এবং শেখ মুজিবের জীবনীকার এস এ করিমের বিবরণে জানা যায়, শেখ মুজিব আগরতলা গিয়েছিলেন ১৯৬৩ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে। তিনি সেখানে ছিলেন ১৫ দিন। তাঁর আগরতলা মিশন সম্বন্ধে দলের সহকর্মীরা এবং সরকারের গোয়েন্দারা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে।[৭]

১৯৯১ সালে মফিদুল হক দিল্লিতে শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করলে তিনি ঘটনাটি নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন। সেই ভাষ্য ফয়েজ আহমদ উল্লেখ করেছেন তাঁর *আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ* বইয়ে।[৮]

এ প্রসঙ্গে একটি ভিন্নমত আছে। শেখ মুজিব ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ত্রিপুরা গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন ছাত্র ইউনিয়নের ওই সময়ের নেতা রেজা আলী। শেখ মুজিবের ত্রিপুরা মিশনে তিনিও যুক্ত ছিলেন। তাঁর ভাষ্য এ রকম :

> মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ বা ২ তারিখের দিকে উনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'তুই আমার সঙ্গে একখানে যাবি।' যত দূর মনে পড়ে, ৩ তারিখেই রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোথায় যাব, আমাকে এ ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই বলা হয়নি। যাওয়ার আগের মুহূর্তে আমাকে তিনি বলেছিলেন একটা ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট ঠিক করতে। তখনকার দিনে কুপে হতো। দুজন থাকতে পারত। নারায়ণগঞ্জ থেকে দুজন কুপেতে উঠবে। এই অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাজে তখন আমি মর্তুজাকেও (প্রকৌশলী গোলাম মর্তুজা) জড়িয়েছিলাম। আমি গাড়িতে করে তাঁকে নিয়ে যাই টঙ্গী স্টেশনে। গাড়ি চালিয়েছেন অন্য দুজন। স্টেশনের পেছন দিকে তখন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমরা দাঁড়িয়ে। নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা দুজন নেমে গিয়েছিল। আমি আর মুজিব ভাই ট্রেনে উঠে পড়ি।
>
> আমার দায়িত্ব ছিল মুজিব ভাইকে নিয়ে সিলেটের ট্রেনে উঠে যাওয়া। উনি তখনো বলেননি কোথায় নামবেন। সারা রাত আমরা ট্রেনে বসে ছিলাম। রাত তিন-চারটার দিকে গাড়ি যখন শ্রীমঙ্গলে এসে থামল, তিনি তখন বললেন, 'তুই দরজাটা খুলে একটু দাঁড়া।' দরজা খুলেই দেখি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী। উনি ওখানে থাকবেন, সেটা আমি জানতাম না। তিনি সম্পর্কে আমার মামা হন। তো তাঁর হাওলায় মুজিব ভাইকে দিয়ে আমি সিলেটে চলে গেলাম। তখন আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেন ওখানে যাচ্ছিলেন উনি। আমাকে যেহেতু কিছু বলেননি, সে জন্য আমি জিজ্ঞেসও করিনি কখনো। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা তাঁর ইন্ডিয়ায় যাওয়ার একটা উদ্যোগের অংশ। শুধু ফরহাদ ভাইকে বিশ্বাস করে বলেছিলাম যে মুজিব ভাই আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে বলেছিলেন।[৯]

শেখ মুজিবের এই ট্রেনভ্রমণের কোনো রেকর্ড রেলওয়ে বিভাগের কাছে ছিল না। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা গোলাম মর্তুজা ও তাঁর সঙ্গীর নামে কেনা টিকিটে শেখ মুজিব ও রেজা আলী ট্রেনে চড়েছিলেন। গোপনীয়তার ব্যাপারটিতে কোনো ফাঁক ছিল না। উল্লেখ্য, মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী কনভেনশন মুসলিম লীগের মনোনয়ন নিয়ে ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, শেখ মুজিবের একটা নিজস্ব নেটওয়ার্ক ছিল। এর সঙ্গে তাঁর দলের সম্পর্ক ছিল না। পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও গোপনীয়তার অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই গড়ে

উঠেছিল এই নেটওয়ার্ক। একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার, ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ছাত্রলীগের যত দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকুক না কেন, মুজিবের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বিষয়টি সিরাজুল আলম খান জানতে পারেন অনেক পরে। তখনই জানার কথা নয়। কেননা ওই সময় শেখ মুজিব তাঁকে খুব ভালো চিনতেন না।

রেজা আলীর বিবরণ এবং এস এ করিমের ভাষ্যে তারিখের ফারাক লক্ষ করা যায়। শেখ মুজিব যে ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতেই ত্রিপুরা গিয়েছিলেন, তার একটা প্রমাণ মেলে ওই সময় ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমার এসডিওর ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে। ১৯৬২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, ২২ মাঘ ১৩৬৮, সোমবার ডায়েরিতে তিনি ইংরেজিতে লেখেন :

> আজ বেলা প্রায় একটার সময় জনৈক মি. মুজিবুর রহমান, আমির হোসেন এবং টি চৌধুরী এসেছেন আশ্রমবাড়ি হয়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে তেলিয়ামুড়া পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডায়েরির লেখা থেকে এটা স্পষ্ট যে তাঁরা তিনজন সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরায় ঢুকেছিলেন। তাঁরা ধরা পড়েন। মহকুমা কর্মকর্তা তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ শেখ মুজিবের এই মিশন সফল হয়নি। দিনটা ছিল ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২। ওই দিনই তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। এই মহকুমা হাকিমের নাম সমরজিৎ চক্রবর্তী। ১৯৬২ সালের শেষ দিকে তিনি অবসরে যান। এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁর চাকরির মেয়াদকালেই, অর্থাৎ ১৯৬২ সালেই শেখ মুজিব ত্রিপুরা গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ডায়েরিতে সে কথাই লিখেছেন তিনি।[১০]

এস এ করিম তাঁর বিবরণের সূত্র হিসেবে মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরীর কথা উল্লেখ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, ১৯৬২ সালের ত্রিপুরা মিশনেও মোয়াজ্জেম চৌধুরী যুক্ত ছিলেন। যদি এস এ করিমের ভাষ্য সত্য হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, মোয়াজ্জেম তাঁকে বাষট্টি সালের ঘটনাটির তথ্য দেননি।

দুটি ভাষ্যই যদি সত্য হয়, তাহলে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে একটা ঘটনাক্রম সাজানো যায়। শেখ মুজিব প্রথম ত্রিপুরা যান ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তাঁর সে মিশন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। তিনি বেপরোয়া হয়ে বাষট্টির ডিসেম্বরে ঢাকায় ভারতীয় উপহাইকমিশনের কর্মকর্তা শশাঙ্ক ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলেন। যে করেই হোক, তিনি ভারতের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, ভারত সরকার হয়তো তখনই বিষয়টি আগ্রহের সঙ্গে লুফে নেবে এবং তিনি ত্বরিত একটা জবাব পেয়ে যাবেন। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করেও কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি অস্থির

Monday 5th FEBRUARY 1962

৫ সেক্রে—সোম ২২ মাঘ '৬৮—অমাঃ প্রাঃ ঘ৬।২১, প্রতিপদরাঃ ঘ৪।৭—১৬ মাঘ '৮৩

Beng—22 magh '68—amabasya 6-21a.m., prati. 4-7 a. m.—Saka—16 magha '83
22 magh 1368—29 shaban '81—16 magh 1369—15 magh bodi, 1 magh sudi '18

Sunrise—6-30 a. m. (36-329) Sunset—5-21 p. m.

Today at about 1300 hrs One Mr Mujibur Rahaman, Amir Hossain & T. Chowdhury arrived through Akhara. They have been sent to Teliamura under instruction from D.M.

শেখ মুজিবের ত্রিপুরা যাওয়ার তথ্যসংবলিত এসডিওর ডায়েরি

হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হলো, ঢাকায় ভারতীয় উপহাইকমিশনের কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণেই দেরি হচ্ছে। ধৈর্য হারিয়ে তিনি ১৯৬৩ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে আবারও ত্রিপুরার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁর দ্বিতীয় মিশন কিছুটা সফল হয়। তিনি আগরতলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং দিল্লিতে বার্তা পাঠাতে সফল হন।

তারপরও সন্দেহ থেকে যায়। প্রশ্ন হলো, এখানে তারিখবিভ্রাট আছে কি না। খোয়াই মহকুমার এসডিওর ডায়েরি একটি প্রামাণ্য দলিল, যা রেজা আলীর দেওয়া তথ্যকে নিশ্চিত করেছে। প্রশ্ন হলো, শশাঙ্ক ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলা এবং তাঁর মাধ্যমে নেহরুকে চিঠি পাঠানোর পর মুজিব অতি উৎসাহী হয়ে আবার কেন ত্রিপুরায় যাবেন? এখানে গোল বাধিয়েছে মফিদুল হককে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের ভাষ্য, যা কিনা একধরনের প্রত্যয়নপত্র। শেখ মুজিবের মতো একজন অতি সাবধানী এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ভারতীয় উপহাইকমিশনের কর্মকর্তাকে না জানিয়ে বা ডিঙিয়ে আবার ত্রিপুরায় যাবেন, এটা কষ্টকল্পনা মনে হয়। একমাত্র শেখ মুজিবই এই ধাঁধার অবসান ঘটাতে পারতেন।

এ তো গেল শেখ মুজিবের উদ্যোগের কথা। এর মধ্যে সিরাজুল আলম খানের নিউক্লিয়াস-তত্ত্ব কতটুকু প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ? সম্প্রতি তাঁর অনুসারীরা, বিশেষ করে তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত আ স ম

আবদুর রব দাবি করেছেন, সিরাজুল আলম খানই সবার আগে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। তিনিই স্বাধীনতার রূপকার। বিষয়টি তাঁরা জেনে বলছেন, নাকি না জেনে শুধু সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য শুনে বলছেন? বোঝা যায়, শেখ মুজিবের লেখা স্বাধীনতার প্রচারপত্র বিলি করা এবং তাঁর ত্রিপুরা মিশন সম্পর্কে রব ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সিরাজুল আলম খান তাঁকে যা বলেছেন, তিনি তা বিশ্বাস করে বসে আছেন এবং তা-ই প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

## তথ্যসূত্র

১. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন
২. হক, মুহাম্মদ শামসুল (২০১৮), *আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি।* ইতিহাসের খসড়া, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৮-৩৯
৩. রায়, খোকা (১৯৮৬), *সংগ্রামের তিন দশক,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৭০-৭১
৪. সিরাজুল আলম খান
৫. Banarjee, Sashanka S. (2011), *India, Mujibur Rahman, Bangladesh Liberation and Pakistan,* Aparajita Sahitya Bhaban, Narayanganj, p. 17; আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬)। *আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১১৬-১১৭
৬. আহমদ (২০১৬), পৃ. ১১৬-১১৭
৭. Karim, S. A. (2009), *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy.* UPL, Dhaka, p. 108-109
৮. আহমদ, ফয়েজ (১৯৯৪), *'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পরিশিষ্ট ৭
৯. রেজা আলী, 'আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ ফরহাদ ভাই', *আকণ্ঠ বিপ্লব পিপাসা : মোহাম্মদ ফরহাদ স্মারকগ্রন্থ,* মোহাম্মদ ফরহাদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ২৩৪-২৩৫
১০. মানস পাল

# ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট

শেখ মুজিবের লেখা এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের মাধ্যমে ছাত্র-কর্মীদের দিয়ে তা বিলি করা প্রচারপত্রে পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্টের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। এটি ছিল বাংলায় লেখা। শেখ মুজিবের মূল লেখাটি ছিল ইংরেজিতে। সুতরাং নামটি হওয়ার কথা ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট। ইংরেজি ভাষ্যটি বিভিন্ন দূতাবাসের গেটের কাছে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং বাংলা ভাষ্যটি প্রচার করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে। বাংলায় লেখা লিফলেটটি আবদুর রাজ্জাক পেয়েছিলেন শেখ ফজলুল হক মনির কাছ থেকে। শেখ মনি এটা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। অজ্ঞাত কারণে শাহ মোয়াজ্জেম কিংবা সিরাজুল আলম খান এটি স্বীকার করেন না।

প্রশ্ন হলো, ইংরেজি ভাষ্যে প্রচারিত লিফলেটে 'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' নামটি এল কীভাবে। এই কাহিনির সূত্র খুঁজতে আমাদের যেতে হবে জামালপুরে।

জামালপুর হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক সলিল কাহালি। নামটি একটু অন্য ধরনের, মনে রাখার মতো। 'কাহালি' নাম সচরাচর দেখা যায় না। ১৯৫৪ সালে যখন এ দেশে সাধারণ নির্বাচন হয়, তখন তিনি কিশোর। নির্বাচনী প্রচার চালাতে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এসেছেন জামালপুরে। স্থানীয় যুবকদের একজন হলেন আওয়ামী লীগের কর্মী আলী আসাদ। গায়ের রং কালো। তাই সবাই ডাকে কালা খোকা। জামালপুর শহরে আছেন আরেকজন খোকা। গায়ের রং ফরসা। তাঁর নাম হয় ধলা খোকা। দুই খোকার মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। ধলা খোকার আসল নাম ফজলুল হক। তিনি সংগীতশিল্পী। পরে বেশ নামডাক হয়েছিল—ওস্তাদ ফজলুল হক। সলিল কাহালির বিবরণ থেকে জানা যায়, নির্বাচনের আগে শেখ মুজিব বেশ কয়েকবার জামালপুরে গেছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গী হতেন কালা খোকা। জামালপুরে এলে মুজিব থাকতেন নিরালা হলের উল্টো দিকে মাহির মণ্ডল সাহেবের টিনের দোতলা ঘরে। এখন আমরা সলিল কাহালির গল্প শুনব, তাঁর জবানিতে :

১৯৫৪ সালের কোনো এক পড়ন্ত বেলা। আমি তখন জামালপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বন্ধুরা মিলে হিন্দু বোর্ডিং মাঠে ফুটবল খেলছিলাম। কলেজের দিক থেকে শেখ মুজিবুর রহমান কালা খোকাদাসহ রিকশাযোগে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। খোকাদা রিকশা থামিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন. 'সলিল কাহালি, আমার ছোট ভাইয়ের মতো। আমি ওকে খুব ভালোবাসি। ওর বাড়ি জামালপুরের আমলাপাড়ায়। ওর দাদু একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল, বাবা সরকারি কর্মচারী।'

কাহালি নামটি শেখ মুজিবের নজর এড়ায়নি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোদের আসল বাড়ি আমাদের জেলা ফরিদপুরে, তাই না?' আমি বললাম, আমার দাদু ওকালতি করতে স্থায়ীভাবে জামালপুর চলে আসেন। সেই থেকে আমাদের বাড়ি জামালপুর। আমার দাদু জয়রাম কাহালিকে শেখ মুজিব চিনতেন। শেখ সাহেব খোকাদাকে ধমকের সুরে বললেন, 'কী রাজনীতি করিস? মানুষের সঠিক পরিচয় জানিস না?' আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ভালো করে পড়াশোনা করিস।'

কালা খোকাদা তখন নির্বাচন নিয়ে খুবই ব্যস্ত। সাথিদের নিয়ে তিনি থানায় থানায় বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেব ট্রেনযোগে জামালপুর আসেন। কালা খোকাদা, খুররম ভাই, মতি ভাই এদের নেতৃত্বে পতাকা হাতে স্কুলের ছাত্ররাসহ নুরুল আমিন মুর্দাবাদ ধ্বনি মুখরিত করে স্টেশন অভিমুখে বিপুল ছাত্র-জনতা রওনা হয়। পুলিশের প্রবল বাধার মুখে মিছিলটি ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নুরুল আমিন সরকার তথা মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে।

১৯৫৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী হিসেবে জামালপুরে সরকারি সফরে আসেন। জামালপুরের সংস্কৃতির বিশেষত্ব দেখানোর জন্য জামালপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুখলেসুর রহমান ফকির সাহেবের লেখা ও নির্দেশনায় *কেরানির মেয়ে* নামে একটি নাটক নিরালা হলে মঞ্চস্থ হয়। শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে ওই নাটক উপভোগ করে অত্যন্ত প্রীত হন এবং নাট্যকার মুখলেসুর রহমান সাহেবকে ধন্যবাদ জানান।

সেদিন ছিল আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন। বর্তমানে আমার স্ত্রী অনুরাধা কাহালি ওই নাটকের একটি অংশে অভিনয় করে। তার অভিনয় দেখার জন্য আমি খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলাম।

ছেলেদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল না। জোরদার পুলিশি পাহারা ছিল। প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও হলে ঢোকার কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ঠিক সেই সময় কালা খোকাদা আমাকে ডেকে বললেন, 'চল শেখ সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।' আমি সুযোগটা গ্রহণ করলাম। বললেন, 'কলেজে পড়ছিস, চাকরি-বাকরির প্রয়োজন হলে মুজিব ভাইয়ের কাছে যাবি।

সলিল কাহালি

তখন হয়তো আমি না-ও থাকতে পারি। কিন্তু আমার পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে গেলে নিশ্চয়ই তিনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। কারণ একসময় মুজিব ভাই এ দেশের খুবই বড় নেতা হবেন।' তাঁকে অনুসরণ করে হলে প্রবেশ করলাম। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তখন প্রধান অতিথির আসনে বসা। কালা খোকাদা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'মুজিব ভাই, আমার ছোট ভাই সলিল কাহালি।' সাথে সাথেই শেখ মুজিব সাহেব বললেন, 'ওর নাম সলিল কাহালি। বাড়ি আমার জেলা ফরিদপুরের শরীয়তপুরে। বর্তমানে ওর দাদু ওকালতির সুবাদে জামালপুরের বাসিন্দা। হিন্দু বোর্ডিং মাঠের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলি, আমি তা ভুলিনি।' আমি বিস্মিত হলাম। তিনি এত কথা কী করে মনে রাখেন, কী প্রখর স্মৃতিশক্তি! আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কোন কলেজে পড়িস?' বলেছিলাম, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করিস। আর একটা কথা, তোর দাদা (কালা খোকা) যদি কোনো দিন ডাকে, দেরি না করে সাথে সাথে তার ডাকে সাড়া দিস।'

আমি আর কী নাটক দেখব। অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দেশের প্রয়োজনে ডাক আসতে পারে এবং কালা খোকাদা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন, এমন ইঙ্গিত ছিল তাঁর কথায়। তিনি যতক্ষণ ছিলেন, প্রথম সারির একটি চেয়ারে তাঁর কাছাকাছি বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর কালা খোকাদাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু আমার বিস্ময় রয়েই গেল।

নির্বাচনী প্রচারের সময় কালা খোকাদার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। যার ফলে তাঁকে বেশ কয়েকবার জেলে যেতে হয়। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি হলে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু হয়। কালা খোকাদার নামে হুলিয়া জারি হয়। ১৯৫৯ সালে কালা খোকাদা, মেলান্দহের আবদুর রহমান সিদ্দিকী এবং গফরগাঁওয়ের আর এম সাঈদ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান।[১]

## ২

সলিল কাহালির বিবরণে কয়েকজন তরুণের ভারতে চলে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেল। প্রশ্ন হলো, তাঁদের দেশত্যাগের পটভূমি কী? এরপর কী হলো? এ বিষয়টি গবেষক মোরশেদ শফিউল হাসান তাঁর *স্বাধীনতার পটভূমি: ১৯৬০ দশক* বইয়ে উল্লেখ করেছেন। এর সূত্র ধরে আরও তথ্য পাই ১৯৮৭ সালে সাপ্তাহিক *বিচিত্রার* বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত আফসান চৌধুরীর একটি নিবন্ধে। সেখানে আবদুর রহমান সিদ্দিকীর একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। সেখানে তুলে ধরা হয় 'পূর্ব বাংলা লিবারেশন পার্টির ভারত অভিযানের' কথা।[২]

শাহ মোয়াজ্জেমের ভাষ্য অনুযায়ী, শেখ মুজিবের নিজের লেখা ও ছাপানো প্রচারপত্রে 'পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্ট'-এর উল্লেখ আছে। লেখাটি ছিল ইংরেজিতে। সেখানে 'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' নামটি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। প্রশ্ন হলো, এ নামটি শেখ মুজিবের মাথায় এল কীভাবে?

'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' নামে একটি উদ্যোগ বাস্তবে ছিল। এর উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন জামালপুরের তরুণ আলী আসাদ, যিনি কালা খোকা নামে পরিচিত। সলিল কাহালির দেওয়া বিবরণে তাঁর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি আমার হাতে এল *ধ্রুবতারা* নামের একটি সংকলন। জামালপুরের 'ভাষাসৈনিক মতি মিয়া ফাউন্ডেশন' এটি প্রকাশ করেছে। এটি পড়ে আমি ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট সম্পর্কে অনেক তথ্য পাই। আমার সামনে খুলে যায় স্বাধীনতাসংগ্রামের এক অজানা অধ্যায়।

আলী আসাদ ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগে যোগ দেন। খাদ্যমন্ত্রী মফিজউদ্দিনের সমালোচনা করায় তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি জামালপুর মহকুমা (এখন জেলা) ছাত্রলীগের সহসম্পাদক

হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি। ওই সময় আবারও গ্রেপ্তার হয়ে তিনি ময়মনসিংহ জেলে তিন মাস আটক ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং জামালপুর শাখা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক হন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে ওই সময় তিনি আরও কয়েকজনসহ প্রতিষ্ঠা করেন ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট। জামালপুর হাইস্কুলের (এখন জিলা স্কুল) বিপরীত দিকে আবদুর রহমান সিদ্দিকীর ভাড়া বাসায় ফ্রন্টের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ নিয়ে আবদুর রহমান সিদ্দিকীর একটি সাক্ষাৎকার ১৯৮৭ সালে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র বিজয় দিবস সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। তাঁর বর্ণনামতে, ব্রহ্মপুত্র নদে সম্মেলনের পর ১৯৫৯ সালের মার্চে আলী আসাদ, আর এম সাঈদ, খন্দকার ফজলুর রহমান এবং তিনি ভারতে যান। ফজলুর রহমানের আদি বাড়ি আসামের নওগাঁয়। তাঁদের কোনো পাসপোর্ট ছিল না। ফজলুর রহমান তাঁদের পথঘাট চিনতে সাহায্য করেন। তাঁরা মাইনকারচর হয়ে ধুবড়ি যান। সেখানে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সৈয়দ আহমেদ আলী (পরে মন্ত্রী) এবং সম্পাদক জিতেন দত্তের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়। পরে তাঁরা কলকাতায় গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুক্তাগাছার রাজকুমার স্নেহাংশু আচার্য (পরে পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট জেনারেল) এবং মুজাফফর আহমদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা বলেন, 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে কথা না বলে আমরা আপনাদের সমর্থন বা বিরোধিতা কোনোটাই করতে পারব না।' এরপর তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সম্পাদক সুরেন ঘোষের সঙ্গে কথা বলেন। সুরেন ঘোষ তাঁদের বলেছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে আপনাদের দেখা করিয়ে দিতে পারি। তিনি রাজি হলে আপনাদের সাহায্য করতে পারবেন।' পার্লামেন্ট সম্মেলন উপলক্ষে সুরেন ঘোষের দিল্লিতে যাওয়ার কথা। তিনি আসাদদের সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁর চেষ্টায় নেহরুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে লিয়াকত-নেহরু প্যাক্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'যেহেতু এই চুক্তি আমি নিজেই স্বাক্ষর করেছি, তাই তোমাদের (অস্ত্র) সাহায্যের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে কাজ করতে পারব না যতক্ষণ এটা বলবৎ আছে।' নেহরু সাহায্য দিতে অপারগ হলেও বাঙালি নেতাদের কাছে তাঁরা উৎসাহ পেয়েছিলেন। এরপর তাঁরা কলকাতায় ফিরে এসে দেশের পথে রওনা হন। আবদুর রহমান সিদ্দিকীর বর্ণনায় জানা যায় :

> এর মধ্যে আলী আসাদ ডিনামাইট ও বোমা তৈরির ফর্মুলা বিভিন্ন সূত্র হতে জেনে নেয়। স্নেহাংশু আচার্য ও অন্য নেতারা কিছু অর্থ সাহায্যের সংস্থান করে দেন। তা দিয়ে আমরা কলকাতা প্রেস থেকে কিছু বিজ্ঞাপন (প্রচারপত্র) ছাপিয়ে নিয়ে দেশের পথে পা বাড়ালাম।

উদয়নালার কাছে সহযাত্রী ফজলুর রহমান হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যান। এক জায়গায় যাওয়ার কথা বলে তিনি আর নেই। অতঃপর আমরা তিনজনই রওনা হই।

শিলিগুড়িতে এসে আমাদের সাথে দেখা হলো চারু মজুমদার ও কানু সান্যালের। চারু মজুমদার তখন চা-বাগান শ্রমিকনেতা ছিলেন, আর কানু সান্যাল শিলিগুড়ি কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি। তাঁরা আমাদের আর্থিক সাহায্যও করলেন। অতঃপর কোচবিহার থেকে ধুবড়ি।

গারো পাহাড় হয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ থানার কাছে একটা বাড়িতে উঠি। সেখানে পুলিশ খবর পেয়ে আমাদের ধরে নিয়ে গেল তুরায়। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বিচারে এক মাসের জেল হলো আমাদের। অপরাধ, বিনা পাসপোর্টে সীমান্ত পারাপার। আমাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেখে তারা গোয়েন্দা বিভাগে খবর দেয়। গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা এসে গেলেন আমাদের জেলখানায়। তাঁরা বিবৃতি নিলেন, বিজ্ঞাপন দেখলেন। শেষে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জেলে আমাদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

দিন পনেরো পর তাঁরা আবার এসে হাজির। এবার বললেন, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আপনাদের সাহায্য করতে রাজি। আপনারা দেশে গিয়ে ভারতীয় হাইকমিশন অফিসে যোগাযোগ করবেন। এই গোয়েন্দাগণ আদিতে পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আমাদের নৈতিক সমর্থন দেন।

এক মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেলে গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন আমাদের বর্ডার পর্যন্ত এগিয়ে দেন। এটা ছিল গভীর রাত, তিনটা-চারটা হবে। যে পথে পাক সীমান্তপ্রহরী থাকবে না এমন পথেই তাঁরা আমাদের যেতে সাহায্য করেন।

আমরা তিনজনই প্রায় আধা মাইল বিলের গলাপানি ভেঙে বকশীগঞ্জে এলাম। সেখানে আমাদের বন্ধু আশরাফ হোসেনের বাড়িতে উঠলাম। ভারতে ছাপানো প্রচারপত্রগুলো পানিতে ভিজে যাওয়ায় আশরাফের বাড়িতে রোদে শুকানো হয় এবং জামালপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বিতরণ করা হয়।

বন্ধুর বাড়িতে এক দিন থেকে জামালপুরে ফিরেই দেখি আমাদের প্রত্যেকের নামে ওয়ারেন্ট। কেমন করে জানাজানি হয়েছিল জানি না। সুতরাং আত্মগোপন করতে হলো। সাঈদকে বাড়ি পাঠালাম। আলী আসাদ ও আমি ঢাকা চলে এলাম।[৩]

৩

বকশীগঞ্জের আশরাফ হোসেন

আবদুর রহমান সিদ্দিকীর ভাষ্যে বকশীগঞ্জের আশরাফ হোসেনের কথা উঠে এসেছে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, যে দলটি সীমান্ত পেরিয়ে আসামে গিয়েছিল, তিনিই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা হিসেবে তিনি পথঘাট চিনতেন। ওই সময় তিনি ছিলেন জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি। তিনি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে শুরু থেকেই যুক্ত ছিলেন। আসামে একটি মাজারে তাঁরা কয়েক দিন ছিলেন। তারপর মহেন্দ্রগঞ্জে তাঁদের রেখে চলে আসেন।[৪]

সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব' নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্যের কিছু অংশের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করে আবদুর রহমান সিদ্দিকী একটি চিঠি দেন। চিঠিটি *বিচিত্রায়* ছাপা হয় ২২ জানুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে। চিঠিতে আবদুর রহমান সিদ্দিকী ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের জন্মকাহিনির একটি বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাতে বলা হয়, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করার জন্য ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের কাছে ১৫ নম্বর মুহাম্মদ আলী রোডে সিদ্দিকীর বাসায় গঠন করা হয় ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট। প্রতিষ্ঠাতা তিনজন সদস্য হলেন সিদ্দিকী, আর এম সাঈদ এবং খন্দকার বজলুর রহমান। সিদ্দিকী দলের জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ১৪-১৫ নভেম্বর আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভা বসেছিল ময়মনসিংহ শহরে অলকা সিনেমা হলে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন আয়োজনে সিদ্দিকী অনেক সাহায্য করেছিলেন। তথ্যটি শেখ মুজিবুর রহমান *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে উল্লেখ করেছেন।[৫]

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হওয়া পর্যন্ত সিদ্দিকী ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। খন্দকার ফজলুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মী এবং আর এম সাঈদ ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) কর্মী। সিদ্দিকীকে ফ্রন্টের সেক্রেটারি করা হয়।[৬]

১৯৫৮ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে জামালপুরে আলী আসাদের নেতৃত্বে ফ্রন্টের শাখা কমিটি তৈরি হয়। এ কমিটিতে ছিলেন জামালপুরের

আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামান (মতি মিয়া), সৈয়দ আলী মণ্ডল, রেজাউল করিম, সৈয়দ আবদুস শরিফ প্রমুখ। সবাই পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের শপথ নেন। আলী আসাদকে 'মেজর তারিক' এবং আখতারুজ্জামানকে 'মুহম্মদ মুসা' নাম দেওয়া হয়। জামালপুরের সমবায় প্রেসে কিছু প্রচারপত্র ছাপানো হয়। প্রচারপত্রে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের বদলে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি নাম লেখা হয়। প্রচারপত্রে স্বাধীন বাংলার দাবি করে স্লোগান দেওয়া হয়—পূর্ব বাংলা বাঙালিদের, পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলা ছাড়ো।[৭]

আলী আসাদ ছিলেন জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। তাঁকে 'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি' গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ডিসেম্বরের (১৯৫৮) প্রথম দিকে সিদ্দিকী, আর এম সাঈদ এবং নেত্রকোনার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি এম এ খালেকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের পার্টি কমিটি গঠন করা হয়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি টাঙ্গাইলের শ্রমিকনেতা সৈয়দ আবদুল মতিনকে সেক্রেটারি করে সাত সদস্যের টাঙ্গাইল কমিটি গঠন করা হয়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ব্যবসায়ী আবু বাকারের নেতৃত্বে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয় কিশোরগঞ্জে। ১৯৫৯ সালে ময়মনসিংহে আরও একটি শাখা কমিটি হয়। আর এম সাঈদ ছিলেন এই কমিটির দায়িত্বে।

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে একটি বড় নৌকায় পার্টির সম্মেলন হয়। সম্মেলনের কয়েক দিন পর অস্ত্র ও অর্থ জোগাড়ের জন্য সিদ্দিকী, আলী আসাদ, আর এম সাঈদ ও খন্দকার ফজলুর রহমান ভারতে যান। ভারত থেকে ফিরে আসার পর ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে সিদ্দিকী ঢাকার পল্টন ময়দান থেকে গ্রেপ্তার হন। সিদ্দিকীর ভাষ্য অনুযায়ী :

> গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েক দিন আগে আমরা ঢাকায় পার্টির একটি শাখা কমিটি গঠন করি। ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলে সিরাজ সিকদার নামের এক ছাত্র ছিলেন এই কমিটির সেক্রেটারি। এই সিরাজ সিকদার পরে সর্বহারা পার্টির সিরাজ সিকদার কি না, সেটা আমি বলতে পারব না। তার সঙ্গে পরে আর কোনো দিন দেখা হয়নি। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জেলে ছিলাম। ভারত থেকে ফিরে আসার পর সেখানে ছাপানো প্রচারপত্রগুলো পানিতে ভিজে যাওয়ায় বকশীগঞ্জের আশরাফ হোসেনের বাড়িতে রোদে শুকিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং জামালপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বিতরণ করা হয়।
>
> আমাদের এই ইতিহাস জানেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সাংবাদিক মানিক মিয়া, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর

রহমান খান, ময়মনসিংহের আওয়ামী লীগ নেতা রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, হাতেম আলী তালুকদার, শামসুল হক, আলতাব উদ্দিন তালুকদার (ভাসানী-ন্যাপ নেতা) এবং আরও অনেকে। জানতেন মওলানা ভাসানী এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ।[৮]

ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের সঙ্গে আরও যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের একজন হলেন নুরউদ্দিন আহমদ তারা মিয়া। তাঁর বাবা গিয়াসউদ্দিন আহমদ ১৯৫৫-৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। তারা মিয়ার দেওয়া বিবরণে জানা যায়, ১৯৫৯ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে একদিন সকালে আলী আসাদ ও আবদুর রহমান সিদ্দিকী তাঁদের ঢাকার ২২ নম্বর টিপু সুলতান রোডের বাসায় আসেন এবং তাঁর বাবা গিয়াসউদ্দিনকে ভারত থেকে ছাপানো কয়েকটা বিজ্ঞাপন (লিফলেট) দেন। ছাপানো কাগজে স্বাধীনতার দাবি এবং পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়েছিল। গিয়াসউদ্দিন আহমদ লিফলেট পড়লেন। ছেলে তারা মিয়া পাশেই দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি সবে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। লেখাপড়ার ক্ষতি হবে বিধায় তাঁকে যেন দলে না নেওয়া হয়, এ অনুরোধ জানিয়ে গিয়াসউদ্দিন সাহেব তাঁদের চা-বিস্কুট খাইয়ে বিদায় করেন। আলী আসাদ ও আবদুর রহমান সিদ্দিকী বেরিয়ে যাওয়ার সময় তারা মিয়া অনেক দূর হেঁটে তাঁদের এগিয়ে দেন। তাঁকে সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দেওয়ামাত্র তিনি রাজি হয়ে যান। শুধু বলেন, বাবা যেন জানতে না পারেন। ওই দিন বিকেলে গিয়াসউদ্দিন সাহেব লিফলেটটি শেরেবাংলাকে দেখান। শেরেবাংলা তাঁকে বলেছিলেন, 'গিয়াস, আমি জানি বাংলা একদিন স্বাধীন হবেই। সেদিন পর্যন্ত আমরা হয়তো বেঁচে থাকব না।' এই বলে তিনি কেঁদে ফেলেন। ফিরে আসার সময় শেরেবাংলা গিয়াসউদ্দিনকে বলেছিলেন, 'যদি পারো, ওই ছেলেদের গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করাইও। আমি তাদের আশীর্বাদ করব।' এ কথা তারা মিয়া শুনেছেন তাঁর বাবার কাছে।[৯]

তারা মিয়ার ভাষ্যে জানা যায়, এই দলে আরও যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের একজন হলেন আওয়ামী লীগ কর্মী আকরাম হোসেন। এত দিন দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল ময়মনসিংহে আবদুর রহমান সিদ্দিকীর বাড়িতে। এরপর এটি সরিয়ে ঢাকার ফকিরাপুলে আকরামের বাসায় নিয়ে আসা হয়। আলী আসাদ ও আবদুর রহমান সিদ্দিকী এ বাসায় থাকতেন। সেখানেই তাঁরা মাঝেমধ্যে সভা করতেন। কাজ হতো খুব গোপনে। সবাইকে সবার পরিচয় জানানো হতো না। সন্ধ্যার পর মাঝেমধ্যে পল্টন ময়দানের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংগঠকেরা আসতেন। এক সাধু সেখানে ধূপধুনা

ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের চার সংগঠক : আলী আসাদ (কালা খোকা), আবদুর রহমান সিদ্দিকী, আখতারুজ্জামান (মতি মিয়া) ও নুরউদ্দিন আহমদ (তারা মিয়া)

জ্বালিয়ে বসতেন। তার কাছে গাঁজা খেতে আসত কিছু লোক। ফ্রন্টের লোকেরা সেখান থেকে একটু দূরে বসতেন। সেখানে আসতেন ঢাকা বেতারের শিল্পী ওস্তাদ ফজলুল হক এবং আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব।

এক সন্ধ্যায় তাঁদের কয়েকজনের সভা করার কথা পল্টন ময়দানে। সেখান থেকে সিদ্দিকীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলী আসাদ বসে ছিলেন একটু দূরে। টের পেয়ে তিনি পালিয়ে আকরামের বাসায় চলে যান। ওই বাসায় ডাকে পাঠানোর জন্য ২০০টি লিফলেট ছিল। তারা মিয়া ও সিরাজুল ইসলাম পোস্ট অফিস থেকে ২০০টি খাম কিনে আনেন। খামে তাঁরা ঠিকানা লিখতে থাকেন। বিভিন্ন জেলার বার লাইব্রেরি, কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজ ছাত্র সংসদের সেক্রেটারি এবং রাজনৈতিক নেতাদের ঠিকানায় লিফলেট পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। রাতে রেলওয়ে পোস্ট অফিসের ডাকবাক্সে খামগুলো ফেলা হয়েছিল।[১০]

এর কয়েক দিন পর আর এম সাঈদ গফরগাঁওয়ে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে ময়মনসিংহ জেলে রাখা হয়। গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে খুঁজছে আলী আসাদকে। আলী আসাদ সিদ্ধান্ত নেন, তিনি জামালপুরে যাবেন। তাঁর সঙ্গী হন তারা মিয়া। তারা মিয়ার জবানিতে জানা যায় :

> সবাই বললেন প্রথমে জামালপুর শহরে না ঢুকে দূরে কোনো আত্মীয়বাড়ি থেকে সব সংবাদ জানতে। সে অনুযায়ী আমরা নান্দিনা স্টেশনে নামলাম ট্রেন থেকে। উঠলাম আলী আসাদের এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুকে পাঠানো হলো আসাদের বাবার কাছে। বিকেলে তার বাবা তাসিরউদ্দিন মোক্তার এলেন। তিনি বললেন, আমাদের এ দেশে থাকা বিপজ্জনক। কারণ, গোয়েন্দা বিভাগ কোথা থেকে তার ফটো জোগাড় করে বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়েছে, তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। ধরিয়ে দিলে পাঁচ হাজার

টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। জামালপুরে ভারতে ছাপানো কিছু বিজ্ঞাপন (লিফলেট) পুলিশের হাতে পড়েছে। গুজব রটেছে, এসব সে ভারত থেকে ছাপিয়ে এনেছে।

তাসিরউদ্দিন মোক্তার ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতা ও পার্লামেন্ট সদস্য সুরেন ঘোষের কাছে চিঠি লিখলেন, যেন আসাদকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়। দেশভাগের আগে সুরেন ঘোষ ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এই সুরেন ঘোষই কিছুদিন আগে তাদের চারজনকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমরা রাতের ট্রেনে আসাদকে উঠিয়ে দিলাম। আসাদের বাবা কলকাতায় যাওয়ার খরচ বাবদ কিছু টাকা দিলেন। বললেন, কুড়িগ্রাম মহকুমার ভূরুঙ্গামারী সীমান্তের কাছে তাঁদের আত্মীয় আছে। সেখানে গেলে তারাই ওপারে পৌঁছে দেবে। রাত ১২টায় আমরা চোখের জলে আসাদকে বিদায় জানালাম। ঘটনাটি ১৯৬০ সালের কোনো এক সময়ের।[১১]

আলী আসাদ (কালা খোকা) সম্পর্কে সলিল কাহালি আরও তথ্য দিয়েছেন। তাঁর স্কুলের সহপাঠী ও বন্ধু সত্যেন্দ্রমোহন নিয়োগীর সঙ্গে কালা খোকার দেখা হয়েছিল কয়েক মিনিটের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে। নিয়োগী পরিচিত ছিলেন শংকর বাবু নামে। কালা খোকা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ছিলেন। নিয়োগী ছিলেন ট্রেনের ভেতরে। দুজনের চোখাচোখি হলে কালা খোকা ট্রেনের কামরায় জানালার কাছে এসে জামালপুরের খোঁজখবর নেন।[১২]

সত্যেন নিয়োগী তখন কলকাতা থেকে আসামের বিজনি যাচ্ছিলেন। নিয়োগীর ভাষ্য অনুযায়ী, 'আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি এখানে কেন? উত্তরে তিনি বলেন, "আমি আপাতত এখানেই আছি।"' এমন সময় ট্রেন ছেড়ে দেওয়ায় কথা আর এগোয়নি।[১৩]

ওই সময় কালা খোকার সঙ্গে সলিল কাহালির শিক্ষক রবীন্দ্রচন্দ্র দত্তের দেখা হয়েছিল দর্শনা সীমান্তে। কালা খোকা তাঁকে একটি লিফলেট পড়তে দিয়েছিলেন। লিফলেটে কী লেখা ছিল, তা তিনি সলিলকে বলেননি। সলিল কাহালি আরও কিছু তথ্য দেন, যা গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর :

১৯৬০ সালে আমার বাবা সুশীল কুমার কাহালি যখন টাঙ্গাইলে খাদ্য বিভাগের চিফ ইন্সপেক্টর, সে সময় তিনি অফিসের কাজে জামালপুরে এসেছিলেন। ফেরার পথে টাঙ্গাইল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বাবার সহযাত্রী হন। একটি ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভারকে পেছনে যেতে

বলে তিনি নিজেই ট্রাকটি চালিয়ে টাঙ্গাইলের দিকে রওনা হন। সম্ভবত তিনি বেসামাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কিছুদূর আসার পর গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ট্রাকটি খাদে পড়ে যায়। দুজনই আহত হন। পরদিন খবরটি *ইত্তেফাক*-এ ছাপা হয়। পোস্টকার্ডে বাবা তাঁর অবস্থা জানিয়ে তাড়াতাড়ি টাঙ্গাইলে যেতে বলেন। পরদিন সকালে আমি জামালপুর থেকে ময়মনসিংহে রওনা হই। তখন টাঙ্গাইল যেতে ট্রেনে ময়মনসিংহ হয়ে তারপর বাসে যেতে হতো। টিকিট কেটে আমি ট্রেনে উঠি। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে আর এম সাঈদ ট্রেনের একই কামরায় উঠে আমার পাশে বসে এবং কথাবার্তা বলতে থাকে। ওর হাতে ছিল কালো রঙের একটা ব্যাগ। আলাপের একপর্যায়ে ব্যাগ থেকে ডিমাই সাইজের একটি লিফলেট আমার হাতে দিয়ে টয়লেটে গিয়ে পড়তে বলে। টয়লেটে গিয়ে আমি কাগজটি সম্পূর্ণ পড়লাম। এই কাগজে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা 'কাটা স্বাধীনতা' বলে উল্লেখ করে পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট নামে গঠিত তাদের সংগঠনে যোগ দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কাগজটা পড়ে খুব আনন্দ বোধ করি এবং সাঈদের হাতে ফেরত দিই। কাগজটা সাঈদ তৎকালীন আলম কেবিনের মালিক নেপাল মিয়ার ছোট ছেলে আজিজ ভাইকে পড়তে দিয়েছিল। আজিজ ভাই কাগজটি আর ফিরিয়ে দেননি। বলেছেন, টয়লেটে ফেলে দিয়েছি। সাঈদ জামালপুরে আশরাফ হোসেনের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল। আশরাফ আমার সহপাঠী ছিল।

সাঈদ দু-একটা স্টেশন পরে হঠাৎ ট্রেন থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা হয়নি। বাবা খানিকটা সুস্থ হলে জামালপুরে ফিরে আসি। সে সময় জামালপুরে ডিআইবি প্রধান ছিলেন আলী বিশ্বাস সাহেব। তিনি একসময় আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে রফিকুল চৌধুরীর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। ছোটবেলা থেকেই বিশ্বাস সাহেবকে আমরা চাচা ডাকতাম। তিনিও আমাদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি গম্ভীর স্বরে মাগরিবের নামাজের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি কিছুটা ভীত হয়ে রহিম চাচার (আবদুর রহিম অ্যাডভোকেট) সঙ্গে দেখা করি। তাঁর চেম্বারেই বিশ্বাস চাচার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিশ্বাস চাচা রাগত স্বরে আমাকে তিরস্কার করলেন এবং পরদিন সকাল নয়টার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। পরদিন তাঁর দেওয়ানপাড়ার বাসায় গেলাম। তিনি আর এম

সাঈদের দেওয়া লিফলেট থেকে গাড়ির ঘটনা—সবই বললেন। আমি ওই দিন বাবার দুর্ঘটনাসংবলিত চিঠি এবং পরদিন *ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত দুর্ঘটনার কথা তাঁকে বললাম। সেখানেই আর এম সাঈদের সঙ্গে কথা এবং তাঁর দেওয়া লিফলেটের কথা বিস্তারিত জানালাম। বাবার চিঠি ও পত্রিকাটি পরদিন দেখাতে বললেন। আমি রহিম চাচাকে বিস্তারিত জানালাম। তিনি বললেন, স্টেটমেন্টে ভুলেও সই দিবি না। স্টেটমেন্টে সই দিতে বললে আমি বললাম, রহিম চাচার সঙ্গে না বুঝে কোনো সই দেব না। বিশ্বাস সাহেব রাত দুইটার সময় আমাকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে বললেন, ১৫ দিনের মধ্যে জামালপুর থেকে কোথাও যেতে পারবে না। রহিম চাচা কোর্ট থেকে ফিরে আমাকে ডেকে এনে সব কথা শুনলেন। বললেন, 'সন্ধ্যায় বিশ্বাস সাহেব যদি আমার কাছে আসে, তাহলে তার সঙ্গে দেখা করতে তুই এখানে আসবি।' যথারীতি তিনি এলেন। রহিম চাচা তাঁকে বললেন, 'আমি ছোট থেকে ওদের চিনি। ওর বাবা বিদেশে (টাঙ্গাইলে) চাকরি করে এবং এখানে আমিই তার প্রকৃত অভিভাবক। দেখবেন ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।'

কয়েক দিন পর ময়মনসিংহ ডিআইবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার ওপর নির্যাতন চলল। একটা বদ্ধ ঘরে বসিয়ে ধীরে ধীরে একটার পর একটা ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাতে লাগল। আমি ঘামতে লাগলাম। একজনের পর একজন একেক ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু করল ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্যদের আমি চিনি কি না। তারপর কালা খোকা, আর এম সাঈদ, আবদুর রহমান সিদ্দিকী—এমন আরও অনেকের কথা জিজ্ঞাসা করল। বললাম, কালা খোকাদাকে ভালো করে চিনি এবং দাদা বলে সম্মান করি। আর এম সাঈদ আমার বন্ধু। আবদুর রহমান সিদ্দিকী বয়সে বড় বলে তার সঙ্গে শুধুই আলাপ হয়েছে, সখ্য হয়নি। আমি ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য নই। ওরা আশরাফ হোসেন ও আজিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলল এবং আলো জ্বালাতে থাকলে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।

হঠাৎ বিশ্বাস সাহেবের কথা শুনতে পাই। তিনি বললেন, 'ওকে আমার হেফাজতে ছেড়ে দিন। আমি ওকে দেখেশুনে রাখব। আমার ইনভেস্টিগেশনে তেমন কিছু পাইনি।' আলোগুলো ধীরে ধীরে নিভে গেল। গম্ভীর গলায় ডিআইবি কর্মকর্তা বিশ্বাস সাহেবকে বললেন, 'আপকো হেফাজত মে ছোড় দেতিহু। ইস আদমিকো গলদ কুই তুমসে গলদ। ইউ উইল বি সোল রেসপনসিবল হোগা, মাইন্ড ইট।'

বিশ্বাস সাহেব ট্রেনে করে আমাকে জামালপুরে নিয়ে বাসায় পৌঁছে দিলেন। তাঁর রিপোর্টেই এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেলাম।[১৪]

৪

লিবারেশন ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সংগঠক আবদুর রহমান সিদ্দিকী হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন শাখার সংগঠকদের নাম অন্যদের দিয়ে যেতে পারেননি। এই সংগঠনে সবাই সবাইকে চিনতেন না। সিদ্দিকী একদিন তারা মিয়াকে বলেছিলেন, 'কোনো সময় টাকার অসুবিধা হলে আমার কথা এবং লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য পরিচয় দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গেলে তিনি টাকা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।' তারা মিয়ার ভাষ্যে জানা যায় :

> আমি ও আকরাম সাহেব শেখ সাহেবের সঙ্গে আলফা ইনস্যুরেন্সের অফিসে দেখা করলাম। শেখ সাহেব আকরামকে চেনেন অনেক আগে থেকেই। তিনি বললেন, 'আকরাম, কী খবর? কেমন আছ?' আকরাম সাহেব আমাদের পরিচয় দিলেন লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য হিসেবে এবং আলী আসাদ যে ভারতে গেছে, তা-ও জানালেন। শেখ সাহেব বললেন, 'সিদ্দিকী জেলে আছে। পুলিশ ওকে নির্যাতন করছে। আমরা ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকেও জানিয়েছি। গোয়েন্দা বিভাগ কিছু লিফলেট পেয়েছে। সন্দেহ করছে, এগুলো ভারতে ছাপানো। ওরা নাকি ভারত থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র এনেছে, এসব গুজব রটেছে। পুলিশ তাদের পাকড়াও করার জন্য পাগল হয়ে খুঁজছে। ধরতে পারলে ফাঁসি হয়ে যাবে। আমি তোমাদের সংগ্রামকে সমর্থন করি না, বিরোধিতাও করি না। আমি পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এখন রাজনীতি নিষিদ্ধ, তাই করি না। যেহেতু সিদ্দিকী ও আলী আসাদ আওয়ামী লীগের নির্ভীক কর্মী ও জাঁদরেল সংগঠক এবং তোমাদের সবাই আওয়ামী লীগের লোক, ভবিষ্যতে সবাইকে নিয়ে আওয়ামী লীগ করতে হবে।' তিনি আমাদের ৫০০ টাকা দিলেন, আকরামের হাতে। বললেন, 'গ্রামে চলে যাও। অবস্থা ভালো হলে শহরে আসিও।' ওই টাকা থেকে বিমানভাড়া নিয়ে আমি পরদিন করাচি চলে যাই আমার বোনের কাছে।[১৫]

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্যদের যোগাযোগ ছিল বলে তারা মিয়ার ভাষ্যে জানা যায়। বিষয়টি আরও নিশ্চিত করেছেন শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেন। লিবারেশন ফ্রন্টের

নেতা আর এম সাঈদ ছিলেন তাঁর গুরুস্থানীয়। আখতার হুসেন জানিয়েছেন:

> গফরগাঁওয়ে স্কুলে পড়ার সময় সাঈদ ভাই আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন। আমি ছাড়া আরও ছিলেন আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ (সাবেক সংসদ সদস্য), জামালউদ্দিন (সোনালী ব্যাংকের সাবেক সিবিএ নেতা) ও হেলালউদ্দিন। আমরা সবাই গফরগাঁওয়ে থাকি।
>
> ১৯৬৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমি ঢাকায় আসি। সাঈদ ভাই একদিন মতিঝিলে আলফা ইনস্যুরেন্স কোম্পানির অফিসে আমাকে নিয়ে যান। সেখানে শেখ মুজিব অফিস করতেন। সাঈদ ভাই এবং শেখ সাহেব একসঙ্গে জেলে ছিলেন। সাঈদ ভাই ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। শেখ সাহেব তাঁকে বললেন, 'তুই আমার দলে চলে আয়।' তিনি সাঈদ ভাইকে পকেট হাতড়ে ৩০ টাকা দিলেন। সেই টাকা দিয়ে আমি দুদিন খাওয়াদাওয়া করলাম, পত্রপত্রিকা কিনলাম।[১৬]

অলি আহাদ একসময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। গুরুত্ব বিবেচনায় দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের পরেই ছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনের সময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে আরও অনেকের মতো তিনিও গ্রেপ্তার হন। ছাড়া পান ১৯৬৩ সালে। ওই সময়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া বিবরণে জানা যায়:

> কারামুক্তির পর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লক্ষ করিতেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-যুবসমাজে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বাধীন বাংলার আওয়াজ একটি সোচ্চার আওয়াজে পরিণত হইয়াছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) সভাপতি খাজা নাজিমউদ্দিন ২৭ নভেম্বর (১৯৬২) রাত্রিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় ভাষণদানকালে মন্তব্য করেন, 'পাঁচ বৎসরকাল ঢাকায় অবস্থানকালে বিভিন্ন স্তরের লোকজন, যাহার অধিকাংশই আমার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মী, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিয়া ব্যথিত হইয়াছি যে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইবার ব্যাপারে কানাঘুষা চলিতেছে। দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিম পাকিস্তানিদেরও একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ এই মতের সমর্থক। সম্প্রতি এক নৈশভোজে পশ্চিম পাকিস্তানের একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাকে বলেন যে, কনফেডারেশন গঠন করিলে ক্ষতি কী?...

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে ময়মনসিংহ নিবাসী রাজবন্দীদ্বয় আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও আবু সৈয়দের (এটি হবে আর এম সাঈদ) নিকট হইতে আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিষয়াদি অবগত হই। ভারতে মুদ্রিত বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ময়মনসিংহ ও বিভিন্ন জেলায় বিতরণকালেই তাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।[১৭]

আবদুর রহমান সিদ্দিকী বারবার গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আটক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ছাড়া পেয়ে তিনি আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডে আবারও সক্রিয় হন। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি নিয়ে সারা দেশে হইচই পড়ে গিয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হন ৮ মে ১৯৬৬। ওই দিন ময়মনসিংহ থেকে জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুর রহমান সিদ্দিকীও গ্রেপ্তার হন।

**আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার**

গৌরীপুর শহর (ময়মনসিংহ), ৯ই মে—গতকল্য রাত্রে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ মহল হইতে জানা গিয়াছে। জনাব সিদ্দিকীকে ময়মনসিংহ কারাগারে আটক রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জনাব সিদ্দিকী ৯২(ক) ধারার সময় দেড় বৎসর এবং সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর প্রায় দুই বৎসর নিরাপত্তা আইনে আটক ছিলেন।

আবদুর রহমান সিদ্দিকীর গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' চলাকালে শেখ মুজিব যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ জানিয়ে একপর্যায়ে বলেন, '...মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিকনেতাকে পাকিস্তান রক্ষাবিধি ৩২ ধারাবলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়।'[১৮]

৫

আলী আসাদ দ্বিতীয়বার ভারতে গিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে ছিলেন না। তখন তাঁর সঙ্গে আর কে কে ছিলেন, তা জানা যায় না। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের

প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৬৬ সালে। তখনো আলী আসাদের তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যায়। স্মিতা মিত্রকে দেওয়া আসাম বিধানসভার সদস্য শৈলেন মেধির একটি সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উঠে এসেছে। গবেষক হারুন হাবীব তাঁর *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত: তথ্য ও দলিল, আসাম ও মেঘালয়* বইয়ে সাক্ষাৎকারটি উদ্ধৃত করেছেন। পুরোনো স্মৃতি হাতড়ে শৈলেন মেধি বলেছেন :

> অনেক দিন আগের কথা। একদিন ছয়জনের একটা দল গুয়াহাটিতে এল। ওরা এসেছিল ওদের সংগ্রামের জন্য অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে। ওরা প্রথমেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কয়েকজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে পরিচয় না থাকা আসামের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের জানিয়ে দিল যে অস্ত্র-সংগ্রামে ওরা বিশ্বাস করে না, তাই পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য ওরা অপারগ। তখন মুক্তিবাহিনীর লোকেরা আরসিপিআইয়ের খোঁজে কমলা মজুমদারের বাড়িতে হাজির হলো। মজুমদার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল। তারপর ওদের কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পান্নাবাবুর (পান্নালাল দাশগুপ্ত) সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হলো।
>
> উড়িষ্যা রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথির সঙ্গে পান্নাবাবুর পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই পান্নাবাবু ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রয়াত ফখরুদ্দিন আলী আহমদ সাহেবের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনেক মন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ করার সুযোগ হলো। ইন্দিরা গান্ধী পান্নাবাবুকে আসাম গিয়ে বিমলা প্রসাদ চালিহার (তখন আসামের মুখ্যমন্ত্রী) সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দিলেন। এই কথাও বললেন যে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির জন্য ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে সাহায্য করতে পারবে না।
>
> শ্রী বিমলা চালিহার সঙ্গে পান্নাবাবুর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। চালিহা বাবুকে পান্নাবাবু ওর পরিকল্পনার কথা জানান। পরিকল্পনাগুলো হলো ১. আসাম ও ত্রিপুরা সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর যুবকদের অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া। ২. প্রচারপত্র আর গোপন রেডিওর সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। ৩. মুক্তিবাহিনীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র, ওষুধ ইত্যাদি সাপ্লাই করা।
>
> চালিহা বাবু রাজি হলেন। তিনি টেলিফোনযোগে সীমানা সুরক্ষা বাহিনীর (বিএসএফ) ব্রিগেডিয়ার বরুরাকে ডেকে পাঠালেন। আমি

ও পান্নাবাবু ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে পরিচিত হলাম। দুই দিন পর ব্রিগেডিয়ার বরুরা, আমি আর পান্নাবাবু বিএসএফের একটা গাড়িতে চেপে পূর্ব পাকিস্তান ও আসাম সীমান্তে মানকারচর এবং ডাউকির সীমান্ত অঞ্চলগুলো পরিদর্শন করলাম। দুই রাত্রি সীমান্ত অঞ্চলের বিএসএফ ক্যাম্পেই আমাদের থাকতে হলো। চালিহা বাবু আমার হাতে নগদ ৬০ হাজার টাকা দিলেন, খরচের একটি হিসাবও ওর কাছে দাখিল করার অনুরোধ করলেন। সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশহর কলেজে প্রভাষক হিসেবে কাজ করত আমার এক বন্ধু (প্রয়াত) ববিজিৎ চৌধুরী। কৈলাশহর, খোয়াই ও আসামের করিমগঞ্জ, ডাউকি, বাঘমারা আর মানকারচরে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করেছিলাম।[১৯]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করার পর আসাম বিধানসভায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা অসুস্থ থাকায় তাঁর জায়গায় মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী দায়িত্ব পালন করছিলেন। সে সময় বিধায়ক শৈলেন মেধি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে অভিনন্দন প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দিতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী চালিহার অতীতের অবদানের কথা বলে দেন। বিধানসভায় বেশ হইচই হয়। স্পিকার মুখ্যমন্ত্রী চালিহার কথা উল্লেখ থাকা অংশটি বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেন। কেননা, আন্তর্জাতিক রীতিনীতির বাইরে গিয়ে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্য এক সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে এমন কাজ করতে পারেন না।[২০]

শৈলেন মেধি তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী ছয়জনের নাম উল্লেখ করেননি। অনুমান করা যায়, তাঁরা ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টেরই সদস্য হবেন। আলী আসাদ তখনো ভারতেই ছিলেন।

আলী আসাদ মায়ের কাছে শুনেছিলেন, তাঁদের এক আত্মীয় মোমেনা বেগম কোচবিহারে থাকেন। দ্বিতীয়বার ১৯৬০ সালে তিনি যখন ভারতে যান, তখন কিছুদিন কোচবিহারে ছিলেন। তিনি 'বেঙ্গল ইমিউনিটি' নামক একটি ওষুধ তৈরির কারখানায় কাজ পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে জামালপুরে পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তাঁর ছোট ভাই আলী ইয়ার পারভেজ জানিয়েছেন, ১৯৬৪ সালে তাঁর মা ছোট দুই বোন রেহেনা ও সেলিনাকে নিয়ে কোচবিহারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে পাঁচ-ছয় দিন থাকার পর তাঁরা জামালপুরে চলে আসেন। মা খোকাকে দেশে ফিরে আসতে বলেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'মা, এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।


www.amarboi.com

ভাষা সৈনিক
মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, পূর্ব বাংলা
লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-১৯৫৮ সন, সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, জামালপুর মহকুমা-১৯৫৫ সন
আলী আছাদ (কালো খোকা)
মিয়াপাড়া, জামালপুর।

জামালপুরে কালা খোকার বাড়ির নামফলক

কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি দেশে ফিরে যেতে পারি না।' ১৯৭১ সালের শুরুর দিকে কলকাতার *কালান্তর* পত্রিকার সাংবাদিক আশুতোষ দত্ত (কমরেড আশুদত্ত) আসাদের বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 'কালা খোকা এখনো জীবিত আছে। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি দেশে আসলে আপনার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করব।'[২১]

আলী ইয়ার তাঁর ভাইকে কখনো দেখেননি। মায়ের কাছে তাঁর কথা শুনেছেন। কালা খোকার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। নুরউদ্দিন আহমদ তারা মিয়া করাচি থেকে ফিরে আসেন ১৯৬৫ সালে। এরপর তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ছয় দফা আন্দোলনে অংশ নেন। আবদুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে ১৯৭২ সালে আবার দেখা হয়েছিল তাঁর।

আর এম সাঈদ শেষ জীবনে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রক্ষীবাহিনীর গুলিতে নিহত হন বলে শোনা যায়।[২২] তিনি ১৯৭৫ সালে মারা যান। সিদ্দিকীর সঙ্গে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক মতভেদ হয়েছিল। তিনি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশ নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সিদ্দিকী ১৯৭০ সালে ভাসানী-ন্যাপে যোগ দেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৯৬ সালে।[২৩] আকরাম হোসেন ১৯৭১ সালে রাজাকারদের হাতে নিহত হন। আখতারুজ্জামান মতি মিয়া ১৯৯১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সদরঘাটের আলহামরা লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে পুরান ঢাকায় তাঁর আত্মীয়বাড়িতে ফেরার পথে নিখোঁজ হন।[২৪]

বকশীগঞ্জের আশরাফ হোসেন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী

লীগের টিকিটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ শহরে থেকে আইন ব্যবসা করতেন।[২৫] ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তিনি মারা যান।

নেত্রকোনার এম এ খালেক ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। সলিল কাহালি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে ২০০৫ সালে জামালপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসরে যান।[২৬]

## তথ্যসূত্র


১. সলিল কাহালি, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গকৃত জামালপুরের প্রথম সৈনিক আমাদের কালো খোকাদা', *ধ্রুবতারা*, সম্পাদনা: স্বাধীন আশরাফুজ্জামান, ভাষাসৈনিক মতি মিয়া ফাউন্ডেশন, জামালপুর, পৃ. ২৭-২৯

২. হাসান, মোরশেদ শফিউল (২০১৪), *স্বাধীনতার পটভূমি: ১৯৬০ দশক*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৩০-২৩৩; আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব*, *বিচিত্রা*, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৮৭

৩. আবদুর রহমান সিদ্দিকী, 'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের ভারত অভিযান', *ধ্রুবতারা*, পৃ. ১৬-১৭

৪. আশরাফ হোসেন

৫. রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ২৪৬

৬. *বিচিত্রা*, ২২ জানুয়ারি ১৯৮৮

৭. ওই

৮. ওই

৯. নুরউদ্দিন আহমদ (তারা মিয়া), 'স্মৃতিতে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট', *ধ্রুবতারা*, পৃ. ১৮-১৯

১০. ওই

১১. ওই

১২. ওই

১৩. ওই

১৪. সলিল কাহালি, *ধ্রুবতারা*, পৃ. ২৯-৩০

১৫. নুরউদ্দিন আহমদ (তারা মিয়া), পৃ. ২০

১৬. আখতার হুসেন

১৭. আহাদ, অলি (২০০৪), *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা, পৃ. ২৭৩-২৭৪
১৮. বেগম, সাহিদা (২০০০), *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৮২৬
১৯. *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত : তথ্য ও দলিল, আসাম ও মেঘালয়* (২০১৭), গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : হারুন হাবীব, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৯৬-১৯৭
২০. ওই
২১. আলী ইয়ার পারভেজ, 'অকুতোভয় স্বাধীনতাসংগ্রামী আলী আসাদ', *ধ্রুবতারা*, পৃ. ৫৩
২২. সেন, নির্মল (২০১২), *আমার জবানবন্দি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৭
২৩. শাহজাহান সিদ্দিকী
২৪. স্বাধীন আশরাফুজ্জামান
২৫. আশরাফ হোসেন
২৬. সলিল কাহালি

# স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ

নিউক্লিয়াস কিংবা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কার্যক্রমের কোনো দালিলিক সূত্র পাওয়া যায় না। যাঁরা 'বিপ্লবী বাংলা' নামের মুখপত্রটির কথা বলেন, তাঁরা কেউ আজ পর্যন্ত এর কোনো কপি দেখাতে পারেননি। গোপনীয়তার স্বার্থে এগুলো সংরক্ষণ করা বিপজ্জনক, এটা মেনে নিয়েও বলা যায়, এর কনটেন্ট কী ছিল, তা-ও জানা যায়নি।

আমি এর গোড়ায় যেতে চাইলাম। সিরাজুল আলম খান বিষয়টি বারবার এড়িয়ে গেছেন। আবার যাঁদের ডিকটেশন দিয়ে তিনি লেখান, সেগুলো বেশির ভাগই অগোছালো। আমি লেগে থাকলাম।

রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে আমি ধারাবাহিকভাবে গবেষণার কাজ করছি ২০১২ সাল থেকে। তখন থেকে মাঝেমধ্যে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে দেখা ও কথা হতো। প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি জবাব দেন না। এ ধরনের আচরণ বা স্টাইলের কারণে 'রাজনীতির রহস্যপুরুষ' হিসেবে তাঁর একটি পরিচিতি দাঁড়িয়ে গেছে। 'কাপালিক' নামটি চলে গেছে আড়ালে।

২০১৪-১৮ সালে আমি তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। কথাগুলো রেকর্ড করি। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের গোড়ার দিকের কিছু কথাবার্তা এখানে তুলে ধরলাম :

> মহিউদ্দিন আহমদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন কোন বছর?
>
> সিরাজুল আলম খান : ১৯৫৮ সালে। ম্যাথমেটিকসে। ফজলুল হক হলে রেসিডেন্ট হলাম। যে রুমে গেলাম, সেটা ছিল ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারির রুম। রফিকুল্লাহ চৌধুরী হলেন প্রেসিডেন্ট, আজহার আলী জেনারেল সেক্রেটারি। বুঝতেই পারো। একজন জেনারেল সেক্রেটারির রুমে—একটা অভাগা ঢুকলেও তো অনেক দিক দিয়ে একটা...

মহি : ভিআইপি!

সিরাজ : হ্যাঁ। রফিকুল্লাহ চৌধুরী আসতেন। আজহার ভাই তো ছিলেনই। উনি পরে ব্যারিস্টারি পড়তে গেছেন। পরে আবার বাংলাদেশবিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। হি ডাইড অ্যাজ আ পাকিস্তানি। বছর পাঁচ-ছয় আগে লন্ডনে মারা গেছেন। ছাত্রলীগের অফিস সেক্রেটারি ছিলেন সৈয়দ রেজা কাদের। উনিও ওই রুমে।

মহি : এটা কি থ্রি-সিটেড রুম?

সিরাজ : থ্রি-সিটেড রুম। পরে হয়ে গেছে ফোর-সিটেড।

মহি : রুম নম্বর মনে আছে?

সিরাজ : টি ই ফোর। টপ ইস্ট ফোর। পরে আবার টি বাদ দিয়ে দিয়েছে। শুধু ইস্ট ফোর।

তখন তো রাজনীতি বন্ধ। ছাত্রসংগঠনগুলো সব বন্ধ। আজহার ভাই চলে গেলেন। রফিকুল্লাহ ভাই প্রেসিডেন্ট। মোয়াজ্জেম ভাই সেক্রেটারি হবেন। পুরোনো আর্টস বিল্ডিংয়ে ইফতার পার্টি করে ৬০-৭০ জন জোগাড় করে, গোপনে সন্ধ্যার পরে আমাদের একটা কমিটি করা হলো। দুই বছরের জন্য। পরের বছর রেজা কাদের ভাই আমার নাম এক্সিকিউটিভ কমিটিতে মেম্বার হিসেবে দিলেন। পরের বছর রফিকুল্লাহ ভাই চলে গেলেন।

মহি : তাহলে ’৫৯ সালে আপনাকে কমিটিতে নেওয়া হলো।

সিরাজ : ’৬০ সালের শুরুর দিকে। ওই রোজার টাইমে। পরের বছর মোয়াজ্জেম ভাই হলেন প্রেসিডেন্ট, শেখ মনি সেক্রেটারি। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হওয়ারও একটা গল্প আছে। যে ছেলেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিল, নাজমুল হক, সে আবার রেডিও পাকিস্তানে চাকরি পেয়ে গেছে। সরকারি চাকরি হওয়াতে সে তো আর সংগঠন করবে না। রিজাইন দিয়েছে। আমাকে এক্সিকিউটিভ মেম্বার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বানিয়েছে।

মাঝেমধ্যে রুমের মধ্যে দেখি যে সৈয়দ রেজা কাদের ভাইয়ের কাছে লোকজন আসে, কথাবার্তা বলে। সবাই ছাত্রলীগের। আমাকে বলে, থাকো তুমি। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হওয়ার পরে, মনির গলা থেকে হঠাৎ করে রক্ত বের হলো। ডাক্তার টিবি সাসপেক্ট করে বললেন, ‘তুমি কমপ্লিট রেস্টে যাও।’ তখন আমি অ্যাক্টিং জেনারেল সেক্রেটারি হলাম। অ্যাক্টিং জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার ফলে সারা ইস্ট পাকিস্তানে চিঠি লিখে লিখে যোগাযোগ হতো। রেজা কাদের ভাই আছেন তখনো।

মহি : উনি তখন কী?

সিরাজ : উনি আউটগোয়িং। কিন্তু তখনো হলে থাকেন।

মহি : তাস খেলতেন?

সিরাজ : ব্রিজ খেলতাম।

মহি : আপনি কি কলেজে থাকতে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছিলেন?

সিরাজ : তখন ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন ছিল না। পাইওনিয়ার্স পার্টি আর ডেমোক্রেটিক পার্টি। আমরা ছিলাম পাইওনিয়ার্স পার্টিতে। এখানেও ছাত্রলীগাররা ছিল, আবার ডেমোক্রেটিক পার্টিতেও ছাত্রলীগাররা ছিল। আবার এই দুটোতেই ছাত্র ইউনিয়ন ছিল। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ডেমোক্রেটিক পার্টিতে ছিলেন। তখন যোগাযোগ ও দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু কোনো রিলেশন গড়ে ওঠেনি।

মহি : তাহলে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, এগুলো ঢাকা কলেজে অ্যালাউড ছিল না।

সিরাজ : গভর্নমেন্ট কলেজে খুব স্ট্রিক্ট ছিল। এর মধ্যে এসে গেল '৬২ সালের মুভমেন্ট।

মহি : রাজ্জাক ভাইয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয়ের ইতিহাসটা বলুন।

সিরাজ : সে তো আমার এক বছর-দুই বছরের জুনিয়র। একই হলে এল। ফজলুল হক হলে ভর্তি হলো। সে ছিল আবার কুস্তিগির, জিমনেসিয়ামে যেত। আমিও জিমনেসিয়ামে যেতাম। সেখানে দেখা।

মহি : রাজ্জাক ভাইয়ের কোন দিকটা আপনাকে আকর্ষণ করেছে?

সিরাজ : হি কুড অর্গানাইজ। খুব সহজে মিশতে পারে।

মহি : কোন ডিপার্টমেন্টে পড়তেন তিনি?

সিরাজ : পলিটিক্যাল সায়েন্স।

মহি : তখন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কারা? ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে?

সিরাজ : নেতা অরিজিনালি হলো ফরহাদ ভাই। পরবর্তীকালে এসেছে কাজী জাফর।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এল। হামুদুর রহমান কমিশন, শরিফ কমিশন ইত্যাদি।

মহি : তখন শরিফ কমিশন। একটা কথা বলি, শরিফ কমিশনের রিপোর্ট আপনারা কেউ পড়েছেন?

সিরাজ : পড়েছি মানে, আউটলাইনগুলো জানি।

মহি : ওটাতে এমন কিছু ছিল না। যা ছিল, তা এখন এ দেশে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে। মানে আইয়ুববিরোধী একটা আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন আপনারা?

সিরাজ : না না, ওই যে তিন বছরের পাস কোর্স? আমরা এটার পক্ষে ছিলাম না।

মহি : কিন্তু তিন বছর হলে অনার্স আর পাস কোর্সের মধ্যে যে একটা ফারাক ছিল, ওটা বন্ধ হতো।

আবদুর রাজ্জাক

সিরাজ : না। পাস কোর্স দুই বছরেরই হবে। অনার্স হবে তিন বছরের। পাস কোর্স তিন বছরের হবে কেন, এই ছিল কথাটা। কিন্তু ওখানে সেমিস্টার সিস্টেমটা ছিল। এটা বাদ দিতে গিয়ে সেমিস্টার সিস্টেমও বাদ গেল। যে কারণে আমরা পিছিয়ে পড়লাম। সেমিস্টার সিস্টেমটা তো খুবই ইফেকটিভ সিস্টেম।

তো সারা বছর স্ট্রাইক হচ্ছে। আন্দোলন, মিটিং, মিছিল, এসব হচ্ছে, পুলিশের দাবড়াদাবড়ি হচ্ছে। এর মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের ওপর অত্যাচার করছে, আমাদের শোষণ করছে, এসব ধারণা আস্তে আস্তে আসা শুরু হলো।

মহি : আরেফ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হলো কীভাবে?

সিরাজ : তখন আমরা সিক্সটি টুতে...শিক্ষা আন্দোলনে। বিভিন্ন কলেজে গিয়ে আমরা যখন ছোট ছোট গ্রুপে আলোচনা করতাম, তখন দেখি যে একটা ছেলে বসে থাকে। বাট হি ইজ ভেরি অ্যাটেনটিভ অ্যান্ড হি ইজ ভেরি রেগুলার। জগন্নাথ কলেজে পড়ত।

ধীরস্থির ছেলেটা। আন্দোলনগুলোয় আছে। কিন্তু হইচই করার মধ্যে নাই। একটা র‍্যাপোর্ট—প্রথম র‍্যাপোর্টটা হলো আমি আর রাজ্জাক, এর পরের র‍্যাপোর্টটা হলো আমি আর আরেফ। এর পরে হলো আবুল কালাম আজাদ। পরে প্রাইমারি শিক্ষকদের নেতা হয়েছিল। হতে হতে আমরা একসময় তিনজন, আবার একসময় চারজন বসা শুরু করলাম—ছাত্রলীগকে কীভাবে আরও বেশি অর্গানাইজ করা যায়। এই করার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার কথাটা আস্তে আস্তে এল। বাট নট ইন আ কংক্রিট টার্ম।

'৬২-এর শেষের দিকে আমরা—এখনকার দিনে যাকে ককাস বলে—ঠিক করলাম আমরা সেন্ট্রাল সেল টাইপের কিছু একটা করব। আউটার স্টেডিয়ামে পাঁচ-সাতটা মিটিং দেওয়ার পর আমরা ইকবাল হলের মাঠে বসতাম, টেনিস গ্রাউন্ডে। এটা অবশ্য আরও পরে। বললাম, আমরা এই কাজটা শুরু করি।

মহি : চারজনে?

সিরাজ : হ্যাঁ। চারজন থেকে তিনজন এসে গেল কীভাবে, তা একটু বলে রাখি। আমি জেলে গেলাম। আজাদও জেলে গেল। রাজ্জাকও জেলে। আরেফ কিন্তু জেলে যায় নাই। আজাদ বলল যে সিরাজ ভাই, আমি বোধ হয় এটার সঙ্গে থাকতে পারব না। আমাকে বাদ দিয়ে আপনারা কাজ করেন। তবে এটার প্রতি আই উইল রিমেইন সিনসিয়ার।

মহি : জেলে এই আলাপ হলো?

সিরাজ : জেলে। জেলে তো আমরা ২০-২৫ জন একসঙ্গে থাকতাম। মনি, ওবায়দুর রহমান, আমি, রাজ্জাক, আজাদ, ছাত্র ইউনিয়নের অল লিডার্স, বদরুল হক বাচ্চু, পরে জাস্টিস হয়েছিল, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, রেজা আলী। আজাদ বলল, আমি গরিবঘরের ছেলে। আমার ভাইদের পড়াতে হবে।

আমরা জেলে যাওয়ার পর সিটিতে আরেফ কাজ করতে থাকল। জেলে যাওয়ার আগে আমি জেনারেল সেক্রেটারি হলাম। জেল থেকে বেরিয়ে কনফারেন্স করলাম। মনে আছে, কনফারেন্স হলো ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। রাজ্জাক জেনারেল সেক্রেটারি হলো।[১]

## ২

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বড়সড় আন্দোলন শুরু হয়। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। এই প্রথমবারের মতো প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন—ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে আন্দোলন করে।

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচিতে গ্রেপ্তার হলে ঢাকায় এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ঢাকার ছাত্রসমাজ তখন আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অধীনে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তার ছাত্র আন্দোলনের একটি বড় সুযোগ তৈরি করে দেয়। এই আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ছাত্রলীগ ও ছাত্র

ইউনিয়নের কাছাকাছি চলে আসা। সাবেক কূটনীতিক-লেখক কামরুদ্দীন আহমদের ভাষ্যে বিষয়টি উঠে এসেছে এভাবে :

> ঢাকায় খবর এল ৩১ জানুয়ারি যে, শহীদ সাহেব ৩০ জানুয়ারি তারিখে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ছাত্ররা, বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে তারা সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট করবে পয়লা ফেব্রুয়ারি। ছাত্র ইউনিয়ন, যারা শহীদ সাহেবের মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা করেছে বহুদিন, তারা কেন এ আন্দোলনে যোগ দিল, তা আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। পরে অবশ্যই শুনেছিলাম যে তারা বহুদিন আগে থেকে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় এক বড় আন্দোলন করতে চেয়েছিল, কিন্তু ছাত্রলীগের তেমন সমর্থন না পাওয়ায় তারা সে আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলতে পারেনি। ছাত্রলীগের ধারণা, যে আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন, সে আন্দোলনে তারা বক্তৃতামঞ্চে সমর্থন দিতে পারে, কিন্তু সক্রিয় সমর্থন দিতে পারে না। এবারকার আন্দোলন জোরদার হলো, কারণ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান এসে গেল।
>
> পাঁচ দিন পর্যন্ত ধর্মঘট-বিক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগল, ক্রমাগত বেশি করে। অবস্থা সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো। ছাত্রদের হল ছেড়ে যেতে আদেশ দেওয়া হলো। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসকে শহরের বিভিন্ন স্থানে 'পজিশন' নিতে বলা হলো।...
>
> পরের দিন অবস্থা আরও গুরুতর হলো। সেনাবাহিনীও তলব করা হলো। ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের হল থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে ৭ তারিখে ছাত্র-জনতা নবাবপুর রোড পার হয়ে জেলা কোর্টের সম্মুখে আসার পর ইপিআরের জওয়ানরা প্রথম টিয়ার গ্যাস ও পরে বেয়নেট চার্জ করে।...কাঁদানে গ্যাস ছাড়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ছাত্র-জনতা শাঁখারীপট্টির ভেতর দিয়ে, তাঁতীবাজার দিয়ে পালিয়ে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হলো। একটি ছেলে রাস্তায় তখনো পড়ে আছে, যার ভুঁড়ি ছিদ্র হয়ে পেটের অন্ত্রনালি বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেরা পালানোর সময় চিৎকার করে উঠল, গুলিতে একজন মারা গেছে—সে রাস্তায় পড়ে আছে। মৃতদেহ কালেক্টরের বাংলোর সম্মুখে পুলিশ নিয়ে এল। দেখা গেল, মৃত্যু হয়েছে বেয়নেটের চার্জে।[২]

কামরুদ্দীন আহমদের ভাষ্যটি হলো একজন সংবেদনশীল পর্যবেক্ষকের। যাঁরা বিষয়টি ভেতর থেকে দেখেছেন, তাঁদের একজন হলেন ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক হায়দার আকবর খান রনো। ছাত্র আন্দোলন, ছাত্রসংগঠনগুলোর আন্তসম্পর্ক এবং আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে। রনোর ভাষ্যটি এ রকম :

> ৩১ জানুয়ারি ১৯৬২ সাল। মধুর ক্যানটিনে আমরা চারটি ছাত্রসংগঠনের প্রতিনিধিরা মিলিত হলাম। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, এনএসএফ ও ছাত্রশক্তি। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ফরহাদ, বদরুল হক, মহিউদ্দিন আহমেদ ও আমি ছিলাম। ছাত্রলীগ ছিল আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন। ছাত্রলীগকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগনে। ছাত্রশক্তির পক্ষে মিয়া মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এবং এনএসএফ-এর পক্ষে আবুল হাসনাত। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের মধ্যে আগেই কথা হয়েছে, আমরা সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘটের প্রস্তাব দেব। সিদ্ধান্তমতো ছাত্র ধর্মঘটের প্রস্তাব দেওয়া হলো। আপত্তি করল এনএসএফ ও ছাত্রশক্তি। রাত বারোটা পর্যন্ত মধুর ক্যানটিনে এই আলোচনা চলল। একপর্যায়ে মোহাম্মদ ফরহাদ বললেন, ঠিক আছে আজ আর আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই, আগামীকাল আমরা আবার বসব। কোথায় কখন বসা হবে তা ঠিক হলো। সভা এইভাবে শেষ হলো। ছাত্রলীগের শেখ ফজলুল হক মনি এবং আমরা মোহাম্মদ ফরহাদের এমন ভূমিকায় বেশ মনঃক্ষুণ্ন হলাম। কিন্তু এনএসএফ ও ছাত্রশক্তির প্রতিনিধিরা চলে গেলে ফরহাদ বললেন, 'আগামীকালই ধর্মঘট হবে। ওদেরকে ফাঁকি দিলাম। ওরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাবে, আইবিকে খবর দিতে পারবে না। কিন্তু আমরা আগামীকালই স্ট্রাইক করব।' আমরা ফরহাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারিনি।
>
> সেই মধ্যরাতে ধর্মঘটের পোস্টার লিখলাম। তখনকার দিনে হাতে লেখা পোস্টারের চল ছিল। তাও আবার খবরের কাগজের ওপর লেখা হতো পোস্টার। ধর্মঘটের ডাক দিয়ে পোস্টার লিখে প্রত্যেকটা হলে ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সেঁটে দেওয়া হলো।...বেলা এগারোটার দিকে আমতলায় ছাত্ররা জমা হলেন, খুব বেশি না, শ পাঁচেক হবে। একটা ছোটখাটো সভা হলো। আমি একক বক্তা ছিলাম। এই সভায় কোনো সভাপতি ছিল না। সামরিক শাসনকে অমান্য করে এটাই প্রথম সামরিক শাসনবিরোধী সভা ও বক্তৃতা।...

পরদিন ২ ফেব্রুয়ারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটের খবর কোনো কাগজে ছাপা হয়নি। আমরা শ দেড়েক ছাত্রের এক মিছিলসহকারে তোপখানা রোডের প্রেসক্লাবের সামনে উপস্থিত হয়ে সব কটি খবরের কাগজ পোড়ালাম। সেখানে আবদুর রহিম আজাদ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাস্তায় বক্তৃতা এই প্রথম।

পরদিন ৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের মন্ত্রী মনজুর কাদের এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি। তিনি বক্তৃতা করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর্টস বিল্ডিংয়ের দোতলায় এক নির্ধারিত রুমে তিনি এলেন এবং যথারীতি বক্তৃতা শুরু করেছেন বা করতে যাচ্ছেন, এমন সময় শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে থাকেন। প্রধানত জিয়াউদ্দিন মাহমুদ প্রশ্ন করতে শুরু করেন। 'গণতন্ত্র নাই কেন?' 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কেন?' এইসব ছিল প্রশ্ন। বস্তুত মনজুর কাদেরকে প্রশ্নের জবাবও ভালোভাবে দিতে দেওয়া হয়নি। জিয়াউদ্দিন মাহমুদ এগিয়ে এসে তাঁকে ধাক্কা মারেন এবং চলে যেতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁকে আগলিয়ে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু তার ওপর থুতু বর্ষিত হতে লাগল। মুখে, গায়ে, কাপড়ে থুতু গিয়ে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে মন্ত্রীর যে গাড়িটি রাখা ছিল, তা অগ্নিদগ্ধ হলো। পুলিশের গাড়িতে করে মন্ত্রীকে সরিয়ে নেওয়া হলো। এরপর আমতলার ছাত্রসভায় জিয়াউদ্দিন মাহমুদ খুব গরম বক্তৃতা দিলেন। আর্টস বিল্ডিংয়ে যত ছাত্র ছিল, সবাই জমায়েত হয়েছিল সেই সভায়।

এই তিন দিনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ বেশ তেতে উঠেছে। খবরের কাগজে কোনো রিপোর্ট না থাকলেও মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরাসরি মার্শাল লকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

পরের দু-তিনদিন তেমন কিছু ঘটেনি। একদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। আরেক দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক কর্মচারী ধরা পড়ে। তাকে ছাত্ররা বেদম প্রহার করে। এই ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন বদরুল হক।

৬ ফেব্রুয়ারি কার্জন হলের মাঠে প্রায় হাজার তিনেক ছাত্র জমা হয়েছিল সকালবেলায়। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মিছিল বের করতে হবে। প্রথমে হাইকোর্টের মোড়েই পুলিশ বাধা দেয়। আবু তালেব ও দিলীপ দত্ত গ্রেপ্তার হলেন।

'৬২-র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে তাঁরাই প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পুলিশের প্রতি ইট নিক্ষেপ করা হলো। একপর্যায়ে পুলিশ বহনকারী একটি বাসে আগুন লাগানো হয়। হাইকোর্ট ও কার্জন হলের মাঝখানের রাস্তাটা হয়ে উঠল লড়াইয়ের জায়গা। ওই রাস্তায় সেনাবাহিনীর জিওসির গাড়ির ওপরও পাথর ছোড়া হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে যখন সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, তখন আমরা কজন ঠিক করলাম মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে পুরান ঢাকায় মিছিল নিয়ে যাওয়া হোক। এ পথে তখন পুলিশ ছিল না। সেই পথে আমরা মিছিল বের করলাম। একটু যেতেই সাধারণ মানুষও যোগ দিয়েছিল। প্রায় দশ হাজার মানুষের মিছিল পরিণত হয় সামরিক শাসনবিরোধী স্লোগানে মুখরিত মিছিলে। খুবই জঙ্গি। বিশাল মিছিল পুরান ঢাকা প্রদক্ষিণ করে নবাবপুর রোড, গুলিস্তান হয়ে কার্জন হলে ফিরে আসে। গোটা পথ প্রদক্ষিণ করতে তিন ঘণ্টার মতো লেগেছিল। মিছিল চলার পথে যেসব দোকান, অফিসে আইয়ুব খানের ছবি ছিল, সেসব জায়গা থেকে ছবি নামিয়ে ভেঙে ফেলা হলো।...

পরদিন ৭ ফেব্রুয়ারি আবার একই পথে মিছিল বের হলো কার্জন হল থেকে মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে পুরান ঢাকার দিকে। সেদিন মিছিল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল নবাবপুরের রথখোলার মোড়ে। সামনের দিক থেকে পুলিশ বাধা দিল এবং টিয়ার গ্যাস ছুড়ল।...এরপর পুলিশের বদলে মিলিটারি এসে দাঁড়াল। আমাদের দিকে মেশিনগান তাক করে পজিশন নিয়েছে।...

৭ ফেব্রুয়ারি সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হলো। আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ের জন্য। অপেক্ষা করছি কবে ইউনিভার্সিটি খোলে। কিন্তু এর মধ্যে ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি জনগণের অন্য কোনো অংশকে মাঠে নামানো গেল না। এমনকি অন্যান্য কলেজের ছাত্রদেরও কোনো সভা বা মিছিল হয়নি। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একটা হরতালের ডাক দেওয়া যেতে পারত। না, তেমন কিছুই হয়নি।[৩]

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের অ্যাকটিভিস্টদের একজন ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক পঙ্কজ ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন জগন্নাথ হল শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। ১৯৬৩ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি হন। ওই সময় সভাপতি বদরুল হক গ্রেপ্তার হয়ে গেলে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সহযাত্রী হওয়ার পটভূমি জানতে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম। তাঁর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ভাষণ দিচ্ছেন সিরাজুল আলম খান (১৯৬২)

সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ : ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন একসঙ্গে আন্দোলন করবে, এটা তো একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কীভাবে এটা হলো?

পঙ্কজ ভট্টাচার্য : ১৯৬১ সালের মে মাসের শুরুর দিকে মানিক মিয়ার দূতিয়ালিতে তাঁর কাকরাইলের বাসায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ এবং খোকা রায়ের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক হয়। বৈঠকে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'এখন থেকে স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব তুলতে হবে।' এই পটভূমিতে ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনি এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার বৈঠক হয় এবং তাঁরা দুই সংগঠনের যৌথ আন্দোলনের ব্যাপারে একমত হন। এ রকম একটা বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি রেজা আলীর ইস্কাটনের বাসায় দুই সংগঠনের প্রায় ৩০ জনের একটা বর্ধিত সভা হয়। দুই দলের অ্যাকটিভিস্টরা উপস্থিত ছিলেন। এঁরা এসেছিলেন শেখ মনি এবং মোহাম্মদ ফরহাদের পছন্দের ভিত্তিতে।

৩১ জানুয়ারি খবর আসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার

হয়েছেন। ওই দিন মধুর ক্যানটিনে ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ সভা ছিল। এ সময় হঠাৎ এনএসএফের নেতারা এসে হাজির। যেহেতু তারা সরকারি দল, আমরা তাদের সামনে আলাপ-আলোচনা করতে চাইনি। চোখের ইশারায় আমরা প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলি। ঠিক হয় রাতে আবার সভা হবে।

রাত দুটোর সময় ইকবাল হলে আবার সভা বসে। ঠিক হয়, পরদিন সকাল দশটায় আমতলায় ছাত্রসভা হবে। আগেই সিদ্ধান্ত ছিল পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে আন্দোলন হবে। সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি পাল্টে যায়। আন্দোলনের ফোকাস তখন গিয়ে বন্দিমুক্তির দাবিতে দাঁড়ায়। একটানা কয়েক দিন বিক্ষোভ মিছিল হয়। ৩ তারিখে মিছিলে দুপাশের বাড়ির বারান্দা ও ছাদ থেকে আমাদের ওপর ফুল ছিটানো হয়েছিল। ৫ তারিখ দিলীপ দত্ত গ্রেপ্তার হন। আমাকেও পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়েছিল। আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাই এবং ওয়াইজঘাটে এক ব্যাংক কর্মচারী আমাকে আশ্রয় দেয়। ওই দিন মিছিলটি সদরঘাট হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত যায়। বিভিন্ন দোকানে রাখা আইয়ুব খানের ফটো আমাদের কাছে দিলে আমরা তা বাঁশের ডগায় উঁচিয়ে আগুন ধরিয়ে দিই। অনেক স্কুলের ছাত্র ইউনিফর্ম পরে মিছিলে যোগ দিয়েছিল। এটা ছিল অভিনব। ঢাকা কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে শরিক হয়েছিল।

মহি : কত দিন চলেছিল আন্দোলন?

পঙ্কজ : আমাদের বিক্ষোভ মিছিল চলেছিল ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু বন্দিমুক্তি ও শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত ছিল। আগস্ট মাসে শরিফ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত স্থগিত ঘোষণা করা হলে আমাদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে এটা ছিল আমাদের বিজয়। তারপর আমরা কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি বাতিলের দাবি জানাতে থাকি।[৪]

## ৩

১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আইয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল বেশ জোরেশোরেই। ওই সময়েই

ছাত্রনেতা হিসেবে সিরাজুল আলম খানের উত্থান। সাধারণ কর্মী থেকেই তিনি হয়েছিলেন একজন সংগঠক। ওই সময়ের একটি বিবরণ আমি পেয়েছি মোস্তফা মোহসীন মন্টুর কাছ থেকে। ষাটের দশকের শেষ দিকে ছাত্র আন্দোলনে মন্টু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু '৬২ সালে তিনি নিতান্তই একজন কিশোর। তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় আলাপ হলো :

মোস্তফা মোহসীন মন্টু : ১৯৬২ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় আমি স্কুলে পড়ি, নবকুমার ইনস্টিটিউশন। আমাদের ওপর দায়িত্ব পড়ল কারওয়ান বাজারের মোড়ে রেলগেটে। ওখানে একটা গেট বানানো হয়েছিল। আমরা ১৫-২০ জন গেলাম সেখানে। পলিটেকনিক স্কুলের কিছু ছেলেও এসেছে। আমরা ওই গেটে আগুন লাগিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আর্মি এসে গেল।

মহিউদ্দিন আহমদ : আপনাদের অর্গানাইজ করেছিলেন কে?

মন্টু : সিরাজ ভাই। উনি তখন ছাত্রলীগের সেক্রেটারি না, মনি ভাই সেক্রেটারি। আর্মি এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। এর মধ্যে দু-তিনজন দৌড়ে পালিয়ে গেল। একজন সৈন্য এসে বলল, বাচ্চালোগ, ইয়ে কাম তোম আচ্ছা নেহি কিয়া। তোমকো ইয়ে করনা নেহি চাহিয়ে। তোমকো কোন ভেজা?

আমি ভাঙা ভাঙা উর্দুতে উত্তর দিলাম, আইয়ুব খান কো নেহি মাংতা।

—ও মেরা সদর (প্রেসিডেন্ট) হ্যায়। ঠিক হ্যায়, জিসকে জিসকে ঘর যানা হায়, ঘর যাও। আর জিসকো পুলিশ চৌকিকে মে যানা হ্যায়, উনলোগ ট্রাক মে ওঠ যাও।

আমরা ১০-১২ জন ট্রাকে উঠে পড়লাম। আমাদের নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে। একটা ব্যারাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। শীতের দিন। বিকেল হচ্ছে, আমরা শীতে কাঁপছি। পরে দুবার করে কম্বল দিল, মোটা পশমের কম্বল। সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমরা চিৎকার শুরু করলাম। পরে চাদর এনে দিল। এক চাদরে হয় না। একটা বিছাব, আরেকটা কম্বলের নিচে দিতে হবে। দুইটাই দিল। পরে খাবার—রুটি, খাসির মাংস আর ডাল। ঠেসে খেলাম। পরদিন সকালে ভালো নাশতা দিয়েছে। ওদের একজন মহিলা ডাক্তার ছিল। সে আমাদের পরীক্ষা-টরিক্ষা করল।

মহি : বাঙালি?

মন্টু : না, পাঞ্জাবি। ওর সঙ্গে আরেকজন জুনিয়র পুরুষ ডাক্তার ছিল, বাঙালি। বলল, তোমরা বাবা এ অবস্থায় কেন এগুলো করতে

যাও। এখন তো মার্শাল ল চলছে। তোমরা এগুলো করবা না। তোমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। মিলিটারির তো নিয়ম-টিয়ম আছে। তারা মানুষ মারলে কোনো বিচার-টিচার হয় না।

তারপর গাড়িতে করে রমনা থানায় পাঠিয়ে দিল। থানা থেকে আমার বড় ভাইকে খবর পাঠানো হলো। উনি থানায় এসে বন্ড দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। এটাই আমার জীবনে প্রথম ধরা পড়া।

আমতলাতে আমরা মোয়াজ্জেম ভাইয়ের (শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন) বক্তৃতা শুনতে যেতাম। মোয়াজ্জেম ভাই আধা মিনিট থেকে এক মিনিট বাংলায় বলতেন। তারপর ইংলিশ। কথাবার্তা যেন কামানের গোলার মতো বের হতো তাঁর মুখ দিয়ে। গলাটাও ছিল ওই রকম। তাঁর গলা শুনে মনে হতো, এখনই যুদ্ধে চলে যাই। গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যেত।[৫]

## ৪

ফিরে আসি নিউক্লিয়াস প্রসঙ্গে। সিরাজুল আলম খান তখন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। শেখ মুজিবুর রহমান তখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং মূল সংগঠক ও নেতা। রাজনৈতিক দলগুলো তখন অতটা সক্রিয় নয়। ওই সময় শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয় সিরাজুল আলম খানের। এটা ১৯৬২ সালের শেষের দিকে বা ১৯৬৩ সালের শুরুর দিকের কথা।

মোয়াজ্জেম ভাই আমাকে প্রথম নিয়ে যায় মুজিব ভাইয়ের কাছে—উনি আলফা ইনস্যুরেন্স ইস্ট পাকিস্তানের জেনারেল ম্যানেজার। তৎকালীন জিন্নাহ অ্যাভিনিউ—এখনকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে অফিস। সামনে একটা সাদা কাগজ। সেখানে কিছু লিখলেন। মোয়াজ্জেম ভাইকে বললেন, তুই তো থাকছিস না। মনি প্রেসিডেন্ট, ওবায়দুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারি, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সিরাজুল আলম খান। তারপর অন্য প্রসঙ্গে তিনি চলে গেলেন। বললেন, ভালো করে কাজ কর ইত্যাদি।

আমার কাছে কেন যেন ভালো লাগেনি। প্রথম কথা হলো, ওই যে দুই নম্বর হব না। অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মানেই তো দুই নম্বর। আগেই মোয়াজ্জেম ভাইয়ের কাছ থেকে আমি জেনে

নিয়েছি ছাত্রলীগ কী। উনি বললেন, এটা জেনারেল সেক্রেটারি-বেজড অর্গানাইজেশন। হি ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ চিফ। প্রেসিডেন্ট তো প্রেসিডেন্টই। ওখানে কোনো কথা বলার তো দরকার নাই। আমি চলে এসেছি। বললাম, হাউ আই কেম ইন কনট্যাক্ট উইথ মুজিব ভাই।

রেজা কাদের ভাই এমএ পাস করে গেলেন। চাকরি হচ্ছে না। বাই দিস টাইম আমিও হলে থাকতে পারি না। ওনাকে বললাম। বললেন, নিম ভিলায় চলে আসেন। দুজনে এক বিছানায় থাকি। আলাদা থাকলে তো মাসে ৩০ টাকা দিতে হয় সিটভাড়া।

মহি : এটা কোন জায়গাটা?

সিরাজ : নিমতলী। আগে যে জাদুঘরটা ছিল, পুলিশ হসপিটাল, ওখানে একটা রেলক্রসিংয়ের মতো ছিল, তার ডান দিকে গেলে নাজিমউদ্দিন রোডে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

মহি : ওখানে মেস?

সিরাজ : অ্যারিস্টোক্রেটিক মেস। ওখানে নন-সিএসপি ছিল মোয়াজ্জেম ভাই, রেজা কাদের ভাই আর আমি। আর সবাই ওখান থেকে সিএসপি হতো।

মহি : ডেইলি এক টাকা ভাড়া?

সিরাজ : মাসে ৩০ টাকা। আর এক টাকার খাবার।

মহি : সারা দিনের খাওয়া এক টাকা?

সিরাজ : হ্যাঁ। আমি তো একটু বেশি খানেওয়ালা! রেজা কাদের ভাই থাকলে ভাগ করে খেতাম। উনি প্রাইভেট পড়াতেন। তাতে যা টাকা-টুকা পেতেন, তা দিয়ে খাওয়াদাওয়া। আর তো শুধু হাঁটা। সিগারেট খেতাম তখন।[৬]

## ৫

সিরাজুল আলম খান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে পুরান ঢাকার পাকিস্তান মাঠে ছাত্রলীগের সম্মেলনের আয়োজন হলো। এই অধিবেশনে তিনি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কে এম ওবায়দুর রহমানকে করা হয় সভাপতি। ওই সময়ের একজন সাক্ষী হলেন মাহবুব তালুকদার। তাঁর বয়ানে উঠে এসেছে নানান কথা।

মাহবুব তালুকদার : আমি ওই পিরিয়ডে *ইত্তেফাক*-এ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ছিলাম। যারা ছাত্ররাজনীতি করে, তারা সবাই আমার বন্ধু হয়ে গেল। কারণ, *ইত্তেফাক* তখন একটা দুর্ধর্ষ পত্রিকা। ওইটাতে যদি নাম ছাপানো যায়, এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি হলো বলে তারা মনে করে। নাম ছাপাটা অনেক ক্ষেত্রে আমার ওপরই নির্ভর করত। আর আমি ছিলাম একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার। পরে অবশ্য *পাকিস্তান অবজারভার*-এ মিজানুর রহমান শেলী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসেবে ছয় মাস কাজ করেছিল।

মহিউদ্দিন আহমদ : সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বা সম্পর্ক কেমন ছিল?

তালুকদার : সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত বন্ধুত্ব। শেখ ফজলুল হক মনি, ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, এনায়েতুর রহমান, সিরাজুল আলম খান—এদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়। একজন হলো শেখ ফজলুল হক মনি, আরেকজন হলো সিরাজুল আলম খান। সম্পর্কটা 'তুমি' পর্যায়ের না। এটা 'তুই' পর্যায়ের। খুব ঘনিষ্ঠ না হলে তো আমরা কাউকে তুই বলি না।

একবার সিরাজ হাসপাতালে। খবর পাঠাল, আমাকে দেখতে চায়। গেলাম। অনেক লোকজন ছিল। বলল যে, তোমরা সরে যাও। আমি এখন আমার বন্ধুর সঙ্গে থাকব। সবাই চলে গেল। আমরা বসে বসে কত রাজ্যের গল্প করলাম। নো পলিটিকস।

আমার অনেক সময় মনে হতো, সরকারের সঙ্গে এই লোকটার সম্পর্ক আছে কি না। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। মনির ব্যাপারে তো মনে হয় নাই। ওবায়দুর রহমানের ব্যাপারে তো মনে হয় নাই। তার কারণ হলো...

মহি : এটা কি ওই সময় মনে হয়েছে? ছাত্রজীবনে?

তালুকদার : হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে হয়েছে কেন? তার একটা বড় কারণ হলো, ওর মধ্যে যে রহস্যময়তা এসে দানা বাঁধছিল—লোকে বলে না, সে রহস্যময়? ওটা তখন থেকেই ছিল। আমার মনে হতো, ব্যাপারটা কী? ওর সঙ্গে কি কোনো এজেন্সির সম্পর্ক আছে? কী সব বলে, কী করে, না করে? এটা নিয়ে আমি কনসার্নড ছিলাম না। ছাত্রলীগের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল দুইটা বিষয়ে। সম্ভবত ১৯৬৪ সালে একটা মহাসম্মেলন হয়। সারা দেশ থেকে ১০-১৫ হাজার ছাত্রলীগ সদস্য পাকিস্তান মাঠে এসেছিল।

মহি : এটা ১৯৬৩ সালে।

তালুকদার : পাকিস্তান মাঠে আবদুল লতিফের পরিচালনায় আমার লেখা একটা গীতিনকশা মঞ্চস্থ হয়েছিল, যেখানে বায়ান্ন থেকে ধারাবাহিকভাবে ওই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থা তুলে ধরেছিলাম। এটা খুব সাকসেসফুল হয়েছিল। *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পাতায় বিরাট করে ছাপা হয়েছিল। এই হলো একটা। আরেকটা এর আগে। ছাত্রলীগের প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারির ম্যাগাজিন আমি এবং আমার বন্ধু সৈয়দ আহমদ—মারা গেছে—আমরা দুজন যৌথভাবে সম্পাদনা করেছিলাম, সম্ভবত ১৯৫৮ সালে।

মহি : আপনি কখনো ছাত্রলীগ করেননি?

তালুকদার : আমি তো সাংবাদিক। আমি ছাত্রলীগ করব কেন? আমার যত দূর মনে আছে, কিছুদিন ছাত্রলীগের কালচারাল ফ্রন্টের প্রধান ছিলাম, কেন্দ্রীয়।[৭]

৬

১৯৬৩ সালের ছাত্রলীগ সম্মেলন ছিল সিরাজুল আলম খানের উত্থানপর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ওই সম্মেলনে তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক পদের একজন দাবিদার। তাঁর পেছনে দারুণ সমর্থন জুগিয়েছিলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। বিরোধিতা করেছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি আমি।

মহি : মোয়াজ্জেম ভাই তো যাবেন ’৬৩ সালে। আপনি তো ’৬৩ সালে সেক্রেটারি হলেন।

সিরাজ : হ্যাঁ। ওখানে দেখলাম, যারা ফরিদপুর আর বরিশাল থেকে এসেছে, ওরা আমার বিরুদ্ধে। আর সবাই আমার পক্ষে, ইনক্লুডিং ঢাকা সিটি। হোল হাউস ঢাকা সিটির নেতৃত্বে আমার পক্ষে। অন্য পক্ষে ওবায়দুর রহমান প্রেসিডেন্ট। চিটাগাং থেকে সামবডি অথবা অন্য জায়গা থেকে সেক্রেটারি হিসেবে কার কার নাম এসেছে। বাট নট মি। আমি তো সাপোর্টেড বাই শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। কী কারণে আমাকে নিয়ে দুই পক্ষ হলো, আমি আজও বুঝি না।

মহি : ফেরদৌস কোরেশীর সঙ্গেই বোধ হয় এটা হয়েছিল?

সিরাজ : ফেরদৌস কোরেশী, আর পরে শুনেছি আবদুল হাই

সাচ্চু। ওই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার। ফেরদৌস কোরেশী তো শেখ মুজিবের পক্ষে বা মনির পক্ষে না। এটা হলো চিটাগাংওয়ালাদের কাজ। ফেরদৌস কোরেশীর একটা সুনামও ছিল। তখন যে বন্যা হয়েছিল, বন্যার জন্য সারা দেশে আমরা সাহায্য নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি চিটাগাংয়ের কো-অর্ডিনেটর ছিলেন। তাঁর নামটা সবাই জেনে গিয়েছিল। আমাকে জেনেছিল অ্যাক্টিং সেক্রেটারি হওয়ার কারণে, সবার সঙ্গে আমার যোগাযোগ, সেই কারণে। আমি তো সেক্রেটারি হয়ে গেলাম।

তারপর তো কাজের ধারা আমরা স্পিডআপ করলাম। আমরা *বিপ্লবী বাংলা* নামে একটা পেপার বের করলাম। হাতে লিখে। কয়েকটা সংখ্যা করেছিলাম। এগুলো খুব গোপন। কারণ, ধরা পড়লেই, মানে বেত মারা। আর জেল তো আছেই। রাজশাহীতে একটা স্কুলের ছেলে একটা গোপন দলের পোস্টার লাগাতে গিয়েছিল। তাকে আটটা বেত মারা হয়েছে। সে যখন জেল থেকে বের হলো, তাকে এক্সিবিট করা হলো। ছাত্র ইউনিয়ন ওটা করল। আমরা পক্ষে ছিলাম। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন ওই ছেলেকে তাদের পকেটে নিয়ে গেল।

মহি: এই যে আপনারা ক্ল্যানডেসটাইন কাজ করছিলেন, ওই সময় যারা আপনাদের সিনিয়র বা কনটেম্পোরারি ছিল, বিশেষ করে মোয়াজ্জেম ভাই বা মনি ভাই, এঁদের কনফিডেন্সে নিলেন না কেন?

সিরাজ: মোয়াজ্জেম ভাই হঠাৎ আমাকে আর মনিকে ডাকলেন। হসপিটালে ব্রাদার-সিস্টাররা যেখানে থাকেন, তাঁদের চিফের বাসায় ছিলেন। আজিমপুর কলোনিতে। পেপারে নাম দিয়েছে সারেন্ডার করার জন্য। তাদের নামে তখন হুলিয়া। বললেন, সারেন্ডার করব।

মহি: এটা মোয়াজ্জেম ভাই বললেন?

সিরাজ: হ্যাঁ। বললেন, দেশ থেকে একটু ঘুরে আসি। মুন্সিগঞ্জ থেকে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় বললেন, পরে জানাব। বের হয়ে এসে মনি বলল যে তোরা ঢোকার আগে উনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, উনি এটার সঙ্গে থাকবেন না।

মহি: মোয়াজ্জেম ভাই থাকবেন না? এটা মনি ভাইকে আগেই বলেছিলেন?

সিরাজ: আগে মানে ওই বৈঠকের আগে। এই ওনার ডিসঅ্যাসোসিয়েশন হয়ে গেল। আর মনির ডিসঅ্যাসোসিয়েশন হলো তার গলায় রক্ত। আর সে বিয়ে করে ফেলল। সেরনিয়াবাত সাহেবের

মেয়ে। ওদের একই বংশের মধ্যে বিয়ে হয়, জানো তো? আমি পড়ে গেলাম একা। কিন্তু মাথায় তো পোকাটা ঢুকে গেছে। ওইটার সঙ্গে আর ওরা নাই। আমরা যেটা শুরু করলাম, একেবারে লিংকবিহীন। আমাদের নিউক্লিয়াসটা শুরু করলাম।[৮]

শেখ ফজলুল হক মনি

সিরাজুল আলম খানের কথায় বোঝা যায়, শাহ মোয়াজ্জেম, শেখ মনি ও তিনি—তিনজনই একটা গোপন প্রক্রিয়ায় ছিলেন। পরে তাঁদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সংযোগ কেটে যায়। শেখ মনিকে তাঁদের চক্র থেকে বাদ রাখার যে কারণ সিরাজুল আলম খান দেখিয়েছেন, তা পুরোপুরি সত্য নয়। শেখ মনি বিয়ে করেন অনেক বছর পর, উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের পর। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। এর পরপর তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান।

## ৭

শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন শামসুজ্জামান খান (বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক)। তাঁরা প্রায় একই বয়সের। শামসুজ্জামান খানের কাছ থেকে ওই সময়ের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

> শামসুজ্জামান খান : ১৯৫৯ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, বাংলা বিভাগে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কোনো মুসলিম হলে ভর্তি হব না। তখন ঢাকা হল (পরে নাম হয় শহীদুল্লাহ্ হল) ছিল একমাত্র কসমোপলিটান হল। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই থাকতে পারত।
>
> ১৯৬০ সালের শেষ দিকে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একটু শুরু হলো। জগন্নাথ কলেজে আমার ক্লাসেই ছিল শেখ ফজলুল হক মনি। সে খুব সক্রিয়। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে পরিচয় হলো। যেহেতু আমি ছাত্রলীগ করি, আমি আর আসমত আলী

শিকদার, আমাদের দুজনের রুম ছাত্রলীগের রাজনীতির কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল। এখানে ওবায়দুর রহমান আসতেন। তখন তাঁকে আমরা জঙ্গিনেতা বলতাম। বরিশালে অশ্বিনীকুমার হলের নাম বদলে আইয়ুব হল করেছিল। তখন যারা নেতৃত্ব দিয়ে ওটা তুলে ফেলেছিল, ওবায়েদ সেখানে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল।

মহিউদ্দিন আহমদ : মানে আইয়ুব হল বদলে আবার অশ্বিনীকুমার হল।

শামসুজ্জামান : হ্যাঁ। তখন আমরা একটু পেকে গেছি মনে হয়। ওবায়েদ এসেছেন মফস্বল থেকে। একটু কাঁচা ধরনের। হলের ইলেকশন হবে। ওবায়েদকে পাঠাতাম, যান, কনট্যাক্ট করে আসেন। পরে তো নেতা হলেন। ভালো বক্তৃতা করতেন। প্রথমে ঢাকা হলের হোয়াইট হাউসে ৩১ নম্বর রুমে থাকতাম। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদও রেসিডেন্ট হিসেবে ঢুকলেন।

মহি : আপনারা কি একই ব্যাচের?

শামসুজ্জামান : না। উনি আমার তিন বছরের সিনিয়র। ওনারা ছাত্র ইউনিয়ন করেন। আবদুল্লাহ আল আমিন, মোফাজ্জল করিম ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। ছাত্রলীগে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা কম ছিল। আমাদের হলে আগে আহমেদুর রহমান ছিলেন। তিনিও ছাত্র ইউনিয়নপন্থী। নির্মল সেন, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ছাত্রলীগ করতেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়ন খুবই অ্যাকটিভ। আমরা তো সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে খুব দুর্বল। মনির সঙ্গে আলাপ হলো, মোয়াজ্জেম সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো। বললেন, আমাদের মধ্যে তো এ রকম কেউ নেই। তোমরা করো।

১৯৬৩ সালে ছাত্রলীগের কনফারেন্স হলো। তখন পাকিস্তান মাঠ, এখন বোধ হয় বাংলাদেশ মাঠ নাম দিয়েছে। নিমতলীর পাশে, আগা সাদেক রোড। আমি ১০ জন বুদ্ধিজীবীকে আনলাম। আমাকে চিফ ইলেকশন কমিশনার করা হয়ছিল।

তখন এনএসএফও সামনে এসে গেছে। মেননকে ডাকসু অফিসের সামনে ফেলে বেশ মারপিট করল। ছাত্রলীগের গায়ে তেমন হাত পড়েনি। তখন ছাত্রলীগ মূলধারার দিকে একটা শক্তিশালী অবস্থানে গেছে। তার আগে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ইউনিয়ন শক্তিশালী। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারা মাত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তখন ওই সম্মেলনটা করলাম। ওই সময় থেকে ছাত্রলীগে সংস্কৃতির দিকে একটু চোখ পড়ল।

সিরাজুল আলম খান

অনার্সের পর আমি ৫২ নম্বর রুমে গেলাম—সিঙ্গেল সিটেড রুম। আমার পাশে থাকতেন মোফাজ্জেরুল হক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়তেন। আমরা পত্রিকা বের করেছি। ঢাকা হলের পত্রিকার নাম ছিল *শতদল*। আমি সম্পাদক। ভবতোষ দত্ত এখানে ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে লেখা পাঠালেন। মুনীর চৌধুরী স্যারের লেখা ছাপলাম। আর্কিটেকচারের ওপর ইংরেজিতে একটা লেখা মোফাজ্জেরুল হক অনুবাদ করলেন।
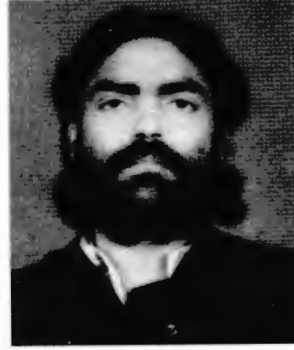
আমাদের সময় প্রিফেক্ট সিস্টেম ছিল। সিনিয়র ছাত্রদের প্রিফেক্ট করা হতো। প্রিফেক্টের কাজ ছিল রাতের বেলা রেজিস্টার বই নিয়ে ১০টার সময় সবাই উপস্থিত আছে কি না, সেটা চেক করা। এমএ ক্লাসের ছাত্র হয়ে এমএ ক্লাসের ছাত্রদের পরীক্ষা করছি। এখন হলে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রও রোলকল করা বুঝিয়ে দিত!

তখন আমি ২৪ নম্বর রুমে থাকি। রাতে কমনরুমে আকাশবাণীর গান শুনি। সিরাজুল আলম খান এলেন এবং আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো। উনি ম্যাথমেটিকস পড়তেন। আমার রুমে ফ্লোরে থাকতেন। দেখতাম, সকাল ১০টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু পা নাড়ছেন। সেবার আমি ইলেকশনে দাঁড়ালাম, হলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে।

মহি : এটা কোন সালে?

শামসুজ্জামান : '৬৩ সালে। আমি মোটামুটি জনপ্রিয়ই ছিলাম। তখন ছাত্রলীগ কোয়ালিশন করল এনএসএফের সঙ্গে। আমি বললাম, হেরে গেলেও আমি এনএসএফের সঙ্গে কোয়ালিশন করব না। ড. মুশফিকুর রহমান ছিলেন প্রভোস্ট। আমাকে বললেন, 'একটা পোস্ট ওদের দিয়ে দাও।'

আমি বললাম, স্যার, ক্ষমা চাই। আমার পক্ষে এটা করা সম্ভব না। যাহোক, ইলেকশন হলো। আমি ১৫১ ভোট পেলাম। ছাত্র ইউনিয়নের বজলুর রহমান জিতল। পরে এক পর্যালোচনা মিটিংয়ে সিরাজুল আলম খান বললেন, 'এত ভালো ক্যান্ডিডেট দিয়েও আমরা

হেরে গেলাম। তবে উনি যে স্ট্যান্ডটা নিয়েছেন, সেটা বোধ হয় ঠিকই আছে।'

আমি যে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি, সিরাজুল আলম খান প্রতিদিন বক্তৃতা করতেন। মোয়াজ্জেম সাহেব, শেখ ফজলুল হক মনি আসত। বক্তৃতা করত।

আমাদের কাছে সরাসরি নিউক্লিয়াসের কথা বলা হয়নি। কিন্তু আমরা একটা সুগন্ধ পাচ্ছিলাম যে আমরা স্বাধীনতাসংগ্রামের দিকে যাচ্ছি। এটা বোঝা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

ওই সময় হলে তো মোয়াজ্জেম ভাই, শেখ মনি, এনায়েতুর রহমান থাকত না। সিরাজুল আলম খানই ছিলেন। আমাদের চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী নেতা। তখনই তিনি আমাদের নেতা ও দার্শনিক। এমনিতে তিনি সিম্পল, একটু ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ, চিন্তাশীল—এ বিষয়গুলো তাঁর মধ্যে আছে। ওই সময়...সামরিক শাসন, কাজটা কত কঠিন।[৯]

৮

ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন সমীকরণ সহজ ছিল না। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তারা কাছাকাছি এসেছিল। আবার দুই সংগঠনে ছিল প্রবল প্রতিযোগিতা। ছাত্র ইউনিয়ন ছিল গোপন কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গসংগঠন। অন্যদিকে ছাত্রলীগ ছিল আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন। আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ছিল।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্ররা ছাত্র ইউনিয়নের দিকেই ঝুঁকতেন বেশি। তাঁদের চালচলন, কথাবার্তা ছিল তুলনামূলকভাবে অসাম্প্রদায়িক ও উদারবাদী। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে 'ভালো ছাত্র' না হলে জেতা মুশকিল ছিল এবং ছাত্র ইউনিয়ন এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিল। বিশেষ করে নারী ও 'অমুসলমান'দের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের সংযোগ ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল বেশি। ছাত্রলীগে যাঁদের সমাবেশ ঘটত, তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন মধ্য কিংবা নিম্নমানের। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলেন কেউ কেউ। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে জীবন গড়ার যে দৌড়, তাতে ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য বা সমর্থকেরা ছিলেন এগিয়ে। শুধু মিটিং-মিছিল বা হইহুল্লোড় করে তো আর 'সিএসপি' হওয়া যায় না!

নানা ইস্যুতে একসঙ্গে আন্দোলন করলেও আদর্শগত মতপার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এ প্রসঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে, দলীয় 'ইগো' অনেক সময় ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

মহি : কী নিয়ে আপনাদের মধ্যে গোলমাল হতো? দু-একটা উদাহরণ দিন না।

সিরাজ : তখন তো আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান নেতা হলেন মওলানা ভাসানী। ছাত্র ইউনিয়ন তো ন্যাপের অনুসারী। আমরা স্লোগান দেওয়ার কিংবা লিফলেট লেখার সময় বলতাম বা লিখতাম সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী—এরপর জিন্দাবাদ বা মুক্তি চাই—এই সব। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা বলত ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী। অর্থাৎ আমরা যার যার দলের নেতার নাম আগে বসিয়ে ভাবতাম এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মহি : আপনাদের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি হতো না?

সিরাজ : একটা ঘটনার কথা বলি। আমি তখন ছাত্রলীগের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক। ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে তখন মন-কষাকষি চলছে। ঢাকা হলে সন্ধ্যার পর হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে হাউস টিউটরের উপস্থিতিতে দুই দলের নেতারা বৈঠকে বসলেন। ছাত্রলীগের পক্ষে নাজমুল ও আমি। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে এনায়েত ভাই (এনায়েতউল্লাহ খান) এবং আরেকজন। পাঁচ-সাত গজ দূরে জনা তিরিশেক সাধারণ ছাত্র। আলোচনার একপর্যায়ে তর্ক শুরু হলো। আমরা একে অপরকে দুষছিলাম। নাজমুল হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে এনায়েত ভাইয়ের মুখে একটা চড় মারল। এই ঘটনায় সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। মিটিং অসমাপ্ত রেখে হাউস টিউটর চলে যান।

মহি : ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

সিরাজ : তখন থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে আই হ্যাড আ কর্ডিয়াল রিলেশন। এমনিতেই সবার সঙ্গে আমার কর্ডিয়াল রিলেশন ছিল।

মহি : ফরহাদ ভাই তো অন বিহাফ অব কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়নের কাজ কো-অর্ডিনেট করতেন।

সিরাজ : করত এবং হি ওয়াজ দ্য গাইড।

মহি : ওনার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হলো কীভাবে?

সিরাজ : আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতেন উনি। আর এরা জানত যে আই অ্যাম দ্য মেইন ম্যান ইন ছাত্রলীগ। ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি হিসেবে যারা ছিল, ওরা মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। কোথায় দেখা হবে—ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির আহসানউল্লাহ হলে। তাঁর কাছ থেকে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেতাম। গুছিয়ে কীভাবে লিফলেট লিখতে হয়, এটাও তিনি দেখিয়ে দিতেন।

মহি : আপনি অনেক দিন আগে আমাকে একটা স্টোরি বলেছিলেন। চিকা মারার গল্পটা।

সিরাজ : হয়েছে কি, ছাত্রলীগের দু-তিনজন, আমিসহ, আর ছাত্র ইউনিয়নের সাইফুদ্দিন মানিক আর আলী রেজা।

মহি : আলী রেজা না রেজা আলী?

সিরাজ : আলী রেজা। রেজা আলীও থাকত। কিন্তু আমি বলছি আলী রেজার কথা। জার্মানিতে ছিল। মারা গেছে কয়েক বছর আগে। আমরা একে অপরকে খুব পছন্দ করতাম।

আমরা ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়ন একসঙ্গে যেতাম। খুব ফ্রেন্ডলি ছিলাম। হাতে থাকত রঙের বালতি আর ব্রাশ। দুই পার্টির জন্য দুইটা। আর পুলিশের গাড়ি আসে কি না, অবজারভেশন পোস্ট থাকত। একবার আমরা ইকবাল হল থেকে বেরিয়ে এস এম হলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ্য হলো আর্কিটেকচার বিল্ডিং। এখানে বিরাট একটা পুকুর ছিল। নতুন আর্কিটেকচার বিল্ডিং হবে। এ জন্য দেড়-দুই বছর ধরে ইট আনা হচ্ছে। ইট জমা হচ্ছে। দেয়ালে লেখা শুরু হয়। হঠাৎ একটা ইঁদুর যায়। ইঁদুরজাতীয় কিছু—চিকা। সামনে দিয়ে চলে গেল। বললাম, এটারে মারি। তো এটা তো ইটের মধ্যে ঢুকে গেছে। চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালাম, হুস হুস করছি। এইটা তো আর বের হয় না। ভোর সোয়া পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। আচ্ছা, বাদ দাও, আজ আর করব না। আবার হয়তো দুদিন পরে প্রোগ্রাম হলো। প্রোগ্রামটা হতো বিকেলবেলা, ইকবাল হলের ক্যানটিনে। আমরা তো বলতে পারব না, গোপনে রাতে দেয়ালে রং দিয়ে লিখতে যাচ্ছি। বলতাম, ওই যে, ওই যে, চিকাটাকে মারতে হবে না? এরপর যেদিনই যেতাম—কী কাজ, চিকা মারা। চিকা মারতে বের হব ওই টাইমটায়। ইট ওয়াজ সো পপুলার! ইনস্পায়ার্ড ফিল করত সবাই। ওখান থেকেই চিকামারা কথাটা এসেছে।

মহি : এটা কোন সময়? আপনি অ্যারেস্ট হওয়ার আগে?

সিরাজ : হ্যাঁ। ১৯৬৩ সালে।

মহি : আপনার সঙ্গে কি বাদশা ভাই (আমিনুল হক বাদশা) ছিলেন?

সিরাজ : হ্যাঁ, ও লিখে দিত। আমাদের মধ্যে লেখার একমাত্র লোক ছিল বাদশা। আমরা ডিপেন্ড করতাম ছাত্র ইউনিয়নের ওপর। সাইফুদ্দিন মানিকও লিখতে পারত। আর আর্ট কলেজ থেকে তিন-চারজন নিয়ে আসত।

মহি : ছয় দফা দেওয়ার সময়টার কথা বলুন।

সিরাজ : '৬৫-এর যুদ্ধ একটা বিষয় শো করেছে। ইস্ট পাকিস্তানকে ভারত আক্রমণ করল না, এটা দখলও করল না।

মহি : ভারতের মার্সির ওপর থাকল।

সিরাজ : না। মানে হলো, পূর্ব পাকিস্তান একা থাকতে পারে। এই একটা ধারণা। পূর্ব পাকিস্তানকে যদি একা থাকতে হয়, ইন্ডিয়া তো কিছু করবে না? এই একটা বিষয় মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু খুব একটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত আকারে, তা না।

ছেষট্টিতে যখন ছয় দফা দিল, একদিন দেখলাম *ইত্তেফাক*-এ থার্ড কলামের মাঝে সাত-আটটা লাইনে—শেখ মুজিবের ছয় দফা। মানে একটা ইম্পরট্যান্ট নিউজকে নেগলেক্ট করে যেভাবে দিতে হয়। ফার্স্ট পেজে দিতে হবে কিন্তু নেগলেক্ট করে। নিউজটা পড়লাম। মনি ডেকে নিয়ে বলল, দোস্ত, চল, এক জায়গায় যাব। গেলাম মুজিব ভাইয়ের অফিসে, আলফা ইনস্যুরেন্সে। বলল, তুই বস, আমি আসছি। সে ফিরে এসে একটা কাগজ দিল আমাকে। টাইপ করা। ওটা পড়ে—আমি জানি না আমার কী হয়েছে, আমি চলে এলাম।

মহি : শেখ মুজিব তখন অফিসে নেই?

সিরাজ : অফিসে আছে।

মহি : লাহোর যাওয়ার আগে তাহলে?

সিরাজ : না, লাহোর থেকে আসার পরে। আমি কীভাবে যে ইকবাল হলে চলে এলাম, কীভাবে যে রাজ্জাককে খবর দিলাম, আরেফকে কীভাবে খবর দিলাম, আর হুঁশ নাই। বললাম, পড়ো। রাজ্জাক বলল, 'এই তো পাইয়া গেছি।'

ছাত্রলীগ কনফারেন্সগুলোকে রিক্রুটের কাজে ব্যবহার করতাম। রাজ্জাককে সারা দেশে ট্যুরে পাঠাতাম। সেন্ট্রাল কনফারেন্সের আগে বিভিন্ন জেলায় কনফারেন্স হয় না? আর সিটিতে কাজী আরেফ। প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টে প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির মধ্যে কমপক্ষে একজনকে

আমাদের রিক্রুট হিসেবে। তারা বুঝে যেত যে একটা ভালো কাজের সঙ্গে, কঠিন কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত হচ্ছে।

আমরা তো সব সময় খুঁজতাম কোথায় কোথায় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ডিফারেন্স বা পার্থক্য। ছয় দফা পাওয়ার পর আমরা তিনজন কতবার যে পড়েছি। মনে হলো একটা স্বপ্ন দেখার মতো। এটাই তো হলো একমাত্র ডকুমেন্ট, যেটা দেশকে স্বাধীন করার প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আওয়ামী লীগ এটাকে নিয়ে এগোতে পারল না। কোনো বিবৃতি দিল না আওয়ামী লীগ।

এদিকে আইয়ুব খান একটা ট্যাকটিকস নিয়েছে। তখন একটা প্রো-চায়নিজ এক্সিস ঘটানোর চেষ্টা করছে। করতে গেলে ইন্টারনালিও তো এটা খাওয়াতে হবে। সে মওলানা ভাসানীকে চুজ করল। আইয়ুব খান ছয় দফার বিরুদ্ধে কঠিন একটা বক্তব্য দিয়েছিল—প্রয়োজনে অস্ত্রের ভাষা দিয়ে এটা মোকাবিলা করা হবে। পলিটিক্যালি হি ইউজড মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী বলল, একটা শর্ত। আমার সব নেতা, যারা আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে, তাদের মুক্তি দিতে হবে। ছয়জনকে—আসহাবউদ্দিন চিটাগাংয়ের, মোহাম্মদ তোয়াহাসহ আরও দু-তিনজন যারা আছে, আর ভুলক্রমে হলো প্রফেসর মুজাফ্‌ফর আহমদ। তার নামটাও উনি দিয়েছিলেন। এরা জেলে ছিল। রিলিজ হলো।

তখন ছাত্র ইউনিয়ন ব্রেক হয়ে গেছে। মেনন গ্রুপ তো আরও বেশি খ্যাপা ছিল। মওলানা ভাসানীর কারণে তখন তারা অ্যান্টি-মুজিব স্টেপটা নিচ্ছে। যেহেতু ভাসানী বলেছে। তাদের এই স্ট্যান্ড, আর আমাদের হলো এর পক্ষে স্ট্যান্ড। তাদের এটা গুরুত্ব পেল কালচারাল ফ্রন্টে। তখন বিএনআর ছিল—ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন। যারা প্রতিষ্ঠিত, তারা সবাই এটার নেতা। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরা পাকিস্তানভিত্তিক সমাজতন্ত্র করবে। আর শেখ মুজিব দেশটাকে ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দিতে চাচ্ছে—এই প্রচার। এ জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোনো শিল্পী-সাহিত্যিককে আমরা পাইনি। যাদের পেলাম, তারা হলো আল মুজাহিদী, মাহবুব তালুকদার, নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু, আমিনুল হক বাদশা।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমরা কামরুদ্দীন আহমদ আর আহমদ শরীফের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। আর ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্যাল সায়েন্সের নূর মোহাম্মদ মিয়া।

আওয়ামী লীগও দুই ভাগে ভাগ। আতাউর রহমান খান থাকলেন এনডিএফে। আর এদিকে হলো শেখ মুজিব। ছিটেফোঁটা ছিল চিটাগাংয়ের এম এ আজিজ, খুলনায় শেখ আজিজ, ফরিদউদ্দিন, সোহরাব হোসেন—ডিস্ট্রিক্ট নেতা বলা হতো এদের। সবাই চলে গেছে, হয় সালাম খানের সঙ্গে অথবা আতাউর রহমান খানের সঙ্গে। আর শক্তি হলো ছাত্রলীগ। আমরা ছাত্রলীগকে কন্ট্রোল করতাম।

এভাবে গড়াতে গড়াতে, আমাদের শক্তি বেশ। রাজ্জাকের সেক্রেটারিশিপে আমাদের শক্তি তখন। ঢাকায় ৪০০-৫০০ পর্যন্ত মেম্বারশিপ।

মহি : ফেরদৌস কোরেশী আপনাদের সঙ্গে থাকলেন না কেন?

সিরাজ : উই ডিড নট ফিল, তার থাকা, না থাকা। একজনের একটা মাইন্ড থাকে তো? তার ছিল না। ওবায়দুর রহমানের ছিল না। আর এটা গোপন সংগঠন তো। যে এটা না জানবে, সে কিছুই জানবে না। অনেকে বলে না, আমরা জানতাম না। গোপন সংগঠন, তুমি জানবা কেমন করে? নূরে আলম সিদ্দিকী বলে না অনেক সময়? গোপন জিনিস সে জানবে কী করে?

ছয় দফা মুভমেন্টকে আমরা কোনো অবস্থায় দাঁড় করাতে পারছিলাম না। আমাদের চিন্তা হলো, ছয় দফা যদি পেতে হয়, তাহলে এটাকে একটা পিপলস ক্যারেক্টর দিতে হবে। কীভাবে সম্ভব? ক্রস-সেকশন অব পিপলকে যদি দাবিদাওয়াভিত্তিক একটা পলিটিক্যাল সাইডে নিয়ে আসতে চাই, তাহলে ইট ক্যান ব্রিং সাম রেজাল্ট। আমাদের মধ্যে এ আলোচনাটা হলো। আমরা ছাত্র ইউনিয়নকে এটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ফরহাদ ভাই তখন কমিউনিস্ট পার্টি অর্গানাইজ করছেন। আন্ডারগ্রাউন্ডে। উনি তো খুবই ভালো মানুষ। এত উঁচু পর্যায়ের চিন্তার মানুষ খুব পাওয়া যায় না। সো পোলাইট, সো কনভিন্সিং! 'হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রো-পিপল হতে পারে।' বললাম ঠিক আছে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের দাবিটা দিই? স্বায়ত্তশাসন বলাতে ওরা খুব খুশি হয়ে গেল। এক নম্বরেই স্বায়ত্তশাসন। এটা ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে। এই হ্যান্ডলিংটা আমি করাচ্ছি ছাত্রলীগকে দিয়ে। রউফ প্রেসিডেন্ট, খালেদ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারি। যখন স্বায়ত্তশাসনের কংক্রিট প্রস্তাব এল, ওরা বেঁকে বসল। না, হবে না, ছয় দফা দিয়ে হবে না। এটা আমেরিকান প্রোগ্রাম। বহু সময় যায়। আলোচনা হয়। কোনো অবস্থাতেই তাদের

মানানো যায় না। ঠিক আছে, ছয় দফার কথা না দিয়ে আমরা টার্মগুলো ব্যবহার করি?

হ্যাঁ, এসব টার্মিনোলজিতে এমন সব কথা আছে, তখন এটা তো আর স্বায়ত্তশাসন থাকে না। অন্য কিছু হয়ে যায়। তাহলে যে জায়গাটায় অন্য কিছু হয়ে যাবে, সেটা বাদ। তাহলে তিন নম্বরটা—দুই মুদ্রা?

আমি বললাম, দুই মুদ্রা বাদ। আমি উদাহরণ দিলাম। যদি একটা পরীক্ষায়—অনেক সময় প্রশ্ন থাকে—এইটা অথবা ওইটা। আমি যদি 'অথবা'টা নিই, আমার অসুবিধা কিসের? আমি তো উত্তর দিচ্ছি। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা না হয় দিলাম না। আলাদা মুদ্রা বা এখানকার টাকা ওখানে যেতে পারবে না। এখানকার হিসাব এখানে থাকবে। রাজি হয়ে গেল। ছয় দফা শব্দটা না থাকলেও এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় করে রেখেছি। ছাত্রলীগেরও বলতে সুবিধা হবে, ছয় দফাভিত্তিক এগারো দফা। পরে বিভিন্ন দাবিদাওয়া মিলিয়ে হলো এগারো দফা। এগুলো আবার পাস-টাস করাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

মুজিব ভাই তো জেলে। অল লিডারস আর ইন জেল।

মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আই ওয়াজ ক্লোজ। খুবই ক্লোজ। আমিও লাইক করতাম। উনিও লাইক করতেন।

তাঁর অফিসে যাওয়া-আসা করতাম। অফিস ছিল ১৫ নম্বরে, ৫১-তে না।

মহি : ১৫ পুরানা পল্টন।

সিরাজ : হ্যাঁ। তিন রুম। তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়। অ্যারেস্ট হচ্ছেন। আবার জামিন নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। একদিন আমাকে গাড়িতে করে ধানমন্ডিতে নিয়ে এলেন। বললেন, কালকে নারায়ণগঞ্জে মিটিং।

আমি কি যাব সেখানে?

না, যাইস না। আমাকে অ্যারেস্ট করবে। আর আমাকে বেইল দেবে না। কারণ, ওখানে বেইল করার লোক নাই। আমাকে ১১০০-১২০০ টাকা দিলেন। কাজ করবি। যোগাযোগ থাকবে।

কার মাধ্যমে যোগাযোগ?

এছলাম। তোর ভাবির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে নিস।

ইসলাম আরকি। উনি বলতেন এছলাম।

এ রকম আরও কয়েকবার গাড়িতে উনি আমাকে হলে নামিয়ে

মেসবাউদ্দীন আহমেদ

দিতেন। আমি তখন এস এম হলে থাকি।

সিক্সটি সিক্সের ৭ জুন। তাজউদ্দীন ভাইকে তো জেলে নিয়ে গেল। মিজান চৌধুরী হলেন অ্যাক্টিং সেক্রেটারি। হরতাল হবে ৭ জুন। মনি এসে জয়েন করল। আদমজীতে অ্যারোমা টি একটা সেকশন খুলেছিল। সে এটার দায়িত্বে। গাড়িতে করে, গাড়ি মানে সাইকেলে ভ্যান লাগিয়ে ঘোরে না?

মহি : যেভাবে আইসক্রিম বিক্রি করে?

সিরাজ : হ্যাঁ। এটার পেছনে চড়ে আর সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চা দিয়ে আসত। মধুর ক্যানটিনে, বিভিন্ন হলের ক্যানটিনে...

মহি : ডিস্ট্রিবিউটর?

সিরাজ : হ্যাঁ। কমার্শিয়াল সাইড দেখত। ১০০ না ২০০ টাকার চাকরি। এসে বলল, দোস্ত, কাজ করে নিই।

কী বলবি বল?

আমি কীভাবে করব। আমার যোগাযোগ নাই।

তখন আমার একটা ৫০ সিসি হোন্ডা আছে। এর আগে একটা ডিসিশন ছিল, শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। তো যোগাযোগটা কীভাবে হবে? আমি তো কিছুই চিনি না। অনলি কানেকশন হতে পারে নোয়াখালী কানেকশন। মানুষ যেমন বিভিন্ন কানেকশনকে গুরুত্ব দিয়ে ঢোকে, এই সেন্সে। তেজগাঁওয়ে পেয়ে গেলাম। রুহুল আমিন ভূঁইয়া না। অন্য একজন। আদমজীতে পেয়ে গেলাম আজিজুল হক, আওয়ামী লীগের ভক্ত। আমার দুই বছরের সিনিয়র। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া হিসেবে তখন আছে ডেমরা, আর শাহজাহান ভাইয়ের পোস্তগোলা। সামান্য কিছু চটকল, ম্যাচ ফ্যাক্টরি এই। নোয়াখালী কানেকশন। বলল যে আমরা তো এটা করতে পারব না। আমাদের বড় নেতাদের বলতে হবে। কে বড় নেতা? রুহুল আমিন ভূঁইয়া, আবদুল মান্নান। এখানে পোস্তগোলায় পেলাম মেসবাকে (মেসবাউদ্দীন আহমেদ)। সে বলল, তারও কিছু

কানেকশন আছে। তার কানেকশন নিয়ে মুভ করে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। আওয়ামী লীগ অফিসে তাদের নিয়ে এলাম। মিজান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললাম। তারা মিজান ভাইকে বলল, কিছু টাকা খরচ করতে হবে। কত টাকা খরচ করতে হবে? ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। তখন তো এটা অনেক টাকা। মিজান ভাই বললেন, 'আপনারা কাজ শুরু করেন। সিরাজ তো যোগাযোগ রাখবে। সিরাজ, তুমি এদের পেছনে লাগো। টাকা আমি জোগাড় করব। যেভাবেই হোক।'

টাকা সংগ্রহ হলো। কেউ ১০০, কেউ ২০০। আদমজীতে সাদুকে পেয়ে গেলাম। সাইদুল হক সাদু, গাঁট্টাগোট্টা। চেহারাসুরতও সে রকম। বলিষ্ঠ, পেটানো শরীর। কী কারণে আমি তাকে লাইক করে ফেলেছি। আজিজ ভাইকে বললাম। 'গুন্ডামার্কা, প্রস্টিটিউশনে পড়ে থাকে, এটাকে নিয়ে কী করবেন?' বললাম, কাজ হলেই তো হলো।

একটা ভিন্ন ধরনের প্রচার-প্রপাগান্ডায় আমরা নেমে গেলাম। প্রথম যেদিন নামলাম, মোয়াজ্জেম ভাই বাইরে, মিজান ভাই বাইরে। হরতালের প্রচার হবে কীভাবে? বায়তুল মোকাররমের ওখানটা, মোয়াজ্জেম ভাই বলে, 'সিরাজ, তুই বক্তৃতা কর।' আমার তখন গা কাঁপতেছে। বললাম, কী বলব? 'বল, বল?' তখন আমি তো বক্তৃতা-টক্তৃতা দিই। একটা দোকান থেকে টুল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বললাম, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবির পক্ষে, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ৭ জুন হরতাল। লোক ছিল ৭-৮ জন। ১৫-২০ জন হলো এসবির লোক।

তখনো বায়তুল মোকাররম মসজিদের সিঁড়িগুলো হয়নি। মোয়াজ্জেম ভাই বললেন, 'ভাগ। আর একটু হলে অ্যারেস্ট করে ফেলবে।' ভেগে চলে এলাম। আমরা স্টুডেন্টদের মধ্যে প্রচার শুরু করলাম। তেজগাঁওয়ে তো স্কুল আছে। স্টুডেন্টদের বললাম, কোথায় কোথায় শ্রমিক আছে, আমাদের খোঁজ দাও। আদমজীতে কলেজ আছে। তাদের খোঁজ দাও। সেভাবেই আমরা যোগাযোগ করেছি। নোয়াখাইল্যা আর ছাত্রলীগের কানেকশনে।

ডিস্ট্রিক্টেও ছড়িয়ে গেল। যে হরতাল হলো, আনপ্রিসিডেন্টেড। মনে হলো, যেন একটা পাখিও ওড়েনি। আর সারা ঢাকার রাস্তায় ইট পেতে দেওয়া হয়েছে। তখন তো গাছ কাটার অভ্যাস হয়নি। আদমজীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—'সাদু, তোমাদের ওপর নির্ভর করছে ঢাকার হরতাল।' বলল, 'মুসলমান হিসাবে কথা

দিলাম—হবে। আপনাকে কোথায় খুঁজব।' বললাম, আওয়ামী লীগ অফিসে। রাতে থাকলাম মঞ্জুদের (আনোয়ার হোসেন মঞ্জু) বাসায়। তখন বেশির ভাগ সময় মঞ্জুদের বাসায় থাকতাম। ওর একটা প্রিন্স গাড়ি ছিল। ওটায় চড়ে আমরা ঘুরতাম।

রাস্তায় এমনভাবে ইট ছিটানো। ইট সরিয়ে সরিয়ে গেলাম, হরতাল কেমন হয়েছে জানার জন্য। কাছে কী আছে? তেজগাঁও। যেভাবে ইট ছড়ানো, বহু কষ্টে—সোনারগাঁও হোটেল তো তখন ছিল না, ওই পর্যন্ত আসতে দেখলাম, ছাত্ররা মিছিল বের করার চেষ্টা করছে। তেজগাঁওয়ে গুলিতে শ্রমিক মারা গেছে, মনু মিয়া নাম। পরে পেপারে ছাপা হওয়ায় নাম জেনেছি।

তারপর আওয়ামী লীগ অফিসে গেলাম। হঠাৎ পুলিশের একটা জিপ এল। আমরা তো কোনো অবস্থায় অ্যারেস্ট হব না। ভেতরে এসে বলল, 'সিরাজুল আলম খান কার নাম?' বললাম, আমার নাম। ওখানে দেখলাম তার সঙ্গে জিপে এসেছে সাদুর সঙ্গের এক লোক। পুলিশ বলল, 'এই শ্রমিক এসেছে আপনার সঙ্গে কথা বলতে।' দেখলাম, তার নাম শফি। বলে যে, 'আমরা মিছিল নিয়ে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত এসেছি। সাদু ভাই বলেছে, আপনাকে নিয়ে যেতে।'

পুলিশ অফিসারটা বলছে, 'আমরা বলেছি হরতাল হয়ে গেছে। ওরা বলে যে উনি না বললে আমরা যাব না।'

২০ থেকে ২২ হাজার লোকের মিছিল। হাতে হলো আগুনের লুয়া। তখন তো মশাল বলত না।

আদমজী এমনিতেই তো জুট মিল। পাটের কোনো অভাব নেই। কাঠের কোনো অভাব নেই। পেট্রলপাম্প আছে। তেলের কোনো অভাব নেই। তিন থেকে চার হাজার লোকের হাতে লাঠি। মাথায় পাট, তাতে আগুন। একটু অন্যমনস্ক হলেই সারা ঢাকায় আগুন জ্বলে যাবে। এই রকম অবস্থা। পুলিশ অফিসার আমাকে এটা বলেছে, 'আমি চিনি না আপনাকে, যে-ই হোন, ওখানে গিয়ে তাদের থামান।'

গেলাম। সবাই সেখানে বসে আছে। কিছু লেবু দেওয়া হয়েছে। লেবুর শরবত খাচ্ছে, ১৩ মাইল হেঁটে আসার পর। বললাম, মিছিল হয়েছে। এখন তোমরা যাও। সবাই জিন্দাবাদ দিয়ে দিয়ে আবার চলে গেল। মোট খরচ হয়েছে দেড় শ টাকা। লেবুর শরবত। আর তো কিছু দেওয়া যায় না। অনেক পত্রিকা বাধ্য হলো হরতালের খবর দিতে, কীভাবে ডিভাস্টেটিং হরতাল হলো।

তখনই আমাদের ধারণা হলো, ইয়েস, শ্রমিকদের অর্গানাইজ করতে পারলে ইট ক্যান বি ডান। আত্মবিশ্বাস এসে গেল। শ্রমিক সংগঠন থাকলে, ইট ক্যান বি ডান। এটা তো বলতে গেলে একেবারে ওয়ানম্যান শো, আমার দ্বারা। আর আমার মোটরসাইকেল আর মেসবা। আর পেয়ে গেলাম সিনিয়র লোকগুলোকে। মান্নান ভাই তো সমাজবাদী দলের। তাঁকে বললাম, শ্রমিকনেতা থাকবেন। শ্রমিকনেতা থেকে যদি একজন পার্লামেন্ট মেম্বার হতে পারেন, আপনি কত কথা সামনাসামনি বলতে পারবেন? সারা দেশের লোক জানবে? এ কথাগুলো উনি অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন। এই তো হলো শ্রমিক সংগঠন করার গোড়ার কথা। নাম না দিয়ে, সেল সেল সেল। একেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে পাঁচটা, সাতটা, দশটা পর্যন্ত সেল। আদমজীতে তো ২০-২৫টা সেল বানিয়ে ফেলেছি।

আর এদিকে হলো ছয় দফাকে এগারো দফায় পরিণত করা। একদিকে আন্দোলন, আরেক দিকে সংগঠন। এই জায়গাটায় আসতে ১৯৬৯ এসে গেল।

মহি : শেখ মুজিব যে টাকা দিলেন, কত টাকা?

সিরাজ : ১১০০-১২০০, তাদের খরচের জন্য। ওই কথা, 'তোর ভাবির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস।' আর ইসলাম হলো মূলত পোস্টার লেখার লোক। মাঝেমধ্যে ১০০-২০০ পোস্টার লিখে দিত সে। আমরা আমাদের লোকের মাধ্যমে এটা লাগাতাম।

মহি : ওনার পুরো নাম নুরুল ইসলাম নাকি? নাম শুনেছি।

সিরাজ : হ্যাঁ। একটা বইও লিখেছে। আমার একটা নিক নেম ব্যবহার করা হতো। ভাবির কাছে ফোন করার জন্য— ইটালা—মানে ইটওয়ালা। তখন বাড়ির কনস্ট্রাকশন হচ্ছে তো। ইট সাপ্লাই হতো। তো ফোনে কে বলছেন আপনি? ইটালা বলতেছি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে আসেন। কোনো জরুরি খবরটবর থাকলে, ওয়ানস ইন আ মান্থ।

ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে আমরা একটা ফরমেশনে চলে গেলাম। ছাত্রলীগ হলো মেইন অর্গানাইজেশন। তারপর আন্ডারগ্রাউন্ড বা ব্যাকআপ নিউক্লিয়াস। শ্রমিক সংগঠনের ওপর জোর দেওয়া হলো। আওয়ামী লীগের স্ট্রাকচার তো নাথিং।

মহি : আপনাদের নিউক্লিয়াসের এক্সপানশনটা কখন শুরু হলো?

সিরাজ : তখন থেকেই। পার্টিকুলারলি সিক্সটি ফাইভে, যখন জেল থেকে বের হলাম।

তুমি বুঝতে যে আমার সঙ্গে তোমার চলাফেরার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আর আমিও তোমাকে চুজ করছি। বাট আই অ্যাম নট টেলিং ইউ এভরিথিং যে এটা একটা গোপন সংগঠন। তুমি তো বুঝেই ফেলবে যে হাউ ইমপরট্যান্ট ইট ইজ। একটা সময় বোঝা যাবে যে উই আর ওয়ার্কিং ফর আ কজ।[১০]

৭ জুনের হরতাল সফল করার একক কৃতিত্ব দাবি করেছেন সিরাজুল আলম খান। এ বিষয়ে ভিন্নমত আছে তোফায়েল আহমেদের। তাঁর মতে, এটি ছিল একটি যৌথ প্রয়াস। আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

অনেস্টলি যদি বলি, আমি খুব নিরপেক্ষ ছিলাম। আমি তো ইকবাল হলের ভিপি। ইকবাল হল ছাত্র সংসদের ভিপি হয়েছি ১৯৬৬-৬৭ সালে। ওই সময় বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দিলেন। ৭ জুন মূলত সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, মনি ভাই, আমি—ইকবাল হলে আমার ৩১৩ নম্বর রুম থেকেই কিন্তু কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। আমার রুমে বসেই সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম হতো।

আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। ৭ জুনের মূল ভূমিকা আসলে পালন করেছে মনি ভাই। এটা ফ্যাক্ট। সে জন্য মনি ভাইকে গ্রেপ্তার করল। সম্ভবত ১৮ তারিখ। লিফলেটগুলো মনি ভাই লিখতেন। সিরাজ ভাই, মনি ভাই, রাজ্জাক ভাই, আমি—ঢাকা মেডিকেল কলেজে যখন বসেছি ৭ জুন সফল করার জন্য, আমু ভাইও ছিলেন। নূরে আলম সিদ্দিকীও ছিল। আমরা এরিয়া ভাগ ভাগ করে...কে কোন জায়গায় যাবে।

আমি তখন অত বড় নেতা না। সত্যি কথা বলতে কি, তখন আমি কর্মী। রাজ্জাক ভাই হলো ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, মাজহারুল হক বাকী হলো সভাপতি। বাকী ভাই, রাজ্জাক ভাই দুজনই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। মনি ভাই, সিরাজ ভাই আউটগোয়িং। তারাও এই প্রসেসের মধ্যে ছিল। আমি হলাম অনেকের মধ্যে একজন।

বঙ্গবন্ধু অ্যারেস্ট হলেন মে মাসের ৮ তারিখ (১৯৬৬)। তারপর ৭ জুন পালন করার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করলাম। আন্দোলন হয়েছে ইকবাল হলভিত্তিক। এখানে প্রত্যেকেরই ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে।[১১]

কামরুদ্দীন আহমদ

## ৯

আওয়ামী লীগের মধ্যে সিরাজুল আলম খানের যে একটি ভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা ছিল, তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ঘোষণার পর। সিরাজ বলেছেন, তিনি কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁর পরামর্শ নিতেন। কামরুদ্দীন আহমদ তখন আর আওয়ামী লীগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু অনেক আওয়ামী লীগ নেতার কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ছয় দফার পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ৭ জুনের (১৯৬৬) হরতাল সফল করার ক্ষেত্রে সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা তাঁর অজানা ছিল না। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদের খোলামেলা পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য উল্লেখ করা হলো :

> তখন থেকেই আওয়ামী লীগ সংগঠনের মধ্যে দুটো ধারা দেখা গিয়েছিল। একটি ধারায় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কেন্দ্রে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণক্ষমতা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষমতা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। আর এক ধারায় সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে একটি সেল গঠিত হয়েছিল, যাঁরা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার পক্ষপাতী ছিলেন। ওই সেলের সদস্যরা শেখ মুজিবকে তাঁদের নেতা বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ অনুসারে কাজও করতেন। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সিরাজুল আলম খান নিজস্ব দল গঠন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৬৬ সালেও সিরাজুল আলম খান সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করতেন বলেই আমার ধারণা। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আবদুর রাজ্জাকও তখন একই ধারণা পোষণ করতেন। আবদুর রাজ্জাক তাঁদের সেলের গোপনীয়তা রক্ষা করলেও নিজেকে আওয়ামী লীগের শৃঙ্খলার অধীন বলেই মনে করতেন। অন্যদিকে সিরাজুল আলম খান নিজের জীবনেও গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেন। তিনি সর্বদা তাঁর নিজের চারদিকে এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলতে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি কখন কোথায় থাকতেন বা কখন

কোথায় যেতেন, তা রহস্যে ঢাকা থাকত। যেখানে যা পেতেন, তা খেয়েই তাঁর দিন চলত। তাঁর দলের কর্মীদের জন্য যতটা দরদ ছিল, বস্তিবাসীদের জন্যও ততটাই দরদে ভরা ছিল তাঁর মন। গোড়াতে সূর্য সেন-প্রীতিলতা ছিলেন তাঁর স্বপ্নের নায়ক-নায়িকা। আওয়ামী লীগের কর্মীরা সিরাজুল আলমকে শ্রদ্ধা করতেন। কারণ, তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা সিরাজুল আলম খান অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পেছনে সিরাজুল আলম খানের দান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে আন্দোলন আর পূর্বেকার মতো ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শ্রমিকদের মধ্যেও আন্দোলনের ঢেউ বিস্তার লাভ করেছে। ৭ জুন তারিখে নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও, টঙ্গী ও চট্টগ্রামের শিল্প এলাকায় আন্দোলনের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পেল যে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। আদমজী ও অন্যান্য মিল থেকে হাজার হাজার শ্রমিক পায়ে হেঁটে পল্টনের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ঢাকা এসেছিল।[১২]

সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আবার শুরু হলো আলাপ। ছয় দফা আন্দোলনের পর কীভাবে এগোলেন তিনি, কীভাবে বিস্তৃত হলো তাঁর নিউক্লিয়াস, এ নিয়ে মেলে ধরলেন স্মৃতির ঝাঁপি।

মহি : আপনাদের কাজের অনেক ডাইমেনশন, অনেক ডিটেইলস।

সিরাজ : আমাদের এই বয়সে, আমি তো বুঝি, আমাকে কী কষ্ট করতে হয়েছে। আমি তো অনেক সুঠাম দেহের, অনেক তেজি মানুষ। অনেক কষ্ট সহ্য করার মানুষ, যেটা খুব কম লোকের মধ্যে আছে। মাইলকে মাইল হাঁটা, ফর নো রিজন। শাজাহান সিরাজ তো প্রায়ই বলে, দাদার সঙ্গে চার-পাঁচ মাইল হাঁটা, আবার ফিরলাম, বুঝলাম না যে হাঁটছি। পরে বুঝেছি, এই হাঁটার কারণে আমার যে ইন্টারেস্ট এবং ক্ষমতা, এগুলোর প্রমাণ পেয়ে গেছে সে। দেন হি ওয়াজ আসকড টু জয়েন আ সিক্রেট মুভমেন্ট—স্বাধীনতা। ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে একজন করে, তারা তখনো জানে না নিউক্লিয়াস কী। পরে জেনেছে।

মহি : জাস্ট কন্ট্যাক্ট পারসন?

সিরাজ : কন্ট্যাক্ট পারসন।

যশোরে হলো মনি, আরেক মনি। রবিউল সেকেন্ড ম্যান মনে হয়। রাজশাহীতে হলো ডা. করিম।
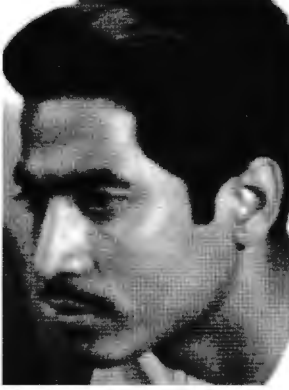
শাজাহান সিরাজ

বগুড়ায় হলো পটল। সিলেটে আখতার আহমদ। ময়মনসিংহে ডা. নুরুল ইসলাম (চঞ্চল)। রংপুরে গোলাপ বা গোলাপের ভাই একজন। দিনাজপুরে দরকারও পড়েনি, সে রকম গড়েও ওঠেনি। বরিশালে হলো জহিরুল ইসলাম খান (পান্না) আর বাকের, দুজন। আর মাতব্বরি দেখাত আমির হোসেন আমু। আমরা অ্যাগ্রি করতাম। আমু ওয়াজ নট আ সেন্ট্রাল লিডার। হি ইউজড টু সিট অলওয়েজ অ্যাট দ্য সেন্টার। আর শেখ সাহেবের আত্মীয় তো, ওকে আমরা নিউক্লিয়াসে নিতে পারিনি। বাট হি ওয়াজ আ ভেরি মাচ অ্যাসপিরেন্ট ক্যান্ডিডেড ফর নিউক্লিয়াস মেম্বারশিপ। নিউক্লিয়াসের তিনজনের পরে ছিল আবুল কালাম আজাদ। ফিফথ মেম্বার হলো আমাদের মেসবা। অঙ্কুর প্রকাশনীর। এত সুন্দর মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপর হলো মনিরুল ইসলাম, মানে মার্শাল মনি। তারপর আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, এরা।

মহি : মার্শালের সঙ্গে আপনার পরিচয় কোন ইয়ারে?

সিরাজ : একই সময়ে। আমরা তখন সংগঠন হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছি। ও বিকেলে আসত, আলোচনাগুলো শুনত। এভাবে সেন্টারকে আমরা গড়ে তুললাম। সেন্টার এটাই থাকবে। তারপর কোথাও করপোরেট লাইন, কোথাও ইউনিভার্সিটির একটা সেল, দুইটা সেল, কলেজ লেভেলের সেল, কোথাও পাড়া কমিটি, এভাবে বা ইনডিভিজ্যুয়ালি—যা আমাদের নলেজে থাকবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর ঢাকা সিটি—মুভমেন্টটা তো তাদের হাতে গড়া। যদি কেউ প্রশ্ন তোলে যে এগুলো তো আমরা পাইনি কোনো দিন। আরে ব্যাটা, তুমি পাইবা কীভাবে? তুমি কি মুভমেন্টের ওই জায়গাতে ছিলা? ভোর রাতে কে উঠে যেয়ে বাস পোড়াত? কে মাইকিংটা দিত? কে রাতে চিকামারার জন্য যেত? অন্য কেউ জানবে না তো? যে যাচ্ছে, সে জানে। আর যারা নেওয়াচ্ছে, তারা জানে। এসব নিয়ে ফেরদৌস আহমদ কোরেশী বা নূরে আলম সিদ্দিকী প্রশ্ন তুলেছে। মাজহারুল হক বাকী কিন্তু কোনো দিন

বলেনি। হি নিউ। সে বলেছে, সিরাজ ভাই আছে ওখানে? ব্যস। আমাকে সিরাজ সাহেব বলত। আমি বাকী সাহেব বলতাম। সে এসেছে রাজশাহী থেকে। সে জানত, এটা এমন একটা শক্তি। আছে না, গ্রিক মিথলজিতে, কাটলে রক্ত বের হয়, মৃত্যু হয় না। এই রকম। এই যে আমাদের লিটল কমরেড রফিক। বয়সে ছোট। বাট এত তার তীক্ষ্ণতা।[১৩]

## ১০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের মতো। সিরাজ নানাভাবে শেখ মুজিবের ওপর নির্ভর করতেন এবং সিরাজের ওপর শেখ মুজিবের অগাধ আস্থা ছিল। মনে হতো তাঁরা বুঝি একই পরিবারের সদস্য। এ সম্পর্কে একটি বিবরণ পাওয়া যায় এস এম ইউসুফের কাছ থেকে।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় ইকবাল হলের ক্যানটিনের ওপরতলায় ছাত্র সংসদ অফিসে ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় যোগ দিতে ইউসুফ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন। বর্ধিত সভায় নির্ধারিত প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে তিনি এসেছিলেন অবজারভার হিসেবে। তিনি বলেন :

> ছাত্রলীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) *বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ* এবং *পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য* নামে দুটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। বর্ধিত সভায় যোগ দিতে আসা প্রতিনিধিদের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পুস্তিকা দুটি পাঠ করা হয়। আমি ইকবাল হলের ১১৬ নম্বর রুমে শাজাহান সিরাজের সঙ্গে ডাবলিং করতাম। একটা সিটে রব থাকত, আর একটায় লোকমান হোসেন। তাঁরাও এসেছিলেন বর্ধিত সভায় যোগ দিতে। সিরাজ ভাই (সিরাজুল আলম খান) ফ্লোরে ঘুমাতেন। আসতেন শেষ রাতে। একটা চৌকির নিচে তাঁর বিছানা থাকত। একটা ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া তোশক, ছেঁড়া বালিশ। রাত দুইটা-তিনটার দিকে ইকবাল হলের পুকুরপাড়ে নিয়ে সিরাজ ভাই আমার আঙুলের রক্ত, স্বাধীনতার শপথ, এই সব করিয়েছে।
>
> থার্ড ডে সকালবেলা উনি আমাকে বললেন, আজকে তুমি কোথাও যাইয়ো না, আমার সঙ্গে থাকো। ওনার সঙ্গে রিকশায়

ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় গেলাম। দেখলাম আরদালি-চাপরাসি সবাই সিরাজ ভাইকে জানে। ঘরের লোক মনে হলো ওনাকে। একজনকে বললেন, মুজিব ভাই আছেন?

হ্যাঁ, আছেন, দোতলায়।

গিয়ে বলো আমি আসছি।

ড্রয়িংরুমে বসলাম। দেখা গেল শেখ সাহেব নামতেছে। নাইমাই বললেন, কোন স্কুলে পড়ো? সিরাজ, তোরা চা খা, আমি তোর জন্য ওইটা নিয়া আসি। কিছুক্ষণ পর আবার উনি নাইমা আসলেন।

সিরাজ, তোর জন্য তিন হাজার টাকা রাখছিলাম।

মুজিব ভাই, এখান থেকে টাকা বাঁচবে। আপনাকে কিছু টাকা ফেরত দিতে পারব।

না, ফেরত দিতে হবে না। যদি বাঁচে, ছেলেদের ১০-২০ টাকা গাড়িভাড়া দিয়া দিস।

এই টাকা হচ্ছে নীলক্ষেতে আনোয়ারা হোটেল আর পলাশীতে খাওয়া খরচের জন্য, যারা বর্ধিত সভায় যোগ দিতে বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছিল। এরপর তাঁরা দুজন দোতলায় গিয়ে আধা ঘণ্টার মতো কথা বললেন। নিচে নেমে এসে সিরাজ ভাইকে টাকা দেওয়ার সময় শেখ সাহেব বললেন, হ্যাঁ, মনে রাখিস কিন্তু, যেন ঠিকঠিকমতো হয়।[১৪]

শেখ মুজিব দলের জন্য টাকা জোগাড় করতেন, অনেক সময় সংসারের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতেন না। ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় যোগ দিতে বিভিন্ন জেলা থেকে যাঁরা ঢাকায় এসেছিলেন, তাঁদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। আর খরচ জোগানোর জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল শেখ মুজিবের ওপর। শেখ মুজিবের কাছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকত না। অনেক কষ্ট করেই তাঁকে দল চালাতে হতো। ছাত্রলীগের কর্মীদের জন্য তাঁর দরজা ছিল সব সময় খোলা। এর একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন সিরাজুল আলম খান :

একদিন মুজিব ভাইকে বললাম, ১০০ টাকা লাগবে। অবাক হয়ে গেলেন। আমি তো কখনো টাকা চাইতাম না।

এখন তো নাই। কখন লাগবে?

কালকে। বগুড়ার পটল আছে আমাদের, ওর হার্নিয়ার অসুখ হয়েছে হাইড্রোসিল। অপারেশন লাগবে। ডা. ফজলে রাব্বীর ওখানে হবে। তখন এত ক্লিনিক ছিল না। অনেক ডাক্তার তাঁদের

বাসায় দু-চারটা বেড রেখে রোগী দেখতেন।

আচ্ছা দেব আমি।

উনি মিটিং-টিটিং করে চলে গেলেন। অন্য সময় হলে ডেকে বলতেন, ওদিকে যাবি? চল।

কিন্তু উনি উঠে চলে গেলেন। চিন্তায় পড়লাম। আমার কাছে তো ১০০ টাকা নাই। ভীষণ চিন্তা। 'আমি বলে দেব'—এ-জাতীয় কিছু একটা কথা বলেছিলেন।

পটলকে ইকবাল হলে রাখলাম। ও তো হাঁটতেই পারে না। সকালবেলা রিকশা করে...পটলকে মনে আছে না? মন্ত্রী পটল না। খুব টল ফিগার, হ্যান্ডসাম। একটু তোতলাত।

সকাল সাতটায় অপারেশন হওয়ার কথা। টাকা তো জোগাড় হয়নি। পটলকে বললাম, চল যাই। রিকশা থেকে নেমে গেট দিয়ে ঢুকলাম। দেখি আমাদের আসার আগেই মুজিব ভাই এসে বসে আছেন। বললেন, আমি বলে দিছি, যা। ক্যান ইউ থিঙ্ক অব ইট? উনি ভোর পাঁচটায় উঠে এসে বসে আছেন। অপেক্ষা করছেন।

ডা. রাব্বী আর উনি সমবয়সী।

এটা তো শুধু আন্তরিকতার বিষয় না। একজন রোগী, পার্টির লোক, তার জন্য সকালে এসে...এমনও হতে পারে ওনার পকেটে ওই দিন ১০০ টাকাও নাই।[১৫]

## ১১

সিরাজুল আলম খানের জীবনযাপন একটু খাপছাড়া। এটা সবার নজরেই পড়ত। হয়তো দেখা গেল তিনি কয়েক দিন ভাত না খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন। হয়তো মুড়ি কিংবা চা খেয়ে দিন কেটেছে। আবার কখনো-সখনো গোগ্রাসে এক বেলাতেই খেয়েছেন তিন দিনের খাবার। এ প্রসঙ্গে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন:

> আমি তখন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট। পুরান ঢাকায় পালোয়ানের হোটেলে খেতে যেতাম মাঝেমধ্যে। ওদের ওখানে ভালো মোরগ-পোলাও পাওয়া যেত। এক প্লেট খেলেই উদরপূর্তি হতো। একদিন গেলাম সেখানে। সঙ্গে সিরাজুল আলম খান এবং আরও একজন। খাওয়ার পর ওয়েটার বিল নিয়ে এল, ছয় টাকা। আমার তো আক্কেলগুড়ুম। আমরা তিনজনে তিন প্লেট খেলে তো দুই টাকা

হবে। কেউ একজন যদি দুই প্লেট খায়, তাহলে আড়াই টাকা। ছয় টাকা কী করে হয়? আমি চেঁচিয়ে বললাম, ম্যানেজার, হিসাবে ভুল আছে। ম্যানেজার ওয়েটারের সঙ্গে কথা বলল। তারপর সিরাজের দিকে আঙুল দিয়ে বলল, 'ওই স্যার একাই ছয় প্লেট খাইছে।' আমার অবাক হওয়ার পালা। ম্যানেজার কাছে এসে বলল, 'আপনেরা দুইজনের বিল দেন, ওই স্যারেরটা ফ্রি। আমার হোটেলের খাওন যে লোক এত পছন্দ কইরা খাইছে, ওর কাছ থিকা আমি ট্যাকা নিমু না। এরপর এই স্যার যতবার আইব, খাওয়া ফ্রি। (সমবেত ওয়েটারদের উদ্দেশে) এই, তোরা সব ওনারে দেইখা চিন্যা রাখ। যখনই আইব, খাইব, ট্যাকা নিবি না'।[১৬]

কেরানীগঞ্জের কলাতিয়ার বোরহানউদ্দিন গগন, কাজী আরেফ আহমদ আর সিরাজুল আলম খান প্রায়ই একসঙ্গে চলতেন, খাওয়াদাওয়া করতেন। তিনজনই খুব খেতে পারতেন। সিরাজুল আলম খান কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন একদিনের অভিজ্ঞতার কথা :

সিরাজ : একবার আমরা একটা রেস্তোরাঁয় পাল্লা দিয়ে খেলাম, কে কত খেতে পারে। গগন খেল ২২টা পরোটা, আমি ২৬টা। আরেফ কয়টা খেল, জানো?

মহি : ওনার যে শরীর, কয়টা আর খেতে পারবেন? বড়জোর পাঁচ-ছয়টা?

সিরাজ : ও খেল ৩২টা।

মহি : উনি তো লিকলিকে। এত খাবেন কী করে? অসম্ভব?

সিরাজ : না খেয়ে থাকার যেমন অভ্যাস ছিল, আবার খুব বেশিও খেতে পারত।

মহি : কথায় আছে, সরু পেটে গরু সয়।

সিরাজ : হা হা হা।[১৭]

তোফায়েল আহমেদ তখন ইকবাল হলের ভিপি। হলে তাঁর কামরায় এসে মাঝেমধ্যে থাকতেন সিরাজুল আলম খান। আসতেন অনেক রাতে। তোফায়েল তাঁর জন্য খাবার রেখে দিতেন টেবিলে। 'হয়তো দেখা গেছে খেয়েদেয়ে উনি ঘুমালেন, একনাগাড়ে দুদিন।'[১৮]

# ১২

সত্তরের দশকে যে কয়জন তরুণ সংগঠক ভিন্ন ধারার রাজনীতি করে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিলেন, সিরাজুল হক সিকদার তাঁদের অন্যতম। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় তাঁর নাম প্রথম চাউর হয়। সিরাজ সিকদারের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের পরিচয় কিংবা কথাবার্তা হয়েছিল কি না, এ নিয়ে আমার মনে কৌতূহল ছিল। সিরাজুল আলম খান এ ব্যাপারে কখনো মুখ খোলেননি। আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের দুজনের মধ্যে কি কখনো দেখা হয়েছে? কথা হয়েছে? তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন এমনভাবে, যেন তাঁদের মধ্যে কোনো রকম দেখাসাক্ষাৎ ছিল না।

সিরাজুল আলম খানের যে স্বভাব, কাউকে প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে তিনি তাঁর খোঁজ নেবেন না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। অনেক কিছুই ছিল তাঁর জানার বাইরে। আর তিনি সব জানবেন, এটা মনে করারও কোনো কারণ নেই। সিরাজ সিকদার একেবারেই একজন গুরুত্বহীন ব্যক্তি ছিলেন, এমনটি ভাববার কারণ দেখি না। অনেক গুরুত্বহীন, অকর্মণ্য ও অপদার্থ লোককে নিয়ে চলাফেরা এবং তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলার অভ্যাস ছিল সিরাজুল আলম খানের, এ আমার নিজের চোখে দেখা। এ ব্যাপারে আমি তাঁর দীর্ঘদিনের সাথি মোস্তফা মোহসীন মন্টুর সঙ্গে কথা বলেছি। জেনেছি, সিরাজ সিকদারের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের দেখা ও কথা হয়েছে। আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন :

> মহিউদ্দিন আহমদ: একটা কথা বলুন তো, সিরাজ সিকদারের সম্পর্কে...
>
> মোস্তফা মোহসীন মন্টু : সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে সিরাজ সিকদারের একটা সম্পর্ক ছিল।
>
> মহি : এটা আমি জানতাম না।
>
> মন্টু : আমি এর নীরব সাক্ষী।
>
> মহি : তাঁদের কি কখনো দেখা হয়েছে?
>
> মন্টু : ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির মাঠে দেখা হয়েছে, নজরুল হলের সামনে।
>
> মহি : কোন সালে?
>
> মন্টু : ১৯৬৭ সালে। খুব ক্রুসিয়াল টাইম। সিরাজ ভাইয়ের একটা লামব্রেটা মোটরবাইক ছিল। উনি এটা নিয়া চলতেন। আবার

আমার মোটরসাইকেলেও যেতেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনের রাস্তাটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতাম। এটা খুব নিরাপদ রাস্তা ছিল। আর রেললাইনের বস্তিতে সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে যে কত রাত কাটিয়েছি!

মহি : সিরাজ সিকদারের বিষয়টা বলুন।

মন্টু : একবার মোটরসাইকেলে সিরাজ ভাইসহ আমরা তিনজন মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে বকশীবাজার হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম। নজরুল হলের কাছে এসে একটা গাছের নিচে দাঁড়ালাম। রাতের বেলা। সিরাজ ভাই বললেন, 'আমার দিকে খেয়াল রাখিস।' আমাদের দুজনের কাছেই পিস্তল আছে। দুজন লোক এল। আমরা একটু এগিয়ে গেলাম। ওই দুজনের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে থাকল। একজন এগিয়ে এল। সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলল। দেখছি, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না। সিরাজ ভাই আমাদের বললেন, 'এই, তোরা পিছে যা। যেখানে ছিলি, সেখানে যা।' আমরা একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, ওরা দুজন এসেছে কেন? আসার কথা তো একজনের? দুই ঘণ্টার মতো কথা বললেন তাঁরা।

মহি : দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

মন্টু : না, বসে।

মহি : মাঠে বসে?

মন্টু : হ্যাঁ, গাছতলায়, চাদর বিছিয়ে। কৃষ্ণচূড়াগাছ ছিল।

মহি : সিরাজ সিকদারকে কি আগে থেকে চিনতেন? তাঁর চেহারা?

মন্টু : না। ডেসক্রিপশনটা হলো চারকোনা মুখ।

মহি : উনি তো ছাত্র ইউনিয়ন-মেনন গ্রুপে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন?

মন্টু : প্রমিন্যান্ট ছিলেন না। এই যে দেয়ালে ছবিটা, এ ছবিটা কিন্তু সিরাজ সিকদারের বোন শামীমের করা।

মহি : তো তাঁদের মধ্যে কী আলাপ হলো?

মন্টু : পরে জিজ্ঞেস করেছি। সিরাজ ভাই বললেন, এরা তো বিপ্লব করতেছে। সামনে আমাদেরও তো বিপ্লবই করতে হবে। বিপ্লব করলে তো একই জায়গায় থাকতে হবে। একই জায়গায় দেখা হবে। ওদের চিন্তাচেতনা এক রকম, আমাদেরটা এক রকম। স্বাধীনতা আমরা দুজনেই চাই। পদ্ধতি কী হবে, এটা পরে দেখা যাবে।

মহি : ইনি যে সিরাজ সিকদার, এটা সিরাজ ভাই বললেন?

মন্টু : হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে ইনি? ‘খবরদার, কাউকে বলবি না, সিরাজ সিকদার।’ বলতে চাননি। অনেক জোর করে কথাটা আদায় করেছি।

মহি : সিরাজ সিকদারের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, এটা আজই প্রথম জানলাম।

মন্টু : মনি ভাই আর সিরাজ ভাইয়ের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল ছিল—ডেস্টিনেশনে যাওয়ার পথে যারা একমত হবে, সেই লোকগুলোকে সাথে নিয়া যাও। আমরা তো এক রাস্তায় যাব। রাস্তা বাঁক না নেওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে চলি না?[১৯]

## ১৩

সংগঠন করা সহজ কাজ ছিল না। সংগঠকদের আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না। সিরাজুল আলম খানের কাছে শুনেছি, আবদুর রাজ্জাক কেরানীগঞ্জে আঁটি স্কুলে ছাত্র পড়াতেন। কাজী আরেফ আহমদ পোগোজ স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের চাকরি নিয়েছিলেন। সিরাজুল আলম খান আঁটি স্কুলের একটা কামরা ব্যবহার করে ওখানে মেট্রিক পরীক্ষার্থীদের কোচিং করাতেন। এসব করে যা পেতেন, তা দিয়ে খাওয়া, চলাফেরা ও সংগঠনের কাজ। পরে সিরাজ ও রাজ্জাক কাজ ছেড়ে দেন। আরেফ একাই শিক্ষকতা চালিয়ে যান এবং অন্য দুজনকে যত দূর পারেন সাহায্য করতেন। সময় ছিল বৈরী। সিরাজুল আলম খান ওই সময়ের একটা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া বিবরণ দিয়েছেন, যেখানে ফুটে উঠেছে তাঁদের কষ্টের কথা, কৃচ্ছ্রসাধনের কথা :

> সিরাজ : তোমাকে ক্ষুধার একটা স্টোরি বলি। বড় আকারে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার আগে আমরা ২০-২২ জন ঢাকা-বেজড কাজ করতাম। আর ১০-১২ জন শ্রমিক। পয়সাকড়ির এত অভাব? বাড়ি থেকে যা পায়—আমারটা পেলে সবাই, সবারটা পেলে আমি, এ রকম তো? কোনো রকমে সকালে নাশতা করার পর—হয়তো সেটা ভালোভাবেই করা হতো। তারপর সারা দিন না খাওয়া। হেঁটে সব জায়গায় যাওয়া, কাজ করা। দুই আনা-চার আনা খরচ করে যে বাসে যাবে, সেটাও খাওয়ার জন্য রাখা হতো। বিকেলে দেখা গেল, এক টাকা বা দুই আনা-চার আনা জোগাড় হয়েছে। যার পকেটে যা আছে। মনি নামে আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে ছিল। এখন বেশ পয়সাকড়ি হয়েছে। খুব সিনসিয়ার। টাকাগুলো সাধারণত রাজ্জাক

কালেক্ট করত। আমি নিজে ধরতাম না। হঠাৎ দেখা গেল দূর থেকে একজন আসছে। মনি। শেখ মনি না, অন্য এক মনি। আলী হোসেন মনি। গেঞ্জিটাকে বিড়া বানিয়েছে। মাথার ওপর এত বড় একটা...

মহি : টুকরি?

সিরাজ : না, কাঁঠাল। মিরপুর থেকে এটা কিনে নিয়ে এসেছে। হেঁটে গিয়ে। আট আনা-দশ আনা দাম। এটা রাখেন সিরাজ ভাই। তারপর দুই সের মুড়ি। এইটা দিয়ে ২০-২২ জনের খাওয়া। বহুদিন এভাবে চলেছে।

একদিন শেখ মনির সঙ্গে পালিয়ে আছি বাড্ডায়, দক্ষিণখান। তখন তো এগুলো চষা খেত, খাল-বিল। আওয়ামী লীগ কানেকশনে এক লোক একটা ঘর উঠিয়েছিল। টিনের বেড়া, কাঁচা ফ্লোর। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু করতে হতো না। গ্রামের লোকেরাই রান্না করে দিত।

একবার একটা পলিসি মিটিংয়ে সে বলল, তুই বেশি তর্ক করিস কেন? বললাম, আমি যা বুঝি, তা-ই করব।

আর একবার বললে কিন্তু বের করে দেব।

মহি : আপনি বললেন?

সিরাজ : না, সে বলল। আমাকে এ রকম বলা? হোয়াট?

বল।

দে বের করে। আমি আবারও বললাম। সে বের করে দিল আমাকে। বলল, গেট আউট। তখন রাত একটা।

মহি : দক্ষিণখান থেকে?

সিরাজ : হ্যাঁ। বেরিয়ে হেঁটে চলে এলাম ঢাকা হলে। দিনে তো বের হতে পারি না। পরদিন সন্ধ্যায় গেলাম ওখানে। মনি বলল, তুই চলে গেলি? আমি বলাতে?

থাকলে হয়তো আরও ঝগড়া হতো। তার চেয়ে চলে যাওয়াটাই ছিল ভালো।

হার্ট খুব ভালো ছিল মনির। সবাই তো বলে, পরে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। খুব ফরমাল হয়ে গিয়েছিল।

এখন যেটা ভাবি...। ওবায়দুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি, ফেরদৌস কোরেশী—এদের কাছে বললে আমার মনে হয় ক্ষতি হতো। ছাত্রলীগের মাধ্যমে এটা আউট হয়ে যেত।

অনেক সময় রাতে থাকার জন্য এর কাছে, ওর কাছে গেছি। কোথাও শেল্টার পেয়েছি. কোথাও পাইনি। এই যে মন্ত্রী আনিসুল

হকের বাবা সিরাজুল হক সাহেব। ফোন-টোন করে গেলাম। বলছে, রাতে খাইয়া আসবা?

না, আপনি খাওয়ালে খাব।

ঠিক আছে, আসো।

উনি মক্কেল-টক্কেল বিদায় দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা শুরু করলেন। আমার সঙ্গে কলিমুর রহমান, একজন স্টুডেন্ট-ডাক্তার। রাত নয়টা-সাড়ে নয়টায় কথা শুরু হলো। দশটা-সাড়ে দশটায় বলে যে সিরাজ, তুমি চলে যাও। আর একবারও যদি কথা বলো, আমি কিন্তু তোমাকে পুলিশে দিয়ে দেব। মানে এসব স্বাধীনতার কথাটথা বললে।

মহি : এটা কোন ইয়ারের কথা?

সিরাজ : সিক্সটি সিক্স।[২০]

## ১৪

১৯৬৫ সালের শেষ দিকে সিরাজুল আলম খান তাঁর কাজের ধরন ও পরিধি পাল্টাচ্ছিলেন। কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে তিনি ওই সময় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদ বলেন :

> ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার *দ্য সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইস্ট পাকিস্তান* প্রকাশিত হয়। বইটি হঠাৎ এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে ছয় মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ওই বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে হয়। ওই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতার রূপ নেয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ওরা দুজন আমার অফিসে যেত, আমার সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য। সিরাজুল আলম খান তখন মুখে বাংলার স্বাধীনতার কথা না বললেও স্বাধীনতা লাভের জন্য শেখ মুজিবের অজ্ঞাতে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মী নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় গুপ্ত সংগঠন করেছিলেন। ওই সংগঠনসমূহের জন্য প্রচারপত্র লেখা হতো ও তাদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। এই সংগঠনের কথা আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটির কেউ, এমনকি শেখ সাহেবও জানতেন না। সিরাজুল আলম খান তার

ওই গুপ্ত সংস্থার জন্য তখন একটি প্রেস কেনার চেষ্টা করেছিলেন।[২১]

সিরাজুল আলম খান কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, খবরের কাগজগুলো তাঁদের কথা তেমন ছাপাত না। সাংবাদিকেরা অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিত। এ নিয়ে তাঁর মনে ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ। এ নিয়ে কিছু কথা হলো।

মহি : সাংবাদিকদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কেমন ছিল?

সিরাজ : একটা জার্নালিস্টও জানতে চায়নি, কখন, কীভাবে—এসব হলো। সব পাকিস্তান-মার্কা জার্নালিস্ট। শুধু আমাদের নূরুল ইসলাম ভাই, পরে বাসসে গিয়েছিলেন, উনি জানতেন। আর আমাকে ভালো জানতেন, বুঝতেন কী একটা কাজ হচ্ছে, সিরাজুদ্দীন হোসেন। আর আউয়াল সাহেব ছিলেন। সিনিয়র জার্নালিস্ট, মারা গেছেন। *আজাদ*-এর তখনকার নিউজ এডিটর। আর ছিল আবুল বাশার মৃধা, *আজাদ*-এ কাজ করত।

মহি : ওই সময় কিছু লোক তো আপনাদের নিশ্চয়ই ফিন্যান্সিয়াল হেল্প করত? অল্প হলেও।

সিরাজ : ফিন্যান্সিয়াল হেল্প করত সাইদ ভাই।

মহি : সাইদ ভাই মানে সাইদুর রহমান? উনি তো আরও পরে, ১৯৬৯-৭০ সালে। আর কোনো ফিন্যান্সিয়াল হেল্প? এই যে রংটং কিনতে হবে, এটা-ওটা কিনতে হবে।

সিরাজ : এটা চাঁদা তুলে। রেজা আলী কনট্রিবিউট করত। লিফলেট আমরা বিনা পয়সায় ছাপায়া ফেলতাম। পাইওনিয়ার প্রেসের মোহাইমেন সাহেবের কী যে কনট্রিবিউশন? হাজার হাজার লিফলেট ওখান থেকে ছাপিয়ে এনেছি। অনেক টাকা দিয়েছেন আমাদের। ১০ টাকা, ১৫ টাকা, ২০ টাকা। থাকতেন সদরঘাটে। ওখানে বাসা ছিল।

আরেকজন ছিলেন, নবাবগঞ্জ রোডে বইয়ের ব্যবসা করতেন। নাম হলো নুরুল ইসলাম বিএসসি। গেলেই উনি ১০ টাকা দিতেন।

মহি : নুরুল ইসলাম বিএসসি? চিটাগাংয়ে একজন আছেন, উনি নাকি?

সিরাজ : না না।

আবদুল বাশার মৃধাও বেশ পয়সা খরচ করতেন। ওনার বাবা ছিলেন ট্রেন ড্রাইভার।

মুজিব ভাই নিজের যোগাযোগের মাধ্যমে ইস্পাহানি গ্রুপ থেকে বড় অঙ্কের চাঁদা পেতেন। উনি আলফা ইনস্যুরেন্স কোম্পানির

মালিক হারুন গ্রুপের কাছ থেকে নিয়মিত বেতন পেতেন। এই কোম্পানির পূর্ব পাকিস্তান শাখার প্রধান ছিলেন স্বয়ং মুজিব ভাই। তাজউদ্দীন ভাই, গাজী গোলাম মোস্তফাসহ বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা আলফা ইনস্যুরেন্সে কাজ করতেন। আমরা ছাত্রলীগের কাজে টাকার দরকার হলে প্রয়োজনমতো তিনি টাকা দিতেন। আমিও দরকার পড়লে টাকার জন্য তাঁকে বলতাম। পরিমাণে বেশি না হলেও দু-তিনবার টাকা নিয়েছি। ছয় দফা দেওয়ার পর মুজিব ভাই গ্রেপ্তার হয়ে গেলে আলফা ইনস্যুরেন্স থেকে টাকা সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয়ভাবে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ময়মনসিংহ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং পাবনা থেকে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁদের দুজনসহ আরও কয়েকজনকে মাসিক হারে টাকা দেওয়া হতো। সৈয়দ নজরুল পেতেন এক হাজার টাকা এবং মনসুর আলী পেতেন পাঁচ শ টাকা।

টাকার অভাবে অন্যান্য খরচ, যোগাযোগ, কষ্টকর ছিল। ১৫ নম্বর পুরানা পল্টনে অফিসভাড়া মাসে ২৫ টাকা, বিদ্যুৎ বিল মাসে ৫ টাকা দিতে হতো। আমি, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমদ, আওয়ামী লীগের আলী হোসেন ও শাহাবুদ্দিন অফিসে নিয়মিত যেতাম। মুহম্মদুল্লাহ ভাই অফিসে আসা বন্ধ করলেন। তাজউদ্দীন ভাই অ্যারেস্ট হওয়ার কারণে প্রথমে মিজান ভাই (মিজানুর রহমান চৌধুরী) এবং তারপর আমেনা বেগমকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়। তখন সৈয়দ নজরুল ও মনসুর আলী সভা-সমিতি উপলক্ষে ঢাকায় আসতেন। ঢাকার গাজীপুরের ময়েজউদ্দিন, নেত্রকোনার মোমেন ভাই সপ্তাহে এক দিন অফিসে আসতেন। মাঝেমধ্যে টাঙ্গাইলের মান্নান ভাইও আসতেন। মোয়াজ্জেম ভাই প্রায়ই আসতেন। এ ছাড়া ঢাকা শহর বা জেলার কেউ ছয় মাসেও একবার আসতেন না।[২২]

শেখ মুজিব জেলে থাকা অবস্থায়ও সিরাজুল আলম খান তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পেতেন বেগম মুজিবের মাধ্যমে। সিরাজুল আলম খান এ ব্যাপারে বলেন :

মুজিব ভাই তখন জেলে। ভাবি (বেগম মুজিব) ১৫ দিন বা এক মাস পরপর তাঁর সঙ্গে জেলে দেখা করতে যেতেন। মাঝেমধ্যে আমি গিয়ে ভাবির সঙ্গে দেখা করতাম মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয় জানার জন্য। একবার ভাবির সঙ্গে দেখা করতে

গেলাম দুপুরের দিকে। ভাবি বললেন, 'ভাই, আসেন, খেয়ে যান।' সারা দিন খাইনি। সাগ্রহেই খেলাম। ভাবি পান খেতেন। আমার হাতেও এক খিলি পান তুলে দিলেন। ঘণ্টাখানেক পর বাসা থেকে বেরিয়ে আসছি। হঠাৎ ভাবি বললেন, 'ভাই, দাঁড়ান।' পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, 'এখানে দুই শ টাকা আছে, রাখেন।' দুটি এক শ টাকার নোট। বললেন, 'ফোনও তো করতে পারেন। আমাকে ফোন করবেন।' আমি বেরিয়ে এসে গেট পার না হতেই ভাবি আবার বললেন, 'মাসের প্রথম দিকে ফোন করবেন, ভাই।' প্রতি মাসে আমি ফোন করতাম। আমাকে তিনি যেতে বলতেন। একটা খাম দিতেন। ভেতরে কখনো দুই শ এক টাকা বা দুই শ দশ টাকা। প্রতি মাসের শুরুতেই আমি ফোন করতাম। দু-তিন মাস বাদ ছিল। '৬৯ সালে মুজিব ভাই জেল থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত একই পরিমাণ টাকার একটা খাম আমাকে দিতেন।[২৩]

## ১৫

পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার একটি উদ্যোগে জড়িয়ে পড়েছিলেন পাকিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় সদস্য। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, লিডিং সি-ম্যান সুলতান উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। ১৯৬২-৬৩ সালের দিকে করাচিতে এই উদ্যোগের সূত্রপাত। পরে তাঁরা সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরে ও বাইরে আরও কয়েকজনকে সম্পৃক্ত করেন। তাঁরা দেশের জন্য একটি পতাকাও তৈরি করছিলেন এবং নতুন দেশের নাম রেখেছিলেন 'বাংলাদেশ'। দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এই গোপন উদ্যোগের বিষয়টি পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। শুরু হয় ধরপাকড়। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগপত্রে বলা হয়, ভারতের সাহায্যে তাঁরা পাকিস্তান ভেঙে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করতে চেয়েছেন; আগরতলায় বসে এ ষড়যন্ত্র করা হয়। মামলাটির নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। গণমাধ্যমে এবং জন-আলোচনায় এটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিতি পায়।

ওই সময় পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলো পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) নামে একটি জোট তৈরির চেষ্টা চালায়। উদ্দেশ্য হলো, ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরকারবিরোধী জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলা। এ সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একধরনের আপসকামিতা দেখা যায়। ওই সময় সিরাজুল আলম খানের একটা চেষ্টা ছিল আওয়ামী লীগ যাতে রাজনীতির মাঠে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে শেখ মুজিব ও মামলার অন্য অভিযুক্তদের মুক্তির দাবিটি হারিয়ে না যায়। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদের ভাষ্য বেশ চমকপ্রদ ও প্রাসঙ্গিক। এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো :

> আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যখন রাজসাক্ষীদের জেরা চলছিল, তখন আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী দল কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি পাঞ্জাবের নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের পরামর্শে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে (পিডিএম) যোগ দেওয়া সাব্যস্ত করে। সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, আমেনা বেগম ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম সালাম খানের পিডিএমে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব আলোচনা করার জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের নিকট থেকে শুনতে পেলাম যে নবাব নসরুল্লাহ নেতাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের ফাঁসি, না হয় ১৪ বছরের জেল অবধারিত। ওই পটভূমিতে সব দলের সব নেতা একত্রে মিলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করা ছাড়া পথ নেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট সংঘটিত হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ যদি এই আন্দোলনে যোগ না দেয়, তবে তাদের পক্ষে একা আন্দোলন করা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে শেখ মুজিব উপস্থিত নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনাও নেই।
>
> আবদুস সালাম খান এবং জহিরুদ্দীন আগরতলা মামলায় শেখের পক্ষে প্রধান উকিল। সুতরাং তাঁদের দুজনকে নবাবজাদা নসরুল্লাহ অনুরোধ করলেন শেখ মুজিবকে বোঝাতে, যাতে তিনি যেন আওয়ামী লীগকে পিডিএমের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কারণ, ওই যোগদানের ফলে কেবল দেশের মঙ্গলই হবে না, আওয়ামী লীগও সংগঠন হিসেবে বেঁচে থাকবে। নবাবজাদা নিশ্চিত ছিলেন যে শেখ সাহেব আবদুস সালাম খান ও জহিরুদ্দীনের অনুরোধ রক্ষা না করে পারবেন না।
>
> পরের দিন ক্যান্টনমেন্টে আসামিরা যখন হাজির হলো, তখন

আবদুস সালাম খান ও জহিরুদ্দীন শেখ মুজিবের নিকট নবাবজাদা নসরুল্লাহর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। শেখ সাহেব আবদুস সালাম খানকে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করতে বলেন এবং আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটিকে সংগঠনের কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য টাকাপয়সার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। নবাবজাদার প্রস্তাবের প্রসঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের যেসব সদস্য বাইরে আছে, তাদের মতামত গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং ওই সদস্যদের সভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করে ওই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপদেশ দেন। তিনি স্টিয়ারিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের নামও বিবেচনা করতে বললেন ও স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আবদুস সালাম খানকে মনোনীত করলেন। আওয়ামী লীগের সদস্য অন্য যেসব উকিল ওই মামলা পরিচালনার জন্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের তিনি ওই সমস্ত ঘটনা এবং আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগমকে তাঁর নির্দেশ ও উপদেশসমূহ জানানোর জন্য বলেন। এ ছাড়া সালাম খানের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথাও জানাতে বলেন। পরদিন আবদুস সালাম খান ও জহিরুদ্দীন আমেনা বেগমকে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সভা আহ্বান করতে অনুরোধ জানালেন। অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিরা যাতে এই সভায় উপস্থিত হতে পারেন, সে জন্য সাত দিনের নোটিশ দিয়ে এই জরুরি সভা ডাকা হলো। সভায় মোটামুটিভাবে যেসব সদস্য গ্রেপ্তার হননি, তাঁরা প্রায় সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন।

সভায় আবদুস সালাম খান প্রথমে সদস্যদের মামলার ভালো-মন্দ দিক বিশ্লেষণ করে শোনান। তিনি ইঙ্গিতে জানালেন যে যদিও রাজসাক্ষীর মধ্যে অনেকেই সরকারকে সমর্থন করেনি, তবু যেসব দলিল ও পুলিশ রিপোর্ট এসেছে ও ভারতীয় মিশনের ভূতপূর্ব বাণিজ্যসচিব সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ ও প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে শেখ সাহেব এবং অন্যদের মুক্তি সম্ভব না-ও হতে পারে। আর যেহেতু সরকারি উকিল মনজুর কাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করে মামলাটা সাজিয়েছেন, তাতে ট্রাইব্যুনাল হয়তো বিশ্বাস করবেন যে মামলা সঠিক, তবে শেখ মুজিব ও তাঁর দলের ভয়ে সাক্ষীরা সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। সে অবস্থায় ট্রাইব্যুনাল শেখ মুজিবকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলতে পারেন। বিপদ হচ্ছে যে ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে

আপিল করার কোনো সুযোগ থাকবে না। সুতরাং ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ট্রাইব্যুনালের রায় মেনে নিতে হবে। অথচ দেশে গণতন্ত্র থাকলে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যেত। সুতরাং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগকে সব দলের সঙ্গে একত্র হয়ে আন্দোলন চালাতে হবে।

মামলা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার পর আবদুস সালাম খান পিডিএমের ম্যানিফেস্টোর একটা করে কপি প্রত্যেক সদস্যকে দিলেন। সবাই যখন তাঁদের কপি পড়ে ফেললেন, তখন আবদুস সালাম খান প্রতিটি দফার ওপর তাঁদের মতামত দিয়ে সদস্যদের বক্তৃতা করতে বললেন। সিরাজুল আলম খান বললেন যে প্রতিটি দফা ভালো করে পরীক্ষা করার জন্য দু-এক দিন সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং সভা আপাতত ২৪ ঘণ্টার জন্য মুলতবি রাখা হোক। সিরাজুল আলমকে সমর্থন করল আবদুর রাজ্জাক, আমেনা বেগম ও নজরুল ইসলাম। সভা মুলতবি করা হলো রাত্রে সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক আমার বাসায় এলেন দফাগুলো আলোচনা করার জন্য। আমি দফাওয়ারি মতামত দেওয়ার আগে তাঁদের সতর্ক করে বললাম, এটা নবাবজাদা নসরুল্লাহর ষড়যন্ত্রও হতে পারে। শেখ সাহেব ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী সর্বদলীয় সম্মেলনে যখন ছয় দফা উপস্থাপন করেছিলেন, তখন নসরুল্লাহ বলেছিলেন যে ছয় দফা বিবেচনা করা যায় না, কারণ, ছয় দফা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মস্তিষ্কপ্রসূত। ওই কথার ওপরই শেখ মুজিব লাহোর সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসেন। সেই থেকে অদ্যাবধি পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবির কোনো দফা প্রত্যাহার করেনি বা পুনর্বিবেচনা করেনি। অথচ নবাবজাদা এখন সেই ছয় দফার প্রবক্তা এবং তাঁর ভাষায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামী লীগকে পিডিএমে টানার জন্য ঢাকায় এসেছেন। উপরন্তু আবদুস সালাম খান ও জহিরুদ্দীন এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, অথচ তাঁরাও ছয় দফা আন্দোলনের সমর্থক নন। তাই স্বভাবতই ধরে নেওয়া দোষের হবে না যে এর পেছনে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র আছেই। হতে পারে পূর্ব পাকিস্তানে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে, তা ভন্ডুল করাই এদের উদ্দেশ্য। আমি বলি যে ব্যক্তিগতভাবে আবদুস সালাম খান আগরতলা মামলা সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণী দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। আমি মনে করি, বিশ্লেষণটি উদ্দেশ্যমূলক। আওয়ামী লীগ যাতে তাঁর প্রস্তাব মেনে নেয়, সে

জন্যই এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারণ, প্রথমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পরে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে আপিলের মাধ্যমে শেখ সাহেবকে মুক্ত করা হবে একটা বাতুল চিন্তা। কারণ, এ ধরনের পদক্ষেপ যথাযথভাবে গ্রহণ করার মতো পরিবেশ বা পরিস্থিতি কখন তৈরি হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জেল বা ফাঁসি থেকে তাঁকে রক্ষা করতে হলে জেলের তালাই ভাঙতে হবে, আর তা করতে হবে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই।

এরপর আমি প্রতিটি দফার ওপর আমার মতামত দিতে আরম্ভ করি। সিরাজুল আলম খান কাগজ-কলম নিয়ে প্রতিটি দফার ওপর আমার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ও মতামত লিখে নেয়। সম্ভবত এর জন্যই পরদিন আবদুস সালাম খান ও জহিরুদ্দীন যথেষ্ট বিতর্কের পরও আওয়ামী লীগকে পিডিএমে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত করাতে ব্যর্থ হন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে শেখ সাহেব ১৯৬৬ সালের পর থেকে জেলে থাকার সময় সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের চেষ্টায় আওয়ামী লীগের কর্মসূচির ভেতর দুটো দফা সংযোজন করা হয়। একটি দফা হলো দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা।[২৪]

## ১৬

কামাল উদ্দিন আহমেদ পড়ে মোহাম্মদপুর গভ. হাইস্কুলে। বাড়ি কাপাসিয়া। থাকে ঢাকার মণিপুরিপাড়ায়। তার পরিবারে রীতিমতো একটা ঝড় বয়ে গেছে। তার বড় ভাই পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবেক লিডিং সি-ম্যান সুলতান উদ্দিন আহমেদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৪ নম্বর আসামি। কামালের ভগ্নিপতির নামও কামালউদ্দিন। তিনি ব্যবসা করতেন। আগে নৌবাহিনীতে ছিলেন। তিনি এই মামলার ২ নম্বর সাক্ষী। দুজনই তখন গ্রেপ্তার অবস্থায় আছেন ঢাকা সেনানিবাসে। কামাল বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে।

কামাল জানে, এই মামলার ১ নম্বর অভিযুক্ত হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কী মনে করে কামাল একদিন গিয়ে উপস্থিত হলো ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাসায়। দেখা করল বেগম মুজিবের সঙ্গে। বলল, এখন সে কী করবে। বেগম মুজিবের অবস্থাও তখন ভালো নয়। দলের লোকেরা তাঁর

বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা লড়ার জন্য উকিল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কামালকে বললেন, 'তুমি সিরাজুল আলম খানের কাছে যাও।' কামাল বলল, 'তাঁকে তো চিনি না। কোথায় পাব তাঁকে।' বেগম মুজিব বললেন, 'তুমি ইকবাল হলে যাও। সেখানে দেখবে একজন লোক, লম্বা চুল, দাড়ি-গোফ। তাকে খুঁজে বের কর। সে-ই সিরাজুল আলম খান।'

কামাল ইকবাল হলে গেল। খুঁজে বের করল সিরাজুল আলম খানকে। তিনি কামালকে নানান পরামর্শ দিলেন। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী কামালদের পরিবারের খোঁজখবর রাখতেন।[২৫]

বদিউল আলম ছিলেন ছাত্রলীগের তুখোড় কর্মী। তাঁর ভাষ্যে জানা যায়, ছাত্রলীগের মধ্যে একটি ঘরানা তৈরি হচ্ছে ষাটের দশকের মাঝামাঝি। একপর্যায়ে তিনিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

বদিউল আলম : আমি তখন সচিবালয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কেরানি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি। থাকতাম আজিমপুরে ছাপরা মসজিদের পেছনে একটা মেসে। ওখানে আসত আখতারুল হক আর রফিক। আখতারুল ছাত্র ইউনিয়ন করত। রফিক ছাত্রলীগ।

মহিউদ্দিন আহমদ : রফিক মানে লিটল কমরেড?

বদিউল : হ্যাঁ। আমরা মাঝেমধ্যে আড্ডা দিতাম, স্বাধীনতা নিয়ে কথাবার্তা বলতাম। আমরা একটা দেয়ালপত্রিকা বের করে ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলের দেয়ালে লাগিয়েছিলাম। ওখানে আমরা স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার—এ-জাতীয় কবিতা, লেখা ব্যবহার করেছি। স্বাধীনতা শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করিনি।

তারপর শুরু হলো ইকবাল হলে যাওয়া-আসা। রফিকের মাধ্যমে কাজী আরেফ আহমদের সঙ্গে প্রথমে পরিচয় হলো। তারপর পরিচয় হলো সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে।

মহি : এটা কি ছয় দফা—৭ জুন (১৯৬৬)-এর আগে না পরে?

বদিউল : আগে। ৭ জুনের হরতালের সময় আমি তো অ্যাকটিভ ওয়ার্কার। ইকবাল হলে এসে ওনাদের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে আমি ছাত্রলীগার হয়ে গেলাম। তখন জগন্নাথ কলেজে নাইট শিফটে ভর্তি হলাম। ক্লাস-ট্লাস করতাম না। ইকবাল হলে তখন মার্শাল মনির সঙ্গেও কথা হয়। উনি আসতেন।

মহি : এদের মধ্যে কার সঙ্গে আগে পরিচয় হয়েছে?

বদিউল : কাজী আরেফ আহমদ।

মহি : উনি তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র?

বদিউল : হ্যাঁ। তখন তাঁদের সঙ্গে কাজে জড়িত হয়ে একপর্যায়ে চাকরি ছেড়ে দিই। চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় আমার সারভাইভালের আর কোনো পথ খোলা থাকল না। আমি মেস ছেড়ে দিয়ে ইকবাল হলে এসে থাকতাম। তখন কাজী আরেফ আহমদের সঙ্গে আমার একটা অ্যাসোসিয়েশন ডেভেলপ করে। তাঁর বাসায় যেতাম। তখন ছয় দফা, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতার কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো।

মহি : নিউক্লিয়াস সম্পর্কে ধারণা হলো কখন?

বদিউল : এ সম্পর্কে আমি জানতে পারি ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে।

মহি : নিউক্লিয়াস শব্দটি কি ব্যবহার করা হয়েছিল?

বদিউল : না। ছাত্রলীগের যে গ্রুপিং আমাদের, এটা ছিল সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক আর কাজী আরেফ আহমদকে কেন্দ্র করে। এরা আমাদের গাইড করত।

কাজী আরেফ আহমদ ঢাকা সিটির সাংগঠনিক কাজ দেখাশোনা করতেন। শেখ মুজিবকে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হলো, আমার তারিখ সঠিক মনে নাই, রাতে আমরা এর প্রতিবাদে পোস্টার লাগিয়েছিলাম। ইকবাল হল, সলিমুল্লাহ হল, *আজাদ* অফিসের দেয়ালে—কিল কিল আইয়ুব কিল, কনডেম লন্ডন কন্সপিরেসি।

মহি : লন্ডন কন্সপিরেসি কেন?

বদিউল : আইয়ুব খান লন্ডন ভিজিটে গিয়েছিল। সেখান থেকে এসেই সে এটা করেছে।

তখন জানলাম, সিরাজুল আলম খান হচ্ছে আমাদের লিডার। আমাদের ধারণা ছিল, তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে লিয়াজোঁ মেইনটেইন করেন। কেউ এটা আমাদের বলে দেয়নি।

এ সময় আমাকে শ্রমিকনেতা আবদুল মান্নানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। আমি ঢাকা জুট মিলে থাকতাম এবং শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে কথাবার্তা বলতাম। তেজগাঁওয়ের শ্রমিকনেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়ার ওখানেও যেতাম, কাজ করতাম। পরে রফিক আর আমাকে রুহুল আমিন ভূঁইয়ার সঙ্গে ট্যাগ করে দেওয়া হলো।

কাজী আরেফ আহমদ আমাকে একদিন বললেন, আমাদের দেশের বাইরে যেতে হবে। ট্রেনিংয়ের জন্য।[২৬]

## ১৭

১৯৬৬-৬৮ সাল ছিল আওয়ামী লীগের জন্য দুঃসময়। নেতারা বেশির ভাগ জেলে আটক। যুবনেতাদের মধ্যে শেখ ফজলুল হক মনি, কে এম ওবায়দুর রহমান ও আবদুর রাজ্জাকও কারাগারে। বলা চলে, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম রীতিমতো হারিকেন জ্বালিয়ে আওয়ামী লীগ অফিস পাহারা দিতেন, আর বাইরে থেকে আন্দোলনের জোয়ার তৈরির চেষ্টায় ছিলেন সিরাজুল আলম খান। মূল ভরসা ছিল ছাত্রলীগ। তাঁরাই কোনোমতে দলের নিবুনিবু সলতেটাকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। এ সময় তাঁদের পাশে দাঁড়ান সাইদুর রহমান নামের এক তরুণ ব্যবসায়ী। ওই সময়ের একটা ছবি পাওয়া যায় তাঁর বর্ণনা থেকে। প্রথমে ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। রউফ তাঁকে ইকবাল হলে নিয়ে আসেন। সেখানে পরিচয় হয় সিরাজুল আলম খান এবং তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাজের তখন সবে শুরু। ছাত্র আন্দোলনের একপর্যায়ে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও আবদুর রাজ্জাক জেল থেকে ছাড়া পান। তাঁদের সঙ্গেও সাইদুর রহমানের ঘনিষ্ঠতা হয়। সাইদুর রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী :

> ওই সময় শেখ সাহেবকে সাপোর্ট করার মতো আই ওয়াজ দ্য লোন ম্যান। সমস্ত ইন্টেলিজেন্স উপেক্ষা কইরা এদের হাইডআউটের জন্য দুইটা বাড়ি ভাড়া করছিলাম আমি। একটা করেছিলাম বাসাবোতে, আরেকটা আদাবরে। এদের রাত্রিবেলা নিয়া যাওয়ার জন্য আমার ঢাকা-ক ৩১৫৫ ভক্সওয়াগন—দ্যাট ওয়াজ দ্য ওনলি কার, তাদের জন্য ইউজ করছি। অন্য কেউ তাদের কাছে আসত না। মিটিংগুলো আমার বাসায় হইত। ১১ দফার প্রথম দিকের লিফলেটটা ছাপানোর টাকা আমি দিছি। মুজিব কোট যে এরা গায়ে দেয়, এদের চার-পাঁচজনকে কোট প্রথম আমিই বানায়া দেই। এরা আমার বাসায় থাকত। পরে ইন্টেলিজেন্স যখন এদের পেছনে লাগল, তখন গাড়িতে—আমার ওয়াইফ থাকত পেছনের সিটে, সিরাজ, মনি, তোফায়েল, রাজ্জাক, রউফ, যেকোনো একজন বা দুইজন পেছনের সিটে আমার ওয়াইফের লগে বইত। আমি তাদের ড্রাইভার। এইভাবে রাতের বেলা তাদের নিয়া নিয়া যাইতাম।[২৭]

ক্রিমিনাল অ্যামেন্ডমেন্ট (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স-৬ ১৯৬৮ অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যদের বিচার চলছিল। আইয়ুব সরকার এই আইন বাতিলের ঘোষণা দেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ আগরতলা

ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এর আগে শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে আইয়ুব খানের ডাকা গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্যারোলে ছাড়া পেয়ে বৈঠকে যোগ দেওয়ার বিষয়টি একটি আপস হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ ছিল। শেখ মুজিব যাতে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে না যান, সে জন্য সিরাজুল আলম খানের একটা চেষ্টা ছিল। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদ বলেন :

> এ কে ব্রোহি, খাজা সাহাবুদ্দীন ও আইনমন্ত্রী জাফর সাহেব শেখ মুজিবকে জামিনে অথবা প্যারোলে বের হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পরামর্শ দেন। স্পষ্টত এটা ছিল ষড়যন্ত্র মামলাকে জিইয়ে রাখার আরেক ষড়যন্ত্র। শেখ মুজিব যাতে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে পা না দেন, তার জন্য সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক বেগম মুজিবকে সতর্ক করে দেন। বেগম মুজিবকে তাঁরা ক্যান্টনমেন্টে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে অনুরোধ করেন। বেগম মুজিবের মাধ্যমে তাঁরা ব্রোহি ও খাজা সাহাবুদ্দীনের প্রস্তাব অনুযায়ী শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেন। যাক, শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত ওই ফাঁদে পা দেননি। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়।[২৮]

## ১৮

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্যক্রম বাতিল হয়ে যায়। ২২ ফেব্রুয়ারি মামলায় অভিযুক্ত সবাই জেল থেকে মুক্ত হন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী নিজেই গাড়ি চালিয়ে শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছে দেন। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদ। তিনি 'জনগণের পক্ষ থেকে' শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ঘোষণা করেন। এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সিরাজুল আলম খান আমাকে বলেন :

> সিরাজ : এই প্রথম রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব ভাষণ দেবেন। ধানমন্ডির বাসা থেকে আমরা রওনা হলাম। গাড়িতে মুজিব

ভাইয়ের সঙ্গে একদিকে আমি, অন্যদিকে তোফায়েল। পেছনে দুটো গাড়িতে খসরু এবং তাঁর টিম। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে এসে লিডার (মুজিব) কানের কাছে মুখ এনে বললেন, কী বলবে-টলবে। আমি বললাম, ছাত্র ইউনিয়ন যা বলবে, ইট ডাজ নট ম্যাটার। আমাদের সব ঠিক আছে। কিন্তু কেউ জানে না এখনো। তোফায়েল বলল, 'কী বলব?' আমি বললাম যে তুমি একটা টাইটেল দেবা, বঙ্গবন্ধু, আজ থেকে আমরা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলাম। তারপর দুবার স্লোগান দেবা। আমি বাঁয়ে ঝুঁকলাম লিডারকে বলার জন্য। তোফায়েল একটা জিনিস দেবে আপনাকে। ওনার ওপর আমার একটা বিরাট কনফিডেন্স ছিল। উনি এটা বুঝলেন। জিজ্ঞেস করলেন না। তোফায়েলকে বললাম, বক্তৃতা শর্ট হবে। এই জায়গায় এটা বলবা, রিসেপশনটা ভালো হবে। মুজিব ভাই অপোজ করলেন না। তার অর্থ হলো, উনি এটা অ্যাকসেপ্ট করলেন। এই তো 'বঙ্গবন্ধু' বলার ইতিহাস। এটা আমরা আনলাম ইঞ্জিনিয়ারিং করে।

শব্দটা এল কোথা থেকে? আমাদের রেজাউল হক মুশতাক আর শেখ কামাল একটা পোস্টার বের করেছে। আহসানউল্লাহ হলে ৩১৪ নম্বর রুমে থাকতাম আমি। ওরা আমার কাছে এল। দেখি যে একটা পোস্টার, 'বঙ্গ-বন্ধু' লেখা। এটা লাগাবে, পরামর্শ চাচ্ছে। কাগজটা মুড়ি দিয়ে বললাম, কাউকে কিছু বোলো না।

বঙ্গবন্ধু নামটি আওয়ামী বৃত্তে নতুন যোগ হলেও শব্দটি আগে থেকেই ছিল। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (খ্রিষ্টীয় ১৯০১) *বঙ্গবন্ধু* নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। পত্রিকাটি বঙ্গ নামের দেশটির হিতৈষী—এ অর্থেই ব্যবহৃত হতো। এর সম্পাদক ছিলেন দুর্গাদাস রায়। তখন *বঙ্গবন্ধু* ছিল একটি পত্রিকা, এখন এটি একজন রাজনৈতিক নেতার বিশেষণ। শিগগিরই এটি তাঁর নামের অংশ হয়ে যায়।

তবে ব্যক্তির ভূষণ হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু' নাম এর আগেও দেওয়া হয়েছিল স্কটিশ সমাজসেবক ডেভিড হেয়ারকে। রাজা রামমোহন রায়, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখকে নিয়ে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দু কলেজ (পরে নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ)। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদানে মুগ্ধ হয়ে রামমোহন রায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' নামে অভিহিত করেছিলেন।[২৯]

মা-বাবার দেওয়া নামের সঙ্গে একটি বিশেষণ বা উপমা জুড়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে প্রাচীনকাল থেকেই। একসময় সিরাজুল আলম খানের

পাক্ষিক পত্র।

... বিশ্বাস, এক রকম প্রণালীতে চলা, এক মা, এক বাপ। ...
... করা আর ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করা একই।—কেশব।

আচার্য্যের প্রার্থনা।

একাগ্রতা।

*বঙ্গ-বন্ধু* নামে একসময় একটি পাক্ষিক পত্রিকা ছিল

ভক্তরা তাঁকে বাংলার ক্যাস্ট্রো বলা শুরু করেন। এই নামের উৎপত্তি-রহস্য জানাতে গিয়ে তিনি বলেন :

মহি : শেখ মুজিব আপনাকে নাকি 'ক্যাস্ট্রো' বলেছিলেন? কখন?

সিরাজ : এটা উনসত্তরের আন্দোলনের পরের ঘটনা।

একদিন মুজিব ভাইয়ের বাসায়। দুপুরবেলা। আফটার লাঞ্চ। সদলবলে সাংবাদিকেরা আসছে। আট-দশজন। ওরা আসার দুই মিনিট আগে আমিও পৌঁছালাম। নাজমুল বলল, 'দোস্ত, তুই এখানে? এত খাইটা কোনো লাভ আছে? তুই তো কর্মী আর সংগঠক। কোনো দিন নেতা হইতে পারবি না। নেতা হতে হলে তুই ভাব দেখাবি। কাজ কম করবি। দেখিস না আমাদের? তুই দুই ঘণ্টা বসে আছিস না? আমরা ফোন করছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আসতে বলছে।'

আসলে আমি এসেছি দুই মিনিট আগে। মুজিব ভাই বলছেন, কাজ আছে। ব্যারিস্টার মওদুদ ভাই এসেছে। এই কথাগুলো অন্য জার্নালিস্টরাও শুনেছে। সবাই বসেছে। মুজিব ভাই আমাকে

বললেন, 'আমার পাশে বস।' আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। মুজিব ভাই বললেন, 'ওকে চিনিস? চেনো ওরে?'

এমনিতে তো চেহারায় চেনে আমাকে।

চিনে রাখো। আমার ক্যাস্ট্রো কিন্তু।

সবাই এটা ইয়ার্কি-ফাজলামো হিসেবে নিয়েছে। কেউ কারও ক্যাস্ট্রো হয় নাকি? এ রকম একটা ভাব নিয়েছে। ও আমার ফাইল-টাইল নাড়াচাড়া করে—একটা নেগলিজেন্সের ভাব না? ওরা বুঝল এ রকম একটা কিছু।

আলাপ-আলোচনা শেষে সালাম-টালাম দিয়ে যাওয়ার সময় মুজিব ভাই ওদের বললেন, 'দেখো, আমি তো তোমাদের সঙ্গে সব সময় কথা বলতে পারব না। সিরাজের সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ রাখবা। হি ইজ দ্য ম্যান। সিরাজ, ওরা যে কী বলতে আসছিল? ওটা করে দে। প্রেসে চলে যাক।'

নাজমুলের তো আক্কেলগুড়ুম। বলে, দোস্ত, আমি তোর কাছে মাফ চাই।

ড. ওয়াজেদ। হাসিনার হাজব্যান্ড। ভালো ছাত্র ছিল। বলত, দোস্ত, জীবনটা নষ্ট করলি। বিয়ে-থা করলি না। চাকরি-বাকরি না, ব্যবসা-বাণিজ্য না। কত বড় হতে পারতি। কিছুই হলি না। ওই টোনের কথা আরকি। নাজমুলের মতোই। তবে এটা হলো সিমপ্যাথেটিক।

এই ওয়াজেদ, শামসুজ্জামান খান এই মানুষেরা মুভমেন্টের টাইমে সবাই চলে এল দেশে, ছুটিতে। এরা পিএইচডি করছিল। একজন জার্মানিতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। আবার কেউ কেউ সিএসপি হয়ে পড়তে গেছে। 'দোস্ত, তুই যে এত বড় কাজ করছিস।' ভালো ছাত্র তো? বোঝে। 'এত বড় কাজ তুই করতেছিস? কিছুই আমরা বুঝতাম না। তুই যে অনেক রাতে ফিরতি। আমরা তো বলতাম তুই বুঝি কোথাও এমন আড্ডা-টাড্ডা দিস, যেটা লেট নাইটে, মুখ দেখানো যায় না।'[৩০]

## ১৯

'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামটি ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। কিন্তু ছাত্রলীগের মধ্যে একটা ঘরানা তৈরি হচ্ছিল, যারা স্বাধীনতার কথা বলে,


www.amarboi.com

সমাজতন্ত্রের কথা বলে। এটাকে একটা গ্রুপ, উপদল, প্রবণতা—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তার উপস্থিতি ছিল। সিরাজুল আলম খান ছিলেন এই তরুণদের নেতা। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের পর এই প্রবণতা আরও বেগবান হয়। এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য আমি শরীফ নুরুল আম্বিয়ার শরণাপন্ন হলাম। আমাদের কথা হলো তাঁর জিগাতলার বাসায় :

মহিউদ্দিন আহমদ : আমি এখন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সুলুকসন্ধান করছি। আদতে কি এর অস্তিত্ব ছিল? নাকি নামটি পরে দেওয়া হয়েছে?

শরীফ নুরুল আম্বিয়া : আমি তখনো ছাত্রলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট হই নাই। তখনো আমি বুয়েটের একজন অর্গানাইজার। বুয়েট আর ঢাকা সিটির বিভিন্ন জায়গায় ফোরামের কাজ করতাম। তখন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামটা এল। আমি এর সদস্য হইলাম।

মহি : এটা কি ১৯৭০ সালের ছাত্রলীগের কাউন্সিল সভার আগে?

আম্বিয়া : হ্যাঁ, কাউন্সিলের আগে।

মহি : ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের পরে?

আম্বিয়া : হ্যাঁ। তারপর ১৯৭০ সালের মার্চে ছাত্রলীগ সেন্ট্রাল কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হইলাম। বুয়েটের কোটা থেকে। কোটা ঠিক না। বুয়েট থেকে একজন হয় আরকি। আগে ইসহাক ভাই ছিল। অন্যরা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হইছিল। তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট কেবল আমিই। আমাকে বলা হয়েছে, ছাত্রলীগ সেন্ট্রাল কমিটিকে কন্ট্রোল করতে হবে টুওয়ার্ডস লিবারেশন। অতশত বুঝতাম না। এগুলো বুঝত মার্শাল (মনিরুল ইসলাম)। কোথায় ভোট দিতে হবে, কোথায় কী করতে হবে, কমিটি ভাগ করে কে কারে ম্যানেজ করবে, এগুলো—ইট ওয়াজ আ স্কিম, ভেরি ইফেকটিভ। সে অনুযায়ী কাজ করতাম।

স্বাধীনতার প্রস্তাবের সময়, আমার মনে আছে, আমি তো পরীক্ষার প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম। তখন পড়া থেকে মন উঠে গেছে। এখন কী করব? ভাবলাম পরীক্ষা-টরিক্ষা দেব না। বিপ্লবের পথে চইলা যাই। বাঁচি কি মরি, স্বাধীনতা...। সিরাজ ভাইকে বললাম, পড়ব না।

না, পরীক্ষাটা দাও।

তখন তো তাঁর কথা বেদবাক্যের মতো। বললাম, ঠিক আছে। পরীক্ষার জন্য পড়ব। দরকার হইলে ডাইকেন। আমি আসব।

আমার ফিলিং হইল, আমি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের মেম্বার হিসেবে রিক্রুটেড হইছি এবং সে অনুযায়ী ছাত্ররাজনীতিতে কাজ করতেছি। আমি ঢাকা সিটিতে কাজ করছি, বুয়েটের ভেতরে কাজ করছি। এটার রেজাল্ট দেখা গেছে একাত্তরের ২৫ মার্চের পর।

মহি : শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজ ভাইয়ের যোগাযোগের পুরো ইতিহাসটা আপনি জানেন?

আম্বিয়া : সিরাজ ভাই যেটুকু বলছে, শুধু সেটুকুই জানি।

মহি : উনি তো কখনো পুরোটা বলেন না।

আম্বিয়া : এখন ওনার অনেক কিছু মনে না-ও থাকতে পারে। ১৯৭০ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ঢাকায় হাতে লেইখা 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলো'—রাতভর এই পোস্টারিং আমরা করছিলাম এবং সিরাজ ভাই নিজে থেকে...আমি ছিলাম, ইনু (হাসানুল হক ইনু) ছিল, জগন্নাথ কলেজের নজরুল ছিল, আর সম্ভবত সালাউদ্দিন ইউসুফ বা আবদুল্লাহ সানি ছিল। ইনুর একটা ভক্সওয়াগন গাড়ি ছিল। ওইটা নিয়া আসছিল। শ্রমিক লীগের অফিস ছিল পল্টনে। নজরুল ওইখানে বসে পোস্টার লিখছে। আমরা গাড়ি নিয়া ওইখানে গিয়া ওই সব পোস্টার আইনা আঠা-উঠা বানায়া নিয়া আহসানউল্লাহ হলে নিয়া আসলাম। বললাম, চলেন দেশ স্বাধীন কইরা আসি। সারা রাত পোস্টার লাগাইলাম। ভোর ছয়টায় হলে আসছি, ক্যানটিনে নাশতা খাইছি। এইটা এক্সক্লুসিভ একটা রোমান্টিক কাজ।

সিরাজ ভাই হাতে-কলমে সবাইকে শিখাইছে। এমনি এমনি বইলা দিলে আমরা কি যাইতাম? ডাউট আছে। বা ওনার ডাউট ছিল, আমরা পারি কি পারি না, করি কি করি না। উনি নিজে ছিল আমাদের সঙ্গে।

'৬৯ সালের পর আমাদের মধ্যে ওনার যে জনপ্রিয়তা, দেবতার মতো। শেখ সাহেব জেল থিকা বাইর হওয়ার পর সবাই তো তাঁর কাছে যাইত না। ইকবাল হলে আসত নির্দেশনার জন্য, বিশেষ করে যারা মুভমেন্টের লোক।

ওনাদের মেকানিজম ছিল। যে গ্রুপ যে কাজ করবে, আরেক গ্রুপ তা জানবে না। জিজ্ঞেস করতে পারবে না।[৩১]

## ২০

সত্তর দশকের শুরুতেই 'জয় বাংলা' স্লোগানে কেঁপে উঠেছিল দেশ। প্রথম প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যেই এটা উচ্চারিত হতো। খুব দ্রুতই তা প্রকাশ্য জনসভায় ঠাঁই করে নেয়। এ নিয়ে কথা হলো সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। তিনি বললেন :

> জয় বাংলা স্লোগানটা খুব ক্রিটিক্যাল ছিল। এটার বিরোধিতা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এটা হিন্দুদের, এটা নন-আওয়ামী লীগ স্লোগান, এটা ইন্ডিয়া বেইজড—এই সব কথা। সে জন্য আমাকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হয়েছে। এর আগে যে যে জায়গায় ঢোকানো হয়েছে, বাধা হয়েছে। দেন উই ডিসাইডেড, ১১ জানুয়ারি (১৯৭০) পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের যে মিটিংটা হবে, ওখানে এটা ইঞ্জিনিয়ারিং করা হবে, খুব প্ল্যানড ওয়েতে। ওয়ার্ক করতে ফরোয়ার্ড খেলার জন্য গাজী গোলাম মোস্তফাকে চুজ করলাম। গাজী আমাকে বস বলত। যেকোনো কাজে আমাকে সাপোর্ট দিত। ওই দিনও দিয়েছে।
>
> মাজহারুল হক বাকীর 'বিজ্ঞাপন' অফিস। সেখানে আর্টিস্ট কামাল ভাই (কামাল আহমেদ)। বললাম, কামাল ভাই, আমার একটা কাজ।
>
> আপনি বললে তো করবই।
>
> বাকীকে বললাম, আপনার অফিসটা দুইটার পর আমার কাছে ছেড়ে দেন।
>
> আমার এখানে গোপন মিটিং করে কি সব শেষ করে দেবেন?
>
> ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিল তো? সেন্সগুলো তো থাকে তাঁর। আমি ওনাকে বললাম, আমার একটা লেখা দরকার। কালারটা একটু চুজ করে দিতে হবে। 'জয় বাংলা'—দুইটা শব্দ হবে। একটা 'জয়', আরেকটা 'বাংলা'। কাঠের ওপর হবে। কালার ইজ ইয়োরস।
>
> কিসের জন্য, বলেন না?
>
> তাকে বললাম। কার থেকে নিয়ে যেন আমি তার পকেটে ২০ বা ৩০ টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছি।
>
> আফতাবরা (আফতাব আহমাদ) এটা (এই স্লোগান) এখানে-সেখানে বলছে। আমাদের একেবারে হার্ডকোর যারা, তারা এই স্লোগান দেবে। এই দায়িত্বটা দিলাম মার্শাল মনিকে। চিরকুট দিয়ে দিয়ে, পল্টনে কোন কোন জায়গায় কে থাকবে। রাতে একবার শুধু ঘুরে দেখলাম।

এসব সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে করেছি। এখন দেখি যে কত সায়েন্টিফিক ছিল। আগের লোক জানে না পরে কী হবে। পরের লোক জানে না আগে কে করে গেছে। এই ধরনের একটা মেকানিজম, হাইলি সফিস্টিকেটেড বলা যায়।

সেদিন শেখ সাহেবকে আমি স্কট করলাম না। পথের মধ্যে গাজী গোলাম মোস্তফার হাত ধরে বললাম, মোস্তফা ভাই, আজকে আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। উনিও লজ্জা পেলেন।

কী বলেন আপনি?

লিডারকে বলবেন, একটা স্লোগান হবে।

আচ্ছা ঠিক আছে। যান, আপনি করেন।

এদিকে ডায়াসটা অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক উঁচু করে বানানো হয়েছে। দুইটা কাঠের তক্তায়, বড় সাইজ, লেখা হয়েছে। একটাতে 'জয়', অন্যটাতে 'বাংলা'। যেন দূর থেকে চোখে পড়ে। কামাল আহমেদের আঁকা। শেখ সাহেবের এই ব্যাপারগুলো এত ভালো! আমি আর বক্তারা ছাড়া আর কাউকে ডায়াসে উঠতে দিলেন না। বললেন, কে কে যাবে, গাজী, নজরুল সাহেব তো যাবেন, তাজউদ্দীন তো যাবেন, মোশতাক তো থাকবে, আর কেউ না। আর শুধু সিরাজ থাকবে।

তক্তা দুইটা ওঠানো হলো ১০-১২ মিনিট আগে। পেরেক দিয়ে ডায়াসে লাগানো হলো। দুজনের বক্তৃতার পর লিডার বলল, 'সিরাজ, স্লোগান দে।' আমি বুঝলাম, গাজী গোলাম মোস্তফা কাম করায়া দিছে। আমি তো উঠলাম। আকাশ, সাগরের ঢেউ, গর্জন এই সব বললাম। ইট ওয়াজ জাস্ট লাইক ডেলিভারি পেইন। আমি এক্সাইটেড। দেড়-দুই মিনিট কথা বলেছি। আমার সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে। বললাম, ওপরে আপনারা দুইটা শব্দ দেখছেন, আমার সঙ্গে আপনারা কণ্ঠ মিলায়া ধরেন—জয় বাংলা। আর কী—বাব্বা! কিসের কামানের গর্জন-টর্জন। স্টাম্বলড হয়ে গেল সব। আমি যখন পেছনে তাকালাম, শেখ সাহেবকে দেখলাম—হি ওয়াজ হ্যাপি। আমাকে বললেন, 'পাশে বয়।' আমি ওনার পাশে না বসে খন্দকার মোশতাকের পাশে গেলাম। মোশতাক আমার হাত ধরে বলল, 'ভাইডি, কামডা আজকে সাইরে দিছ, না?' হি ওয়াজ নট হ্যাপি। অ্যাট দ্য সেম টাইম, হি ওয়াজ নট আনহ্যাপি অলসো।[৩২]

জয় বাংলা স্লোগানটি মধুর ক্যানটিন চত্বরে ছাত্রলীগের এক কর্মিসভায় প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন সূর্য সেন হলের (আগের নাম জিন্নাহ হল)

ছাত্রলীগের সংগঠক আফতাব আহমাদ। এরপর এটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। সিরাজুল আলম খানের অনুসারীদের মধ্যেই এটা চালু ছিল। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়ার পর আওয়ামী লীগ প্রথম জনসভা করে পল্টন ময়দানে ১১ জানুয়ারি। একটি জনসভায় প্রথমবারের মতো 'জয় বাংলা' স্লোগানটি উচ্চারিত হয়েছিল ওই দিন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজে ওই স্লোগান ওই দিন দেননি। তবে বোঝা যায়, এটি তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় নিজ কণ্ঠে প্রথমবার এই স্লোগান দিয়েছেন ৭ জুন ১৯৭০, রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায়। ওই দিন বক্তৃতার একপর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি নেতা নই, আমি কর্মী। ওই যে নেতা ঘুমিয়ে আছেন—শেরেবাংলা আর সোহরাওয়ার্দী। আজ থেকে আপনারা আইয়ুব নগর বলবেন না, বলবেন শেরেবাংলা নগর। আর রেসকোর্সকে বলবেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।'[৩৩]

উল্লেখ্য যে পাকিস্তান সরকার ঢাকার আগারগাঁও এলাকায় জাতীয় পরিষদ ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করছিল। ওই এলাকাকে বলা হতো সেকেন্ড ক্যাপিটাল বা দ্বিতীয় রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল ইসলামাবাদ। সেকেন্ড ক্যাপিটালের নামকরণ হয়েছিল 'আইয়ুব নগর'। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আমার কথোপকথন জারি থাকল।

মহি : ওই সভায় গণমাধ্যমের সাপোর্ট কেমন পেয়েছিলেন?

সিরাজ : এটা চিন্তায় ছিল, হাউ টু ক্যারি আউট। সব পেপারে কীভাবে ওয়ার্ক করাব। সব পেপারেই নিউজ দিয়েছে, বাট নট দ্যাট, বিস্তারিত দেয় নাই। একটা পেপারও তো কো-অপারেট করে নাই। সে জন্য আমি তোফায়েলকে দিয়ে বলিয়েছি। যদি এখন থেকে কোনো নিউজ করা না হয়, তাহলে প্রতিটা পেপার অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হবে। যেমন *মর্নিং নিউজ* অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল (১৯৬৯ সালে)। তা-ও কভার করে না। কিন্তু কী করব? জার্নালিস্টরা প্রস্তাব নিল, এটা নাকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি। এই যে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী একমাত্র লোক, শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা করে গেছে। যেহেতু আমাকে শেখ সাহেবের রাইট হ্যান্ড হিসেবে দেখত। *পূর্বদেশ*-এ পরে লিখত, চ্যাংড়া পোলাপানরা নাকি লাফালাফি করতেছে। সিরাজুদ্দীন হোসেন আমাকে ভীষণ লাইক করতেন। মুজিব ভাইয়ের ক্লাসমেট তো।

মহি : বঙ্গবন্ধু ওই মিটিংয়ের পর আপনাকে কিছু বলেননি?

সিরাজ : আসার সময় লিডার বলল, আজ তো তুই আমাকে আনতে যাস নাই? চল, আমার সঙ্গে চল। খুশি হইছস তো? আর ইউ হ্যাপি?

তুমি হয়তো এক লাইনেই বলতে পারো, এটা অমুকের চেষ্টায় হয়েছে। কিন্তু সিনেমায় যদি দেখাও, তাহলে সিকোয়েন্সগুলো উইথ কারেক্ট গ্রামার অ্যান্ড উইথ অল আদার অ্যাডজাস্টমেন্টস—এগুলো দিয়ে জয় বাংলাকে এবং বঙ্গবন্ধুকে প্লেস করা। আরও আছে, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা/ তোমার আমার ঠিকানা, পিন্ডি না ঢাকা। আরও তো গ্রুপ ছিল। তারা সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিত। স্লোগান কী কী হতে পারে। একটা জাতীয়তাবাদী, আরেকটা হলো ক্লাস। এইখানে ডিফিট দিয়ে এটা করা, দ্যাট ওয়াজ নট দ্যাট ইজি। আমাদেরটা কারেক্ট হয়েছে। তাদেরটা ঢাকা পড়ে গেছে।

মহি : ওটাও কারেক্ট স্লোগান।

সিরাজ : না না, কেমন করে কারেক্ট স্লোগান?

মহি : ওটাও কারেক্ট। বাট ইয়োর স্লোগান ডিসাইডস প্রাইমারি অ্যাটেনশন।

সিরাজ : না না, ওটা কীভাবে কারেক্ট হলো? তুমি যে মুহূর্তে ওটাকে কারেক্ট বলো, আদার সেকশনস অব দ্য পিপলকে এক্সক্লুড করে দিচ্ছ। আমাদেরটা ইনক্লুসিভ, তাদেরটা এক্সক্লুসিভ। আকাশ-পাতাল তফাত।

মহি : একটা ন্যাশনাল কোশ্চেন, আর একটা হলো ক্লাস কোশ্চেন।

সিরাজ : তখন আর ওটাকে ক্লাস কোশ্চেন বলা হবে না। এগুলো কনস্পিরেটরিয়াল। না বুঝে আমরা কনস্পিরেসি করি না? ক্ষতি তো মানুষ জেনেশুনে করে না? খুব কম।

মহি : ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয় বাংলা স্লোগানকে পপুলারাইজ করেছে আ ফ ম মাহবুবুল হক।

সিরাজ : আর আফতাব।

মহি : আফতাব ওয়াজ নট আ পপুলার পারসন। মাহবুব তো খুব পপুলার। মাহবুব দশটা ছেলেকে ছাত্রলীগে আনে। আফতাব এর মধ্যে ছয়টাকে হোস্টাইল করে ভাগায়। বিহেভিয়ারটা তো অন্য রকম।

সিরাজ : তোমাকে তো মাহবুবই আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। প্রথম যেদিন পরিচয় করিয়ে দিল, স্লোগান দিতে এসে, মধুর

ক্যানটিনে পাঁচ-ছয়জনসহ, বলল, এই যে আমাদের...খুব ভালো ছাত্র ইত্যাদি।

মহি: ইকোনমিকস ডিপার্টমেন্টে মাহবুব ভিপি পদে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অপোনেন্টরা সাংঘাতিক। ইকবাল আহমেদ আর রিজওয়ানুল ইসলাম। রিজওয়ান তো জীবনে কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হন নাই। এত ভালো ছাত্র। ওই সময় ইকোনমিকস ডিপার্টমেন্টে ছাত্রলীগের পক্ষে হার্ডলি পাঁচ-ছয়জন। মোস্টলি ছাত্র ইউনিয়ন আর নন-পার্টিজান। সেখানে আমি গলা ফাটিয়ে ফেলছি জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে ওখানেও সবাই বিস্মিত—কী বলে? এটা আবার কী স্লোগান।

সিরাজ: ওই সময় একটা পোস্টার ছিল। একটা সাপ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কাশ্মীরের ওপর দিয়ে এখানে এসে ছোবল দিচ্ছে। মাঝখানে ইন্ডিয়া। ওটা সেনসেশন ক্রিয়েট করল। না হলে তো রবকে ডাকসুতে জেতানো যায় না। ফার্স্ট টাইম ডাইরেক্ট ইলেকশন। কত কষ্টে।

মহি: ডাকসু ইলেকশন আসতে আসতে জয় বাংলা তখন মোটামুটি একটা পপুলার স্লোগান হয়ে গেছে।

সিরাজ: তারপরও আমি ইলেকশনটা নিজে কনডাক্ট করেছি। বলেছি, রব জিতবে। জিতেছে।

মহি: রব ভাইয়ের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের আরেকজন দাঁড়িয়েছিল। সে অনেক ভোট কাটল। তিন শ-সাড়ে তিন শ ভোট পেয়েছিল। মাহবুবুল হুদা ভূঁইয়া। ওটাও একটা কনস্পিরেসি ছিল।

সিরাজ: রবকে ভিপি করতে না পারলে...। কয়েকটা জিনিস না ঘটলে হিস্ট্রি উড হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট। বঙ্গবন্ধুর লিডারশিপকে কনফার্ম করা, আমাদের নিউক্লিয়াস আর বিএলএফকে মেইন ইঞ্জিনিয়ারিং রোলটা, ড্রাইভিং রোলটা প্লে করা। থার্ড হলো ইলেকশনে যাওয়াটা। ফোর্থ হলো কোনোভাবে কমপ্রোমাইজ না করা। কথা হবে, কিন্তু কমপ্রোমাইজ করা হবে না। সে জায়গাটা নিয়ে আর্মস স্ট্রাগলে যাওয়া।

একটা লোকই শুধু শেখ সাহেবকে সমর্থন করেছে। মওলানা ভাসানী। যা গালাগালি আমাকে দিত সবাই! মাহমুদ আলী তো— সিরাজ, যদি এইটা করো, আমি ইস্ট পাকিস্তান ছাইড়া চলে যাব, ওয়েস্ট পাকিস্তানে চলে যাব। গেছেও সে। মন্ত্রীও হয়েছে। অথচ কত শিক্ষিত!

মহি: ন্যাপের ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারি না? পরে পলিটিকস চেঞ্জ করল। সেভেনটি ওয়ানে ইউএনওতে গেল অ্যাজ লিডার অব দ্য

ডেলিগেশন ফ্রম পাকিস্তান। সঙ্গে শাহ আজিজুর রহমান গেল।

সিরাজ : আর্টফিল্ম করলে এগুলো বলা যায়।

মহি : বাজারি ফিল্ম করলে তো হবে না। ওই যে *ওরা এগারোজন*—এ রকম ধুম-ধাড়াক্কা ছবি হবে।

সিরাজ : কিন্তু যদি আর্টফিল্ম করা যায়, যেকোনো একটা ভালো সিকোয়েন্স নিয়ে। একটা সিকোয়েন্সকেই মোটামুটি দেড় ঘণ্টা।

মহি : আমাদের দেশে যদি একটা মৃণাল সেন বা ঋত্বিক ঘটক টাইপ পরিচালক থাকত, তার হাত দিয়ে এ ধরনের ছবি হতো। আরেকজন ছিল। উনিও পারত। ভালো ছবি করছিল।

সিরাজ : কে?

মহি : ফখরুল আলম সাহেব। ওই যে *বিন্দু থেকে বৃত্ত* সিনেমা প্রযোজনা করেছিল।

সিরাজ : পারল না। সাউন্ডটা একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল।

মহি : এ ধরনের ছবিতে মেসেজ দেওয়া যায়।

সিরাজ : সত্যজিৎ রায়ের কাছে কামাল ভাই (কামাল আহমেদ) গিয়েছিলেন। উনি নিজেই গেলেন। বাংলাদেশে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, আপনি ছবি করবেন না?

না না, ওটা তো একটা মহাভারত! এটা আমার পক্ষে সম্ভব না।

অনেক রিকোয়েস্ট করলেন। উনি বললেন, কিছু মেটেরিয়াল দেন। আমি বইটই পড়ি।

কামাল ভাই ৩০-৩৫টা বই নিয়ে গেছেন—সব মুকুল সাহেব, গাফ্ফার চৌধুরীর—কী সব লেখা। উনি বললেন, 'আমাকে সব বই পড়তে হয়েছে। শুধু শুধু সময় নষ্ট করলেন।'

আমি বললাম, কামাল ভাই, আপনি আহমদ ছফার *ওঙ্কার* নিয়ে যান। পড়েছ? ওই যে বোবা মেয়েটা। ওরও কথা বলার অধিকার আছে।

মহি : সিক্সটি নাইনের মুভমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে। ছফা ভাই আমাকে বলেছেন, হুমায়ূন আহমেদের ছোট বোন ছিল বোবা, তার কথা মাথায় রেখে লিখেছে।[৩৪]

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। সিরাজুল আলম খান ব্যাপারটি খুলে বলেননি। বিষয়টি আমি কিছুটা জানতাম। তবে সবটা নয়।

ডাকসু নির্বাচনে সহসভাপতি পদে সিরাজুল আলম খানের পছন্দের প্রার্থী ছিলেন আ স ম আবদুর রব। অপর একজন প্রার্থী হলেন শেখ শহীদুল

১৯৭০ সালের মে মাসে ডাকসুতে নির্বাচিতদের অভিষেক অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

ইসলাম। শেখ শহীদ ছাত্রলীগের দীর্ঘদিনের নেতা। সম্পর্কে বেগম মুজিবের বড় বোনের ছেলে। সিরাজপন্থীরা ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে চাইছিলেন ছাত্রলীগের আরেক নেতা স্বপন কুমার চৌধুরীকে।

সহসভাপতি পদে দুজন শক্ত প্রার্থীকে নিয়ে ছাত্রলীগের মনোনয়ন বোর্ড মুশকিলে পড়ে যায়। মনোনয়ন বোর্ড তৈরি করা হয় ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে। কমিটির সভাপতি হলেন ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মো. কামালউদ্দিন। একই সঙ্গে তিনি ছাত্রলীগের মুহসীন হল শাখারও সভাপতি। সিরাজুল আলম খান বললেন ৩২ নম্বরে গিয়ে কথা বলতে, বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ নিতে। কামালউদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> সিরাজ ভাই বললেন সকাল সকাল যেতে। তখন নাকি লিডারের মুড ভালো থাকে। সকাল আটটার দিকে গেলাম বঙ্গবন্ধুর বাসায়। আমার সঙ্গে আরও পাঁচ-ছয়জন। এদের মধ্যে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিস এবং দপ্তর সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানও আছে। বঙ্গবন্ধু জানতেন আমরা আসব। হয়তো সিরাজ ভাই আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। আমরা তো কিছু জানাইনি।

বঙ্গবন্ধুকে রব আর শেখ শহীদের কথা বলতেই ঘরে ঢুকলেন বেগম মুজিব। দরজার আড়াল থেকে উনি হয়তো আমার কথা শুনছিলেন। বললেন, আমাদের মাইয়া-পোলারা যেন ইলেকশনে না দাঁড়ায়। নামের সঙ্গে শেখ আছে, এমন কেউ যেন ডাকসু ইলেকশন না করে।

ওনার কথায় মনে হলো বঙ্গবন্ধু কনভিন্সড। বললেন, 'ডাকসু ইলেকশন আমার জন্য একটা মাইলস্টোন। যে-ই দাঁড়াক, তাকে জিততে হবে। সামনে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ইলেকশন। ডাকসু ইলেকশনের দিকে সবাই তাকায়া আছে। আমি চাই ভিক্টোরি।'

আমরা যা বোঝার বুঝে নিলাম। ফিরে এসে আমরা ঠিক করলাম, রব হবে আমাদের ক্যান্ডিডেট। কিন্তু জিএস ক্যান্ডিডেট স্বপনকে নিয়ে অনেকের আপত্তি। ইকবাল হলের ক্যানটিনে বসে আছি। এমন সময় ওখানে হাজির হলেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। মঞ্জু ভাই ফজলুল হক হলের ভিপি ছিলেন। ডাকসাইটে নেতা। বললেন, 'দেখো, আমার হলের একটা ছেলে আছে, মাখন। তাকে জিএস নমিনেশন দাও। ও ভালো ক্যান্ডিডেট হবে।' এভাবেই আবদুল কুদ্দুস মাখন চলে আসে লাইমলাইটে। মাখন ক্যান্ডিডেট হওয়ায় মনি ভাইও খুশি।[৩৫]

## ২১

১৯৭০ সালে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হওয়ার পর প্রায় প্রতি রোববার ছুটির দিনে পল্টনে জনসভা হতো। প্রথম রোববার পড়েছিল ৪ জানুয়ারি। ওই দিন আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ সভা করেছিল। পরের রোববার ১১ জানুয়ারি ছিল আওয়ামী লীগের জনসভা। তার পরের রোববার ১৮ জানুয়ারি ছিল জামায়াতে ইসলামীর জনসভা। ওই দিন পল্টনে তুলকালাম হয়। সিরাজুল আলম খান আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, জামায়াতের সভা পণ্ড করে দিতে হবে। হয়েছিলও তাই। পরের রোববার ২৫ জানুয়ারি ছিল পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) সভা। সভাপতিত্ব করবেন নুরুল আমিন। ওই মিটিংয়েও হামলা করে তা বানচাল করে দেওয়া হয়েছিল। এসবের নাটের গুরু ছিলেন সিরাজুল আলম খান। পরে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলেছিলেন ছাত্রলীগের সংগঠক আবু করিমের সঙ্গে। তার কাছ থেকেই বিষয়টি শোনা। সিরাজুল আলম খানের অবশ্য এ ব্যাপারে রাখঢাক ছিল না। ঢাকায় জামায়াতকে আর নুরুল আমিনকে মিটিং করতে দেব না—এটাই ছিল

তাঁর কথা। তিনি এককথার মানুষ। আবু করিমের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম :

আবু করিম : সিরাজ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, ১৯৭০ সালে জামায়াতকে মিটিং করতে দিলেন না কেন? আসলেই কি জামায়াতের মিটিং ভেঙেছিলেন?

'হে, ইট ইজ মি।' সিরাজ ভাই নিজে এটা আমাকে বলেছে।

মহিউদ্দিন আহমদ : আমিও তো ছিলাম ওই মিটিংয়ে।

করিম : সিরাজ ভাই বলেছেন, 'ইট ইজ মি।' 'ইট ইজ মি' মানে পার্টি ডিসিশন না।

মহি : তাঁর ডিসিশনই তো?

করিম : উনি এটা কীভাবে অর্গানাইজ করেছেন, সেটাও বলেছেন আমাকে। ওনার কিছু পরিচিত লাকড়ি বিক্রেতাকে ভাড়া করেছেন। জামায়াত তো পল্টনে প্যান্ডেল-ট্যান্ডেল করেছে। এর বাইরে যে সলিমাবাদ রেস্টুরেন্ট, এর কর্মচারীরা সবাই হচ্ছে সিরাজুল আলম খানের চামচা। এরা পরে আমাদের বিনা পয়সায় খাওয়াত।

এই রেস্টুরেন্টে লাকড়ি লাগে দৈনিক দুই মণ বা তিন মণ। উনি অর্ডার দিয়েছেন ৩০০ মণ। ঘটনাটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? লাকড়ির একটা পাহাড় হয়ে গেছে সেখানে। তখন ছোট চিরকুটের মাধ্যমে ওনার যত ক্যাডার, যেমন আফতাব, মধু, বুলবুল, বদিউল, মাহবুব থেকে আরম্ভ করে, মানে তখনকার দিনে যারা যারা ছিল।

মহি : মানে 'গ্রুপের' লোকজন।

করিম : মানে লাকড়ির অভাব নাই। জামায়াত মিটিং আরম্ভ করেছে। মিটিংয়ের একপর্যায়ে ওরা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কী একটা সেন্টেন্স বলছে...জিব্বা টাইনা ছিঁড়া ফেল। এই যে পেটানো আরম্ভ করল। মুহূর্তের মধ্যে মিটিং রণক্ষেত্র।

মহি : ওই দিন দুজন নিহত, ৫০০ আহত।

করিম : মানে নিহত তো পত্রিকায় ওভাবে আসে নাই।

মহি : পত্রিকায় এভাবেই এসেছে, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭০।[৩৬]

## ২২

ছাত্রলীগের মধ্যে যে মেরুকরণ ঘটেছিল, তার একটা বিস্ফোরণ হয় ১৯৭০ সালের নভেম্বরে। ওই সময় 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' শিরোনামে

একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে হইচই বেধে যায়। নিউমার্কেটের কাছে বলাকা বিল্ডিংয়ের তিনতলায় ছাত্রলীগ অফিসে তখন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা চলছিল। সব জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সভা চলাকালে একপর্যায়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য স্বপন কুমার চৌধুরী প্রস্তাবটি তোলেন। প্রস্তাব সমর্থন করেন রাজশাহী নগর ছাত্রলীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম এ করিম। অধিকাংশ সদস্য এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রস্তাবের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন। এরপর বসে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। বৈঠকে প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক আ ফ ম মাহবুবুল হক। প্রস্তাবটি ছিল এ রকম :

> ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিকে স্বাধীনতার পথে একটি পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করে '৭০-এর নির্বাচনকে ক্ষমতা দখলের পর্যায়ভুক্ত না করে আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত করার জন্য এবং বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের মাধ্যমে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জনই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের লক্ষ্য।

প্রস্তাবটি তোলার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির বেশির ভাগ সদস্য এটি সমর্থন করলেও মাত্র ১৩ জন এর বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি হলো, এ প্রস্তাব অবাস্তব ও গঠনতন্ত্রবিরোধী। বিরোধিতাকারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী স্বয়ং। বিরোধিতাকারীদের মধ্যে আরও ছিলেন শেখ শহিদুল ইসলাম, সৈয়দ রেজাউর রহমান, আবদুল কুদ্দুস মাখন, ইসমত কাদির গামা, মনিরুল হক চৌধুরী, ওবায়দুল মুক্তাদির, শফিউল আলম প্রধান প্রমুখ। নূরে আলম সিদ্দিকী সভা মুলতবি করে সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যান। আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যান। মনিরুল ইসলামের (মার্শাল) সভাপতিত্বে সভা আবার শুরু হলে প্রস্তাবটি পাস হয়।[৩৭]

এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিরাজুল আলম খানের অনুসারীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন স্বপন কুমার চৌধুরী। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্বপন শহীদ হন। তাঁর সম্মানে তখন 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রস্তাবের উত্থাপক হিসেবে তাঁর নাম প্রচার করা হয়। বিষয়টি সবাই মেনে নেন।[৩৮]

একটি সিদ্ধান্ত পাওয়ার আশায় সবাই মিলে তখন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসায় যান। উত্তেজিত ছাত্রনেতাদের শান্ত করেন তিনি। বলেন, 'প্রস্তাব পাস করে স্বাধীনতা হয় না। গ্রামে যা, কাজ কর।'[৩৯]

প্রস্তাবের বিরোধিতাকারীরা যুক্তি হিসেবে ডিসেম্বরে (১৯৭০) অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচন ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা জানিয়েছিলেন এবং এই প্রস্তাবের পেছনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাঁদের আরেকটি বক্তব্য ছিল, 'স্বাধীনতার প্রশ্ন তখনই আসবে, যখন লিডার (শেখ মুজিব) আহ্বান জানাবেন।'[৪০]

উনসত্তরের আন্দোলনের সময় শেখ ফজলুল হক মনি জেল থেকে ছাড়া পান। তিনি ছাত্রলীগের মধ্যে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই ছাত্রলীগের মধ্যে দুটি ধারা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একটির কেন্দ্রে শেখ মনি এবং অন্যটির কেন্দ্রে সিরাজুল আলম খান। তাঁদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল খুবই চমৎকার, হৃদ্যতাপূর্ণ। কিন্তু তাঁদের অনুসারীরা মাঝেমধ্যে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ত। এর প্রভাব পড়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে। বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দুই ধারার অনুসারীরা দুটি প্যানেল দিয়ে নির্বাচন করতে শুরু করে। কোথাও কোথাও সমঝোতা হতো, কোথাও-বা আলাদা করেই তারা নির্বাচনে যেত।

'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রস্তাব নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যকার আদর্শগত বিভক্তি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ঢাকার জিন্নাহ কলেজের (পরে নাম হয় তিতুমীর কলেজ) ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ছাত্রলীগের দুটি প্যানেল হয়। সিরাজপন্থীদের প্যানেলে কুতুবউদ্দিন চৌধুরী ও আনিসুজ্জামান খোকনকে সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। অন্য উপদলটি আলী হোসেন ও মনজুর কাদেরকে সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন দেয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও নগর শাখার নেতাদের মধ্যে রাফিয়া আক্তার ডলি, শেখ কামাল, তাজুল ইসলাম প্রমুখ আলী-মনজুর প্যানেলকে সমর্থন দেন। অন্যদিকে কুতুব-আনিস প্যানেলের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেন স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজউদ্দৌলা। এ নিয়ে দুটি গ্রুপ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।[৪১]

একপর্যায়ে সিরাজউদ্দৌলা ট্রাকবোঝাই কর্মীসহ ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাসায় আসেন এবং নালিশ জানিয়ে বলেন, 'শেখ কামাল জিন্নাহ কলেজে এবং আমাদের এলাকায় বাড়াবাড়ি করছে।' এটা শুনে শেখ মুজিব ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'আমি কলেজে একটা প্যানেলই দেখতে চাই।' একটা আপসরফার জন্য তিনি শেখ মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও শাজাহান সিরাজকে দায়িত্ব দেন। দুই পক্ষের প্রতিনিধিরা রাতে এই চার নেতার সঙ্গে বৈঠকে বসে। এক পক্ষে শেখ কামাল, অন্য পক্ষে সিরাজউদ্দৌলা এবং জিন্নাহ কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমেদ। আবদুর রাজ্জাক সিরাজউদ্দৌলাকে বলেন, 'প্যানেল একটাই হবে। তোমরা সংসদের

নয়টা পোস্টের আটটা নাও, ওদের একটা ছেড়ে দাও, মনজুর কাদেরকে রাখো।' এভাবে একটা আপসের চেষ্টা হয়। তবে শেখ কামাল এটা মেনে নেননি। কুতুব-আনিস পরিষদের অনেক পোস্টার প্রতিপক্ষ পরিষদের ছেলেরা ছিঁড়ে ফেলে। কামাল উদ্দিন আহমেদের ভাষ্যমতে :

> আমি এবং তাদের পক্ষের ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন রাতে নীলক্ষেতে আনোয়ারা রেস্তোরাঁয় যাই। ওখানে তখন সিরাজুল আলম খান কাঁচা মরিচ মেখে ভাত খাচ্ছিলেন। ওই সময় এসে হাজির হন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক আ ফ ম মাহবুবুল হক এবং জিন্নাহ হলের (এখন সূর্য সেন হল) ছাত্রলীগ নেতা আফতাব আহমাদ। আফতাবের হাতে একটা হকিস্টিক। সেটা দোলাতে দোলাতে তিনি বললেন, 'দেয়ার ইজ নো কমপ্রোমাইজ ইন পলিটিকস।'
>
> পরদিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন। আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের আর সুযোগ ছিল না। আমি পুরানা পল্টনে *বাংলার বাণী* অফিসে মনি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমি বলি, পোস্টার-লিফলেট নষ্ট করে ফেলার কারণে অনেক বাড়তি খরচ হয়েছে। এটা দিতে হবে। মনি ভাই আমাকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'জিতে আয়, টাকা আমি দেব।'
>
> নির্বাচনে সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ আটটি পদে কুতুব-আনিস পরিষদের প্রার্থীরা জয়ী হয়। অন্য পক্ষের একমাত্র জয়ী প্রার্থী ছিল মাকসুদ। পরে সে-ও আমাদের এই পক্ষে চলে আসে। রাতে আমি আবারও *বাংলার বাণী* অফিসে গিয়ে মনি ভাইয়ের কাছে টাকা চাই। মনি ভাই জানতে চান, 'জিতছস?' আমি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলে মনি ভাই বলেন, 'দোস্তরে ডাক।' আমি ওপরতলায় আওয়ামী লীগ অফিস থেকে 'দোস্ত', অর্থাৎ সিরাজুল আলম খানকে ডেকে আনি। মনি ভাই সিরাজ ভাইকে বললেন, 'এরা কী বলে?' সিরাজ ভাইয়ের সোজা জবাব, 'তুমি বলছ টাকা দিবা, এখন দ্যাও।' মনি ভাই আমাকে পাঁচ শ টাকা দিলেন।[৪২]

## ২৩

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শেখ মুজিবের সঙ্গে ড. কামাল হোসেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। শেখ মুজিব সংবিধানসম্পর্কিত বিষয়ে

তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তাঁর মতামতের ওপর নির্ভর করতেন। সিরাজুল আলম খান সম্পর্কে তাঁর ধারণা বেশ ইতিবাচক। বিষয়টি বোঝার জন্য ২০১৯ সালের ৯ জুন আমি হাজির হলাম মতিঝিলে তাঁর চেম্বারে। নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হলো। সিরাজুল আলম খান প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি।

মহিউদ্দিন আহমদ : সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আপনার কখনো ওয়ান টু ওয়ান আলাপ হয়েছে?

কামাল হোসেন : ইদানীং হয়নি। দু-একবার বলেছি, ওর সঙ্গে তো একটু দেখা হওয়া দরকার।

মহি : আগে তো কথা হতো?

কামাল : অবশ্যই হতো। আপনি কারেক্ট লোকের নাম নিচ্ছেন। এখনো মনে করি, রিয়েলি যে রাজনীতি বোঝে, বাংলাদেশের যে রাজনীতি, হি ইজ পারহ্যাপস দ্য ওনলি ওয়ান। দ্বিতীয় কাউকে আমি মনে করি না। আমার নিজেরও আগ্রহ থাকে তাঁর সঙ্গে কথা বলার, এই কারণে।

মহি : উনি তো অনেক কিছুর মাস্টারমাইন্ড।

কামাল : অফ কোর্স। এটা হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।

মহি : উনি বলেন, 'আমি কখনো আওয়ামী লীগ করি নাই। বাট বঙ্গবন্ধু ইজ নট আওয়ামী লীগ। ওনার অবস্থান আলাদা, অনেক উঁচুতে।'

কামাল : ওয়ান্ডারফুল। এটা আমারও অবস্থান, হানড্রেড পার্সেন্ট।

মহি : ওনাকে কেমন দেখেছেন?

কামাল : উনি তো বঙ্গবন্ধুর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অনেক কাজ করতেন। সমন্বয়ের কাজ করতেন। ছাত্রদের মধ্যে ওনার অনেক প্রভাব ছিল। পাকিস্তানিদের সঙ্গে তাঁরা কোনো রকম আপস করার ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৪৩]

অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন সিরাজুল আলম খান। এঁরা অনেকেই ছিলেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে। আবার কেউ কেউ ছিটকে পড়েছিলেন আওয়ামী বৃত্ত থেকে। সাংগঠনিক কাজে তিনি ছিলেন একরোখা। পেশিশক্তির ব্যবহারে কার্পণ্য করতেন না। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল অদ্ভুত ধরনের একটি বলয়। এ নিয়ে আমরা কথা বলেছি। তিনি বলেছেন তাঁর কথা।

মহি : অনেক সময় মনে হয়, আপনি খুব অ্যাগ্রেসিভ পলিটিকস

করেছেন। আবার ঠান্ডা মাথার লোকদের সঙ্গেও আপনার বেশ ওঠবস। কীভাবে ব্যালান্স করেন?

সিরাজ : অলি আহাদ আমাকে ভীষণ পছন্দ করতেন। ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টে তো হি ওয়াজ দ্য মেইন ম্যান। '৯২ সালে আমি যখন অসুস্থ, অপারেশন হলো স্পাইনাল কর্ডে, অলি আহাদ ভাই দেখতে এসেছিলেন। আউট অব দ্য ওয়ে। শেখ সাহেবের জন্য এঁরা রাজনীতিতে থাকতে পারলেন না। এটা কি তাঁর নিজস্ব কারণে, নাকি সুদূরপ্রসারী একটা চিন্তা আছে তাঁর মাথায়, সে কারণে; সেটা আমি এখনো বের করতে পারিনি। আমি '৪৮, '৫৪, '৫৫ সালের কথা বলছি।

আমরাও অ্যাগ্রেসিভ ছিলাম। স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা যে কাজ করেছি, এ কাজে যদি কেউ হ্যাম্পার করে, নির্মম হতে পারতাম, মারপিট করে কেউ দাঁড়াতে পারত না। এ রকম একটা শক্তি ছিল। বিশেষ করে, মিছিলগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে। ওদের স্লোগান ছিল জয় সর্বহারা, আমাদের হলো জয় বাংলা। ওদের হলো শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধরো, আমাদের হলো বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো। একটা হলো ক্ল্যাসিক মুভমেন্ট অব সমাজতন্ত্র, আরেকটা হলো ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট। এগুলো এস্টাবলিশ করতে কত-কী যে করেছি! এবং (কামরুল আলম খান) খসরু আর (মোস্তফা মোহসীন) মন্টুর অবদান অসম্ভব! এরা তো ১৯৬২ সাল থেকে আমার সঙ্গে। আর এই মুভমেন্টগুলোর সুযোগে ছাত্রলীগ থেকে বিরাট বাহিনী বের করে নেওয়া হয়েছিল আন্ডার দেয়ার কমান্ড।

কামালউদ্দিন ফিরু। কী ডেয়ারিং! খসরুর সামনে কেউ দাঁড়াবে! আনথিংকেবল! যেভাবে তার গ্যাংগুলোকে সে অর্গানাইজ করত! তার আন্ডারে ঢাকায় আমাদের মিনিমাম একেবারে হেলেফেলে হলেও ৬০ জন-আপ টু ওয়ান হানড্রেড স্ট্যান্ডবাই থাকত। হল-বেসিস, কলেজ-বেসিস, পাড়া-বেসিস। আমাদের খুব বেশি পয়সা খরচ করতে হতো না। মিনিমাম কস্ট। সবাই তো যার যার বাড়িতে থাকত। হলে যারা আছে, তাদের বাপ তো বাড়ি থেকে টাকা পাঠায়। সে জন্য বেশি পয়সা লাগত না। খসরু একজনই। মহিউদ্দিন একটু ভীরু ছিল। ফিরু ছিল খুব সাহসী। ও প্রথমে এনএসএফের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

মহি : পরে নিউট্রাল করেছেন।

সিরাজ : পরে তো খসরু-মন্টু-ফিরু-মহিউদ্দিন।[৪৪]

## ২৪

ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় জন্ম নেওয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ১৪ সদস্যের প্রথম যে আহ্বায়ক কমিটি তৈরি হয়েছিল, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন শেখ মুজিব। নঈমুদ্দীন আহমদ ছিলেন আহ্বায়ক। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে ছাত্ররাজনীতি থেকে সরে যান। ইতিমধ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ছাত্রলীগকে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন হিসেবে দেখা হলেও এর সঙ্গে শেখ মুজিবের সব সময় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ছাত্রলীগ নেতারা আলোচনা-পরামর্শের জন্য শেখ মুজিবের কাছেই যেতেন। অন্য আওয়ামী লীগ নেতাদের তেমন গুরুত্ব ছিল না ছাত্রলীগে। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্থান ও জাতীয় নেতা হওয়ার পেছনে ছাত্রলীগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বলা চলে, ছাত্রলীগ ছিল শেখ মুজিবের শক্তির ভিত্তি।

১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে ছাত্রলীগে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের একজন হলেন আমির হোসেন আমু। ছাত্রলীগে শেখ মুজিবের ভূমিকা, ছাত্রলীগের মধ্যকার দলাদলি ও রসায়ন, মনি-সিরাজের দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে মন খুলে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনি ২০১৯ সালের ৪ জুন। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

> মহিউদ্দিন আহমদ : কীভাবে এলেন ছাত্রলীগে?
>
> আমির হোসেন আমু : ১৯৫৭ সালে ঢাকার মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন হয়। আমি ছিলাম অন্য লাইনের লোক। অন্যভাবে আমার নামডাক ছিল। আমাদের তো পলিটিক্যাল ফ্যামিলি। যখন আওয়ামী লীগ হয় বরিশালে, এর অ্যাডহক কমিটির ১৯ জন ছিল আমাদের ফ্যামিলির। ওই সময় ন্যাপ হইতেছে। ন্যাপ ভাঙা, পিটাপিটি করা—ওই সময় আমি একটু ফোকাসে আসলাম। হঠাৎ মঞ্জু ভাই চিঠি লেখছে, 'তুমি তোমার পছন্দমতো ৩৫ জন কাউন্সিলর নিয়া সন্ধ্যাবেলা ঢাকায় হাজির হও।'
>
> মহি : নুরুল ইসলাম মঞ্জু?
>
> আমু : হ্যাঁ। আমি চিঠির অর্থ বুঝলাম। ছাত্রলীগ হব, কিন্তু মাকু হইতে হবে। আমার পছন্দমতো লোকজন না নিয়া গেলে গোলমাল

হবে। তাঁর ভাই হিরু ছিল আমার ফ্রেন্ড। তারে বললাম, দোস্ত, তোমার ভাই যা লেখছে, তার অর্থ তো এই। বলল, 'লইয়া লও।' তো আমার পছন্দমতো ৩৫ জনকে পকেটে লইয়া ঢাকায় এলাম, লঞ্চে। যখন নামলাম, তহন দেহি দুইটা বাস। একদল কয় এইটায় ওঠেন, আরেক দল কয় এইটায় ওঠেন। মহা মুশকিল!

মহি : এটা কোন ইয়ারে?

আমু : ফিফটি সেভেন। বললাম, মঞ্জু ভাই পাঠাইছে।

এই বাসে ওঠেন।

উঠলাম। আগামসিহ লেনে একটা জমিদারবাড়ি ছিল, সাদা দালান দুইটা। আমাগো ওই জায়গায় রাখল। এহানে শুনলাম আউয়াল সাব (এম এ আউয়াল) প্রেসিডেন্ট, মঞ্জু ভাই (নুরুল ইসলাম মঞ্জু) সেক্রেটারি। এই হইল একটা প্যানেল। আরেকটা প্যানেল হইল রফিকুল্লাহ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট, পাবনার আজহার আলী সেক্রেটারি। আমরা তো মঞ্জু ভাইয়ের লোক, মঞ্জু ভাই হইল বরিশালে আমাগো নেতা।

মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে আমি একেবারে ফার্স্ট রোতে বসা। পাশে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে পা তুইলা বইসা আছি। প্রথম থিকাই গুনগুন আন্দোলন, মানে গোলমাল—আউয়াল সাবকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া যাবে না। কেন? আউয়াল সাব বক্তৃতা দিলে হাউস কন্ট্রোল হইয়া যাবে। উনি খুব ভালো বক্তা। পপুলার ছাত্রনেতা তখন, ছাত্রলীগের সেক্রেটারি তিনি। প্রেসিডেন্ট মোমিন তালুকদার, ভালো বক্তৃতা দিতে পারে না। আউয়াল সাব ছিল একক নেতা। এন্টায়ার হাউস তার পক্ষে। চেয়ারটা টান দিয়া তুইলা ছুইড়া মারলাম। ওইটা গিয়া পড়ছে ময়মনসিংহের উপরে। আমার পেছনে ছিল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ। স্লোগান উঠল—ঢাকা-নারায়ণগঞ্জওয়ালারা ময়মনসিংরে মারে, এইটা হইতে দেওয়া যাবে না। আমরা হইচই করতেছি। এর মধ্যে আউয়াল সাব বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। কিন্তু পারে নাই। আমারে একটা টেবিলের ওপর দাঁড়া করায়া দিল—যা, বক্তৃতা দে । যহন বক্তৃতা শুরু করছি, হঠাৎ দেহি পেছনে একটা হাত—কাজী গোলাম মাহবুব, বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি। আমারে কয় :

নাম।

নামলাম। সামনে দেহি একটা গাড়ি।

ওঠ।

উঠলাম। নিয়া গেল বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। সেহানে দেহি আরেকজন বসা। বলল, আউয়াল সাবের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। বঙ্গবন্ধু বলল, 'তোর দোষ কী। তুই তো নিজের ইচ্ছায় আসছ নাই। ও তো মঞ্জুর দলের লোক। মঞ্জুকেই সাপোর্ট করবে।'

আমি একটু কনফিউজড হইলাম। কী করব? এহানে লইয়া আইল। এরা কী আলাপ করে?

বঙ্গবন্ধু বলল, 'মাহবুব, ওর সঙ্গে কথা কও।'

মাহবুব ভাই কইল, 'রফিকুল্লাহ চৌধুরী আর আজহার হইল আমাদের প্যানেল। এর পক্ষে থাকবি। ওরা যদি বাইর হইয়া যায়, যাক। মঞ্জুরে গিয়া বোঝা। আমরা তারে ভাইস প্রেসিডেন্ট করব।'

মঞ্জুরে আমি কী বোঝাব? আইলাম এক রকম, আর শুনলাম আরেক রকম। আমার তো মাথা খারাপ হইয়া গেছে। মঞ্জু হইল বরিশালের মূল।

বঙ্গবন্ধুর কথার বাইরে আমি যাব নাকি? আমারে তো আগে জানাইতে হবে। আমি তো মঞ্জু ভাইয়ের চিঠি পাইয়া আমার লোক লইয়া আইছি।

নোয়াখালীর কচি ভাই তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্রলীগের সেক্রেটারি। টিক্কিওয়ালা পাঞ্জাবি পরছে। কে যেন টিক্কি ধইরা টান দিছে। ছিঁড়া গেছে। সে ছিল খুব ঠান্ডা স্বভাবের। কয়, 'দেখ দেখ।' আমি তো অবাক।

যা-ই হোক, মূল প্যানেল হইল—রফিকুল্লাহ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট, আজহার আলী সেক্রেটারি, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। এই প্যানেল পাস। এদের কথা ছিল, চাইর বছরের বেশি কেউ থাকতে পারবে না। মোমিন তালুকদার প্রেসিডেন্ট আর আউয়াল সাব সেক্রেটারি—এরা চাইর বছর ছিল।

তহন মঞ্জু ভাই এক্সপেলড হইল। আমি একটা পোলাপান মানুষ। আমারে একটা মেম্বার কইরা দিল, সেন্ট্রাল কমিটির। বরিশাল ঠিক রাখার জন্য—মঞ্জুর বদলে আমুরে ঢুকায়া দাও।

মহি : তাহলে সিরাজুল আলম খানের আগেই আপনি সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার?

আমু : হইছি তো।

মহি : শেখ ফজলুল হক মনিরও আগে?

আমু : হ। আমি মনিরে বরিশাল বিএম কলেজে লইয়া গেছি। সে তহন জগন্নাথ কলেজে আইএ পরীক্ষা দেয়। সেইখানে কী

একটা ঝামেলা হইছিল। আমি কইলাম, তুমি বরিশালে আসো, বিএম কলেজে আসো। এই কথা কইয়া তারে লইয়া গেলাম বরিশালে। বিএম কলেজে ভর্তি করাইলাম। সেখান থিকা সে বিএ পাস করছে।

মহি : আপনি তো অনেক সিনিয়র? আপনি তো একেবারে ছায়ার মধ্যে পড়ে গেছেন?

আমু : ওই যে, বরিশালে থাকার কারণে।

বঙ্গবন্ধু '৬১ সালে আমাদের ডাইকা বলছিলেন, আরও অনেকরে ডাকছিলেন। বরিশাল থিকা আমারে দুইটা কারণে ডাকছে। একটা হইল, এন্টায়ার খুলনা-বরিশাল অঞ্চলটা—আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হইছিল। ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে গোলমাল। আমি ছাত্র ইউনিয়নের সাতজনকে পিটায়া বরিশাল থিকা বাইর কইরা দিছিলাম। উনি বললেন, 'ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে প্রবলেম মিটায়া ফেলতে হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হইছে, ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন মিলায়া... গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের জন্য সোহরাওয়ার্দী একটা প্রেস কনফারেন্স করবে, ওইটার পক্ষে এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হবে। মানিক ভাই (তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া) ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস লেখবে।'

এইটা ফ্যাক্ট। বাষট্টি সালে যখন মুভমেন্ট আরম্ভ হয়, তখনই কিন্তু বিএলএফের লিফলেট—তোমরা পাইছ কি না, জানি না। দ্যাট ওয়াজ সার্কুলেটেড ফ্রম এস এম হল বাই শেখ মনি।

মহি : মোয়াজ্জেম ভাই একটা লিফলেটের কথা বলেছেন। এটা কি একষট্টি সালে?

আমু : আই গট ইট ইন সিক্সটি টু।

মহি : পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্ট?

আমু : বিএলএফ। এই যে নিউক্লিয়াসের কথা কয়, এদের জন্ম হইছে কখন?

মহি : লিফলেটটা কি ইংরেজিতে ছিল?

আমু : না না, বাংলায়।

মহি : সিরাজ ভাইরা যে নিউক্লিয়াসের কথা বলেন...

আমু : এইটা ঠিক না। জিনিসটা হইল কি—যখন ছয় দফা দেয়, তার আগে। ছাত্রলীগে বাকী-রাজ্জাকের (মাজহারুল হক বাকী সভাপতি, আবদুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক) ক্যাবিনেট

হইল ব্ল্যাকআউটের মধ্যে। পরের দিন আমরা ঠিক করলাম, এই কমিটির বাকী, রাজ্জাক আর আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করব। আমি ছিলাম অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ক্যান্ডিডেট। তখন নোয়াখালীর খালেদ মোহাম্মদ আলী অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হওয়ার জন্য ফিট পইড়া গেল। থাক তুই অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, আমি পাবলিসিটি সেক্রেটারি। আমার কী। আমি তো বরিশালে থাহি। তহন অবশ্য ম্যাক্সিমাম টাইম ঢাকায় থাকতাম, ইকবাল হলে। এমএ ফার্স্ট পার্ট পর্যন্ত পড়ছি। যা-ই হোক, আমরা ঠিক করলাম, বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব। সকালে আইসা দেহি, বাকী আর রাজ্জাক গাইল খাইতেছে। জমির আলী আর হায়দার আকবর খান রনো, এই দুই গ্রুপ, এনএসএফ আর আলট্রা লেফট। বলতেছে, ভারতের দালাল, আওয়ামী লীগ কোনো স্টেটমেন্ট দেয় না। *ইত্তেফাক*-এর কোনো ভূমিকা নাই, কোনো নিউজ নাই যুদ্ধের ব্যাপারে।

মহি: পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো স্টেটমেন্ট দেয় নাই?

আমু: হ। আমার অ্যাডভানটেজটা হইল, এনএসএফের যারা মাকু, তারা বেশির ভাগই বরিশালের। সাইদুর-পাচপাত্তু—এরা আমার শিষ্য। এরা বরিশালে যাইয়া ছাত্রলীগ করত, এহানে এনএসএফ করে। জমির আলীর সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল আলতাফের মাধ্যমে। আলতাফ বরিশালের স্পোর্টসম্যান। জমির আলী আমারে কয়:

বস?

আরে যা ব্যাটা।

ওদের দুজনরে বাইর কইরা নিয়া আইলাম। গেলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে। বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার বলে নাই। তবে বলছে যে, 'আইজকা তোমরা গালি খাও। কিছুদিনের মধ্যে আমি একটা জিনিস দেব, তোমরা ফুলের মালা পাবা।' বললাম, ফুলের মালা পাওয়ার আগপর্যন্ত আমাদের যদি ইউনিভার্সিটিতে যাইতে হয়, তাইলে আপনাগো কিছু কইতে হবে, যুদ্ধের ব্যাপারে। কিছু লিখতে হবে।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর বঙ্গবন্ধু বিরক্ত হইয়া গেল। 'ঠিক আছে। একটা পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আছে, ওরে দিয়া একটা স্টেটমেন্ট দেওয়াই।' উনি তহন শাহ আজিজুর রহমানরে ফোন করল। শাহ আজিজ হইল আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট,

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের উপনেতা। শাহ আজিজরে বলল, 'তুমি একটা স্টেটমেন্ট দাও।' একটা ফয়সালা করল বঙ্গবন্ধু। '*ইত্তেফাক*-এর ব্যাপারে মানিক ভাইয়ের কাছে যাও।' গেলাম মানিক ভাইয়ের কাছে। উনি তো হুঁকা খায় আর কথা কয়। 'আমি কিছু জানি না, মজিবর মিয়া জানে। উনি যেভাবে বলতে আছে, '৬২ সাল থিকা সেইভাবে লেখতে আছি।'

আমির হোসেন আমু

মানিক ভাইয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। উনি বঙ্গবন্ধুরে ফোন করলেন। কী কইছে, তা তো জানি না। আমাদের কইল, 'যান আপনারা।' আমরা আইসা পড়লাম। পরের দিন *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় লাস্টে এক কলামে একটা ছোট্ট নিউজ দিছিল, যুদ্ধের ব্যাপারে।

মহি : সিরাজ ভাইয়ের নিউক্লিয়াসের ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

আমু : সে যেটা করত, সে ছাত্রলীগে একটা গ্রুপ করত। নিজস্ব একটা বাহিনী—ইনফ্লুয়েন্স রাখার জন্য। সে হলে থাকত। যাতে সে এইভাবে থাকতে পারে এবং ছাত্রলীগে তার একটা প্রভাব থাকে, এ জন্য সে একটা গ্রুপ মেইনটেইন করত।

মহি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি তো তাঁর লয়্যালটি ছিল?

আমু : লয়্যালটি ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নাই।

মহি : শেখ মুজিবের খুব কনফিডেন্সের লোকও তো ছিল?

আমু : ছিল। এখন ক্ল্যাশ যেটা হইছে, এটা ইন্টারনাল। কোল্ড ওয়ারের মতো, বহিঃপ্রকাশ নাই। মনি আর সিরাজ—দুজনে খুব বন্ধুত্ব। বাট ভেতরে-ভেতরে ভীষণ অমিল। সিরাজুল আলম খান যখন সেক্রেটারি হয়, মনি কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত অপোজ করছে—এটা পাকিস্তান মাঠে, ১৯৬৩ সালে। আমি মনিরে জিগাইলাম—ধুর মিয়া, তোমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাখো। ও আমার বন্ধু। ও কেন মোয়াজ্জেম ভাইয়ের ক্যান্ডিডেট হইল? ওরে একটু নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছি।[৪৫]

## ২৫

ছাত্রলীগের মধ্যে দুটি গ্রুপ ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্য সংগঠনগুলোর কাছেও এটা ধরা পড়ত। এটা কি শুধুই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, নাকি এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণও ছিল, যা তাদের মধ্যে বিভাজনটি আরও স্পষ্ট করে তোলে? এ নিয়ে ২০১৯ সালের ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর খোলামেলা কথা হয় তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে। তিনি তখন ছাত্রলীগের মধ্যে উদীয়মান সূর্য। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন এখানে তুলে ধরছি :

মহিউদ্দিন আহমদ : ছাত্রলীগের মধ্যে তো দুটি গ্রুপ ছিল?

তোফায়েল আহমেদ : সিরাজ ভাই যে নিউক্লিয়াসের কথা বলে, আমি তো এর মেম্বার না। আমি এ সম্পর্কে জানিও না। মনি ভাইও এর মেম্বার না। আমরা বাষট্টিতে যখন বিএম কলেজে পড়ি, তখন মনি ভাই একটা লিফলেট লেখছে, সাংঘাতিক! সেই লিফলেটের মধ্যে স্বাধীনতার কথা ছিল। এই লিফলেট জেলায় জেলায় পৌঁছছে। যে লোকটা স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তিনি নিউক্লিয়াসে নাই। আছে কাজী আরেফ। সে তো তখন কলেজে পড়ে, জগন্নাথে। হয়তো ইন্টারমিডিয়েট পড়ে বা কিছু একটা।

সিরাজ ভাইয়ের তো কাজ ছিল দিনে ঘুমানো আর রাতে কাজ করা। রাজ্জাক ভাই, সিরাজ ভাই বা আরেফ যা করছে, আমি তাদের অবদানকে অস্বীকার করি না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। নর আই ওয়াজ মেম্বার অব দ্যাট।

মহিউদ্দিন : আপনি ডাকসুর ভিপি হলেন কোন ইয়ারে?

তোফায়েল : সিক্সটি এইটের ১৭ জানুয়ারি। ইকবাল হলের ভিপি থেকে ডাকসুর ভিপি। হলো কি, আমার ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না, ইকবাল হলের ভিপি। চাকরি করার জন্য বাড়ি থেকে বারবার তাগাদা দিচ্ছে। ইন দ্য মিন টাইম, ইকবাল হলের কোটায় ভিপি আসল। আগে কিন্তু হলে হলে ডাকসু ভিপি আসত। এ বছর এই হলে।

মহিউদ্দিন : বাই রোটেশন।

তোফায়েল : বাই রোটেশন, ইনডাইরেক্ট ইলেকশন। আগে মেম্বার হয়ে তারপর ভিপি। ওইবার ছিল ইকবাল হলের টার্ম। আই অ্যাম দ্য লাকিয়েস্ট ম্যান অব দ্য কান্ট্রি!

আমি ওই দিন ভিপি হলাম, যেদিন বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার করল। ১৭ জানুয়ারি রাত, ১৮ জানুয়ারি প্রথম

প্রহরে। আমি ভিপি হওয়ার পর উনি আমাকে চিঠি দিল, স্নেহের তোফায়েল, তুই ডাকসুর ভিপি হয়েছিস। কারাগারে বসে খবর পেয়ে...। সামাদ নামে জেলখানার এক কনস্টেবল চিঠিটা আমাকে পৌঁছে দিল। ওই রাতেই বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেটে আবার গ্রেপ্তার করে।

মহিউদ্দিন : তখন ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেল।

তোফায়েল : হ্যাঁ। প্রথম ছয় মাস আমরা জানতামও না উনি কোথায় আছেন। আটষট্টি সালের ১৯ জুন ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হলো। তখনই আমরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। আমার লাক আমাকে কীভাবে ফেবার করেছে? আটষট্টির শেষে ডাকসু ইলেকশন হবে। ডাকসুর মেয়াদ শেষ। ইলেকশনের ডেট হয়ে গেছে। ইন দ্য মিন টাইম, পাচপাত্তুকে এস এম হলে মার্ডার করল। সে থাকত এফ এইচ হলে। খোকা-পাচপাত্তু দুই নাম একসঙ্গে জড়িত, যেমন রাজ্জাক-তোফায়েল, মনি-সিরাজ—এই রকম। পাচপাত্তু মার্ডার হওয়ার ফলে ইউনিভার্সিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ইলেকশন স্থগিত হয়ে গেল। আমি ডাকসুর ভিপি রয়ে গেলাম। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারির ১ তারিখ ইউনিভার্সিটিতে কালো পতাকা ওড়ালাম আমি এবং ডাকসুর জিএস নাজিম কামরান চৌধুরী।

আটষট্টি সালে আমি হলাম ইকবাল হলের মেম্বার। এটারও একটা ইতিহাস আছে। আমি তো ছাত্র না। আমি তো মেম্বার হতে পারব না। আমি গেলাম ভিসি ওসমান গণির কাছে। ড. ওসমান গণির কারণেই আমি তোফায়েল আহমেদ হয়েছি। আমি গেলাম ওনার কাছে। স্যার, ইলেকশন আসছে। আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাই।

এখন তো ভর্তির সময় নাই। তোমাকে ভর্তি করলে তো পার্সেন্টেজ-উপস্থিতি কাউন্ট হবে না।

স্যার, এইবার ইকবাল হল থেকে ডাকসুর ভিপি হবে। আপনি যদি আমাকে ভর্তি করান, তাহলে আমি মেম্বার হয়ে পরে ডাকসুর ভিপি হতে পারি।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে কাগজে সাইন দিয়ে আমাকে ভর্তি করে দিলেন লাইব্রেরি সায়েন্সে। তখন হল সংসদে আমি মেম্বার হলাম। আর হলো মাহবুবুল হুদা ভূঁইয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাড়ি। আমরা দুজন ক্যান্ডিডেট। ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ফেরদৌস কোরেশী আমাকে সাপোর্ট করল। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং অন্যান্য হলের যারা মেম্বার হয়েছে, আই ওয়াজ সাপোর্টেড বাই দেম। আমি ১৭

জানুয়ারি ১৯৬৮ ভিপি হলাম। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে ইলেকশন না হওয়ায় আই কন্টিনিউড।

আমি ডাকসুর সহসভাপতি, পরের বছর ছাত্রলীগের সভাপতি। আমি নিউক্লিয়াসের মেম্বার না। আমি এটা সম্বন্ধে জানিও না।

মহিউদ্দিন : গ্রুপিং তো একটা ছিল। সত্তর সালে তো এটা আমি দেখেছি।

তোফায়েল : কী দেখেছ? আমি কখনো গ্রুপিং করি নাই। এখনো করি না। সিরাজ ভাইকে আমি যে চোখে দেখতাম...এই কথা সত্য, এটা আমি স্বীকার করি, আমি কবরে যাওয়ার সময়ও স্বীকার করব, সিক্সটি নাইনের আন্দোলনের সময় রাজ্জাক ভাই গ্রেপ্তার, মনি ভাই গ্রেপ্তার। সবাই বন্দী। সিরাজ ভাই গ্রেপ্তার না। তিনি আমাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে আন্দোলনের সময় আমাকে সাহায্য করেছেন। এটা আমি কোনো দিন অস্বীকার করব না।

মহিউদ্দিন : আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনি কোনো গ্রুপিংয়ে নাই, ওই সময় আমি যেটা দেখেছি—এই যে স্বপন চৌধুরী, রব, আ ফ ম মাহবুবুল হক, মার্শাল মনি, আম্বিয়া—এরা তো একসঙ্গে—ওই গ্রুপিংটা তো ছিল?

তোফায়েল : একটা হলো রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে গ্রুপিং। তোমার এক মত, আমার এক মত। আরেকটা হলো নেতৃত্বের জন্য গ্রুপিং। এটা তো ছাত্রলীগে সব সময় ছিল। রাজ্জাক ভাই যখন জেনারেল সেক্রেটারি হলো, আমরা তো রাজ্জাক ভাইকে প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট করলাম। ফেরদৌস কোরেশীও প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট। পরে কম্প্রোমাইজ হলো, ফেরদৌস কোরেশী প্রেসিডেন্ট, রাজ্জাক ভাই জেনারেল সেক্রেটারি। এ ধরনের গ্রুপিং তো সব সময় ছিল। যেমন আমার সঙ্গে নূরে আলম সিদ্দিকীর গ্রুপিং ছিল। আমি যে ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হলাম ১৯৬৯ সালে, আমাদের সময় সিস্টেম ছিল প্রতিবছর ২১ মার্চ ছাত্রলীগের সম্মেলন করতে হবে। তুমি যদি করতে না পারো, তিন সদস্যবিশিষ্ট একটা কমিটির কাছে ছাত্রলীগের ক্ষমতা চলে যাবে। এই যে ড. মোশাররফ, এখন বিএনপি করে, সে-ও তিন সদস্যের একজন ছিল। সম্মেলন হলো জুন মাসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। তখন বঙ্গবন্ধু সম্মেলনে যেতেন না। এইখানে তো মারাত্মক গ্রুপিং। নূরে আলম সিদ্দিকী হলো ফেরদৌস কোরেশীর লোক। আর আমি হলাম মনি ভাই, সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, তাদের লোক। আমি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ইন্টারেস্টেড ছিলাম না। কিন্তু মনি

ভাই, সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই—তারা ঠিক করছে—তোফায়েল প্রেসিডেন্ট। আমি কন্ডিশন দিলাম, আমাকে প্রেসিডেন্ট করলে রবকে সেক্রেটারি করতে হবে। নূরে আলম সিদ্দিকীর জিএস ক্যান্ডিডেট হলো নেত্রকোনার মান্নান। তখন সাবজেক্ট কমিটি বসল। এই কমিটিতে আছে প্রতিটি জেলার প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি আর ওয়ার্কিং কমিটির সব মেম্বার। আমি পেলাম ৯৬ ভোট, নূরে আলম সিদ্দিকী পেল ২৩ ভোট। অর্থাৎ আমার সঙ্গে ভোট করে নূরে আলম সিদ্দিকী পরাজিত হলো। ফেরদৌস কোরেশী ছাত্রলীগ ভেঙে দিল। আল মুজাহিদীকে প্রেসিডেন্ট আর মান্নানকে জেনারেল সেক্রেটারি করল। নূরে আলম সিদ্দিকী ওই দিকে গেল না। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৭০ সালে সে প্রেসিডেন্ট হলো। ইকবাল হলে ২১ মার্চ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ওইখানে সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটা ভুল-বোঝাবুঝি হলো। আমি মনিরুল হক চৌধুরীকে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি করতে চাইলাম। সিরাজ ভাই চাইল স্বপনকে করতে। কিন্তু আমারটাই হলো। এই প্রথম সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হলো। সিরাজ ভাই অসন্তুষ্ট হলো। তুমি এইটাকে যদি গ্রুপিং ধরো, তাহলে ঠিক আছে।

মহি: ১৯৭০ সালে শেখ শহীদ কি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট ছিল? তার নামে কিন্তু স্লোগান হয়েছিল।

তোফায়েল: ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি কে হবে, এটা বঙ্গবন্ধু কোনো দিন বলে দিত না। এটা ফার্স্ট টাইম ইন হিজ লাইফ। নূরে আলম সিদ্দিকী প্রেসিডেন্ট হতে পারত না। যে কেউ দাঁড়ালে সে-ই হতো। বঙ্গবন্ধু বলছে, 'আমারে খুব ডিস্টার্ব করে। এইবার ওরে বানায়া দে।' নূরে আলম সিদ্দিকী প্রেসিডেন্ট হলো, শাজাহান সিরাজ জেনারেল সেক্রেটারি হলো। মনিরুল হক চৌধুরী হলো অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। এইটাকে যদি তুমি গ্রুপিং বলো, সেটা আলাদা। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো গ্রুপিং ছিল না। এটাকে অনেকে বলে গ্রুপিং, যে অমুকে অমুকে স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না—এইটা বেজলেস। ছাত্রলীগে গ্রুপিং তো ছিলই।[৪৬]

## ২৬

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের আছে একটি বিস্তৃত পটভূমি। বিভিন্ন সময়ে এ লক্ষ্যে নানান উদ্যোগের কথা জানা যায়। অনুসন্ধানী গবেষণা যত বেশি

হবে, ততই এর গভীরে যাওয়া যাবে, জানা যাবে এর পেছনের মানুষগুলোর স্বপ্ন, লড়াই আর তিতিক্ষার কথা।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ওপর অনেক বাঙালির আস্থায় চিড় ধরেছিল। এমনকি যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে হাঁটতেন, তাঁদেরও কারও কারও মধ্যে। ঘটনাপরম্পরায় দেখা যায়, ওই সময় থেকেই আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নানামুখী উদ্যোগ ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনুসারীরা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে থাকলেও সেখানে একাধিক স্রোতোধারার সন্ধান পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ তখন অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যে প্রচার করার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। এমনকি গোপন প্রচারের পক্ষেও জোরালো কোনো প্রবণতা দৃশ্যমান হয়নি। কিছু কিছু সাহসী তরুণ এ লক্ষ্যে কাজ করতেন গোপনে, সতর্কতার সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে কেবল একটি প্রক্রিয়া বহমান ছিল, এমনটি বলা যাবে না। এ হলো নদীর জলধারার মতো। একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগ নেই। যেমন তিতাস জানে না তিস্তার কথা, কংস জানে না কুমারের কথা। জানাজানি হয় তখনই, যখন তারা এক মোহনায় মেশে।

দেখা যাচ্ছে, অনেক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। অথবা তাঁকে অবলম্বন করেই আবর্তিত হয়েছে একাধিক ধারা। এই পরিক্রমার একটি সুনির্দিষ্ট মাইলফলক হলো ছয় দফা, যা ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঝোড়ো হাওয়ার সূচনা করেছিল। তারপর শুধুই এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু পথটি সহজ ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য এ প্রক্রিয়াগুলোর সুলুকসন্ধান খুবই জরুরি। সিরাজুল আলম খানের 'নিউক্লিয়াস' তেমনই একটি উদ্যোগ। এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. সিরাজুল আলম খান
২. আহমদ, কামরুদ্দীন (২০১৮), *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪২০-৪২১
৩. রনো, হায়দার আকবর খান (২০০৫), *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৪-৩৮

৪. পঙ্কজ ভট্টাচার্য
৫. মোস্তফা মোহসীন মন্টু
৬. সিরাজুল আলম খান
৭. মাহবুব তালুকদার
৮. সিরাজুল আলম খান
৯. শামসুজ্জামান খান
১০. সিরাজুল আলম খান
১১. তোফায়েল আহমেদ
১২. আহমদ, কামরুদ্দীন (১৯৮২), *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর,* নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ৬৮-৬৯
১৩. সিরাজুল আলম খান
১৪. এস এম ইউসুফ
১৫. সিরাজুল আলম খান
১৬. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন
১৭. সিরাজুল আলম খান
১৮. তোফায়েল আহমেদ
১৯. মোস্তফা মোহসীন মন্টু
২০. সিরাজুল আলম খান
২১. আহমদ (১৯৮২), পৃ. ১০৩-১০৪
২২. সিরাজুল আলম খান
২৩. ওই
২৪. আহমদ (১৯৮২), পৃ. ৭১-৭৪
২৫. কামাল উদ্দিন আহমেদ
২৬. বদিউল আলম
২৭. সাইদুর রহমান
২৮. আহমদ (১৯৮২), পৃ. ৭৯
২৯. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব (২০১৫), *নবজাগরণের নায়করা,* পত্রভারতী, কলকাতা, পৃ. ২৯৫
৩০. সিরাজুল আলম খান
৩১. শরীফ নুরুল আম্বিয়া
৩২. সিরাজুল আলম খান
৩৩. লেখকের স্মৃতি থেকে
৩৪. সিরাজুল আলম খান
৩৫. মো. কামালউদ্দিন

৩৬. আবু করিম
৩৭. বদিউল আলম
৩৮. ওই
৩৯. ওই
৪০. সৈয়দ রেজাউর রহমান
৪১. কামাল উদ্দিন আহমেদ
৪২. ওই
৪৩. ড. কামাল হোসেন
৪৪. সিরাজুল আলম খান
৪৫. আমির হোসেন আমু
৪৬. তোফায়েল আহমেদ

পর্ব ২

# মুজিববাহিনী

www.amarboi.com

# বিএলএফ

১৯৭০ সালের অক্টোবরের একদিন। রোজার ছুটি শুরু হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হচ্ছে না। কলাভবনের পূর্ব দিকের করিডরের পাশে লাগোয়া দুটি কামরা। একটিতে ডাকসুর সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব বসেন। অন্যটিতে বসেন সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন। ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সদস্যরা দুটি কামরায় সচরাচর আলাদা আলাদাভাবে বসে, আড্ডা দেয়। সিরাজুল আলম খানপন্থীরা জড়ো হন রবের কামরায়। অন্যরা তাঁদের 'রব গ্রুপ' হিসেবে ইতিমধ্যে ব্র্যাকেটবন্দী করে ফেলেছেন।

সকাল ১০টা-১১টা হবে। আমরা কয়েকজন বসে আছি সহসভাপতির কামরায়। এমন সময় ওখানে এলেন কাজী আরেফ আহমদ। হাতে একটা প্যাকেট। প্যাকেট খুলে কিছু কাগজ বের করে আমাদের দিলেন। ফুলস্কেপ সাইজের তিন পৃষ্ঠার একটা দলিল। হাতে লেখা, সাইক্লোস্টাইল করা। শিরোনাম 'জয় বাংলা'। বুঝলাম, এটা একটা প্রচারপত্র।

আরেফ আমাদের ব্রিফ করলেন। ডিসেম্বরের ৭ তারিখ সারা দেশে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে। আমাদের বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিতে গিয়ে নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার চালাতে হবে। একই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার বক্তব্য কৌশলে তুলে ধরতে হবে, স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে কিছু তরুণকে বাছাই করে একটা নেটওয়ার্কে নিয়ে আসতে হবে।

প্রচারপত্রটি হাতে মুড়ে নিয়ে এলাম মুহসীন হলে আমার কামরায়। হলের আবাসিক ছাত্ররা বেশির ভাগই ঢাকার বাইরের। তাঁরা অনেকেই চলে গেছেন যাঁর যাঁর বাড়িতে। আমার স্বজনেরা সবাই ঢাকায় থাকেন। তাই বাড়ি যাওয়ার তাড়া নেই। ধীরেসুস্থে বসে বসে প্রচারপত্রটি পড়লাম। এত দিন অন্যদের সাহস আর বীরত্বের গল্পগাথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছি। এখন নিজেদেরই কাজটা করে দেখাতে হবে।

প্রচারপত্রে আমাদের জন্য কিছু নির্দেশনা ছিল। এক জায়গায় বলা হয়েছে :

ক. জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও যেকোনো কারণে ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত না হলে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনই হবে পরবর্তী কর্মসূচি এবং পশ্চিমা শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর সঙ্গে সেখানেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু।

খ. সে সংগ্রাম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে অসহযোগ, ট্যাক্স বন্ধ, পণ্য বর্জন ইত্যাদি আন্দোলনে পরিণত হবে এবং আরও পরে রক্ত দেওয়া ও রক্ত নেওয়ার পর্যায়ে উপনীত হবে। সে জন্য প্রত্যেককে মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

গ. ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হলেও বাংলা ও বাঙালির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরূপভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

ঘ. পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত না হলে বাংলা ও বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকবে না।

তত্ত্বের কচকচানি নেই, কোটেশন-কণ্টকিত বাণী নেই, ধোঁয়াশাপূর্ণ কথাবার্তা নেই। প্রতিটি বাক্য সরল, প্রাঞ্জল এবং সরাসরি মনের মধ্যে গেঁথে যায়। নির্বাচন হোক বা না হোক, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাক বা না পাক, লক্ষ্যটি পরিষ্কার। দেশ স্বাধীন করতে হবে। প্রচারপত্রের শেষ দুটি পরিচ্ছেদ মনে হলো শপথনামার মতো :

> জাতীয় নেতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সর্বোপরি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেক কর্মীকে 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।
>
> শত প্রতিবন্ধকতা, লোভ-লালসা, আত্মকলহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, 'জয় বাংলা' একটি আদর্শ। 'জয় বাংলা' আমাদের মূল উৎস। 'জয় বাংলা' আমাদের চলার পথের শেষ প্রান্ত। জয় বাংলা।

এই প্রচারপত্র নিয়ে ছাত্রলীগের অনেক সদস্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। কোথাও একজন, কোথাও-বা একাধিক সংগঠক আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের সমান্তরাল কাজ হিসেবে স্বাধীনতার বক্তব্য প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। কাজটি করতে হচ্ছিল খুবই কৌশলে এবং গোপনে। ছাত্রলীগের সিরাজপন্থীদের বাইরে এটি কারও জানা ছিল না। এমন একটি মিশনে সিরাজগঞ্জে গিয়েছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয়

কমিটির দুজন সহসম্পাদক—আ ফ ম মাহবুবুল হক ও বদিউল আলম। বদিউল তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> ‘জয় বাংলা’ স্লোগান নিয়ে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই অস্বস্তিতে ছিলেন। অক্টোবরে (১৯৭০) আ ফ ম মাহবুবুল হক আর আমি গেছি সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর নির্বাচনী এলাকায়। মাহবুব ভাই সিরিয়াস বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার এক ফাঁকে মনসুর আলী সাহেব আমার পাঞ্জাবি ধরে টেনে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার ব্যাপারে মৃদু আপত্তি জানালেন। তাঁর চিন্তা হলো, এই স্লোগান দিলে ভোট কমে যাবে।
>
> আরেকটা ইন্টারেস্টিং ঘটনার কথা বলি। আমরা গেছি বেলকুচি। এটা হলো মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের এলাকা। জায়গাটা মাদ্রাসায় ভরা। মওলানাকে জানালাম, আমরা এখানে নির্বাচনী প্রচার চালাব, মিটিং-টিটিং করব। উনি সহজভাবেই বললেন, ‘তোমরা তোমাদের কাজকর্ম করতে থাকো।’ সেখানে একটা মিটিংয়ে মাদ্রাসার অনেক মৌলভি হাজির হলো। ‘জয় বাংলা’ স্লোগান নিয়ে সেখানে সিরিয়াস রিপারকেশন দেখা দিল। এটা হিন্দু স্লোগান, ভারতের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চক্রান্ত—এই সব কথাবার্তা। মওলানা তর্কবাগীশ ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের পক্ষে কোরআন-হাদিস থেকে নানান উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, ‘এটা একটা সঠিক স্লোগান। বাংলার উন্নতির জন্যই তো এটা বলা হচ্ছে।’ উপস্থিত মৌলভিরা মাথা নিচু করে শুনছিল। তর্কবাগীশ ভাবলেন, ওরা হয়তো কনভিন্সড হয়ে গেছে। তিনি বললেন, ‘সবাই আমার সঙ্গে স্লোগান ধরেন—জয় বাংলা।’ কেউ একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। সবাই চুপ। তখন তর্কবাগীশ বললেন, ‘ঠিক আছে, আপনারা তো বাংলার জয় চান না। চলেন স্লোগান দিই—পরাজয় বাংলা।’ উপস্থিত হুজুররা খুবই অপ্রস্তুত হলো। তর্কবাগীশ বললেন, ‘হয় জয় চাইবেন, না হলে পরাজয় চাইবেন।’ তখন সবাই খুব নিচু স্বরে বলল—জয় বাংলা।[১]

এর কয়েক দিন পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজের নামে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করা হয়। এর শিরোনাম ছিল ‘নির্বাচন—বাংলাদেশ ও ছাত্রসমাজ’। প্রচারপত্রে সরাসরি বলা হয়েছিল, ‘বর্তমানে পশ্চিমা শোষণ হতে মুক্তি এবং ইতিহাস-স্বীকৃত বাঙালির বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই আজ ৭ কোটি মানুষ “বাংলাদেশ” গঠন ও বাঙালি জাতি সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী।’

'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের ভেতরে মতভিন্নতা ছিল। তরুণদের আবেগের ওপর ভর করে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া আর নৌকার পক্ষে ভোট পাওয়ার বিষয়টি এক করে দেখা যায়নি। তখন তরুণদের মধ্য থেকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উঠে আসছে। আওয়ামী লীগের অনেক রক্ষণশীল নেতা এটা পছন্দ করতেন না। তাঁরা বড়জোর 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর কথা বলতেন। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদের পর্যবেক্ষণ ছিল এ রকম :

> নির্বাচন প্রচারণার প্রাক্কালে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের আধিপত্য ও জয়জয়কার প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল। দেশবাসীর মুখে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিব ছাড়া যেন আর কথা ছিল না। সবাই শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র নেতা বলে মেনে নেয়। শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। আওয়ামী লীগের এই ভরা জোয়ারের পূর্ণ লগ্নেও কিন্তু ভেতরে-ভেতরে চলছিল ভিন্ন প্রস্তুতি। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের অংশ কার্যসূচির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে ক্রমশ দ্বিধান্বিত হয়ে উঠছিল। সভা-সমিতিতে তারা যেসব স্লোগান দিতে আরম্ভ করল, তা শেখ মুজিবের মনঃপূত হতো না। এগুলো ছিল সমাজতান্ত্রিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক 'জয় বাংলা' স্লোগানটি শেখ সাহেব নির্বাচনের সময় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেছিলেন। শেখ সাহেব নির্বাচনী প্রচারণায় এ ধরনের স্লোগান পছন্দ করতেন না। কিন্তু ছাত্র সম্প্রদায় তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করেনি। শেখ সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, জয় বাংলা, জয় সিন্ধু, জয় সীমান্ত প্রদেশ, জয় বেলুচিস্তান, জয় পাঞ্জাব এবং শেষ স্লোগান দিলেন জয় পাকিস্তান। এ ছাড়া অনেকগুলো সমাজতন্ত্রবাদী স্লোগানও শেখ সাহেবের সভায় দেওয়া হতো। অথচ শেখ মুজিব তখনো সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আদর্শ ছিল নির্ভেজাল সংসদীয় গণতন্ত্র। ফলে দেখা যায়, তখনই আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল।[২]

## ২

শুরুতে ছিল ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট বা ইবিএলএফ। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের পর ছাত্রলীগের তরুণদের একটা বড় অংশের চিন্তার মধ্যে

'পাকিস্তান' শব্দটি আর জায়গা ছিল না। এ সময় 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' বা 'বিএলএফ' শব্দটির চাউর হতে থাকে। সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য অনুযায়ী, 'আমাদের রাজনৈতিক সংগঠন হলো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ এবং সামরিক সংগঠন হলো বিএলএফ।'[৩]

'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামটি ১৯৭২ সালের আগে অজানা ছিল। ১৯৭০ সালের গোড়া থেকেই এই প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়লেও আমি এ নাম শুনিনি। কিন্তু আমি শুনিনি বলেই এর অস্তিত্ব ছিল না, এমন উপসংহার টানা ঠিক হবে না। সিরাজুল আলম খানকে কেন্দ্র করে যে চক্রটি স্বাধীনতার পক্ষে গোপন প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, তিনি এটাকে বলেছেন 'নিউক্লিয়াস'। সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁদের তিনজন, অর্থাৎ আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমদ এবং পরে ১৯৬৮ সালের দিকে এই প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে যুক্ত হন মনিরুল ইসলাম। দেখতে একটু মোটাসোটা হওয়ার কারণে তাঁকে সবাই মার্শাল নামে ডাকতেন। মার্শাল মনি নামের আড়ালে তাঁর আসল নাম চাপা পড়ে গিয়েছিল। ১৯৭০ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যে কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল, তাতে তিনি পাঁচজন সহসভাপতির অন্যতম ছিলেন। নূরে আলম সিদ্দিকী ছিলেন সভাপতি এবং শাজাহান সিরাজ ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। সহসভাপতিদের ক্রম অনুযায়ী এক নম্বরে ছিলেন সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং দুই নম্বরে ছিলেন এস এম ইউসুফ। ছাত্রলীগের নেতৃত্বের কাঠামোয় মনিরুল ইসলাম তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও সিরাজুল আলম খানপন্থীদের কাছে তিনি ছিলেন চোখে পড়ার মতো। ওই সময় সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগকে সরাসরি দেখভাল করতেন না। তাঁর হয়ে এ কাজটি করতেন কাজী আরেফ আহমদ। বিশেষ করে ঢাকা শহরে। মনিরুল ইসলাম সব সময় কাজী আরেফের সঙ্গে পরামর্শ করেই ছাত্রলীগের ভেতরে কাজ করতেন। তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র ছিল উত্তরবঙ্গ, অর্থাৎ রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন এলাকা। আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> মহিউদ্দিন আহমদ : সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বা পরিচয় কখন থেকে?
>
> মনিরুল ইসলাম : ১৯৬৬ সাল থেকে। তখন আমি রাজশাহী থেকে ঢাকায় আসি।
>
> মহি : 'নিউক্লিয়াস' শব্দটির সঙ্গে কি আপনি পরিচিত ছিলেন?
>
> মনিরুল : না। ওইভাবে নামটি শুনিনি। তবে একটা প্রক্রিয়া ছিল। তবে এই শব্দ তখন প্রচারে ছিল না।

মহি : এরপর তো এসে গেল 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'। এ নাম কি কখনো প্রচার পেয়েছে? এ নামে কি কোনো প্রচারপত্র বা পুস্তিকা দেখেছেন, শুনেছেন?

মনিরুল : ঠিক এই নামে কিছু ছিল বলে মনে পড়ছে না।

মহি : আমার মনে হয়, তাঁদের তিনজনের মনে মনে হয়তো এ ধরনের একটা ধারণা কাজ করে থাকতে পারে। কিন্তু এ নামে কোনো প্রচারপত্র আমি নিজে দেখিনি।

মনিরুল : হতে পারে। আমি জানি না।

মহি : ১৯৭০ সালের অক্টোবরে 'জয় বাংলা' শিরোনামে যে প্রচারপত্রটি আমাদের দেওয়া হলো, সেখানে কিন্তু স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামটি ছিল না। প্রচারপত্রে কোনো সংগঠনেরই নাম ছিল না। তবে আমরা জানতাম এটা আমাদের গ্রুপের গোপন প্রক্রিয়ার ফসল।

মনিরুল : ওই নাম ব্যবহার না করা হলেও স্বাধীনতার জন্যই এই প্রচার ছিল।

মহি : আমাকে আবদুর রাজ্জাক বলেছিলেন, তাঁরা 'বিপ্লবী বাংলা' নামে একটি বুলেটিন প্রকাশ করেছিলেন। হাতে লিখে, সাইক্লোস্টাইল করে এটা বিলি করা হতো। আপনি কি নিজের চোখে এটা দেখেছেন?

মনিরুল : না।

মহি : আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কারও কাছে 'বিপ্লবী বাংলা'র কোনো কপি পাইনি। ১৯৭০ সালে প্রচারিত 'জয় বাংলা' প্রচারপত্রের আগে এ ধরনের কোনো গোপন প্রচারপত্রও দেখিনি। হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু তার কোনো এভিডেন্স পাইনি।

মনিরুল : আমার যোগাযোগ বেশি ছিল কাজী সাহেবের (কাজী আরেফ আহমদ) সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েই আমি কাজ করতাম। এর বেশি কিছু থাকলে, সেটা আমার জানা নেই। এটা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন।[৪]

## ৩

তিন সংগঠকের নিউক্লিয়াস থেকে চার সংগঠকের বিএলএফ। এটা হলো বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছায়। এই পরিবর্তনের ফলে কাটা পড়লেন কাজী আরেফ

আহমদ। যুক্ত হলেন শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমেদ। প্রকৃতপক্ষে কাজী আরেফ কখনোই শেখ মুজিবের হিসাবের মধ্যে ছিলেন না। সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য অনুযায়ী, শেখ মুজিবের সঙ্গে আরেফের কখনোই সরাসরি দেখা বা কথা হয়নি।[৫]

কাজী আরেফ আহমদ

১৯৬৩ সালে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের পছন্দের প্রার্থী হিসেবে সিরাজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হন। শেখ ফজলুল হক মনির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটি হয়েছিল। কাজী আরেফের নেতৃত্বে ঢাকা নগর ছাত্রলীগের একটি অংশ তখন থেকেই সিরাজের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। আরেফ তখন থেকেই মনির চক্ষুশূল। ১৯৬৪ সালে আরেফ ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ওই কমিটির সহসভাপতিদের মধ্যে ছিলেন শেখ শহীদুল ইসলাম এবং মামুনুর রশীদ (পরে নাট্যকার)। আরেফ কখনো শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাড়িতে যাননি। শেখ মনি থাকলে তিনি আওয়ামী লীগ অফিসেও যেতেন না। ঢাকা নগর ছাত্রলীগে আরেফের ভূমিকা ছিল অনেকটা গডফাদারের মতো। তিনি বিভিন্ন কলেজে কমিটি বানাতেন, ভাঙতেন, জোড়া লাগাতেন। অনেকের চোখে তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রকারী, ক্লিকমাস্টার।

বিএলএফের শীর্ষ নেতৃত্বে জায়গা না পেয়ে কাজী আরেফ আগের মতোই 'নিউক্লিয়াসের' ত্রিভুজ নেতৃত্বের অংশ হয়ে থাকলেন। 'নিউক্লিয়াস' ও বিএলএফ সমান্তরাল অবস্থানে থাকল। পরে তাঁকে বিএলএফের গোয়েন্দাপ্রধান হিসেবে প্রচার করেছেন স্বয়ং সিরাজুল আলম খান। আরেফ একাত্তরের জুনে কলকাতায় গিয়ে বিএলএফের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং প্রশিক্ষণ নেন।[৬]

বিএলএফের মাধ্যমে শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে যে রসায়নটি তৈরি হয়, তার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিরাজুল আলম খান বলেন :

> একদিন মুজিব ভাই আমাকে একা ডেকে কাঁধে হাত রেখে অনেক কথার মধ্যে বললেন, 'তোদের তো কাজ অনেক বেড়ে গেছে দেখছি। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তোদের লোক দরকার।' আমি তাঁর এই কথাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে বললাম, তাহলে তো অনেক ভালো হয়। আমি

ভেবেছিলাম আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ, এম এ হান্নান, যদিও আমাদের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়, এই ধরনের কাউকে নিউক্লিয়াসের অন্তর্ভুক্ত করতে বলবেন। আমাকে অবাক বিস্ময়ে শুনতে হলো, 'মনি-তোফায়েলকে নিয়ে কাজ করতে পারবি না?' আমি আধা মিনিটের মতো নিশ্চুপ থেকে বললাম, রাজ্জাক-আরেফের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

সেদিনই গভীর রাতে আমরা তিনজন ইকবাল হলের মাঠে বসে বিষয়টি চার ঘণ্টা ধরে আলোচনা করে 'হ্যাঁ' সিদ্ধান্তে আসি। আমাদের মধ্যে একজন—আরেফ ভেটো দিয়েছিল। প্রায় চার ঘণ্টা লাগল ভেটো প্রত্যাহার করাতে। আরেফ শর্ত দিয়েছিল, তাকে যেন অন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।

পরদিন রাজ্জাক আর আমি মুজিব ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত জানালাম। এর পরদিন দুপুর ১২টায় আমাদের দুজনকে তাঁর বাসায় যেতে বললেন। আমরা গিয়ে দেখি মনি-তোফায়েল উপস্থিত। আমাদের যাওয়ার পাঁচ মিনিট আগে ওরা গেছে। আমরা বারান্দায় বসলাম। মুজিব ভাই একতলার ড্রয়িংরুমে চারজনকেই আসতে বললেন। তিনি দুহাত দিয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরে বললেন, 'চারজন মিলে একসঙ্গে কাজ করবি।' আমরাও খুশি হলাম। দুপুরের খাবার একসঙ্গেই খেলাম।

শেখ ফজলুল হক মনি তার কিছুদিন আগে জেল থেকে বেরিয়েছে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক থেকে বিদায় নিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে মনি ৭ জুন হরতালের সময় গ্রেপ্তার হয়। জেল থেকে বেরিয়ে জেলে যাওয়ার আগের ও পরের রাজনীতি এবং আন্দোলনের চেহারা ও কাজের হিসাব মেলাতে পারছিল না সে। আমার ও রাজ্জাকের অগোচরে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে তোফায়েলের ঘনিষ্ঠতা চোখে পড়ার মতো। অবিরাম আন্দোলনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা তোফায়েল আহমেদের ডাকসুর নেতা হিসেবে যে বলিষ্ঠতা এবং তার আরও বেশি কাজ করার ইচ্ছা, তা আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্প্রসারণ এবং নতুন চিন্তার যে বিকাশ ঘটছিল, তা মনি ও তোফায়েলের অগোচরে থাকল না। ইকবাল হলের মাঠে গোটা বিকেলটাই ঢাকা শহরের কর্মী-সংগঠকদের যাওয়া-আসা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি মনি হয়তো পরে শুনেছে। কিন্তু তোফায়েল সঙ্গে সঙ্গেই এগুলো বুঝতে পারত।[৭]

সিরাজুল আলম খানের দেওয়া তথ্য আমি যাচাই করেছি তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে। তিনি এই ভাষ্যের সঙ্গে একমত হলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল এ রকম :

> ইয়াহিয়ার মার্শাল লর মধ্যে '৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে যান। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা তখন স্বামীর সঙ্গে ইতালিতে ছিলেন। সেখান থেকে লন্ডনে গিয়ে পিতার সঙ্গে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু সেই সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ প্রতিনিধি ও বিশেষ সংস্থার শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে বৈঠক করেন এবং স্বাধীনতাসংগ্রাম থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ট্রেনিং ও অস্ত্র সহযোগিতার আশ্বাস মেলে।[৮]

তোফায়েল আহমেদের ভাষ্যের সঙ্গে আবদুর রাজ্জাকের ভাষ্য অনেকটাই মিলে যায়। ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আবদুর রাজ্জাক আমাকে বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে মনি ভাই, সিরাজ ভাই, তোফায়েল ও আমি—আমাদের এই চারজনের বায়োডাটা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।'[৯] আবদুর রাজ্জাকের কথার সূত্র ধরে বলা যায়, ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে তাঁদের চারজন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছিল এবং আসন্ন রাজনৈতিক পালাবদলের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তোফায়েল আহমেদ এ প্রসঙ্গে বলেন :

> বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ফিরে এসে আমাদের চারজনকে প্রস্তুতি নিতে বলেন। ছাত্রলীগের তরুণদের মধ্যে বাছাই করে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানোর কথা হয়। আমাদের বলা হলো, ২৪ জনের গ্রুপ করে পাঠানো হবে। এক গ্রুপ প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এলে আরেক গ্রুপ যাবে। এভাবে ট্রেনিং চলবে। পরে যখন দেখা গেল নির্বাচন হবে, তখন বিষয়টি স্থগিত করা হয়। কেননা, এ ধরনের ট্রেনিংয়ের কথা জানাজানি হয়ে গেলে নির্বাচন বানচাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।[১০]

## ৪

বিএলএফ নামটির সূত্রপাত কখন থেকে এবং চার যুবনেতা কবে থেকে একসঙ্গে কাজ শুরু করলেন, এটি জানতে আমি আগ্রহী ছিলাম। সিরাজুল আলম খান বলেছিলেন, শেখ মুজিব লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর তাঁরা একসঙ্গে কাজ শুরু করেন। দিন-তারিখ তিনি উল্লেখ করেননি। এই ভাষ্য

তোফায়েল আহমেদের দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। খটকা বাধে অন্য জায়গায়। ১৯৬৯ সালের শেষে বা ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে তাঁরা চারজন যৌথভাবে কাজ করছিলেন বিএলএফের ব্যানারে। কিন্তু ছাত্রলীগের মধ্যে দুটি স্রোতোধারা তখনো বহমান। অর্থাৎ বিএলএফের কার্যক্রমের সমান্তরাল আরেকটি গ্রুপ তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভালোভাবেই বজায় রেখেছিল, যেটি পরিচালিত হতো সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে। বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বললাম তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে। আমাদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ : বিএলএফ নামটি কখন আপনার নজরে এল, কখন শুনলেন?

তোফায়েল আহমেদ : আমার নজরে এসেছে ১৯৬৯ সালের পর। বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স মানে কী? একটা মুক্তিযুদ্ধ করা। অন্যরা অন্য রকম বলতে পারে। আমি আমার কথা বলছি। অনেস্টলি বললে, আমি জেনেছি আফটার সিক্সটি নাইন।

মহি : এটা কি উনসত্তরের আন্দোলনের পরে?

তোফায়েল : হ্যাঁ।

মহি : বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ফিরে আসার পরে, নাকি যাওয়ার আগে?

তোফায়েল : উনি আসার পরে।

মহি : আমি বারবার প্রশ্ন করে জানতে চাচ্ছি। কেননা, ইতিহাস রাইট ট্র্যাকে নাই।

তোফায়েল : রাইট ট্র্যাকে নাই। যে যেভাবে বলে, নিজেকে বড় করে বলে। আমি কিন্তু 'আমি' দিয়ে বলি না। আমার মধ্যে আমিত্ব নাই। আমি হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট বলছি। আমি ডিসটর্ট করি না।

মহি : তাহলে ধরে নেব, সিক্সটি নাইনে বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর, ওখানে ওনার একটা কানেকশন হলো।

তোফায়েল : অ্যাকচুয়ালি আগরতলা মামলা হওয়ার পরে, বিশেষ করে ওনার মুক্তির পরই কিন্তু স্বাধীনতার কথা...আগে থেকেই তো আমরা স্লোগান দিচ্ছি, বাষট্টি সালেই 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', ৬ দফার সময় 'পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা বাংলা', 'পিন্ডি না ঢাকা', উনসত্তরে বলেছি 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো'। আমরা কিন্তু ধাপে ধাপে এসেছি।

মহি : আপনাদের এই চারজনের টিম, এটা কি আপনারা নিজেরা নিজেরা হলেন, নাকি বঙ্গবন্ধুর এখানে কোনো রোল ছিল? কেননা, সিরাজ ভাই যেটা বলেছে...

তোফায়েল : কী বলেছে?

মহি : যেটা বলেছে, সেটা আপনার সঙ্গে ক্রস চেক করছি। ওনার ভাষ্য হলো, বঙ্গবন্ধু একদিন তাঁকে ডেকেছেন। বলেছেন, 'অনেক কাজ, তোদের তো আরও লোক দরকার। আমি দুইজন লোক দিব।' সিরাজ ভাই ভেবেছে চিটাগাংয়ের এম এ আজিজ আর মান্নান সাহেবের কথা। পরদিন বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে দেখে মনি ভাই আর আপনি বসা। রাজ্জাক ভাই আর সিরাজ ভাই গিয়ে বসছে। আপনারা চারজন। বঙ্গবন্ধু আপনাদের ধরে বলেছে, তোরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবি না? সিরাজ ভাই বললেন, পারব।

তোফায়েল : একদম অবাস্তব। মনি ভাই তো বড় নেতা ছিল। সিরাজ ভাইও বড় নেতা ছিল। রাজ্জাক ভাইও সেক্রেটারি ছিল। আমি নতুন হইলাম। আমি হলের ভিপি, ডাকসুর ভিপি, ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট।

একটা কথা বলি। সিরাজ ভাই আমাকে অনেক স্নেহ করতেন, আদর করতেন। আমাদের হলেই থাকতেন। তাহলে আমাকে উনি নিউক্লিয়াসে ইনক্লুড করে নাই কেন? বলে নাই কেন? এত কিছু করছি ওনার সঙ্গে। উনি আমাকে করে নাই কেন?

মহি : নিউক্লিয়াসের কথা তো আমি প্রথম শুনি রাজ্জাক ভাইয়ের কাছে, ১৯৮৩ সালে। উনিও তো বলেন তিনজনের নিউক্লিয়াসের কথা?

তোফায়েল : আমি জানি না। মনি ভাইয়ের মতো নেতা, যিনি বাষট্টি সাল থেকে স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন, উনিও এক্সক্লুডেড, আমিও এক্সক্লুডেড। রাজ্জাক ভাই, সিরাজ ভাই আর কাজী আরেফ—যাহোক, এটা নিয়ে আর আলাপ করতে চাই না।

মহি : আপনার ব্যাপারটা আমি বুঝি। আপনি লাইমলাইটে এসেছেন সিক্সটি নাইন মুভমেন্টের সময়।

তোফায়েল : একদম ঠিক কথা।[১১]

## ৫

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ক্রমে তীব্রতর হয়। এটি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা। এই ধারার আড়ালে আরেকটি প্রক্রিয়া চালু ছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতা চিত্তরঞ্জন

সুতার এবং ডা. কালিদাস বৈদ্য। দুজনের বাড়ি পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানায়। চিত্তরঞ্জন সুতার বাটনাতলায় তাঁর গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্দল প্রার্থী হিসেবে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কালিদাস বৈদ্য ছিলেন একজন চিকিৎসক। তাঁর বাড়ি সামন্তগাতি গ্রামে। তিনি ঢাকার শাঁখারীবাজারে থাকতেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে দুজনেরই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লন্ডনে যান। আগরতলা মামলায় আটক থাকা অবস্থায় তাঁর মামলা পরিচালনায় লন্ডনে বসবাসরত বাঙালিরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বিখ্যাত আইনজীবী টমাস উইলিয়ামকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য। শেখ মুজিব দৃশ্যত লন্ডনবাসী বাঙালিদের ধন্যবাদ দিতে এই সফরে যান। সেখানে তিনি যে নিশ্চুপ বসে ছিলেন না, তোফায়েল আহমেদের বর্ণনায় তা কিছুটা উঠে এসেছে। তাঁর এই 'ইন্ডিয়া কানেকশন' পরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের লন্ডন সফর নিয়ে কালিদাস বৈদ্যের বয়ানটি চমকপ্রদ :

> জেল থেকে মুক্তি পাবার কিছুদিন পরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মুজিব লন্ডনে যান। সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটা কী, তা কেবল মুজিব নিজে, চিত্তবাবু ও আমি জানতাম। লন্ডনের কাজ সেরে ঢাকায় ফেরার দিনই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। কারণ, তাঁর লন্ডন যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের কাছে তার ফলাফল ছিল আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
>
> সেদিন আমাকে দেখেই মুজিব খুশির মেজাজে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'খবর খুব ভালো। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।' পরক্ষণেই আরও জোরে ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কবিরাজ, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বটে, কিন্তু গুজরাটে হিন্দুরা যেভাবে মুসলমানদের মারছে, তাতে এখানকার মুসলমানরাও যদি হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন পরিণতি কী হবে?' (আমাকে বৈদ্য না বলে তিনি কবিরাজ বলতেন এবং সেই সময় ভারতের গুজরাটে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলছিল।) সে কথার কোনো জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সেদিন সম্ভব হয়নি।...
>
> আর পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। সংযত হলেন। আর চিত্তবাবুকে সত্বর ঢাকায় আসার জন্য জরুরি খবর পাঠাতে বললেন। আমার জরুরি খবর পেয়ে চিত্তবাবু ঢাকায় এলেন এবং মুজিবের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যাপারটা তাঁকে বিস্তারিতভাবে

কালীদাস বৈদ্য (সামনের সারিতে বাঁ থেকে তৃতীয়)

জানালাম। তারপর মুজিবের লন্ডন যাত্রার সাফল্য ও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়। তখন আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে মুজিবের লন্ডন সফর যেহেতু সফল হয়েছে, তাই তাঁর ব্যক্তিগত গুণাগুণের দিকে গুরুত্ব দেওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ, আমাদের লক্ষ্য হলো পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা, মুজিবকে দিয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করানোটাই ছিল আমাদের প্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে তাঁর মুখ দিয়ে একবার স্বাধীনতা ঘোষণা করাতে পারলে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবেই হবে। কেউ তা রুখতে পারবে না।...

মুজিবের লন্ডন যাত্রার সফলতার ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে বিশেষ আলোচনার পরই তখন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য কী কী আলোচনা সেদিন মুজিবের সঙ্গে হয়েছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা প্রকাশ করে বলা এখন সম্ভব নয়। তবে চিত্তবাবুর কলকাতা আসার সিদ্ধান্ত ওই দিন নেওয়া হয়। মুজিবের প্রতিনিধি হয়েই তিনি স্বাধীন পূর্ববঙ্গের জন্য গোপনে কাজ করেন।

আগেই বলেছি যে চিত্তবাবু ঢাকা থেকে অনেক দূরে বরিশালে তাঁর গ্রামের বাড়িতে থাকতেন এবং মাঝেমধ্যে ঢাকায় আসতেন। আমি ঢাকা শহরেই বাস করতাম। তাই মুজিবকে জানার সুযোগ

> আমার ছিল অনেক বেশি। আমাদের মধ্যে বয়সের তফাত তেমন বেশি ছিল না। বড়জোর চার-পাঁচ বছরের ব্যবধান হবে। তাই বেশ সহজ-সরলভাবেই আমরা মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। দরকার মতো আমার গাড়িও তিনি ব্যবহার করতেন। কারণ, তখন আওয়ামী লীগের কোনো কর্মী বা নেতার গাড়ি ছিল না। নেতাদের বেশির ভাগই ছিলেন ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট বা ইন্সপেক্টর।...
>
> শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার বা চিত্তবাবুর কথাবার্তা হতো অত্যন্ত গোপনে। কারণ, আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিপজ্জনক। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও চিত্তবাবু ও আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাক্তার হওয়ার সুবাদে তাঁর বাড়ি যাওয়ার আমার অবাধ সুযোগ ছিল। চিত্তবাবু ও আমার মধ্যে এই বোঝাপড়া হয়েছিল যে ঘটনা এমনভাবে ঘটিয়ে যেতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষই চিৎকার করে বলতে থাকবে, আমরা পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চাই।[১২]

১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে গঠন করা হয় জাতীয় গণমুক্তি দল। নতুন এই দলের সভাপতি হলেন মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডা. কালিদাস বৈদ্য সাধারণ সম্পাদক এবং অ্যাডভোকেট মলয় রায় কোষাধ্যক্ষ। নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে থাকলেন চিত্তরঞ্জন সুতার। দলের ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল 'অসাম্প্রদায়িক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন। স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে রেখে এই দল মুজিবের ৬ দফাকে পূর্ণ সমর্থন জানাল।' দলের লক্ষ্য সম্পর্কে কালিদাস বৈদ্যের ভাষ্য হলো :

> গণমুক্তি দলের ঘোষণাপত্রে স্বায়ত্তশাসনের দাবির আড়ালে স্বাধীন পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তখন কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তখন তাদের কাছে স্বাধীনতা ছিল কল্পনাতীত। শুধু তা-ই নয়, স্বাধীনতার কথা বললে তখন সব রাজনৈতিক দলই তার বিরোধিতা করত। এমনকি আওয়ামী লীগের কাছেও তখন স্বাধীনতার কথা ছিল অবাস্তব। তখন প্রকাশ্যে স্বাধীনতার কথা বললে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই তার বিরোধিতা করত। এককালে ছয় দফা দাবিরও তারা বিরোধিতা করেছিল। কাজেই স্বাধীনতার কথা বললে তারা যে আরও প্রবলভাবে তার বিরোধিতা করত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
>
> পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের যুক্তিগুলো ছিল অকাট্য এবং তা রূপায়ণের বিষয়ে আমরা ছিলাম নিশ্চিত। তাই গণমুক্তি দলের ঘোষণাপত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সাহসের সঙ্গে লেখা হয়েছিল,

> ‘পাকিস্তান সৃষ্টির ২২ বছর পরও যদি সংখ্যালঘুদের ভিটামাটি ছাড়িয়া যাইতে বলা হয় তবে ন্যূনতম দায়িত্ব হিসাবে তাহাদের জন্য অন্য কোনো আস্তানার ব্যবস্থা করিয়াই তাহাদের যাইতে বলিতে হইবে।’ এই বক্তব্য সংখ্যালঘুদের জন্য পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে একটি হোমল্যান্ড গড়ার দাবির ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ইসলামিক পাকিস্তানের মধ্যে বসবাস করে এর থেকে স্পষ্ট ভাষায় এই দাবির কথা বলা সম্ভব ছিল না।...
>
> আমরা বুঝতে পারি মুজিবের মনে যা-ই থাকুক না কেন, বৃহত্তর স্বার্থে তার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।...মুজিবেরও তখন প্রয়োজন ছিল সব সময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার। তাই পারস্পরিক স্বার্থেই ক্রমে যোগাযোগ ঘনীভূত হয়।...গণমুক্তি দলের সমস্ত জনসভায় মুজিবের প্রশংসা ও তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের উল্লেখ করেই আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতে থাকি।[১৩]

গণমুক্তি দল রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁদের কয়েকজন ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। সবাই পরাজিত হন। দলটি পরে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু দলের নেতাদের যোগাযোগ ছিল ভারতের সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন সুতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

## ৬

একটা কঠিন সময় যে এগিয়ে আসছে, সেটি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পারছিলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে একচেটিয়া জয় পান। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট তাঁকে করেছিল আরও আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী এবং একই সঙ্গে দায়িত্বশীল। এই ম্যান্ডেটকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে দর-কষাকষির অস্ত্র হিসেবে। একদিকে তিনি খোলা রেখেছিলেন আলোচনার দরজা, অন্যদিকে তাঁর প্রশ্রয়ে ডালপালা মেলছিল তারুণ্যের দ্রোহ। এটি ছিল একটি কৌশল। তরুণদের একটি অংশ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরে পা বাড়াতে চাইত না। অপর অংশটি ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি জঙ্গি, আগ্রাসী। ‘তোমার আমার ঠিকানা/ পদ্মা মেঘনা যমুনা’, কিংবা ‘পিন্ডি না ঢাকা/ ঢাকা ঢাকা’—এসব স্লোগান

উনসত্তরের আন্দোলনের আগেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের জঙ্গি অংশের কণ্ঠে উনসত্তর সাল থেকেই শোনা যাচ্ছিল ভিন্ন স্লোগান, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'মুক্তিফৌজ গঠন করো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। তখনই বিভাজনরেখাটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বোঝা যায়, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সমর্থকেরা শেখ মনির অনুগত এবং অন্য গ্রুপটি সিরাজুল আলম খানের সমর্থক। কিন্তু এ থেকে সরল উপসংহার টানা ঠিক হবে না যে মনিপন্থীরা স্বাধীনতাবিরোধী। তাদের যুক্তি ছিল প্রধানত দুটি। এক, এমন কিছু করা যাবে না, যা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; এবং দুই, শেখ মুজিব নিজে থেকে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আগবাড়িয়ে স্বাধীনতার স্লোগান দেওয়া হবে হঠকারিতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দুটি ধারাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। দুই ধারার কর্মী-সমর্থকেরা অনেক সময় পরস্পরের বিরুদ্ধে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়েছেন, ছাত্রলীগের বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলনে ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পাল্টাপাল্টি প্যানেল দিয়েছেন। তবু উভয় গ্রুপের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনিই সুপ্রিমো। শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খান প্রকাশ্যে কখনো কোন্দলে জড়াননি। তবে তাঁদের অনুসারীদের ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। শেখ মুজিবের অবস্থান ছিল বেশ সুবিধাজনক। তাঁর কাছে দুটো বিকল্পই খোলা থাকল। তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা একাত্তরের জানুয়ারিতেই উবে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করেছিলেন। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ বেশ সতর্কতার সঙ্গেই পর্যালোচনা করেছিলেন। এ ঘোষণার সামরিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আক্রমণ করলে জনগণের তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা আছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ওই আলোচনার ভিত্তি ছিল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ওই সময়ের সামর্থ্য।[১৪]

ভারতীয় গোয়েন্দারা একাত্তরের ৩০ জানুয়ারি কাশ্মীরি মুজাহিদের ছদ্মবেশে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের অভ্যন্তরীণ রুটের একটি বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে গিয়েছিল। পরে বিমানটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এর জবাবে ভারত সরকার ভারতের আকাশসীমার ওপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়। এর ফলে ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর সক্ষমতা তলানিতে

ঠেকে। শেখ মুজিব বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল হোসেন বলেছেন :

> স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। তাজউদ্দীন আহমদের পরামর্শ অনুযায়ী আমি খসড়া তৈরি করি। খসড়ায় আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে স্বাধীনতা ঘোষণার কারণ হিসেবে ব্রিটিশরাজের অবিচারের কথা বলা হয়েছিল। তাজউদ্দীন ভাইকে কাছে রেখে মতিঝিলে আমার শরীফ ম্যানশনের অফিসে দুদিন কাজ করি। ঘোষণাপত্রটি আমি নিজেই টাইপ করি। খুব গোপনে এটি করা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি আমরা এটা বঙ্গবন্ধুর হাতে দিই। তিনি এটা তাঁর কাছে রেখে দেন। তাজউদ্দীন আহমদ শুধু খসড়া তৈরিতেই অংশ নেননি, ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের একটি কর্মসূচিও তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই কর্মসূচিতে প্রধান প্রধান শহরে মহাসমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে রাজপথে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়। সামরিক বাহিনী এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আমরা রেডিও স্টেশন, সচিবালয় ও গভর্নর হাউসের দখল নিয়ে নেব এবং গভর্নর তখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন।
>
> আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার দাবি করে আসছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও কার্যকরী কমিটির সদস্যদের একটি যৌথ সভা ডাকা হয়। সভায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানানো হয়। মনে হয়েছিল, ওই সভায় স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। আমার মনে আছে, এক বিদেশি কূটনীতিক আমাকে আগের দিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনারা কি এই সভায় একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন?'
>
> জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে দেরি হওয়ায় জনমনে ক্ষোভ বাড়ছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সভা হওয়ার কথা। ওই দিন সকালে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।[১৫]

ড. কামাল হোসেনের ভাষ্যে এটা পরিষ্কার যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার অপেক্ষায় ছিলেন শেখ মুজিব। অধিবেশন না বসলে বিকল্প হিসেবে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার চিন্তা বিবেচনায় ছিল।

এটি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে সমঝোতার আশা খুবই ক্ষীণ।

এত দিন ইয়াহিয়া মনে করেছিলেন, মুজিব ছয় দফা পরিমার্জন করবেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাঁর সেই আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।[১৬]

শেখ মুজিব তখন পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরে পা বাড়াননি। ১৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নেতা নির্বাচন করা হয়। উপনেতা নির্বাচিত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।[১৭] ঠিক এ সময় আরেকটি ঘটনা ঘটে, যার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৮ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন ধানমন্ডির বাসায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ডের' সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, এম মনসুর আলী ও তাজউদ্দীন আহমদ। যেকোনো কারণে খন্দকার মোশতাক উপস্থিত ছিলেন না বা তাঁকে রাখা হয়নি। আরও উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। শেখ মুজিব তাঁদের একটি ঠিকানা মুখস্থ করিয়েছিলেন। ঠিকানাটি হলো ৩২১ রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা।[১৮] যুবনেতাদের বয়ানে পরে এ তথ্য খণ্ডিতভাবে এসেছে। তাঁরা ওই বৈঠকে আওয়ামী লীগের চার নেতার উপস্থিত থাকার কথা কখনো প্রকাশ্যে বলেননি। শুধু আবদুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাজউদ্দীন আহমদের উপস্থিতিতে শেখ মুজিব প্রয়োজনে তাঁদের ওই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলেছিলেন।[১৯] ওই ঠিকানায় ছিল ১৮ কামরার একটি তিনতলা বাড়ি। চিত্তরঞ্জন সুতার সপরিবার ওই বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটির নাম 'সানি ভিলা'।[২০]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কাজ করতেন দশ হাতে। তিনি জানতেন কাকে দিয়ে কী করানো যাবে। ছাত্রদের মধ্যে কাজ করতেন কেউ কেউ। এ ক্ষেত্রে সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের মধ্যেও যোগাযোগ হতো তাঁর মাধ্যমে। অন্য একজন বা কয়েকজন হয়তো যোগাযোগ রাখতেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। আরেকজন হয়তো সামলাতেন গণমাধ্যম। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও তাঁর লোক ছিল, যাদের মাধ্যমে তিনি তথ্য পেতেন। বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটি করতেন অন্য কেউ। অন্য দলের নেতাদের সঙ্গে তিনি নিজেই সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন। প্রত্যেকেই দরকারি কাজ করতেন। তাঁরা একে অপরের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেতেন না, প্রয়োজনও হতো না। প্রত্যেকেই নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য মনে করতেন। সিরাজুল আলম খানকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আলমগীর রহমানকে চেনেন কি না। তিনি বলেছেন, চেনা তো দূরের কথা, নামও শোনেননি। অথচ তিনি শেখ মুজিবের আস্থাভাজন ছিলেন।

সময়টা ছিল উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তায় ভরা। সংকট থেকে উত্তরণের জন্য শেখ মুজিব মার্কিন প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছিলেন। ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল ছিলেন আর্চার কে ব্লাড। শেখ মুজিবের পক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন আলমগীর রহমান। তিনি ছিলেন মার্কিন তেল কোম্পানি ইএসএসওর (ESSO) পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের প্রধান। আলমগীরকে দিয়ে মুজিব আর্চার ব্লাডকে বার্তা পাঠালেন, বাংলাদেশ যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করবে কি না। আর্চার ব্লাড জানিয়ে দেন যে তাঁর সরকার চায় পাকিস্তানের ঐক্য টিকে থাকুক এবং সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতা করার সুযোগ আছে। আর্চার ব্লাডের বক্তব্যের প্রথম অংশটির ভাষা ছিল কূটনৈতিক এবং পরের অংশে যুক্তরাষ্ট্রের নমনীয় ভূমিকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২১]

শেখ মুজিব আলোচনার দরজা সব সময় খোলা রেখেছিলেন। তিনি সমঝোতার মাধ্যমে একটি নিষ্পত্তি চেয়েছিলেন। ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হবে, এ তথ্য তাঁকে ২৮ ফেব্রুয়ারি জানিয়েছিলেন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং গভর্নর এস এম আহসান। শেখ মুজিব বারবার অনুরোধ করছিলেন, নতুন একটি তারিখ ঠিক না করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হলে তাঁর পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না।[২২] ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর ধানমন্ডির বাসায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষ তাঁর পেছনে এককাট্টা। তবে কিছু চরমপন্থী কমিউনিস্ট আছে। তারা ইতিমধ্যে তাঁর তিনজন নেতাকে হত্যা করেছে। তিনি এর বদলা নিতে বলেছেন। তাঁর একজনকে মারলে তিনজন কমিউনিস্ট মারা হবে এবং এটি বাস্তবায়িত হয়েছে। যদি দেশের ঐক্য ধরে রাখা না যায়, তাহলে গুলির মুখোমুখি হতে তিনি পিছপা হবেন না। তাঁকে যদি আবারও জেলে নেওয়া হয়, কিংবা যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, তবু তিনি জনগণের দেওয়া ম্যান্ডেট থেকে সরে আসবেন না। তিনি বিচ্ছিন্নতা চান না। তিনি চান একটি কনফেডারেশন, যেখানে বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা পাবে।[২৩]

একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য তরুণ সমাজের চাপ ছিল। পয়লা মার্চ বেলা একটায় রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পক্ষে জনমনস্তত্ত্ব যেন তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই জনতা পথে নামে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘোষণা করে স্বাধীনতা। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। এই পতাকা ১৯৭০ সালের ৭ জুন পল্টন ময়দানে 'জয় বাংলা বাহিনী'র প্যারেডে

প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এর আগেও বাংলাদেশের একটি পতাকা তৈরি করেছিলেন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্তরা। মামলার অভিযোগপত্রের ৫০ অনুচ্ছেদে বলা হয়, ১৯৬৬ সালের জুন মাসে মামলার ২ নম্বর আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির বাসায় একটি সভা ডেকেছিলেন। ওই সভায় তিনি সবাইকে তাঁর একটি ডায়েরি ও নোটবুক দেখান, যাতে 'বাংলাদেশ' নামে প্রস্তাবিত নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দিকগুলো লিপিবদ্ধ ছিল। সবুজ ও সোনালি রঙের জাতীয় পতাকাও সেখানে দেখানো হয়।[২৪] বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় পতাকার ধারণা এটাই প্রথম।

৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের পক্ষে শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে জানান দেওয়া এটিই ছিল প্রথম লিখিত ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রে শেখ মুজিবকে 'জাতীয় নেতা' এবং 'আমার সোনার বাংলা...' গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সভায় পাঠ করা একটি প্রস্তাবে শেখ মুজিবকে বলা হয় 'জাতির পিতা'। ২ মার্চ সন্ধ্যায় ইকবাল হলের (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ৩১৩ নম্বর কামরায় শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের উপস্থিতিতে ইশতেহারটির প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রায়হান ফিরদাউস (মধু)।[২৫] বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাপত্রটি এসেছে বিএলএফের মাধ্যমে।

৩ মার্চ পল্টনে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের ওই জমায়েতে শেখ মুজিব বলেছিলেন, ৭ মার্চ অনুষ্ঠেয় জনসভায় তিনি তাঁর বক্তব্য দেবেন। পল্টনে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে পিছিয়ে আসার সুযোগ ছিল না। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কী বলবেন, এ নিয়ে শেখ মুজিবকে অনেক হিসাব-নিকাশ করতে হয়েছিল। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ ও ঝুঁকি ছিল প্রবল। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহানের ভাষ্য উল্লেখ করার মতো :

> আওয়ামী লীগের তরুণেরা, যেমন সিরাজুল আলম খান, যিনি কাপালিক নামে পরিচিত, এখনই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পুরোদস্তুর মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার পক্ষে ছিলেন। ৭ মার্চের সভায় যাওয়ার আগে নুরুল ইসলাম (পরে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান) ও আমি তাঁদের মনের ভাব জানার


www.amarboi.com

একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। ছবি : সংগৃহীত

জন্য ইকবাল হলে গেলাম। কাপালিকের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁকে হতাশ মনে হলো। তিনি বললেন, স্বাধীনতার কোনো নাটকীয় ঘোষণা আসছে না।[২৬]

রেহমান সোবহানের ভাষ্যে এটা বোঝা যায়, সিরাজুল আলম খান ৭ মার্চের ভাষণে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব এ প্রস্তাবে রাজি হননি। তোফায়েল আহমেদের ভাষ্যমতে, 'সিরাজ ভাই বঙ্গবন্ধুকে বলল, আজ কিন্তু কমপ্লিট স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া মানব না।' তখন বঙ্গবন্ধু আমাদের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সিরাজ, আই অ্যাম দ্য লিডার অব দ্য পিপল। আই লিড দেম। দে ডোন্ট লিড মি।'[২৭] শেখ মুজিব সরাসরি ওইভাবে ঘোষণা না দিয়ে সমঝোতার শেষ চেষ্টা হিসেবে চার দফা দাবি জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি জনতাকে প্রতিরোধসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ওই ভাষণে বলা কথার চেয়ে না বলা কথা কম ছিল না। পরে মুজিববিরোধীরা কেউ কেউ প্রচার করেছে যে মুজিব স্বাধীনতা চাননি। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন; সে জন্য সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

## তথ্যসূত্র

১. বদিউল আলম
২. আহমদ (১৯৮২), পৃ. ১০৩-১০৪
৩. সিরাজুল আলম খান
৪. মনিরুল ইসলাম
৫. সিরাজুল আলম খান
৬. মাজহারুল হক টুলু
৭. সিরাজুল আলম খান
৮. তোফায়েল আহমেদ; পীর হাবিবুর রহমান, 'বঙ্গবন্ধু লন্ডনে ইন্দিরার প্রতিনিধির সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৮ জুন ২০১৯
৯. আবদুর রাজ্জাক
১০. তোফায়েল আহমেদ
১১. ওই
১২. বৈদ্য, ডা. কালিদাস (২০০৫), *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অন্তরালের শেখ মুজিব*, কর্মকার বুক স্টল, কলকাতা, পৃ. ১১৬-১১৯
১৩. ওই, পৃ. ১১১-১১৬
১৪. Hossain, Kamal (2013), *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*, UPL, Dhaka, p. 71-73

১৫. Ibid

১৬. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৭), *আওয়ামী লীগ: যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৩২

১৭. *The Pakistan Observer,* 17 February 1971

১৮. তোফায়েল আহমেদ

১৯. তৃতীয় মাত্রা, চ্যানেল আই, ৪ এপ্রিল ২০০১

২০. সিরাজুল আলম খান

২১. Blood, Archer K (2006), *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat,* UPL, Dhaka, p. 136

২২. Sisson, Richard & Rose, Leo (1990), *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh,* University of California Press, California, p. 89-90

২৩. Blood, p. 148-152

২৪. বেগম, সাহিদা (২০০০), *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৭৩

২৫. রায়হান ফিরদাউস

২৬. Sobhan, Rehman (2016), *Untranquil Reflection: The Years of Fulfilnent,* Sage, New Delhi, p. 328-329

২৭. তোফায়েল আহমেদ

# ঢাকা থেকে কলকাতা

একাত্তরের মার্চ। সারা দেশ জ্বলে উঠেছে। বিএলএফের দুই শীর্ষ নেতা শেখ ফজলুল হক মনি আর সিরাজুল আলম খান এক কাতারে। তাঁদের অনুসারী ছাত্রলীগ নেতারা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে এককাট্টা। তাঁদের দ্বন্দ্ব-কোন্দল আপাতত উধাও। সিরাজুল আলম খানের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন এস এম হলের তৃতীয় বর্ষের আবাসিক ছাত্র সুমন মাহমুদ। এটি সুমনের কাছে শোনা :

> ১৯ মার্চ সিরাজ ভাই বিকেলে এস এম হল থেকে আমাকে ডেকে নেন। রিকশায় চড়ে আমরা গেলাম গাউছিয়া মার্কেটে। নিচতলায় কোনার দিকে একটা দোকান ছিল। ইলেকট্রনিকসের জিনিসপত্র বিক্রি হতো। দোকানমালিক সম্ভবত সিরাজ ভাইয়ের পূর্বপরিচিত সালাম বিনিময়ের পর সিরাজ ভাই একটা বস্তুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'দিস ওয়ান।' দোকানমালিক এটা সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন। সিরাজ ভাই দোকানমালিককে বললেন, এটা কীভাবে চালানো হয়, সেটা আমাকে দেখিয়ে দিতে। দেখলাম নতুন একটা জিনিস, আগে দেখিনি। এটা একটা থ্রি-ইন-ওয়ান। রেডিও, গ্রামোফোন ও রেকর্ডার একসঙ্গে। এটা নিয়ে আমি হলে চলে এলাম। সিরাজ ভাই আমাকে বলেছিলেন, কেউ একজন এসে আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে যাবে। কে আসবেন, জানতে চাইলে উনি বললেন, শরীফ নুরুল আম্বিয়া। তিনি আর আসেননি।[১]

ওই সময় একটা রেডিও ট্রান্সমিটার বানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে এটি সফল হয়নি। ছাত্রলীগের সহসভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া বিষয়টি জানতেন। তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়। আমাদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

> শরীফ নুরুল আম্বিয়া : ১৯৭০ সালের মার্চে ছাত্রলীগের কনফারেন্সের পর বঙ্গবন্ধু বুয়েটের টিচারদের সঙ্গে একটা মিটিং

করতে চেয়েছিলেন, অথবা তাঁর সঙ্গে বুয়েটের টিচারদের বৈঠকের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু টিচারদের একটা বড় অংশ যদি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বসতে না চায়, তাহলে অল্প কয়েকজনকে নিয়ে বৈঠক করাটা দৃষ্টিকটু লাগতে পারে। এ জন্য এ পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয়। আমাদের প্ল্যান ছিল শর্ট রেঞ্জের একটা রেডিও ট্রান্সমিটার বানানো যায় কি না, মোবাইল। এ বিষয়ে আমাদের ধারণা ছিল না। আমাদের ইলেকট্রনিকসের টিচার নূরউল্লাহকে এটা অ্যাসাইন করা ছিল। উনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করছিলেন। যাহোক, কাজটা হয় নাই।

আমাদের ব্যাচমেট ফজলুর রহমান খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। সে ওই টিমে জড়িত ছিল। আমি ছিলাম লিয়াজোঁম্যান। এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় ছিল। ফজলুর রহমানের নামটা এখন আর কেউ বলে না। বাট হি ওয়াজ ডিপলি ইনভলভড ইন ইট। এখন বোধ হয় সে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। এক্সট্রা বিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল।

একাত্তরের ফেব্রুয়ারির শেষে পরিস্থিতি যখন খুব উত্তপ্ত, সিরাজ ভাই একদিন বলল, ওইটার অবস্থা কী?

এখনো ডেলিভারি স্টেজে না। যেহেতু এইটা আমার সাবজেক্ট না, আমি এর টেকনিক্যাল দিক অতটা বুঝি না।

মার্চের মধ্যে রেডিও হবে কি না?

এইটা মার্চের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। আমি আবার ওদের বললাম, মার্চে রেডিও হবে কি না। ফজলুর রহমান বলল, 'চান্স ইজ ভেরি লেস।' ও আমার পাশের রুমেই থাকত। আমার রুম ৪০১, ওর রুম ৪০২।

মহিউদ্দিন আহমদ: কোন হল?

আম্বিয়া: শেরেবাংলা হল, নর্থ। আমি, হাসানুল হক ইনু, এহসান শামীম আর শাহ আলম এক রুমে থাকি। সিরাজ ভাইকে বললাম, এটা আর হচ্ছে না। এখন এই গবেষণার আর সময় নাই।

সিক্সটি নাইন মুভমেন্টের পর অনেকেই এ রকম করছে। নানা রকম বোমা বানানো, নানা তরিকা, সার্কিট সিস্টেম, ওয়াকিটকি—যাদের টেকনিক্যাল নলেজ আছে, তারা আইসা আমাদের বলত। মজার বিষয় হইল, আমরা যখন ইন্ডিয়া চইলা যাই, চৌকির নিচে এই সব রাইখা দিছিলাম।

মহি: আপনারা যখন এগুলো করতেছেন, তখন ওই দিকে

জিয়াউর রহমান কালুরঘাটে দিয়া দিল একটা ঘোষণা।

আম্বিয়া : না, আমরা তো এসব করছি ২৫ মার্চের আগে।

মহি : এত চিন্তাভাবনা না করে একটা রেডিও সেন্টার তো দখল করা যেত, গেরিলা কায়দায়। সবাই তো বাঙালি, সহযোগিতা পেতেন।

আম্বিয়া : আমাদের তো লক্ষ্য ছিল একটা শর্ট রেঞ্জ মোবাইল রেডিও স্টেশন করা। আমি ২৫ মার্চের পর প্রথম ছয় দিন কেরানীগঞ্জে ছিলাম। তারপর দুই দিন নওয়াবগঞ্জে ছিলাম। তারপর ভাঙ্গায় ছিলাম। এভাবে এক মাস যদি টেম্পোটা ধইরা রাখতে পারি—এর চেয়ে বেশি এই প্ল্যানে পসিবল না। আমাদের চিন্তা ছিল একটা প্রলংগড ওয়ারের জন্য প্রস্তুত হওয়া। আমাদের মাথায় ছিল ভিয়েতনাম আর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়কার আরবান গেরিলা ওয়ার, প্রট্রেক্টেড ওয়ার।[২]

## ২

বাংলাদেশ স্বাধীন করার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মনোভাব, এ ব্যাপারে ভারতের পরিকল্পনা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের পটভূমি—এসব বিষয়ের একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় ডা. আবু হেনার কাছ থেকে। আবু হেনা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা। ১৯৬২ সালে তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং ১৯৬৩ সালে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আবু হেনা বলেন :

> আমরা জাস্টিস ইব্রাহিমের বাসায় ছোট একটা স্টাডি সার্কেল করছিলাম—কেন স্বাধীনতা দরকার। ১৯৬৪-৬৫ সালের কথা। জিরো পয়েন্টের এই মোড়ে, সেক্রেটারিয়েটের কোনায়, ওইখানে একটি পেট্রলপাম্প ছিল। ওইখানে ওনার বাড়ি ছিল। স্টাডি সার্কেল থিকা উনি নেতৃত্ব দিতেন, বুদ্ধি দিতেন। ওনার মেয়ের জামাই ইশতিয়াক সাহেব, কাজী আরেফ, আমি, মাজহারুল হক বাকী, ইকবাল হলের ভিপি হারুন—আমরা সবাই স্টাডি সার্কেলে বসতাম। উনি আমাদের একটা পত্রিকা বানায়া দিতে চাইছেন। বলছেন, 'গ্রিন রোডে আমার এক বিঘা জায়গা আছে। এইটা নাও, পত্রিকা বের

করো। স্বাধীনতার জন্য লাগবে।'

ইব্রাহিম সাহেব বলতেন, 'মুজিবের মতো বাঘের বাচ্চা ছাড়া স্বাধীনতা হবে না।' আমার সামনে বলছে ছয় দফা দেওয়ার আগে। ওরা আমাদের ছোবড়ার মতো ফেলে দিছে। দেশটা স্বাধীন করতে হবে।

আমি সিরাজ ভাইয়ের (সিরাজুল আলম খান) খুব কাছের লোক। সব ঘটনার সূত্রপাত আমি জানতাম। ওনাদের সঙ্গে ভারত সরকারের একটা সম্পর্ক ছিল। এই গ্রুপের সঙ্গে এখানে নেটওয়ার্কে যারা কাজ করত, তার মধ্যে রূপলাল হাউসের জমিদার, শ্যামবাজারের জমিদার—তার ছেলে—রূপা মুখার্জিরে বিয়া কইরা এখানে থাকতেছে। কালিদাস বৈদ্য। কে? একটা রাজনৈতিক দল বানাইছিল, গণমুক্তি দল। সেই দলে ছিল চিত্ত সুতার। পরে কলকাতায় চিত্ত সুতারের ওখানে গিয়া এদের সবার সঙ্গে পরিচয় হইছে। এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে সিরাজদের একটা সম্পর্ক ছিল। এই নেটওয়ার্কের কাজ কী ছিল? টু ডিস্টার্ব ইস্ট পাকিস্তান। তারা বলত, ইস্ট পাকিস্তানে হিন্দুদের—মাইনরিটিকে অত্যাচার করা হচ্ছে। তাদের জন্য সেপারেট এনটিটি তৈরি করা দরকার।

'স্বাধীন বঙ্গভূমি' বানানোর জন্য ম্যাপ তৈরি হইছিল ইন্ডিয়ায়। আমি জানি এইগুলো। মুজিব ভাই জানত। তাজউদ্দীনও জানত। আইয়ুব খান এটা জানতে পারছে, চিত্ত সুতারকে ধইরা জেলে পুরছে। জেল থিকা মুক্ত হইলে মুজিব ভাই ডাইকা পাঠাইল, 'তুমি হিন্দু হিন্দু করতেছ, আমি বাঙালি বাঙালি করতেছি। আমার পক্ষে তুমি কাজ করো। তুমি ইন্ডিয়া চইলা যাও।' চিত্ত সুতার কলকাতায় পাটের অফিস নাম দিয়া একটা বাড়িতে থাকে। ইন্ডিয়া বলছে, 'তুমি তো আমাদের লোক। তাদের একজন লোক দাও।'

শেখ মনি একদিন আওয়ামী লীগ অফিসে বললেন, 'তোমাকে ক্যালকাটা যাইতে হবে। একজন তরুণ নেতা, যে ইংরেজি-বাংলা জানে, হিন্দি জানে, এই টাইপের একজন। ইলেক্টেড হইলে ভালো হয়।'

উনি (মুজিব) বলতেন, 'বুড়ারা তো মন্ত্রী হইতেছে। আমি তো স্বাধীনতা চাই। আমার স্বাধীনতার সেনা হবি তোরা। ইলেক্টেড হইলেই তোরা নেতা হবি।' এই নীতি নিয়া আমরা অনেকেই নির্বাচন করছি। ওনার বিশ্বাস ছিল আমাদের ওপর।[৩]

একাত্তরের মার্চে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে। ভারতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। বরিশালের চিত্তরঞ্জন সুতার ছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগের একটি মাধ্যম। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় ঢাকার ইংরেজি *প্রোব* ম্যাগাজিনকে দেওয়া ডা. আবু হেনার একটি সাক্ষাৎকারে। তাঁর সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> একাত্তরের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে মনি ভাই (শেখ ফজলুল হক মনি) আমাকে বললেন, 'এখন কাজে নামতে হবে, জরুরি একটি কাজে তোমাকে কলকাতা যেতে হবে। সেখানে ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে হবে।' আমি বললাম, মুজিব ভাই না বললে আমি কোথাও যাব না।
>
> ১ বা ২ মার্চ মুজিব ভাই আমাকে ডেকে বললেন, 'আমি ব্যস্ত মানুষ, সব সময় তোমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারব না। এখন থেকে যা বলার মনিই বলবে এবং এটা আমার কথা বলেই জানবে। তুমি ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ভালোই বলো। এ ছাড়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করি এবং সে জন্যই তোমাকে বেছে নিয়েছি।' এবার মনি ভাই আমাকে কিছু নির্দেশনা দিলেন এবং কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমার প্রতি নির্দেশ ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বলতে যে যুদ্ধ বাধলে তারা যেন সীমান্ত খোলা রাখে এবং অস্ত্র ও রেডিও ট্রান্সমিটার দিয়ে আমাদের সাহায্য করে।
>
> আমি ৭ মার্চ রওনা হলাম এবং পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে রৌমারী-কুড়িগ্রাম হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছলাম। কিন্তু মনি ভাইয়ের কথামতো সুতারকে পেলাম না। কারণ, তিনি ভুজঙ্গভূষণ নাম নিয়ে কলকাতায় থাকতেন। অবশেষে ভবানীপুরে নর্দার্ন পার্কের কাছে ২১ রাজেন্দ্র রোডের 'সানি ভিলা'য় তাঁর সন্ধান পেলাম। সুতার তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন।
>
> চিত্তরঞ্জন সুতার ১৯৫৪ সালে বরিশাল থেকে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগে তিনি তফসিলি ফেডারেশনের সঙ্গে ছিলেন। পরে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ হলে তিনি ন্যাপে যোগ দেন। কালিদাস বৈদ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গণমুক্তি পার্টি তৈরি করেছিলেন। পরে এই পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত হয়। ১৯৬৮ সালে সুতার কলকাতায় চলে যান।

চিত্তরঞ্জন সুতার

আমি কলকাতায় পৌঁছলাম ১০ বা ১১ মার্চ। ঢাকা ছাড়ার আগেই আমার কোড নম্বর ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল '৯৯'। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন থেকে কলকাতার কর্তৃপক্ষকে এটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় সুতারের বাড়িতে আমি উঠলাম। দিল্লি থেকে দুজন ভদ্রলোক এলেন। তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ এবং বাংলায় কথা বলতে পারেন। তাঁদের নাম আমার মনে নেই। আমরা যখন কথা বলছিলাম, সুতারকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়নি।

আমি তাদের যা বলার তা বললাম। তারা বলল, 'অস্ত্র দিয়ে তোমরা কী করবে? তোমাদের লোকদের পাঠিয়ে দাও, আমরা ওদের প্রশিক্ষণ দেব।' অস্ত্রের ব্যাপারে ওরা কোনো প্রতিশ্রুতি দিল না। কিন্তু রেডিও ট্রান্সমিটার দিতে এবং সীমান্ত খোলা রাখতে রাজি হলো। শেষে বলল, 'শেখ মুজিবকে বলো, আমাদের যেন একটি চিঠি দেয়। "দিদি, হেল্প আস, মুজিব" এটুকু লিখলেই যথেষ্ট।'

আমি বললাম, তোমরা পুরো জিনিসটাই দেরি করিয়ে দিচ্ছ। আমি ঢাকায় যাব, তারপর চিঠি নিয়ে আসব, এতে অনেক সময় নষ্ট হবে। ওরা বলল, 'এটা দরকার, উনি (ইন্দিরা) এটি চান।' তারা আরও বলল, 'রেডিও স্টেশন তৈরি আছে। বর্ডার খোলা থাকবে। বর্ডার পেরিয়ে যারাই আসবে, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে।'

আমি যশোর হয়ে ১৪-১৫ মার্চ ঢাকায় ফিরে এলাম এবং মুজিব ভাইকে সব খুলে বললাম। বললাম, ওরা একটা চিঠি চায়। মুজিব ভাই শুনলেন, কিছু বললেন না। তারপর তো ২৫ মার্চ ক্র্যাকডাউন হয়ে গেল। শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হলেন।[৪]

আমি শুনেছিলাম ডা. আবু হেনা শেখ মুজিবের দূত হিসেবে এর আগেও কয়েকবার কলকাতায় গেছেন চিত্তরঞ্জন সুতারের কাছে। তথ্যটি তাঁর কাছে যাচাই করতে চাইলাম। তিনি জানালেন, একাত্তরের মার্চের আগে তিনি যাননি। আমি একটু ফাঁপরে পড়ে গেলাম। কার কথা সত্য? ধোঁয়াশা কাটল শেখ শহীদুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলে। তিনি ঢাকা কলেজে পড়ার সময়

থেকেই (১৯৬২) শেখ মুজিবের বাড়িতে থাকতেন। সম্পর্কে নিকটজন। তিনি বেগম মুজিবের বড় বোনের ছেলে। তিনি অনেক ঘটনার সাক্ষী। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপচারিতা ছিল আবু হেনার কলকাতা যাওয়া প্রসঙ্গে।

মহিউদ্দিন আহমদ : চিত্ত সুতারের সঙ্গে কি আপনার আগে কখনো দেখা হয়েছে? তাঁকে চিনতেন?

শেখ শহীদুল ইসলাম : দেখা হয়েছে, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।

মহি : কোন সালে?

শহীদ : ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর ওনাকে অ্যারেস্ট করল না? আমি খালাম্মার (বেগম মুজিব) সঙ্গে গেছি খালুজানের সঙ্গে দেখা করতে। জেলগেটে দেখি ওনার (সুতারের) ওয়াইফ আর খালাম্মা কথা বলতেছে। ওনার ওয়াইফ ছিলেন একটা স্কুলের হেডমিসট্রেস। চিত্ত সুতারের নাম আগে শুনেছি, দেখা হয় নাই। ওই দিন দেখা হইল। পান খাইতে খাইতে ধুতি পরা এক ভদ্রলোক আসলেন। খালাম্মা আমার সঙ্গে পরিচয় করায়া দিলেন—দাদা, এইটা আমার বোনের ছেলে। তখন আমি জানলাম যে ইনি চিত্ত সুতার।

মহি : উনি ইন্ডিয়া চলে যান কোন সালে?

শহীদ : ওনাকে জেল থেকে আগেই ছেড়ে দেওয়া হইছিল। জেলখানার ভেতরেই কনট্যাক্ট হইছিল। ইন্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁকে দায়িত্ব দিছিলেন। ২১ রাজেন্দ্র রোডের বাড়ি থেকে হি ইউজড টু অপারেট। বনগাঁয়ের বাড়িটা, যেখানে পরে আমু ভাই থাকতেন, সেইটা ভাড়া নিল, তারপর আগরতলায় শ্রীধর ভিলা। তুরা আর শিলিগুড়িরটা পরে ভাড়া নিছে। কালশিতে (উত্তর প্রদেশে) আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছিল। আমাদের আবু হেনা—তাকে পাঠানো হইল টু মেক আ সার্ভে।

মহি : কোন ইয়ারে?

শহীদ : সত্তরের ইলেকশনের আগে। আবু হেনা কী করল? কায়েদে আজম কলেজের (পরে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) বাবুলরে সঙ্গে নিয়া গেল। তখন বঙ্গবন্ধু এইটা স্টপ করে দিলেন। এরে নিয়া যাওয়া ঠিক হয় নাই। জানাজানি হইলে ইলেকশনটা বন্ধ করে দেবে। সুতরাং ইট ওয়াজ স্টপড। তা না হইলে আমরা ফার্স্ট ব্যাচ তো সেভেন্টিতেই চইলা যাই।

মহি : আবু হেনা ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বলেছেন, একাত্তরের আগে কখনো যান নাই।

শহীদ : না না, যাইতে গিয়াই তো এই প্রবলেমটা হইল।

মহি : গিয়েছিল?

শহীদ : বিএসএফের কাছে ধরা পড়ল না? নদীর মধ্য দিয়া বর্ডার ক্রস করতে গেছিল, আবু হেনা আর বাবুল।

মহি : কোন জায়গায়, কোন নদী?

শহীদ : রাজশাহী, পদ্মা নদী দিয়া। ধরা পড়ার পর হি ওয়াজ সেন্ট ব্যাক। বাবুলও ছিল। উনি খালি খালি তারে নিয়া গেছে।[৫]

## ৩

সিরাজুল আলম খান আমাকে বলেছিলেন, গোপনে গড়ে ওঠা বিএলএফের হেডকোয়ার্টার ছিল কেরানীগঞ্জে রতন-গগন-মাখনের বাড়ি। গ্রামের নাম কলাতিয়া। রতনের ভাই বোরহানউদ্দিন গগন ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আমরা জানতাম, একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চলছে। যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। যুদ্ধের গল্প বইয়ে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের একটা যুদ্ধ হয়েছিল বটে। তবে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিমে। পূর্ব পাকিস্তান ছিল যুদ্ধের বাইরে। যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ হতে পারে, তা বোঝার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

মার্চ মাসজুড়ে পথে-ঘাটে অনেক স্লোগান হয়েছে, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। আমার জানামতে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা বন্দুকের দোকান লুট হয়েছিল ওই সময়। ওই সব দোকানে পাখি শিকারের জন্য সাধারণ বন্দুক কিংবা পয়েন্ট টু টু বোরের রাইফেল বেচাকেনা হতো। মার্চের প্রথম দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠসংলগ্ন জিমনেসিয়ামের পাশে একটা কামরায় ইউওটিসির অনেকগুলো ডামি রাইফেল ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দরজা ভেঙে ওই ডামি রাইফেলগুলো নিয়ে আসে। এগুলো কাঁধে ঠেকিয়ে রাস্তায় ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা কয়েক দিন মিছিল-প্যারেড করে, ছবি তোলে। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে দুদু নামের এক সিরাজভক্ত রাতে ছাত্রলীগের কয়েকজনকে একটা টু টু বোরের রাইফেল হাতে নিয়ে দেখিয়েছিলেন এটা কীভাবে চালাতে হয়। ওটা দিয়ে বড়জোর হাঁস কিংবা বক শিকার করা যায়। আ স ম আবদুর রব উঁচু গলায় স্লোগান দিতেন—'বাঁশের লাঠি তৈরি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। তো বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পাকিস্তানি

সৈন্য এ দেশ থেকে বিদায় করা হবে, এই ছিল চিন্তা, এই ছিল প্রস্তুতি। মনে মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে নেতাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে বসলে আমরা সবাই দিশেহারা হয়ে যাই।

২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের জনগণ আক্রান্ত হলো। দেশ একটি সংকটে পড়েছে এবং সংঘাতের দিকে যাচ্ছে, এটি অনুমিত ছিল। কিন্তু আক্রমণের ভয়াবহতা সবাইকে বিস্মিত করেছিল।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা শুরু হয় ১৬ মার্চ। তাঁরা কয়েক দফা দলবলসহ, এমনকি একান্তেও বৈঠক করেন। দুই পক্ষের উপদেষ্টারা কয়েক দফা মিলিত হন। পাকিস্তানকে এক রেখে সংকট কাটানোর লক্ষ্যে একটা সংবিধানের খসড়া তৈরির কাজে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। শেখ মুজিব কোনো ধরনের সামরিক বিকল্পের কথা ভাবেননি। তিনি চেয়েছিলেন সমঝোতার মাধ্যমে একটা নিষ্পত্তি। দুই পক্ষের উপদেষ্টাদের মধ্যে শেষ যোগাযোগ হয়েছিল ২৪ মার্চ। ওই দিন শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দেশের নাম হবে ‘কনফেডারেশন অব পাকিস্তান’। প্রস্তাবিত সংবিধানে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুটি আলাদা সার্বভৌম সংসদ এবং আলাদা সংবিধানের কথা বলা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব অপেক্ষা করছিলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি ঘোষণার মাধ্যমে বিষয়টি জাতিকে অবহিত করবেন এবং সংকটের একটি সুরাহা হবে। শেখ মুজিবের পক্ষে আলোচক দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন কামাল হোসেন। ২৫ মার্চ সারা দিন তিনি একটি টেলিফোন কলের আশায় বসে ছিলেন। শেখ মুজিব রাত আটটার দিকে কামাল হোসেনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন ফোনটি এসেছিল কি না। ফোন আর আসেনি।[৬]

কাউকে না জানিয়ে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় একটি বিশেষ বিমানে ঢাকা ছেড়ে করাচির পথে উড়াল দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডির বাসায় অপেক্ষা করছিলেন, কখন আক্রমণটি আসবে। অবশেষে আক্রমণটি শুরু হলো মধ্যরাতে।

আওয়ামী লীগ এবং বিএলএফের শীর্ষ নেতৃত্ব তাকিয়েছিলেন শেখ মুজিবের দিকে, ছিলেন তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায়। আক্রমণ এলে কীভাবে তা প্রতিরোধ করা হবে, কিংবা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কীভাবে তা মোকাবিলা করা যাবে, তার প্রস্তুতি ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের চারজন সদস্য এবং বিএলএফের চার নেতা

জানতেন, তাঁদের কোথায় যেতে হবে। আর জানতেন তাঁরা, যাঁদের এই তথ্যটুকু ওই নেতারা জানিয়েছিলেন। এঁদের সংখ্যা খুব বেশি না।

## ৪

আক্রমণের পর ঢাকার আশপাশে কয়েক দিন আত্মগোপন করে বা নিরাপদ স্থানে থেকে শীর্ষ নেতারা সবাই ছুটলেন ভারত সীমান্তের দিকে। তাঁদের কারও কারও গন্তব্য কলকাতার ভবানীপুরে, 'সানি ভিলা'।

আবদুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা সবাই বুড়িগঙ্গার অপর পারে কেরানীগঞ্জে শেল্টার নেব। আমাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যোগ দেওয়ার কথা। তিনি যেন নিরাপদে পালাতে পারেন, সে জন্য তাঁর বাড়ির পেছন দিকের দেয়ালে একটা মই রাখা ছিল।'[৭]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে গ্রেপ্তার বরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, এটি সিরাজুল আলম খান জানতেন না। তিনি কেরানীগঞ্জের কলাতিয়ায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একাত্তরের এপ্রিলের শেষ দিকে আগরতলায় তাঁর সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়, তিনি বলেছিলেন, 'আমার বিশ্বাস ছিল মুজিব ভাই আসবেন। মনি আর তোফায়েল গগনের বাড়িতে দুদিন অপেক্ষা করে চলে গেল। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে গেলাম না। আমি আরও দুদিন সেখানে থাকলাম। শেষমেশ বুঝলাম, উনি অ্যারেস্ট হয়েছেন।'[৮]

বিএলএফ নেতাদের পরবর্তী গন্তব্য হলো কলকাতা। কেউ আগে গেলেন, কেউ পরে। ২৫ মার্চ রাত থেকে কলকাতা পৌঁছানো পর্যন্ত ঘটনার একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন তোফায়েল আহমেদ। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় যেটুকু জানলাম, তা এখানে তুলে ধরছি :

> মহি : ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের সময় কোথায় ছিলেন?
>
> তোফায়েল : আমি আর মনি ভাই একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে একটা গাড়ি ছিল। গাড়িটা দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী জহিরুল ইসলাম। গাড়িতে আমার একটা ব্যাগ ছিল। ওতে কিছু জিনিসপত্র আর একটা রিভলবার ছিল। আমরা গাড়িটা বিজয়নগরে জহিরুল ইসলামের বাসায় রেখে মনি ভাইয়ের আরামবাগের বাসায় গেলাম। ২৭ মার্চ কারফিউ যখন একটু শিথিল হলো, তখন আমরা জহিরুল ইসলামের বাসায় গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসলাম। গাড়িতেই রওনা দিলাম সদরঘাটের দিকে। তারপর নৌকা করে ওই পারে। গেলাম

কলকাতার সানি ভিলা ছবি : সৈয়দ বদরুল আহসান

গগনদের বাড়ি, কেরানীগঞ্জের কলাতিয়ায়। ওইখানে সবার সঙ্গে দেখা হলো—সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই। ওইখানে আরও ছিলেন কামারুজ্জামান, মনসুর আলী, আবু হেনা ও আরও অনেকে।

মহি : কলাতিয়ায় কত দিন ছিলেন?

তোফায়েল : ওখান থেকে ২৯ মার্চ কামারুজ্জামান, মনসুর আলী, আবু হেনা, মনি ভাই আর আমি রওনা দিলাম। সারিয়াকান্দি,

বগুড়া হয়ে বালুরঘাটে আবু হেনা আগে যে পথে ইন্ডিয়া গিয়েছিল, আমাদের সেই পথেই নিয়ে গেল। মাঝপথে মনসুর আলী সাহেব চলে গেলেন। বললেন, তিনি বাড়ি যাবেন। তিনি সারিয়াকান্দি থেকে নিজ বাড়িতে চলে গেলেন। আমরা বর্ডার ক্রস করে ভারতে গেলাম। আমাদের তো ঠিকানা দেওয়াই ছিল, ২১ রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, কলকাতা। আবু হেনা তার রুট অনুযায়ী আমাদের নিয়ে গেছে। এপ্রিলের ৪ তারিখ আমরা চারজন কলকাতায় পৌঁছলাম। মনসুর আলী সাহেব পরে গেছেন।

মহি : সিরাজ ভাই কখন গেলেন?

তোফায়েল : সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই আমাদের সঙ্গে আসেন নাই। তাঁরা পরে এসেছেন।[৯]

যেহেতু গন্তব্য কলকাতা, মুজিবের অনুসারীদের দরকার একটি অবলম্বন। এমন একজন, যাঁর সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন আবু হেনা। তাঁর দেওয়া বিবরণটি ছিল এ রকম :

২৫ মার্চ ঢাকায় ক্র্যাকডাউনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২৭ মার্চ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবকে নিয়ে রায়েরবাজার দিয়ে বের হওয়ার সময় কামারুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। তিনজনে মিলে নদী পার হয়ে জিনজিরা দিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। পথে পেয়ে গেলাম গোলাম রসুল ময়নাকে। ময়না ছিলেন শেখ মনির ক্লাসমেট। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন কলাতিয়ার বোনের বাড়িতে। এটা ছিল রতন চেয়ারম্যানের বাড়ি। এখানে গিয়ে পেয়ে গেলাম শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, শাজাহান সিরাজ এবং আ স ম আবদুর রবকে। বিকেলে এসে হাজির হলেন নূরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখন।

আমার ইচ্ছা ছিল গ্রামের বাড়িতে যাব। যেহেতু আমি আগেই কলকাতায় গিয়ে সবকিছু দেখে এসেছি, পথঘাট চেনা, তাই সবাই বলল, তোমাকে ছাড়া যাওয়া যাবে না। ফলে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো। এখানে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো—আমি, মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, শেখ মনি, তোফায়েল—এই পাঁচজন একত্রে কলকাতা রওনা দেব। সিরাজুল আলম খান এবং আবদুর রাজ্জাক আরও কিছু দায়িত্ব সেরে পরে যাবেন।

নৌকায় করে আমরা মানিকগঞ্জে গেলাম। সেখানে হাবু মিয়ার

(স্টেট মিনিস্টার ছিলেন) দেখা পেলাম। তাঁর বড় ভাই লেবু মিয়া আমাদের যমুনার পারে পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে দুই দিনের মাথায় ছোট্ট একটা লঞ্চে পৌঁছে গেলাম সিরাজগঞ্জে। এরপর বগুড়ার সারিয়াকান্দি হয়ে হিলি এবং সেখান থেকে সরাসরি কলকাতায় পৌঁছলাম। তবে মনসুর আলী সাহেব কলকাতায় গেলেন না। তিনি সারিয়াকান্দি থেকে আবার সিরাজগঞ্জে ফেরত গেলেন। বললেন, 'সন্তানদের রেখে আমি যাব না।' সাত্তার নামে আর্মির অবসরপ্রাপ্ত এক কমান্ডোকে তাঁর সঙ্গে দিলাম। পরে মনসুর আলীকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।[১০]

সিরাজুল আলম খান তখন কী করছিলেন? তিনি প্রায়ই এস এম হলে সুমন মাহমুদের কামরায় থাকতেন। তাঁদের দুজনের দেখা ও কথা হতো নিয়মিত। ওই সময়ের একটি বয়ান পাওয়া যায় সুমনের ভাষ্যে। এখানে ২৫ মার্চ-পরবর্তী দুই সপ্তাহে সিরাজুল আলম খানের গতিবিধি উঠে এসেছে :

> ২৫ মার্চ সারা দিনই ছিল উত্তেজনায় ভরা। রাত সাড়ে ১০টায় থ্রি-ইন-ওয়ান খুলে রেডিওতে বিবিসির সংবাদ শুনছিলাম। হঠাৎ হলের গেটের কাছ থেকে চিৎকার। কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে—বাবুল, বাবুল। ততক্ষণে তিনি আমার কামরার দরজার কাছে চলে এসেছেন—সিরাজ ভাই। হাঁক দিলেন, 'তাড়াতাড়ি বের হও।'
>
> এস এম হলের ১৬৫ নম্বর কামরায় আমরা চারজন থাকি। এই কামরার একটা ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের ক্যাম্প ছিল এই হলে। এই কামরা স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কামরার ওপরে সিলিং, যা অন্য কোনো কামরায় ছিল না। দ্বিতীয়ত, ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি এই কামরায় থাকতেন।
>
> আমরা যে চারজন এই কামরার বাসিন্দা, তাদের দুজন আগেই বাড়ি চলে গেছে। এদের একজন হলো বদিউর রহমান (পরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান), আরেকজনের নাম রেজাউল, পরে কানাডায় চলে গেছে। আমি আর হাবিবুল্লাহ আছি।
>
> আমি তড়িঘড়ি একটা লুঙ্গির মধ্যে কিছু কাপড়চোপড় আর থ্রি-ইন-ওয়ানটা ভরে একটা বোঁচকা বানিয়ে ফেললাম। হাবিবুল্লাহও রেডি হলো। কী মনে করে কয়েক দিন আগে আমরা দুজন কমব্যাট বুট কিনেছিলাম। সেগুলোও সঙ্গে নিলাম। সিরাজ ভাই মোটরবাইক

নিয়ে এসেছেন। রাস্তায় গাছ কেটে আড়াআড়ি করে ফেলে রাখা হয়েছে। এগুলো ব্যারিকেড। ফুটপাত দিয়ে মোটরবাইক ঠেলে ঠেলে যাচ্ছি। পলাশী রেলক্রসিং পার হয়ে *আজাদ* অফিসের দিকে গেলাম। লালবাগ কেল্লার ডান দিকে একটা গলি। সেখানে বস্তির মতো জায়গায় একটা ঘর। ইটের দেয়াল, টিনের চাল। রাস্তা বরাবর দরজা। আমানুল্লাহ নামের এক শ্রমিকনেতা থাকেন সেখানে। আমরা ওই ঘরে উঠলাম। হাবিবুল্লাহ আর আমি বের হলাম খাবারের খোঁজে। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই আমরা মোড়ের দোকান থেকে পরোটা-মাংস নিয়ে ফিরলাম। তখনই শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি। সিরাজ ভাইকে বেশ পুলকিত মনে হলো।

এই যে, দেখেছ?

মানে অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। একটু পরে শুরু হলো প্রচণ্ড শব্দ। ঘুমানোর প্রশ্নই আসে না। সারা রাত বসে বসেই কাটালাম।

আমরা বড়জোর ১৫ মিনিট ঘরের বাইরে ছিলাম। লালবাগ থানা তখন কেল্লার ভেতরে। হেঁটে যেতে চার-পাঁচ মিনিট লাগে। এর মধ্যে দৌড় দিয়ে সিরাজ ভাই থানা ঘুরে এসেছিল কি না, জানি না। জিজ্ঞেস করিনি, উনিও বলেননি। পরে শুনেছি, উনি নাকি ওই রাতে লালবাগ থানায় গিয়েছিলেন।

ভোরের আলো ফোটার আগেই বোঁচকা নিয়ে আবার বের হলাম। মোটরবাইক থাকল আমানুল্লাহর কাছে। পুরান ঢাকার সব অলিগলি সিরাজ ভাইয়ের চেনা। হেঁটে হেঁটে পৌঁছালাম সোয়ারীঘাট। একটা নৌকায় উঠলাম। জায়গাটি আমার চেনা। সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে অনেকবার এসেছি এ জায়গায় বাঁশ কিনতে। প্যান্ডেল বানাতে, মশাল বানাতে বাঁশ লাগত প্রায়ই। এ ছাড়া মাইকের খুঁটি এবং মারামারির জন্যও বাঁশ লাগত।

নদী পার হয়ে গেলাম কামরাঙ্গীরচর। ভেজা পথ। কিছু দূরে আবারও নদী। আরেকটা নৌকায় উঠলাম। ওপারে নেমে একটু হেঁটে একটা বাড়িতে গেলাম। এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ি। এটা হলো মোস্তফা মোহসীন মন্টুর নানাবাড়ি। খোঁজ করে জানলাম, মন্টু ভাই কেরানীগঞ্জ থানায় গেছেন অস্ত্র আনতে।

কিছুক্ষণ পর মন্টু ভাই এলেন। সঙ্গে সাত-আটজন সশস্ত্র লোক। থানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র সবই নিয়ে এসেছেন। সবাই একসঙ্গে বের হলাম। কিছু দূরে বড় একটা পুকুর। চারপাশে গাছপালা। পুকুরপাড়ে কিছু লোক হতাশ ভঙ্গিতে শুয়ে-বসে আছে। কারও

কারও সঙ্গে রাইফেল। ২৫ জনের মতো। সবার কাপড় ভেজা। দেখেই বোঝা যায়, এরা ইপিআরের সৈন্য। রাতে নদী সাঁতরে এখানে এসেছে। সিরাজ ভাই ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এমন সময় হাবিবুল্লাহর ইচ্ছা হলো বাড়ি যাওয়ার।

কোথায় যাবা তুমি?

কাছেই সৈয়দপুরে লঞ্চঘাট আছে। ওখান থেকে লঞ্চে বাড়ি যেতে পারব। ২০টা টাকা দাও।

ওর বাড়ি কুমিল্লায় ধারিয়ারচর। ও চলে গেল। আমরা সবাই মন্টু ভাইয়ের নানাবাড়িতে দুপুরের খাবার খেলাম। ঢাকা শহর থেকে তুমুল শব্দ ভেসে আসছে। এর সঙ্গে ধোঁয়া। এদিকে এ বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। সিরাজ ভাই তাদের নিয়ে গ্রুপ গ্রুপ করে কথা বলছেন, এদিক-সেদিক পাঠাচ্ছেন। সন্ধ্যায় আমরা দুজন আবার বের হলাম। নদীর ঘাট থেকে একটা নৌকা নিলাম। আমাদের সঙ্গে আরও তিন-চারজন। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা। ঢাকা শহরে আগুন জ্বলছে। মানুষ ছুটছে পাগলের মতো, নদী পার হচ্ছে।

নদীর মধ্য দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা ঘাটে নামলাম। সেখানে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। সিরাজ ভাই তাদের সঙ্গে কথা বললেন। আমরা অন্ধকারের মধ্যেই হাঁটছি। এক ঘণ্টার বেশি হেঁটে একটা বাজারের মধ্যে এলাম। বেশ বড় একটা পুকুর। এক পাশে বড় বড় দুটি টিনের ঘর, মেঝে পাকা। জানলাম, এই গ্রামের নাম কলাতিয়া, এটা রতন-গগনদের বাড়ি। একটা ঘরে আমাদের দুজনকে থাকতে দিল। অন্যরা আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। এভাবেই পার হলো ২৬ মার্চের রাত।

পরদিন ভোরে আবার গেলাম মন্টু ভাইয়ের নানাবাড়ি। সেখানে দেখলাম তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, রতন-গগনদের ভগ্নিপতি ময়না ভাই এবং আরও কয়েকজন। দেখলাম ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও আবু হেনা বসে আছেন। এ ছাড়া শেখ ফজলুল হক মনি, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ ও আবদুল কুদ্দুস মাখনও আছেন। আমি আ স ম আবদুর রবের খোঁজ করলাম। শুনলাম, তিনি এখানে এসেছিলেন, চাঁদপুরে চলে গেছেন।

পরদিন ২৮ মার্চ। আমি রেডিওর নব ঘোরাচ্ছি। সকাল ১০টা-সোয়া ১০টার দিকে চট্টগ্রাম বেতার ধরা পড়ল। তখন মেজর জিয়ার

ঘোষণা শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডার অন করে রেকর্ড করলাম। 'জিয়া' শব্দটির উচ্চারণ ছিল 'ইয়া'। তোফায়েল ভাই মন্তব্য করলেন, 'এইটা আবার কোন মেজর ইয়া।'

পরদিন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, শেখ মনি, তোফায়েল আহমেদ আর আবু হেনা চলে গেলেন একটা লঞ্চে। কেউ একজন এসে রিপোর্ট করল, তাজউদ্দীন আহমদ কেরানীগঞ্জ হয়ে নদী পার হয়ে চলে গেছেন, এখানে থামেননি। শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখনও অন্য পথে চলে যান।

সকালে সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই আর আমি একসঙ্গে বের হলাম। সঙ্গে একজন গাইড। সারা দিন হেঁটে সন্ধ্যায় পৌঁছালাম সৈয়দপুরে। বাজারে একজন নাপিত বসেছিল কুপি জ্বালিয়ে। সিরাজ ভাই বসে পড়লেন ওখানে। নাপিত চুল ছেঁটে দিল, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিল। ওখানে দেখা হলো খসরু ভাই, হাসানুজ্জামান (জুডো মনি) এবং আরেকজনের সঙ্গে। সেখান থেকে আমরা লঞ্চে করে চলে গেলাম মুন্সিগঞ্জে, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়িতে। সেখান থেকে বড় একটা নৌকায় করে ওপারে গেলাম। খসরু ভাইয়ের কোমরে একটা পিস্তল গোঁজা। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। পিস্তলটা তিনি আমার বোঁচকার মধ্যে রাখলেন। রাতে চরের মধ্যে একটা বাড়িতে থাকলাম।

পরদিন ভোরে আবার হাঁটা শুরু। শরীয়তপুরের এক জায়গায় আমরা গেলাম *ইত্তেফাক*-এর সাংবাদিক আমির হোসেনের বাড়িতে। সেখানে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার পথচলা। পথে একটা ঘোড়া জোগাড় করে খসরু ভাই তার ওপর চড়ে বসলেন।

আমরা পাঁচজন হাঁটছি। খসরু ভাই ঘোড়ায়। সঙ্গে রেডিও-জাতীয় একটা জিনিস। দেখে গ্রামের লোকের সন্দেহ হলো। তারা আমাদের ঘেরাও করে ফেলল। পরে রাজ্জাক ভাইয়ের পরিচয় পেয়ে তারা বদলে গেল। রাজ্জাক ভাই ওই এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় পৌঁছালাম মাদারীপুর। আসমত আলী খান সেখানে জাতীয় পরিষদের সদস্য। তাঁর বাড়িতে উঠলাম। আসমত আলী খানের ছেলে শাহজাহান খান সেখানে ছিলেন। খবর পেয়ে এলেন ফণীভূষণ মজুমদার। এসডিও সাহেবের জিপ চেয়ে আনা হলো। ফণী মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা টেকেরহাট গেলাম। সেখান থেকে একটা লঞ্চে করে পরদিন ভোরে পৌঁছালাম মোল্লারহাট।

আমার বাবা নিজামউদ্দিন আহমদ মোল্লাহাটের ওসি, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। উনি তখন খুলনায়। আমাদের বাসায় তখন খুলনার এসপি সাহেবের পরিবার। তাঁরা খুলনা থেকে এখানে চলে এসেছেন। আমরা থানার একটা ইন্সপেকশন কামরায় উঠলাম।

নাশতা খেয়ে রাজ্জাক ভাই, খসরু ভাই আর জুডো মনি বিদায় নিলেন। এসপি সাহেবের পরিবার ৪ এপ্রিল মোল্লাহাট ছেড়ে চলে যায়। আব্বা-আম্মা এসে যান বাসায়।

কলাতিয়া ছেড়ে যাওয়ার আগে সিরাজ ভাইকে একটা খাম দিয়েছিলেন মনি ভাই। ৯ এপ্রিল আমরা সকালে নৌকা করে মোল্লাহাটের পাশে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাই। সেখানে অল্প কয়েকজন লোক ছিলেন। সিরাজ ভাই তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। কাছাকাছিই মনি ভাইয়ের স্ত্রী শামসুননেসা আরজু থাকেন। সিরাজ ভাই তাঁকে খামটা দিলেন। ভেতরে একটা চেক আর ছোট একটা চিরকুট।

টুঙ্গিপাড়ায় ফিরে আসার পর দেখা পেলাম বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের আর কামালউদ্দিন সিদ্দিকীর। কামাল সিদ্দিকী নড়াইলের এসডিও। সিরাজ ভাইকে আগে থেকেই চেনেন। শেখ নাসের টুঙ্গিপাড়ায় থেকে গেলেন। কামাল সিদ্দিকী, সিরাজ ভাই আর আমি লঞ্চে করে রওনা হলাম। ওই লঞ্চে করেই কামাল সিদ্দিকী এসেছিলেন। ঘণ্টা তিনেক পর রাত নয়টার দিকে পৌঁছালাম পিরোজপুরের হুলারহাট। আমরা রিকশা করে পিরোজপুর শহরে গেলাম। একটা ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থা হলো।

কিছুক্ষণ পর এক তরুণ এলেন। তিনি লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন। কামাল সিদ্দিকী রাতে থাকার জন্য আরেক জায়গায় চলে গেলেন। পরদিন সকালে এল ছাত্রলীগের নেতা আবুল হাসিব খান। নাশতা খাওয়ার জন্য আমরা এসডিপিও ফয়জুর রহমানের বাসায় গেলাম। ওই সময় হাজির হলেন মেজর জলিল। তিনি বললেন, অস্ত্র লাগবে। তিনি লঞ্চে করে অস্ত্রের খোঁজে বের হয়েছেন। কামাল সিদ্দিকী, সিরাজ ভাই আর আমি ওই লঞ্চে উঠলাম। সঙ্গে মেজর জলিলের কয়েকজন লোক। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে গেলাম মোল্লাহাট।

আমার ছোট বোনের স্বামী নাজমুল আলম তখন খুলনার এনডিসি। তিনি কামাল সিদ্দিকীর বড় ভাইয়ের বন্ধু। আমাকে

> সেখানে রেখে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন। ১০ এপ্রিল সন্ধ্যা। নাজমুলও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। সিরাজ ভাই বললেন, তিনি তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরবেন। চতুর্থ দিন লঞ্চ এল। নাজমুলও ফিরে এলেন। কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে অনেক অস্ত্র নিয়ে এসেছেন লঞ্চে করে। কুষ্টিয়া থেকে নূর আলম জিকুকে সঙ্গে নিয়ে কামাল সিদ্দিকী আর সিরাজ ভাই সীমানা পেরিয়ে ভারতে চলে গেছেন। অস্ত্রের চালান গেল পিরোজপুরে মেজর জলিলের কাছে। আমি মোল্লারহাটে অপেক্ষা করলাম ১০ জুলাই পর্যন্ত। সিরাজ ভাই আর আসেননি। কোনো সংবাদও পাঠাননি।[১১]

বদিউল আলম জগন্নাথ কলেজে বিএ পড়তেন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক ছিলেন। থাকতেন জিন্নাহ হলে (এখন সূর্য সেন হল) রেজাউল হক মুশতাকের কামরায়। মুশতাক ছিলেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক। জিন্নাহ হলে ওই সময় ছাত্রলীগের সংগঠকদের মধ্যে আরও ছিলেন ছাত্রলীগের সহসম্পাদক আ ফ ম মাহবুবুল হক এবং হলের সংগঠক আফতাব আহমাদ। বদিউল ২৫ মার্চের পর তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এক সাক্ষাৎকারে :

> বদিউল আলম : একাত্তরের ক্র্যাকডাউনের পর রেজাউল হক মুশতাক, আ ফ ম মাহবুবুল হক, আফতাব আহমাদ, রফিকুল ইসলাম আর আমি একসঙ্গে ছিলাম কেরানীগঞ্জে, মন্টু ভাইদের বাড়িতে। আমাদের ওখানে রেখে সিরাজুল আলম খান কোথায় চলে গেলেন, কিছুই বলে গেলেন না। আমরা ঠিক করলাম, ইন্ডিয়া চলে যাব। যাওয়ার আগে শহরে ঢুকলাম ২৭ মার্চ। হলে গিয়ে কাপড়চোপড় নিয়ে রওনা দিলাম ফরিদপুরের দিকে।
>
> ২৫ মার্চ রাতে মুশতাক আর আমি একসঙ্গে পলাশীতে ছিলাম। ২৬ মার্চ পুরান ঢাকায় চকবাজারে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের বাসায় ভাত খেয়ে আমরা নদী পার হয়ে কেরানীগঞ্জে চলে যাই। মুশতাক সিরাজদিখান থেকে চাঁদপুর হয়ে চিটাগাং চলে যায়। আমি, আফতাব ভাই, মাহবুব ভাই, রফিক—চারজন একসঙ্গে রওনা দিয়ে ফরিদপুরে যাই। ওখান থেকে রাজবাড়ী যাওয়ার পথে একটা গাড়িতে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে দেখা। আমাদের গাড়িতে ওঠালেন। তারপর আমাদের নিয়ে কুমারখালীর এমপির বাড়িতে রেখে বললেন, 'তোমরা এখানে থাকো।' ওখানে এক দিন থাকার পর জানলাম ফরিদপুরে পাকিস্তানিরা অ্যাটাক করেছে। তখন আমরা রেললাইন ধরে হেঁটে কুষ্টিয়া শহরে চলে যাই। ওখানে

এসপি ছিলেন মামুন সাহেব। তিনি বিদ্রোহ করলেন। তাঁদের সব অস্ত্র আমাদের ছেলেদের দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইন্ডিয়া গেলেন না। পরে পাকিস্তানিদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

কুষ্টিয়ায় জানতে পারলাম, নদীয়ায় 'জয় বাংলা ক্যাম্প' হয়েছে। আমরা চুয়াডাঙ্গা হয়ে গেদে বর্ডার দিয়ে রানাঘাট পৌঁছালাম। ওপারে গিয়ে আমরা অঝোরে কেঁদেছি। আমাদের জন্য কোনো ডিরেকশন ছিল না।

রানাঘাট থেকে ট্রেনে যাচ্ছি নদীয়ার দিকে। ট্রেনে কয়েকজন আমাদের দেখে বলল, 'আপনারা কি জয় বাংলার লোক?' একজন বুড়ো লোক বলল, 'সেই তো আসতে হলো দাদা, কী লাভ হলো মালাউনদের কেটে?'

আমরা নদীয়ায় নামলাম। গেলাম জয় বাংলা অফিসে। দেখি যে সেখানে দাঁড়িয়ে ফণীভূষণ মজুমদার। সেখান থেকে ফণীদাসহ আমরা শিয়ালদা গেলাম। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম এমএলএ হোস্টেলে। সেখানে রব ভাই, শাজাহান সিরাজকে পেলাম। সেখানে ছিলেন যুব কংগ্রেসের নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এবং ছাত্রনেতা সুব্রত মুখার্জি। শাজাহান সিরাজ তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার হাতে ছিল চে গুয়েভারার *গেরিলা ওয়ারফেয়ার*। মুখার্জি এটা হাতে নিয়ে একটু উল্টেপাল্টে দেখে শাজাহান সিরাজকে বললেন, 'দাদা, আপনার ছেলেদের তো দেখি লাল লাল ভাব!'

সেখান থেকে আমরা চলে যাই কিড স্ট্রিটে ডা. বিধান রায়ের বাড়ি। সেখানে থাকার ব্যবস্থা হলো। ট্রেনিংয়ে যাওয়ার আগে সেখানেই ছিলাম। তারপর তো বিএলএফের ট্রেনিং।

মহিউদ্দিন আহমদ: তোমরা যদি কলকাতায় না যেতে, এ যোগাযোগটা না হতো, তাহলে তো তোমরা বিএলএফে যেতে পারতে না? তোমাদের তো আগে কোনো ডিরেকশন দেওয়া হয়নি।

বদিউল : না, আমরা কোনো ডিরেকশন পাইনি।

মহি : তার মানে, আগে থেকে আমাদের প্রস্তুতি ছিল, এটা তো বলা যাবে না। তুমি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক। অথচ তুমি জানো না কোথায় যেতে হবে!

বদিউল : সিরাজুল আলম খান তো আমাদের কেরানীগঞ্জে রেখে চলে গেলেন। তারপর রাজবাড়িতে দেখা। তখনো কিছু বলেননি।

মহি : ট্রেনিংয়েই তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো। এটা তো কাকতালীয়!

বদিউল : হ্যাঁ। রাজশাহীতে আমাদের লোক ছিলেন ডা. করিম। বর্ডার ক্রস করার পর তাঁকে তো বিএসএফ বেদম পিটিয়েছে, নকশাল মনে করে। আসলে কোনো যোগাযোগ বা সমন্বয় ছিল না।[১২]

শরীফ নুরুল আম্বিয়া ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শেষ বর্ষের ছাত্র। একই সঙ্গে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি। তিনি ছিলেন বুয়েটে সিরাজুল আলম খানের একজন আস্থাভাজন সংগঠক। সবার মতো তিনিও চেয়েছিলেন একটা যুদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। কেমন ছিল তার প্রস্তুতি। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন এখানে তুলে ধরলাম :

মহি : ২৫ মার্চ রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

আম্বিয়া : ওয়ারীতে ছিলাম, ডাক্তার মাহমুদুর রহমানের বাসায়। উনি সম্পর্কে ইনুর খালাতো ভাই। আমাদের বানানো কিছু জিনিসপত্র ছিল। এগুলো সালেহ মৌলভিকে দিলাম। সে বলল, আমি সিরাজ মিয়ার লোক, কোনো অসুবিধা নাই। পলাশীর বস্তিতে এগুলো রাইখা দিব।

রেললাইন ধরে আমরা যখন শহীদ মিনার পার হই, তখন মাথার ওপর দিয়া ট্রেসার বুলেট যাইতেছে। আমাদের সঙ্গে ছিল জগন্নাথ কলেজের নজরুল। ওয়ারীতে মাহমুদুর রহমানের বাসায় দুই দিন ছিলাম। ২৭ মার্চ আমরা এদিক-ওদিক হেঁটে সন্ধ্যার সময় আজিমপুরে এলাম। ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলে এক রাত থাকলাম। তখন জানলাম, নেতারা নদীর ওপারে চলে গেছে। পরদিন ওপারে গিয়ে এক দিন থাকলাম সৈয়দপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অফিসে। ওখানে ইপিআরের অনেকেই ছিল, রাইফেল হাতে। ওখানে আরেফ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। পরে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের নেতা ইয়াহিয়া খান পিন্টুর বাড়ি পাড়াগ্রামে ছিলাম। আমি, ইনু, আরেফ ভাই আর সেলিম ভূঁইয়া প্রায় এক মাস ছিলাম। ওখানে ওয়েট করলাম। কারণ, আরেফ ভাই বলল, সাপ্লাই আসবে। মাঝেমধ্যে ঢাকা শহরে এসে যোগাযোগ করতাম। কাউকে পেয়েছি, কাউকে পাই নাই।

এপ্রিল চলে যাচ্ছে। সাপ্লাই-টাপ্লাই আর আসে না। আরেফ ভাই অস্থির হয়ে গেছে। আমরা ঠিক করলাম নদীর ওপারে টুলু (মাজহারুল হক টুলু) ভাইয়ের বাড়ির কাছ দিয়ে বের হয়ে যাব। সেটা সম্ভব হলো না। কারণ, নদীর ওপারে আর্মি ক্যাম্প বসিয়েছে।

পরে আমরা মানিকগঞ্জ হয়ে লঞ্চে পাবনা, তারপর হেঁটে কুষ্টিয়া হয়ে জলঙ্গি বর্ডার দিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেলাম। বিএসএফ আমাদের অ্যারেস্ট করল। মানে হেফাজতে নিল। ওরা বলল, এখানে জয় বাংলা অফিস আছে, ওখানে যান। জলঙ্গির করিমপুরে রাজশাহীর এক ছাত্রনেতা ছিল। সে বলল, কলকাতায় গেলে সব নেতাকে পাওয়া যাবে। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে বাসে করে তিন ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছালাম।

মহি : চিত্ত সুতারের বাড়ি?

আম্বিয়া : না, প্রিন্সেপ স্ট্রিট। দেখলাম, ওখানে অনেক লোকজন থাকে, খাওয়াদাওয়া হয়, ডাল-ভাত। একটা ট্রানজিট ক্যাম্পের মতো। ওখানে কয়েক দিন ছিলাম। তারপর যোগাযোগ করে চিত্ত সুতারের বাড়িতে গেলাম। সেখানে সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো।

মহি : চিত্ত সুতারের বাড়ির রেফারেন্স পেলেন কোথায়?

আম্বিয়া : আরেফ ভাই জানতেন।

মহি : আরেফ ভাইসহ গেলেন?

আম্বিয়া : না। আরেফ ভাইয়ের শরীর খারাপ ছিল। তাঁকে রেখেই আমরা চলে এসেছিলাম। আমি, ইনু, সেলিম ভূঁইয়া—আমরা তিনজন। মানিকগঞ্জেই উনি লঞ্চ থেকে নেমে যান। তাঁর মাইন্ডে অন্য কিছু ছিল কি না, জানি না।

মহি : টুলু ভাই আমাকে বলেছে, আরেফ ভাই কলকাতা গেছে জুনে।

আম্বিয়া : হ্যাঁ, আরেফ ভাই পরে গেছেন। আমরা তো গেছি মে মাসে। উনি মাসখানেক পরে গেছেন। তাঁকে চিনতে পারি নাই। মুখভর্তি দাড়ি। বিএসএফের কাছে আমরা সিরাজুল আলম খান আর আবদুর রাজ্জাকের নাম বলেছি। এটা রিপোর্টেড হইছে। ওনারা জানছেন। জানার পর আমাদের নিয়া গেছেন।

মহি : বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ কি প্রিন্সেপ স্ট্রিটে?

আম্বিয়া : না, বর্ডারে। ইনুর কাছে পিস্তল ছিল। ওটা নিয়া গেছে। আমাদের দু-এক বেলা খাওয়ার টাকা আর বাসভাড়া দিছে।

সিরাজ ভাই বললেন, 'তোমরা রেডি থাকো। ব্যবস্থা হচ্ছে। তোমাদের ট্রেনিংয়ে যাইতে হবে।'[১৩]

রায়হান ফিরদাউস (মধু) মুহসীন হলেই থাকত। আমরা একই ব্যাচের। হাতের লেখা সুন্দর। ছাত্রলীগের জন্য লিফলেট লেখা, পোস্টার

আঁকা—এসব করত সে। ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্ব তো বটেই, সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে তার সখ্য ছিল চোখে পড়ার মতো। ২৫ মার্চ-পরবর্তী সময়টি তার কেমন কেটেছে, এটি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। সে তার অভিজ্ঞতার বয়ান দিল এভাবে :

> ২৫ মার্চ রাতে আ ফ ম মাহবুবুল হক আর আমি একসঙ্গে ছিলাম। রাত কেটেছে বকশীবাজারের কাছে এক বাসায়। ২৬ মার্চ সকালে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের কাছে কিছুক্ষণ ছিলাম। বিকেলে নদী পার হয়ে কেরানীগঞ্জে চলে যাই। ২৭ তারিখ ঢাকা শহরে একবার ঢুকেছিলাম। ওই সময় মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বিকেলে আবার যাই কেরানীগঞ্জে। ২৮ তারিখ দেখা হয় রব ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা দুজন ২৯ মার্চ দিঘলি হয়ে লঞ্চে চলে যাই চাঁদপুরে। রব ভাই এক পাতার একটা পত্রিকা বের করার প্ল্যান করেন, মুক্তিযুদ্ধ-টুদ্ধ—এই সবের খবর দিয়ে। তিন দিন পর রায়পুর হয়ে মাইজদী যাই, উঠি কচি ভাইয়ের বাড়ি। আমাকে ওখানে রেখে রব ভাই আগরতলা রওনা হয়ে যান। বলে যান, আমাকে খবর পাঠাবেন। খবর আর আসে না। আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হক, ছাত্রলীগের ইকবাল হলের নেতা ফজলে এলাহি আর আমি সপ্তাহখানেক পর ঠিক করলাম, আগরতলা যাব। গেলাম। কিন্তু সেখানে ঘোরাঘুরি করে পরিচিত কাউকে পেলাম না। তিনজনই মাইজদী ফিরে আসি। তারপর আমি চট্টগ্রামে চলে যাই।
>
> অক্টোবরের শেষ দিকে আহমদ শরীফ মুনিরকে সঙ্গে নিয়ে আবার গেলাম আগরতলা। শ্রীধর ভিলায় পেলাম রব ভাইকে। দেখা হলো আরও অনেকের সঙ্গে। নভেম্বরের ২৩ তারিখ আমি কলকাতা যাই। সেখান থেকে শিলিগুড়িতে বিএলএফের পাংগা ক্যাম্পে। তার আগেই ট্রেনিং শেষ।
>
> মার্চের কোনো এক সময় সিরাজ ভাই বলেছিলেন কী করতে হবে, কী কী করণীয়। ইন্ডিয়া যাওয়ার কথা কখনো বলেননি।[১৪]

তথ্যসূত্র

১. সুমন মাহমুদ
২. শরীফ নুরুল আম্বিয়া
৩. আবু হেনা

৪. *The Untold story of Dr. Abu Hena*, interview by Anwar Parvez Halim, *Probe,* Issue 5, Volume 13, December 16-31, 2014, p. 19-22
৫. শেখ শহীদুল ইসলাম
৬. তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৫), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র,* পঞ্চদশ খণ্ড, 'ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার'. পৃ. ২৭২-২৭৭
৭. আবদুর রাজ্জাক
৮. সিরাজুল আলম খান
৯. তোফায়েল আহমেদ
১০. *The Untold Story of Abu Hena*
১১. সুমন মাহমুদ
১২. বদিউল আলম
১৩. শরীফ নুরুল আম্বিয়া
১৪. রায়হান ফিরদাউস

# মুক্তিযুদ্ধ

কলকাতায় বিএলএফ নেতারা সবাই মিলিত হলেন ভবানীপুরের সানি ভিলায়। এখন তাঁরা কী করবেন? তাঁদের এই ঠিকানা মুখস্থ করিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এর বাইরে তাঁরা কিছু জানতেন না। ২৫ মার্চ-পরবর্তী সময়টুকুতে শেখ মুজিব তাঁদের পাশে নেই। অচেনা পরিবেশে থিতু হতেও সময় লাগে। পরে তাঁরা যে কর্মযজ্ঞে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তার সূত্রপাত কীভাবে হলো, এ নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। উনি সরাসরি কিছু বলেন না। একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে জবাব দেওয়া তাঁর স্বভাব। আমাদের আলাপচারিতা ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ : ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হলো কীভাবে?

সিরাজুল আলম খান : ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের শপথ নেওয়ার অনুষ্ঠানে ঘোরাফেরা করছি। এমন সময় একজনকে দেখলাম, হাতে একটা অ্যাটাচি ব্যাগ। তিনিও যেন কাউকে খুঁজছেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। মনে হলো, আমরা যাঁকে খুঁজছি, ইনিই তিনি। তিনি যাদের খুঁজছেন, আমরাই সেই লোক। তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা।

মহি : তাঁর নাম কী?

সিরাজ : নামটা যেন কী, মনে নেই।

মহি : স্মরণ করার চেষ্টা করুন। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিরাজ : মনে পড়েছে। তাঁর নাম ব্যানার্জি। বাঙালি।

মহি : পুরো নাম বলুন। বাঙালিদের মধ্যে লাখ লাখ ব্যানার্জি আছে।

সিরাজ : পুরো নাম মনে পড়ছে না।

মহি : আপনাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা তো হলো জেনারেল উবানের মাধ্যমে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হলো কীভাবে?

সিরাজ : ব্যানার্জির মাধ্যমে জেনারেল উবানের সঙ্গে দেখা হয়।[১]

সিরাজুল আলম খানের ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। মনে হলো তিনি কিছু লুকোচ্ছেন। ঘটনার পাঁচ দশক পরও কেন এই লুকোচুরি, তা তিনিই জানেন।

কলকাতায় বিএলএফ নেতারা একসঙ্গে পৌঁছাননি। সবার আগে গেছেন শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমেদ। সবার শেষে গেছেন সিরাজুল আলম খান। সেখানে তাঁরা নিজেদের কীভাবে সংগঠিত করলেন, এ প্রশ্ন করেছিলাম তোফায়েল আহমেদকে। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ : কলকাতায় বিএলএফ অর্গানাইজড হলো কীভাবে?

তোফায়েল আহমেদ : চিত্ত সুতারের বাসায় বৈঠক হলো ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে। আমরা তাঁকে বলি নাথবাবু। তাঁর মাধ্যমেই সব ব্যবস্থা হলো। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের প্রতিনিধি।

মহি : সব ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ নাথবাবুর মাধ্যমে?

তোফায়েল : হ্যাঁ। আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হলো। আমরা চারজন চারটি অঞ্চলের দায়িত্বে। মনি ভাই চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার দায়িত্ব নেন। রাজ্জাক ভাইয়ের দায়িত্বে ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা। সিরাজ ভাই নর্থ বেঙ্গলের দায়িত্বে, পাবনা বাদে রাজশাহী বিভাগের অন্য জেলাগুলো। আমি দায়িত্ব পেলাম খুলনা বিভাগের। তখন বরিশাল তো খুলনা বিভাগের মধ্যেই ছিল। পাবনা আর ফরিদপুর জেলাও ছিল আমার অধীনে। সিরাজ ভাই থাকতেন শিলিগুড়ি। রাজ্জাক ভাইয়ের ক্যাম্প ছিল মেঘালয়ের তুরা। মনি ভাইয়ের হেডকোয়ার্টার হলো আগরতলা। একমাত্র আমি থাকতাম কলকাতা। ব্যারাকপুরে আমার দপ্তর। আমাদের টাকাপয়সা দিতেন নাথবাবু। তাঁর কাছ থেকে টাকা আমিই রিসিভ করতাম। তারপর আলাদা প্যাকেট করে অন্য তিনজনের কাছে পাঠাতাম।

কলকাতার হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে আমরা নাথবাবুর সঙ্গে বৈঠক করতাম। অর্থ, অস্ত্র আর ট্রেনিং—সবই আমাদের দিতেন ইন্দিরা গান্ধী, নাথবাবুর মাধ্যমে।

মহি : ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনারা কখনো দেখা করেছেন?

তোফায়েল আহমেদ

তোফায়েল : চারজন একসঙ্গে করি নাই। আমরা মেইনলি মিটিং করতাম ডি পি ধরের সঙ্গে। এভরি মান্থ, মিনিমাম একবার।

মহি : কোথায়?

তোফায়েল : কলকাতায়, হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। আমি কলকাতায় থাকতাম। দিল্লি গেলাম। আমাকে ডাকল। নাথবাবুই পাঠিয়েছে আমাকে। টু বি ফ্র্যাংক, আমার সঙ্গেই দেখা হয়েছে।

মহি : তাহলে ওনার সঙ্গে আপনার একবারই দেখা হয়েছে, দিল্লিতে। বাকি তিনজনের হয়নি।

তোফায়েল : দেখা হয়নি। হলে তো আমি জানতাম।

মহি : জেনারেল মানেকশর সঙ্গে আপনাদের কখনো দেখা হয়েছে?

তোফায়েল : হ্যাঁ। মানেকশর সঙ্গে তো দেখা হয়েছেই। স্বাধীনতার পর যখন বাংলাদেশে এল। ওখানে দেখা হয় নাই।

মহি : র-এর পরিচালক আর এন কাওয়ের সঙ্গে কি দেখা হয়েছে? একাত্তরে?

তোফায়েল : আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেকবার।

মহি : মুজিববাহিনীকে তো র-এর সাপোর্টে...

তোফায়েল : ওই তো, সে-ই তো।

মহি : জেনারেল উবানের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো কখন?

তোফায়েল : উবানের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো দেরাদুনে।

মহি : ট্রেনিংয়ের সময়?

তোফায়েল : হ্যাঁ। তারপর নিয়মিত দেখা হতো।[২]

এভাবেই বিএলএফের সংযোগ তৈরি হলো ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর সঙ্গে। নাথবাবু, অর্থাৎ ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছিলেন র-এর কর্মকর্তা। এই সংস্থার অধীনে ছিল স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, যার প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান। উবান বিএলএফের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন।

## ২

শেখ মুজিবের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্তরঞ্জন সুতার আগে থেকেই কলকাতায় ছিলেন। কালিদাস বৈদ্য কলকাতায় পৌঁছান একাত্তরের ১৩ এপ্রিল। শুরু হলো তাঁদের সলাপরামর্শ। কালিদাস বৈদ্যের বয়ানে জানা যায় :

> চিত্তবাবুর ছদ্মনাম ছিল সত্যব্রত রায় আর আমার নাম রতন রায়। বাংলাদেশের ভেতরে হিন্দুদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের ভয়াবহ খবর শুনে আমরা বিচলিত হয়ে পড়ি। তার জন্য চিত্তবাবু ও আমি এক গোপন আলোচনায় বসি। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সেই পথের অনুসন্ধানই ছিল আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। সেদিনের আলোচনায় দুটি পথের কথা আমরা চিন্তা করি। তার প্রথমটি হলো হিন্দু ছেলেদের আলাদাভাবে গোপনে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। আর দ্বিতীয়টি হলো মুক্তিবাহিনী ছাড়াও আরও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনী গঠন করা।
>
> বৈঠকের শেষের দিকে চিত্তবাবু প্রস্তাব করেন এই বাহিনীর নাম হবে মুজিববাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার স্বীকৃতি জানাই। ওই দিন আরও আলোচনা হয়, মুজিববাহিনীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে উক্ত চারজন ছাত্রনেতার হাতে (মনি, সিরাজ, রাজ্জাক, তোফায়েল)। আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করি যে প্রথমে সিরাজুল আলমের সম্মতি পেলেই প্রস্তাবটির পক্ষে চার ছাত্রনেতার সমর্থন পাওয়া সহজ হবে। কেননা, শেখ মনি তাঁর মামার নামের বাহিনীর বিরোধিতা কখনোই করবেন না। মনি ও সিরাজুল একমত হলে রাজ্জাক ও তোফায়েল কোনো বিরোধিতা করবে না। এই প্রস্তাবে সম্মতি আদায় করার দায়িত্ব চিত্তবাবু নিজেই নিলেন। অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে একেবারে গুরুত্বহীনভাবে প্রথমেই সিরাজুল আলমের কাছে তিনি প্রসঙ্গটি তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজুল আলম তা লুফে নেন।
>
> এই প্রস্তাব গ্রহণের পর ছাত্রনেতারা মনে করল ভারত সরকার প্রস্তাবটির অনুমোদন দিলে ও সেভাবে কাজ করলে বাংলাদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতেই যাবে। ফলে বাংলাদেশ সরকার কখনোই তাদের মতের বাইরে যেতে পারবে না। সিরাজুল আলমের কথামতো তারা চিত্তবাবুকে জানিয়ে দেয় যে এই ট্রেনিংয়ের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া কেউ তা জানতে পারবে না।

আর জানতে পারবে শুধু ভারপ্রাপ্ত ট্রেনিং অফিসার। বাংলাদেশ সরকার ও এর সেনা বিভাগের কেউ তা জানতে পারবে না, বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতিও নয়। এই প্রস্তাবটি পরের দিনই বিশেষ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে অতি গোপনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার অনুমোদন দেন। তার পরেই জেনারেল উবানের অধীনে তাড়াতাড়ি মুজিববাহিনীর গোপন ট্রেনিং শুরু হয়। খুব সম্ভব মে মাসের মাঝামাঝি সে টেনিং শুরু হয়।[৩]

এই চার যুবনেতা, যাঁদের কালিদাস বৈদ্য ছাত্রনেতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে বৈদ্যের মূল্যায়নটি প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, 'এই চার নেতার নেতৃত্বের ঐতিহাসিক অবদানের জন্যই মুজিব ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে এত উঁচুতে উঠতে পেরেছিলেন। সরকার গঠনের আগপর্যন্ত তাদের কথাই ছিল শেষ কথা। অথচ সরকার গঠনের সময় তাদের মতামত নেওয়া তো দূরের কথা, তারা কিছুই জানতে পারল না। তাতে তাদের ব্যক্তিত্বে চরম আঘাত লাগে। চিত্তবাবুর বেলায়ও তাই।' কালিদাস বৈদ্য যুবনেতাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

এই চারজন ছাত্রনেতার মধ্যে সিরাজুল আলম খান ছিল কিছুটা চরমপন্থী, চিন্তাশীল, পরিশ্রমী, সৎ, নির্ভীক, আপসহীন বিশেষ ব্যক্তিত্বশালী নেতা। জন্মগত চেতনা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে নিজের গুণেই সে জননেতা হওয়ার অধিকার অর্জন করে। সাংগঠনিক শক্তি তার মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দেয়। সমাজবাদে তার বিশ্বাস ছিল। চীনপন্থী, বিশেষ করে ট্রটস্কিপন্থী বলেই তাকে মানুষ অভিহিত করত। আমার কাছে সে ছিল একজন আয়রনম্যান। আবদুর রাজ্জাক ছিল নরমপন্থী, সৎ, কর্মঠ ও আপসকামী নেতা। তার সাংগঠনিক শক্তি খুব ভালো ছিল। সে-ও সমাজবাদে বিশ্বাসী ছিল। তবে সে ছিল রাশিয়াপন্থী। শেখ মনি ছিল চিন্তাশীল, চতুর ও সুযোগসন্ধানী নেতা। সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত দুজনের মতো নয়। তবে মামার জোরে সে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। কেননা, সে ছিল মুজিবের ভাগনে ও সমাজবাদের কট্টর বিরোধী। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে ছিল ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সংঘাত। তোফায়েল আহমেদ এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তার মধ্যে তখনো তেমনভাবে কোনো বিশেষ গুণ ধরা না গেলেও তার মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি ছিল, তা নিশ্চিন্তে বলা যায়। সে ছিল চতুর ও কিছুটা সুযোগসন্ধানী নেতা। সে-ও কট্টর সাম্যবাদবিরোধী।[৪]

৩

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) অনেকগুলো শাখার একটি ছিল 'পাকিস্তান ডেস্ক'। আইবির যুগ্ম পরিচালক এস শঙ্করণ নায়ার এর দেখভাল করতেন। তাঁর ছদ্মনাথ ছিল কর্নেল মেনন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য পাকিস্তান নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রতিনিধি হিসেবে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও আলী রেজা আগরতলা গিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' চলাকালে বিষয়টি জানাজানি হয়েছিল।[৫]

১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের যে সামরিক বিপর্যয় ঘটেছিল, তা থেকে বেরিয়ে এসে গোয়েন্দা কাঠামো ঢেলে সাজানো দরকার হয়ে পড়েছিল। ১৯৬৮ সালের ১ অক্টোবর আইবির একটি অংশ কেটে নিয়ে তৈরি হয় রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং—সংক্ষেপে 'র' (R&AW)। ঠিক হলো, আইবি কাজ করবে দেশের ভেতরে আর 'র' কাজ করবে দেশের বাইরে। প্রধানমন্ত্রীর সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসার (পি এন হাকসার) এবং আইবির কর্মকর্তা রামেশ্বর নাথ কাও (আর এন কাও) হলেন র-এর কারিগর। কাও হলেন এর প্রথম পরিচালক। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব করা হলো। হাকসারের পরামর্শ অনুযায়ী র-এর কাজ চালানোর জন্য কাওকে দেওয়া হলো অবাধ স্বাধীনতা।[৬] হাকসার পরে মুখ্য সচিব এবং কাও সচিব হয়েছিলেন।

আইবির পাকিস্তান ডেস্ক পুনর্গঠিত হয়ে র-এর অন্তর্ভুক্ত হলো। এর দায়িত্ব পান ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তিনি হলেন র-এর পূর্বাঞ্চলের প্রধান। তাঁর অফিস কলকাতায়। তাঁর ডেস্কেই চালু হলো নতুন প্রকল্প, 'বাংলাদেশ অপারেশন'[৭]।

কর্নেল মেননের লোকেরা আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। গোয়েন্দারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ভেতরে এবং বাইরে অনেকের সঙ্গেই সংযোগ তৈরি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল্লাহ এবং আবদুল কাদের সিদ্দিকী। কাদের সিদ্দিকী পরে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও র-এর 'অপারেটিভদের' মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে হয়েছিলেন বলে ভারতীয় সাংবাদিক অশোক রায়না তাঁর *ইনসাইড র* বইয়ে উল্লেখ করেছেন।[৮]

১৯৬৯ সালের মার্চে র-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি যদি তাদের মনমতো না হয়, তাহলে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। ভারত সরকার এ বিষয়ে 'জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি'র রিপোর্টের অপেক্ষায় ছিল। ১৯৬৯ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রীকে

এস শঙ্করণ নায়ার

দেওয়া র-এর আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে এবং এ জন্য ভারতকে 'সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে' যেতে হবে। র-এর প্রতিবেদনে ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের পূর্বাভাস ছিল।[৯]

একাত্তরের ঘটনাপ্রবাহের সূত্র খুঁজতে হলে আরও পেছনে যেতে হবে। ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর চীনের সেনাবাহিনী যুক্তরাজ্যের চাপিয়ে দেওয়া সীমান্তরেখা 'ম্যাকমোহন লাইন' পেরিয়ে হিমালয় অঞ্চলে ঢুকে পড়লে ভারত-চীন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২০ নভেম্বর চীন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার এক সপ্তাহ আগে ১৪ নভেম্বর ভারত সরকার তৈরি করে একটি বিশেষ বাহিনী—স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এসএফএফ)। তিব্বত থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে গড়া এই বাহিনীর কাজ ছিল চীনের (তিব্বত) ভেতরে ঢুকে ঝটিকা আক্রমণ চালানো। সামরিক ভাষায় এ ধরনের হামলাকে বলা হয় 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'। এই বাহিনীর একটি সাংকেতিক নাম ছিল— এস্টাবলিশমেন্ট টোয়েন্টি টু। এসএফএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বাহিনীর হয়ে ইউরোপে ২২তম পার্বত্য রেজিমেন্টে এবং উত্তর আফ্রিকায় একটি ডেজার্ট স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি খ্যাতি পেয়েছিলেন।[১০]

এসএফএফের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় দেরাদুন শহরের ১০০ কিলোমিটার দূরে চাকরাতা নামক স্থানে। আট হাজার সদস্য নিয়ে এই বাহিনীর যাত্রা শুরু। যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি প্রশাসনের সহায়তায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আইবির প্রশিক্ষণ পেয়ে এই বাহিনীর সদস্যরা অপ্রচলিত ধারায় যুদ্ধ, বিশেষ করে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। এই বাহিনীকে প্রথমে আইবি এবং পরে র-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়।[১১]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে বঙ্গবন্ধু নানাজনের পরামর্শ সত্ত্বেও বাড়িতেই থেকে যান। র-এর ভাষ্যে জানা যায়, আক্রমণের কয়েক দিন আগে মুজিব তাঁর অনুসারীদের ভারতে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দেন। তাঁদের একজন হলেন তাজউদ্দীন আহমদ। আরও যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ, সিলেট আজাদ (আবদুস সামাদ আজাদ) এবং চারজন ছাত্রনেতা—শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। কলকাতায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে তাজউদ্দীনকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপরই তৈরি হয় মুজিবনগর (সরকার)। যে চারজন ছাত্রনেতা ভারতে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের মুজিবের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তাঁদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স—বিএলএফ।[১২]

র-এর সঙ্গে বিএলএফের যোগাযোগের সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রয়োজনের সময় কোথায় যেতে হবে, এ নির্দেশনাটুকু তিনি আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। জেনারেল উবানের সঙ্গে বিএলএফ নেতাদের সরাসরি যোগাযোগ হয় এপ্রিলের শেষের দিকে। এ প্রসঙ্গে উবানের ভাষ্যটি এ রকম :

> গোলযোগের অশান্ত দিনগুলোতে আমরা একদল নিবেদিতপ্রাণ যুবনেতার কথা জানতে পারলাম, যাঁরা বাংলাদেশে বেশ পরিচিত। তাঁরা হলেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। তাঁদের মনে হলো অত্যন্ত অনুপ্রাণিত, করতে অথবা মরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তাঁদের নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, অস্থায়ী সরকার এঁদের তেমন মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা চাইছিল, এঁরা মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে ও যুদ্ধে অংশ নেবে। কিন্তু এই যুবনেতাদের তাতে দৃঢ় আপত্তি ছিল। তাঁরা মুজিববাহিনী নামে অভিহিত হতে পছন্দ করলেন। তাঁরা তাঁদের পুরোনো সহকর্মীদের ক্যাডার হিসেবে বেছে বেছে সত্যায়িত করলেন।
>
> ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি শ্রী আর এন কাও এ সময় আমার ঊর্ধ্বতন সিভিলিয়ান কর্মকর্তা ছিলেন। আওয়ামী লীগের যুব উইংয়ের নেতৃত্ব এবং খোদ সংগঠনটি সম্পর্কে বিস্তারিত গোয়েন্দা তথ্য জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তাঁর গভীর উপলব্ধি ছিল যে, তিনি আমার তত্ত্বাবধানে যে যুবনেতাদের দিয়েছিলেন, কেবল তাঁদের দ্বারাই আসল কাজটি হবে এবং তাঁদের বাংলাদেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর রাজনৈতিক অঞ্চলে কাজ করার জন্য বিশেষ মর্যাদা দেওয়া দরকার। তিনি তাঁদের প্রতি অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের ঈর্ষার কথা জানতেন তাঁদের আপসহীন মনোভাবের জন্য এবং মন্ত্রীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অভিসন্ধির জন্য।[১৩]

বিএলএফ সদস্যদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিল এসএফএফ। জেনারেল উবান নিজেই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। বিএলএফের জন্য

প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালানো, সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, অস্ত্র সরবরাহ, সবকিছুর আয়োজন হয়েছিল এসএফএফের মাধ্যমে। এসবের অনুঘটক ছিল 'র'। বিএলএফের চার নেতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল আগরতলা (ত্রিপুরা), তুরা (মেঘালয়), পাংগা (শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ) এবং ব্যারাকপুরে (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ) চারটি ট্রানজিট ক্যাম্প।[১৪]

বাংলাদেশ সরকারের কমান্ড কাঠামোর অধীনে সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিবাহিনীর তরুণদের জন্য খোলা হয়েছিল অনেকগুলো প্রশিক্ষণশিবির। এসব শিবির পরিচালনা, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সরবরাহের সমন্বয় হতো র-এর মাধ্যমে। তবে ওই শিবিরগুলো পরিচালনা করতেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা। পরে বিএলএফসহ মুক্তিবাহিনীর অনেকেই একে অপরের দিকে আঙুল তুলে কে র-এর এজেন্ট আর কে এজেন্ট নয়, এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ করেছেন। সবকিছুর গোড়া ছিল এক জায়গায়। পুরো ব্যবস্থাটির সমন্বয় হতো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে।

এই কাঠামোর মধ্যে মাঠপর্যায়ের সমন্বয়কারী ছিলেন পূর্বাঞ্চলে র-এর প্রধান ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সচিব এবং র-এর পরিচালক কাও ছিলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। কাও ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। তাঁর পাশে ছিলেন আরও দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পি এন হাকসার এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল স্যাম মানেকশ।[১৫]

বিএলএফ সদস্যদের আলাদা প্রশিক্ষণ এবং তাদের বাংলাদেশ সরকারের কমান্ড কাঠামোর বাইরে থাকার কারণে গুঞ্জন ও প্রচার ছিল যে এই বাহিনী র-এর তৈরি এবং এর পেছনে সিআইএর হাত আছে। এই প্রচারে বাম ধারার কোনো কোনো রাজনীতিবিদের হাত ছিল। তাদের এ রকম মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিএলএফে কেবল ছাত্রলীগের সদস্যদেরই নেওয়া হয়। অবশ্য শ্রমিক লীগের অনেকেই বিএলএফের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। শ্রমিক লীগের শীর্ষ নেতা আবদুল মান্নান, রুহুল আমিন ভূঁইয়া, সাইদুল হক সাদু প্রমুখ প্রথম ব্যাচেই প্রশিক্ষণ নেন।

ছাত্রলীগের সামনের কাতারের নেতা-কর্মীদের একটা বড় অংশ বিএলএফের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো দুটি স্থানে। একটি ছিল দেরাদুনের কাছে তান্ডুয়া, অন্যটি ছিল আসামের হাফলং। প্রশিক্ষণ দিতেন এসএফএফের কর্মকর্তারা। বিএলএফকে অনেকেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলেও এর তরুণ সদস্যদের আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। বিএলএফের সাধারণ সদস্যরা জানতেনই না কীভাবে তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁদের শুধু এটুকু ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে স্বয়ং ভারতের

রামেশ্বর নাথ কাও

প্রধানমন্ত্রী তাঁদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দুই নেতার সন্তান বিএলএফের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে শেখ জামাল এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে শুধু সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীকে এর বাইরে রাখা হয়েছিল। তাঁকে বিএলএফে না নেওয়ার ব্যাপারে চার নেতার মধ্যে ঐকমত্য ছিল।

একটি যুদ্ধ করা কিংবা যুদ্ধ জয়ের জন্য একটি বাহিনী গড়ে তোলার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা, সাহস, বুদ্ধি ও প্রস্তুতি থাকা দরকার, তার যথেষ্ট অভাব ছিল। যে যা-ই দাবি করুন না কেন, বিএলএফের ঘর গোছানোর কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল র-এর তত্ত্বাবধানে। বিএলএফের সঙ্গে র-এর যোগাযোগের সূচনাপর্বে আবু হেনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর বিবরণে জানা যায়:

> শুরুর দিকে তো কাজ করার মতো লোকই ছিল না। তোফায়েল ঘরের বাইরে বের হতে ভয় পেত। কারণ, সেখানে চীনপন্থী নকশালদের ভয় ছিল। তারা দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়েছিল, 'শেখ মুজিবের কালো হাত/ ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও'। তোফায়েল ছিলেন জনপ্রিয় ছাত্রনেতা, ডাকসুর ভিপি। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় দেশের পত্রপত্রিকায় তাঁর ছবি ছাপা হতো। স্বভাবতই তাঁর ভয় ছিল। নকশালরা চিনে ফেললে মেরে ফেলতে পারে, এ জন্য তাঁকে বের হতে দিতাম না। আমি বরং বাইরে যেতাম। আমার ছদ্মনাম ছিল নিতাই চন্দ্র দাশগুপ্ত। রাজ্জাকের নাম ছিল রাজু, তোফায়েল হলেন তপন, শেখ মনি হলেন মনিবাবু আর সিরাজ হলেন সরোজদা। সরোজদা থেকে পরবর্তী সময়ে তিনি 'দাদা' হয়ে গেলেন।[১৬]

## ৪

বিএলএফ কলকাতায় কীভাবে সংগঠিত হলো, কীভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলো, বিএলএফ নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় কেমন ছিল, বাংলাদেশ

সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন—এসব বিষয়ে একটা খোলামেলা বক্তব্য দিয়েছেন আমির হোসেন আমু। বয়স এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে তিনি বিএলএফের শীর্ষ দুই নেতার সমসাময়িক। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

আমির হোসেন আমু : বাষট্টি সাল থিকা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইন্ডিয়ার যে লিয়াজোঁ, সেখানে পরিষ্কার বলা ছিল, তরুণ, যুবক, ছাত্র—শেখ মুজিব যাদের পাঠাবে, তাদের ট্রেনিং দিতে হবে। তাদের অস্ত্র দিতে হবে। এবং ইন হিজ অ্যাবসেন্স, মনি ইজ দ্য মেইন। এই সিগন্যাল তারই ছিল। মনি যেইটা ভুল করছে, তিনজনকে একসঙ্গে রাখছে। এইটা তার গ্রেট মিসটেক।

দুই নম্বর হইল, ২৫ মার্চ তো পার হইয়া গেল। যাইয়া ওইখানে মুজিববাহিনী গঠন-টঠন কইরা, তখন তো মুজিববাহিনী না বিএলএফ, চাইরজনে চাইরটা সেক্টর ভাগ কইরা লইয়া গেল। আমি ১৭ মে বর্ডার ক্রস করছি।

মহিউদ্দিন আহমদ : এত দিন ভেতরে ছিলেন?

আমু : আমি তো খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল—সব জায়গায় যুদ্ধে সাপ্লাই দিছি। সব তো পলায়া গেছে গা!

মহি : মেজর জলিল-টলিল?

আমু : সব পলায়া গেছে। মঞ্জু ভাই, মেজর জলিল, দুইজনই পলায়া গেছে। আমি আর ক্যাপ্টেন বেগ পোলাপান-টোলাপান লইয়া বাগেরহাট-খুলনায় ট্রাক পাঠানো, অস্ত্র পাঠানো, খাবার পাঠানো—বরিশাল তো তখন ফ্রি।

যা-ই হোক, আমি ১৭ মে বর্ডার ক্রস কইরা গেলাম। যাওয়ার পর হঠাৎ ফণী মজুমদার আর আবদুর রব সেরনিয়াবাত, আধা ঘণ্টা পর অফিসে আসছে।

মহি : এটা কোন অফিস?

আমু : বাংলাদেশ সরকারের অফিস। এখানে বসত শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন আর মাগুরার মন্ত্রী ছিল যে, উনি। এরা বসত। আমি আবার ঠাট্টা করলাম। ওনাদের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। কিছুক্ষণ পরে কামারুজ্জামান সাব আইছে। তারও ধুতি-পাঞ্জাবি। আমি কইলাম যে ভাই, ওরা যে স্লোগান দিছে, আপনারা তো বাস্তবায়ন কইরা দিলেন।

কী স্লোগান?

জয় বাংলা জয় হিন্দ, লুঙ্গি ছাইড়া ধুতি পিন্দ। এই যে ধুতি-

পাঞ্জাবি পরছেন, যদি এর ফটো দিয়া দেয়? কামারুজ্জামান আমার দিকে তাকায়া রইছে।

তুমি কী কইলা?

এইটা পরলেন কেন?

বোঝবা নে, কয় দিন থাহো।

এই কথাবার্তার মধ্যে দুইজন আসল, সেরনিয়াবাত সাহেব আর ফণী মজুমদার। আমারে দেইখা জড়ায়া ধইরা কান্নাকাটি। বলল, তোর থাকার জায়গা অন্য জায়গায়। এগো লগে থাকিস না। আমারে নিয়া নর্দার্ন পার্কের এই পারে গাড়ি দিয়া নামায়া বলে, ওই দালান, মাঠটার মধ্য দিয়া হাইটা ওই বাড়িতে উঠবা।

মহি : সানি ভিলা?

আমু : হ্যাঁ। আমি গেলাম, দেখি সিরাজুল আলম খান, আমারে দেইখা উইঠ্যা ধরবে কি ধরবে না, এই অবস্থা। তয় থামল। ব্যাপারটা কী?

আমু সাহেব, আমি দুঃখিত, আপনারে জড়ায়া ধরতে পারলাম না। আমি চিকেনপক্স থিকা উঠছি। এই জন্য ধরলাম না। আপনি সিঁড়িতে উইঠা বাঁ পাশে দেখবেন দেড় তলায় একটা রুম আছে। ওইখানে দুইটা খাট। একটা খাট আপনার। আরেকটা খাট তোফায়েলের। একটা খালি। ওইখানে গিয়া শুইয়া পড়েন। রেস্ট নেন, পরে কথা হবে। আর যদি খাওয়াদাওয়া করেন, পাঠায়া দেব।

না, আমি এখন খাব না।

আমি শুইয়া একদম ঘুমায়া পড়ছি। আমার হুঁশ নাই। সন্ধ্যায় তোফায়েল আইসা ঠেইল্যা-মেইল্যা জাগায়া, এই, ওঠেন ওঠেন।

উঠলাম।

এই যে আপনার ব্রাকেট।

আমার তো কাপড়চোপড় নাই।

সব কিন্যা-টিন্যা দিল। দেওয়ার পর কইল যে, ভদ্র হইয়া যাবেন, না এই অবস্থায় যাবেন? মন্ত্রীগুলার লগে দেহা করবেন না?

নিয়া গেল মন্ত্রীদের লগে দেহা করতে। নজরুল সাবের লগে দেখা হইল, মনসুর আলী সাবের লগে দেখা হইল। মনসুর আলী সাব আবার একটু ডাকল। 'তোমার কাছে তো কিছু নাই। এইটা রাখো।' আমারে দুই হাজার টাকা দিল। বলল, 'রাখো, কাজে লাগবে। ডাক্তার-টাক্তার দেখাও, চিকিৎসা করাও। তারপর কাজে নামো।' তারপর আইলাম মোশতাকের রুমে। তার তো ওই রকম—কপালে

একটা চুমা দেওয়া, জড়ায়া ধরা। তারপর নিল ওসমানীর রুমে, নিচতলায়। আমারে দেইখ্যাই কয়, 'সাইন।' একটা ফাইল বাইর কইরা, কয়েকটা কাগজ, কয় 'সাইন ইট। নূরুল ইসলাম মঞ্জু আর মেজর জলিল বরিশালে ন্যাশনাল ব্যাংক (এখন সোনালী ব্যাংক) ভাইঙ্গা ছয় কোটি টাকা নিয়া আসছে। এইহানে সই দাও।'

আরে ধেৎ, আমি জানি না কিছু।

আমি তো রাস্তা চিনলাম। পরের দিন। তোফায়েল বলল, আপনি রেস্ট নেন, আমি ঘুইরা আসি।

না, আমি একটু ঘুরতে যামু।

গাড়ি লাগবে না?

না, গাড়ি লাগবে না।

ঠিক আছে। আমি ট্যাক্সি নিয়া যাই। আপনি এই গাড়িটা নিয়া যান। আপনি ট্যাক্সি-ম্যাক্সি পারবেন না।

আমি গেলাম থিয়েটার রোডে, মন্ত্রীগো মহল্লায়। এর মধ্যে ওবায়দুর রহমান, মিজান চৌধুরী আর বিপুর বাপ...

মহি : হামিদ সাহেব।

আমু : হামিদ সাব তো হোটেলের মতো একটা বিরাট রুমে থাকত, অনেকেই থাকত। আমারে পাইয়াই,

অ্যাই, তোমার চাকরি হইয়া গেল।

কী চাকরি, মিজান ভাই?

তুমি মোটিভেটর হবা। পলিটিক্যাল মোটিভেটর। সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে তুমি দেখবা। বোঝো না? যুদ্ধের ব্যাপার। আর্মিওলারা ওদের মতো বোঝাবে। আমাদের পলিটিক্যাল লিডারশিপ থাকবে না। সুতরাং পলিটিক্যাল লিডারশিপ যাতে থাকে, এভাবে আমরা কিছু চিন্তাভাবনা করতেছি। তুমি মোটিভেটর হবা। তোমার গাড়ি, বাড়ি, টাকাপয়সা, হেলিকপ্টার, গার্ড—সব থাকবে। তুমি যখন যেখানে যাবা, সব ফ্রি।

ঠিক আছে।

আমরা চিঠি ইস্যু কইরা দেই?

দেন।

চিঠি হয়তো তাজউদ্দীন সাব ইস্যু করবে। কথাবার্তা কইয়া আমি আইছি। বিকালবেলা সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল, রাজ্জাক—বললাম এই ব্যাপার। আমার তো চাকরি হইয়া গেল।

কী চাকরি?

এই চাকরি।

সিরাজুল আলম খান কয়, ধ্যাৎ, আমু সাহেব, আপনে চুপ করেন তো? মনি আসবে দুই দিন পর আগরতলা থেকে। তার আসার পর আপনার ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

ঠিক আছে।

তারপর, বইসা আছি। রোজ এদিক-ওদিক যাই, ঘোরাফেরা করি। খোঁজখবর রাহি-টাহি। একদিন সকালবেলা গেছি। গিয়া দেহি ২০-৩০ জন লোক ঘেরাও করা। তুমুল ঝগড়া, তাজউদ্দীন অ্যান্ড ওসমানী।

মহি : থিয়েটার রোডের অফিসে?

আমু : আরে মাঠের সামনে। সবাই দেহি তামশা দেহে। আমার গেছে মেজাজ খারাপ হইয়া। ভিড় ভাইঙ্গা ঢুইকা তাজউদ্দীন সাবের পাশে গিয়া কইলাম, আপনি প্রধানমন্ত্রী। বিদেশের মাটি। ক্যাপ্টেন নূর ছিল তখন ওসমানীর এডিসি। নূররে কইলাম, সরো। ওসমানী সাবরে কইলাম, কী ব্যাপার? বিদেশের মাটিতে ঝগড়া করবেন? চলেন, রুমে চলেন। নূররে কইলাম, ওরে সরাও। এইটাতে নূর খুব ইমপ্রেসড ছিল যে এ রকম একটা সিচুয়েশন আমি ট্যাকল করছি।

তারপর মনি আসল। এরা চারজন আমারে নিয়া বসল। তখন পর্যন্ত চিত্ত সুতারের লগে আমারে দেহা করায় নাই। এত সিক্রেসি মেনটেইন করে। আমি কিন্তু একদিন তারে দেখছি। আমি কিছু কই নাই। চিত্ত সুতার কিন্তু আমার বাড়ির কাছেই থাকে। আমার এলাকার লোক। আমি তাদের কইলাম, আমার চাকরি হইয়া গেছে, ভাই, আমি আর তোমাগো লগে থাকব না। আমি এত বড় জায়গা থুইয়া তোমাগো এহানে আইয়া থাকমু কেন।

সিরাজুল আলম খানের কিছু গুণ ছিল। মনিরা বলতেছে, আমাদের সঙ্গে থাকবা তুমি। সিরাজুল আলম খান পয়েন্ট আউট করল, উনি কীভাবে থাকবে? আমরা তো চারজন চার সেক্টর ভাগ করছি। তার মধ্যে তো উনি থাকতে পারে না। এখন তুমি কীভাবে অ্যাডজাস্ট করবা, সেইটা বলো। ওনাকে তো স্ট্যাটাস দিয়া রাখতে হবে। তখন ঠিক হইল...তোফায়েলের আন্ডারে হইল সাতটা জেলা। কুষ্টিয়া, পাবনা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, বরিশাল। পাবনা আর কুষ্টিয়া থাকবে তোফায়েলের কাছে আর বাকি পাঁচটা আসবে আমার কাছে, যেহেতু এই অঞ্চল আমি আগে থাকতেই নার্সিং করছি। বাট এইটা আমাদের মধ্যে। ইন্ডিয়ান গভমেন্টের কাছে তো এইটা আর যাচ্ছে না। এই অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের মধ্যে হইল।

একটা সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো দেওয়া হইল আরকি।

আমি ভাবলাম, ঠিক আছে। নিজেরা আছি, থাহি, দেহি কী হয়। আমি কিন্তু দ্বিতীয় দিনই বুইজ্জা ফেললাম, তিনজন একদিকে, একজন একা। মনি একা। সিরাজুল আলম খান, রাজ্জাক, তোফায়েল মোটামুটি এক। তখন মনি আবার চইল্যা গেছে আগরতলা। সে আসল। আমি তারে প্রথম দিনই এই কথা বললাম। সেই দিন চিত্ত সুতারের সঙ্গে আমরা পাঁচজন একসঙ্গে বসলাম। তখন আলোচনা হইল যে মুক্তিবাহিনী-মুক্তিফৌজ তো একাকার। আমাদের আইডেন্টিটি কী? আমি বললাম, তোমরা আইডেন্টিটি হিসাবে বিএলএফ না রাইখা মুজিববাহিনী রাখো। তাইলে আইডেন্টিটি হইয়া যায়।

সিরাজুল আলম খান কইল, প্রস্তাবটা ভালো। নেওয়া যায়। চিত্ত সুতার কইল, হ্যাঁ, নিয়া নেন। এই মুজিববাহিনী নামকরণ হইল। সমর্থন বাই সিরাজুল আলম খান, বাট প্রপোজড বাই মি।

আরেকটা কাজ আমি করছি। সেটা এরা লেখবে না। লেহে না। জিনিসটা হইল, অ্যাট ওয়ান টাইম, ইন্দিরা গান্ধীর যে মূল অ্যাডভাইজার ছিল, ডি পি ধর, সে ছিল তাজউদ্দীন সাবের ফ্রেন্ডের মতো। তাজউদ্দীন সাব তাকে কনভিন্স করছিল যে গভমেন্টের আন্ডারে ছাড়া কোনো ফোর্স রাখা যাবে না। ইন্ডিয়ান গভমেন্ট এইটা এনশিওর করবে। মুজিববাহিনী-টাহিনী এই সব বিলুপ্ত কইরা দিতে হবে। আন্ডার আওয়ার গভমেন্ট আনতে হবে। ডি পি ধর এইটা হয়তো ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করে নাই। যেহেতু পরবর্তীকালে আমাদের প্রস্তাবটা পাস হইছে। ডি পি ধর করছে কি, জেনারেল মানেকশ আর জেনারেল উবান, যে আমাদের মেইন ট্রেইনার ছিল, তাদের নিয়া প্রোগ্রাম দিছে ক্যালকাটায়। প্রপোজাল হইল, ডিজলভ। আমাদের মার্জ করাবে গভমেন্টের আর্মির সঙ্গে। এই প্রপোজাল নিয়া তারা আসছে। আমাদের যে মূল হোতা, মি. নাথ, নাথবাবু এই মেসেজটা দিল যে ওনাদের আসার উদ্দেশ্য হইল তোমাদের ডিজম্যান্টেল কইরা দিয়া বাংলাদেশ গভমেন্টের অধীনে নিয়া যাওয়া।

নাথবাবু ইস্টার্ন জোনে র-এর চিফ ছিল। সে-ই মুজিববাহিনীর মেইন আর্কিটেক্ট। সে ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে মারা গেছে, আফটার লিবারেশন। উনি আমাদের এই মেসেজটা দিল। তখন মিটিং বসল, কী করা যাবে।

জিনিসটা যখন আলোচনা হয়, একেকজন একেক কথা কয়। আমি কইলাম, দেখো, অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। চিত্তবাবু বলল,

কী বলতে চাও? আমি বললাম, ঠিক আছে, তোমাগো সিদ্ধান্ত তোমরা দিলা। আমাগো রাখবা না, হেল্প করবা না। কিন্তু আমরা গভমেন্টের সঙ্গে যাব কি যাব না, দ্যাট ইজ আওয়ার ডিসিশন। এইটা ডিকটেট করার অধিকার তোমার নাই। আমরা এইখানে থাকব, না দেশের ভিতরে যাইয়া যুদ্ধ করব, না অন্য কোথাও যাব, ইট ইজ আওয়ার ম্যাটার। উই উইল টেক আওয়ার ডিসিশন। তোমাদেরটা তোমরা সামলাও। আমি বললাম, এই কথা কও। তারপরে দেখবা। যদি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করে, তখন আইবে নতুন প্রস্তাব নিয়া. তোমরা আর কী চাও, কী কী হেল্প চাও। যদি না চাও, আমি আজ রাত্রেই চইলা যাব। লেইখা দিলাম। নাথবাবু আর চিত্ত সুতার আমার প্রস্তাব অ্যাকসেপ্ট করল। এর বাইরে কোনো প্রস্তাব নাই।

চাইরজন তো অফিশিয়াল। এই প্রস্তাব দেওয়ার মতো সাহস ওদের নাই। আমারে তো অফিশিয়ালি পাঠাইতেও পারতেছে না। তখন শেখ মনিরে বলা হইল, তুমি এই প্রস্তাব দাও। শেখ মনি কয়, না, সিরাজ দেবে। সিরাজ কথা কইতে রাজি না। হে তো পিছে পিছে ফাল পাড়ে। সামনে তো ভোকাল না। কোনো জায়গায়ই না। পার্টিতেও ছিল না।

শেষকালে শেখ মনি প্রস্তাবটা কায়দা কইরা দিছে। 'আমরা আপনাদের সিদ্ধান্ত শুনলাম। আপনারা আপনাদের ডিসিশন নেন, আমরা আমাদের ডিসিশন নেব।'

খাওয়াদাওয়ার পর এরা যখন চইলা যায়, জেনারেল উবান আইসা মনি ভাইরে থ্যাংকস দিল। বলল, 'তোমরা রাইটলি প্লেস করছ। নাউ, উই উইল সি। আমি এখন এইটার ব্যাপারে লুক আফটার করব।' মনি তো অবাক, উবান এইটা অ্যাকসেপ্ট করতাছে! আমি বললাম, উবান এটা পারসু করবে।

আমি তাদের বললাম, পরে আমরা চাইব এয়ার লিফটিং, এয়ার ড্রপিং। আমরা নিজেদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার কথা বলব। আর্মস ট্রেনিং আমরা যাদের দিচ্ছি, এরা আমাদের কন্ট্রোলে থাকবে না। পলিটিক্যাল কন্ট্রোল থাকবে না, যদি আমরা আর্মস ট্রেনিং না নেই। আমরা যতই নেতা হই, আমাদের ওরা মানবে না। আমাগো ট্রেনিং নিতে হবে। আমাদের নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট খুলতে হবে। আমরা যাদের কুরিয়ার হিসাবে কাজ করাচ্ছি, এদের ইন্টেলিজেন্স ট্রেনিং দিতে হবে। এর পরিধি বাড়াইতে হবে। এই সব প্রস্তাব আমি রেডি করলাম। ঠিক ২১ দিনের মাথায় তারা আসল। আমাদের যা যা প্রস্তাব, সব অ্যাকসেপ্ট করল। প্রথমে ৯ দিন, ১১ দিন, তারপর ২১

প্রধান প্রশিক্ষক মে. জে. সুজন সিং উবানের সঙ্গে বিএলএফের চার কমান্ডার

দিন আমরা ভিআইপি ট্রেনিং নিছি।

ওই দিন রাত একটার পর সিরাজুল আলম খান আমারে রুম থিকা নিয়া গেল। নর্দার্ন পার্কের মধ্যে বেঞ্চ। কয়, আমু সাব, নিশ্চয়ই আপনার কাছে কোনো ইনফরমেশন আছে। তা না হইলে আপনি এই স্ট্যান্ড নিলেন কেন। আপনি কী করে ঝুঁকি নিলেন যে আমরা যেখানে খুশি সেখানে যাব, যাদের খুশি তাদের হেল্প নেব। নিশ্চয়ই এর মধ্যে ব্যাপার আছে।

থাকতে পারে। আপনে কী কইতে চান, সেইটা বলেন।

আমার কাছে তো প্রস্তাব আছে। আমাদের ২০ হাজার ছেলেকে লিফট কইরা নিয়া যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক ট্রেনিং আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আমাদের পাঠায়া দিবে।

কারা?

ইসরায়েল।

আইজকা এইটা কইলাম। এইটা আমি কারোরে কই না। তহন থিকাই আমি জানি তার ইসরায়েলি লাইন। নাইলে ইসরায়েলের কথা কবে কেন?

মহি : আমার মনে হয় না। অনেকে অনেক সময় বাগাড়ম্বর করে না? ওনার কোনো ইন্টারন্যাশনাল লাইন-ফাইন ছিল বলে আমার মনে হয় না।

আমু : ছিল। ইন্টারন্যাশনাল লাইন না থাকলে...ইন্ডিয়ার লগে একটা লাইন তো তার ছিল।

মহি : সেইটা থাকতে পারে।[১৭]

একাত্তরের যুদ্ধে ইসরায়েল প্রসঙ্গ উঠেছিল। এ সময় ইসরায়েল সরকার ভারতের ডানপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা বাংলাদেশের কয়েকজন সাংসদের মাধ্যমে ইসরায়েলের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। এটা জানতে পেরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের একান্ত সচিব কামালউদ্দিন সিদ্দিকী সিপিআইএমের পত্রিকায় তথ্যটি জানিয়ে দেন। সংবাদটি ওই পত্রিকায় ছাপা হয়। এরপর ইসরায়েলি লবির তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।[১৮]

ওই সময় ভারত অবশ্য ইসরায়েলের কাছ থেকে অস্ত্র সহযোগিতা পেয়েছিল। ভারত তখন অস্ত্র জোগাড়ের জন্য মরিয়া। সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার মধ্যবর্তী ছোট্ট দেশ লিচেনস্টেইনে অবস্থিত অস্ত্র তৈরির প্রতিষ্ঠান 'সালগাদ' ইসরায়েলের জন্য অস্ত্র তৈরি ও জোগান দিত। পি এন হাকসার ১৯৬৫ সালে লন্ডনে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার থাকাকালে সালগাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্লোমো জাবলুডোয়িচের সঙ্গে পরিচিত হন। হাকসারের অনুরোধে জাবলুডোয়িচ ৩ আগস্ট ১৯৭১ লন্ডনে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার প্রকাশ কাউলের সঙ্গে দেখা করে ভারতে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি ইরান ও তুরস্কের জন্য তৈরি অস্ত্রের চালান সরাসরি ভারতে পাঠিয়ে দেন। এ ছাড়া ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর মজুত থেকে কিছু অস্ত্র আকাশপথে ভারতে পাঠানো হয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার ইন্দিরা গান্ধীকে এক চিঠিতে জানান, ভারতের বিপদের সময় ইসরায়েল অতীতেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এখনো তা করে যাচ্ছে। চিঠিতে তিনি অস্ত্র সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত দেন। ইন্দিরা এই অনুরোধ এড়িয়ে যান।[১৯]

## ৫

বিএলএফ নেতাদের, বিশেষ করে শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তখনকার মতো চাপা পড়ে থাকলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ভেতরে-ভেতরে এটা প্রকাশ পেত। ছাত্রলীগের যাঁরা প্রশিক্ষণে যেতেন, তাঁদের মধ্যে এটা কোনো লুকানো ব্যাপার ছিল না। আমির হোসেন


www.amarboi.com

আমুর চোখে এটা ভালোভাবেই ধরা পড়েছিল। আমি এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন :

আমু : আমি মনিরে নোটিশ করলাম, তোমরা তো ওয়ান ইজ টু ফোর না, তুমি একা। তুমি বোঝো এটা? সে আমার ওপর খেইপা গেল। অ্যা, তুমি আইসাই ক্লিক আরম্ভ করছ?

সে বিশ্বাস করল না। ১৫ দিন পরে আইসা আমারে খুইজ্জা বাইর করছে। নানা, তুমি কেমনে বোঝলা? ঘটনা তো ঠিক।

মহি : আপনাকে নানা ডাকত?

আমু : হ। কয়, তুমি এইটা ঠিক কইরা দাও।

বাই দিস টাইম, সেরনিয়াবাত সাহেব সিআইটি রোডে একটা বাসা করল। মনি আমারে কইল, তুমি সেরনিয়াবাত সাবরে বলো, আমাদের জন্য ভাত পাক করতে। তুমি, আমি, তোফায়েল ওখানে খাব। তুমি তোফায়েলরে কবা, 'চলো তোফায়েল, আইজ একসঙ্গে ভাত খাই, খালুজানের বাসায়।' তারপর খাবার টেবিলে বইয়া যা কবার আমি কব।

বাই দিস টাইম তোফায়েলের সঙ্গে ইনডাইরেক্টলি আলাপ-সালাপ কইরা আমি একটা জায়গায় আইছি। ওরেও বুঝছি আমি। আমি কী, এইটাও মোটামুটি ওরে বুঝতে দিছি। খাবারের টেবিলে বইসা আমি আলাপ উঠাইলাম। এর আগে খালুজানরে কইছি, আজকে আমাগো লগে আপনি বইয়েন না, আপনি আলাদা খাইয়েন।

একপর্যায়ে তোফায়েল কইলো, 'মনি ভাই, আমি আপনের সঙ্গে আছি। আমু ভাইরে কন রাজ্জাক ভাইরে ঠিক করতে।' আমি কইলাম, আমি সেইটা জানি। আমি রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপ করব।

রাজ্জাকরে আমি একদিন ধরলাম, কী মিয়া? দুইজনে হইল বন্ধু। এদের মধ্যে গ্রুপিং করলা? মিলায়া থাকো। আর না হইলে এক জায়গায় আসো। ফরিদপুর-টরিদপুর কও। দুইজনে বন্ধুত্ব আছে তো। এমন তো না যে শত্রুতা। তুই-তাই, হাসি-ঠাট্টা—সবই একসঙ্গে হয়। অসুবিধা কী? দুইজনরে মিলায়া রাখো। আলাদা করো কেন?

আরে, তুই বুঝবি না। ওর ব্যাপার হইছে...

কী ব্যাপার হইছে? আমারে ভাইঙ্গা কও? দরকার হয় আমি থাকমু তোমাগো লগে। পলিটিক্যালি তুই আমাদের সঙ্গে। মনিরে তুই ছাড়তে পারবি না। বাসায় যায়া একা হইয়া যাবি।

মহি : আপনারা তো সেভেনটি ওয়ানে তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন।

আমু : আমরা না। মূলত শেখ মনি এইটার মধ্যে ছিল। ইনিশিয়েটর ছিল। তখন কিন্তু রাজ্জাক-টাজ্জাক সব এক ছিল। আপটু সেভেনটি ফোর, মনি-রাজ্জাক-তোফায়েল এই ব্যাপারে এক ছিল।

মহি : তাজউদ্দীন যে প্রধানমন্ত্রী হলেন, তিনি তো কারও সঙ্গে কথা বলেননি, আলোচনা করেননি। কেউ তো জানত না।

আমু : এইটা চিত্ত সুতাররা অ্যাকসেপ্ট করছিল না। তখন আলোচনা হইল যে, না, যেহেতু বিদেশের মাটিতে একটা গভমেন্ট ফর্ম হইছে, এইটা নিয়া কনটেস্ট করা ঠিক হবে না। এইখানে আমি একটা কথা বলি। সে প্রথমে একটা ঢাকাইজম তুলছিল। ঢাকাইজমের এমপিদের সে এক করছিল। বিভিন্ন জায়গায় জোনাল কাউন্সিলের যে ইলেকশনগুলো হইত, তার নিজস্ব লোক সেটআপ করার চেষ্টা করছিল। খুলনা-বরিশাল বেল্টে সে মহসিনরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বিরুদ্ধে। নুরুল ইসলাম মঞ্জু এহানে ট্যাগ দিল। ঢাকায় ইলেকশন হয় নাই। এহান থিকা ছয়জনরে নিয়া ওইখানে ভোটার করল। আমরা আবার ঢাকা থিকা রফিক-টফিকরে নিয়া, ছয়জনরে নিলাম, মমতাজ বেগম, খুলনার মহিলাকে নিয়া আমরা আবার সেরনিয়াবাত সাবরে মেজরিটি করলাম। তারে ইলেক্টেড কইরা নিয়া আইলাম। তখন থিকাই কিন্তু ঢাকাইজম, তাজউদ্দীন সাব একটা গ্রুপ সৃষ্টি করছে। এইটা বঙ্গবন্ধু জানে। জানার পর, যে কারণে সে মোশতাকরে সরায় নাই। ব্যালেন্স রাখছে। মোশতাকরে তো রাখার কারণ ছিল না। মোশতাক তো আইডেন্টিফায়েড। বঙ্গবন্ধু চিন্তা করছে, মোশতাকরে যদি সরায়া দেই, তাইলে তাজউদ্দীন তো...হইয়া যাবে। তাজউদ্দীনরে যতক্ষণ সাইজ না করা যাবে, ততক্ষণ মোশতাকরে রাখতে হবে। এই ব্যালেন্স পলিটিকস করতে যাইয়া সে মোশতাকরে রাখছে। কারণ, নজরুল সাব তো টিমিড টাইপের লোক। হে তো ভোকাল না। ভোকাল ছিল মিজান চৌধুরী, ওবায়দুর রহমান—এরা।

তাজউদ্দীন গ্রুপের প্রথম মিটিং হয় হোটেল শিলটনে। তখন শিলটন-লিটন দুইটা হোটেল ছিল বোধ হয়, ছোট হোটেল, কিন্তু ভালো। লিটন হোটেলে মালেক উকিল সাব থাকত। ওইখানে প্রায়ই বসত। ওবায়দুর রহমান, মিজান চৌধুরী, মালেক উকিল, নুরুল হক। নুরুল হক আবার তাজউদ্দীন সাবের লগে ব্যালেন্স করত। তারপর হামিদ সাহেব বসত। ঢাকার মধ্যে গাজী গোলাম মোস্তফা ঠিক ছিল। ইভেন ময়েজউদ্দিনও পাল্টে গেছিল। কেরানীগঞ্জের দিকে এমপি ছিল

রফিক। রাজিউদ্দিন রাজুও তাজউদ্দীনের পক্ষে ছিল। রাজুর সঙ্গে তো আমার ঝগড়া হইছে এই গ্রুপিং নিয়া, কলিকাতায় বইসা।[২০]

## ৬

ট্রেনিং পেয়ে মুজিববাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশে গোপনে ঢোকার সময় একটি দল হঠাৎ বিএসএফের নজরে পড়ে। বিএসএফ সদস্যদের চ্যালেঞ্জের মুখে তারা ধরা পড়ে। পরে একটি বিশেষ ফোন পেয়ে তাদের বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। তাতে বাংলাদেশ সরকার ও তার প্রধান সেনাপতি ভীষণ চটে যান। চটে যান ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান জেনারেল অরোরাও। তাঁরা মুজিববাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে, 'এই বাহিনীর খুঁটি বড় শক্ত।' এটা জেনে তাঁরা মুজিববাহিনীর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসেন।[২১]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে বিএলএফ নেতারা ওপরে ওপরে এককাট্টা হলেও তাঁর সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের আলাদা একটা সম্পর্ক ছিল। তাজউদ্দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ ছিল শেখ মনির। এমনকি তাজউদ্দীনের অনুগত কাউকেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বলিয়াদির আহরাম সিদ্দিকী ছিলেন তাজউদ্দীনের ঘনিষ্ঠ। তাঁকে নিয়ে কলকাতায় রীতিমতো একটা ঝগড়া হয়। কলকাতায় সানি ভিলায় থাকাকালে একটি ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে শেখ মনির সঙ্গে আবু হেনার ভুল-বোঝাবুঝি হয়। এ কারণে আবু হেনা বিএলএফের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আবু হেনার বিবরণে জানা যায় :

> আমি তাকে (মনি) গাইড করে কলকাতায় নিয়ে গেলাম। অথচ সেখানে গিয়ে তিনি চেহারা পাল্টে ফেলেন। সিরাজ ভাইয়ের নির্দেশে আমি বলিয়াদির আহরাম সিদ্দিকীকে এক রাতের জন্য কামারুজ্জামানের সিটে থাকতে দিয়েছিলাম। এ নিয়ে মনি ভাই আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। সে রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। মনি ভাই বৃষ্টির মধ্যেই আহরাম সিদ্দিকীকে বের করে দিতে বলেন। অথচ আহরাম সিদ্দিকী ছিলেন তিন দিনের অভুক্ত। শূন্য হাতে অসুস্থ অবস্থায় তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছিলেন। আমরা গেছি যুদ্ধ করতে। অথচ সামান্য ঘটনা নিয়ে মনি ভাই যে আচরণ করলেন, তা ছিল অমানবিক। সে রাতেই ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমার পূর্বপরিচিত নিরঞ্জন বোসের ২৬ পাম অ্যাভিনিউর

বাসায় উঠলাম। নিরঞ্জনের বাড়ি ছিল খুলনায়। পরে সিরাজ ভাই আমাকে মুজিববাহিনীতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেও আমি রাজি হইনি।[২২]

১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে পাঠ করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার কথা উল্লেখ থাকলেও সরকারের মূল সমন্বয়ক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। শুরু থেকেই এই সরকারের সঙ্গে বিএলএফ তথা মুজিববাহিনীর দ্বন্দ্ব ছিল এবং তাজউদ্দীনকে নানা সময়ে মুজিববাহিনী নেতাদের, বিশেষ করে শেখ ফজলুল হক মনির তোপের মুখে পড়তে হয়। এই দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট সবাই জানতেন না। ফলে সরকারের, বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকের চোখেই মুজিববাহিনীকে নেতিবাচকভাবে দেখা হতো। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা গেছে সরকারের সচিব হোসেন তৌফিক ইমামের ভাষ্যে :

> স্বাধীনতাসংগ্রামের কঠিনতম সময়ে আরেকটি বিশৃঙ্খলা এবং মাঝেমধ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো মুজিববাহিনীর কার্যকলাপে। বিশেষ করে শেখ মনি কেন জানি না, কিছুতেই মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্ব মানতে চাইতেন না। আমার সন্দেহ হয়, তাঁর এই আচরণের পেছনে অদৃশ্য কোনো শক্তির হাত থাকতে পারে। খন্দকার মোশতাক কোনো কোনো সময় ইন্ধন জোগাতে পারেন। তবে শেখ মনির ক্ষমতার উৎস ছিল ভারতীয় 'র' (RAW) নামক গোপন প্রতিষ্ঠান। এরাই মুজিববাহিনীকে সংগঠিত করে এবং ট্রেনিং ও অস্ত্র সরবরাহ করে। সমস্যার সৃষ্টি হতো তখনই, যখন মুজিববাহিনীর সদস্য, বিশেষ করে কমান্ডোরা 'নিয়মিত বাহিনী'র ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইত। তাতে সেক্টর কমান্ডাররা ক্ষুব্ধ হতেন, অভিযোগ করতেন প্রধান সেনাপতি ওসমানীর কাছে; তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্তেজিতভাবে এটা উত্থাপন করে দ্রুত প্রতিবিধান চাইতেন। প্রধানমন্ত্রী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারত সরকারের কাছে এই বিষয়ে প্রতিকার পাননি। আমার উপস্থিতিতেই কর্নেল ওসমানী কয়েকবার অব্যাহতি চেয়েছেন মুজিববাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী অনেক বুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করতেন।
>
> আরেকটি ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। সেটা অক্টোবর মাসে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পূর্ব রণাঙ্গন পরিদর্শনে গিয়ে আগরতলা সার্কিট হাউসে অবস্থান করছিলেন। শেখ মনি ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

শিলিগুড়ির পাংগা ট্রানজিট ক্যাম্পে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খান

বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিতে থাকেন। সবাই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। যৌথ কমান্ড গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু হতেই এই বিশৃঙ্খলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সেটা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকেই। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ডি পি ধরকে নীতিনির্ধারণী কমিটির চেয়ারম্যান (মন্ত্রীর মর্যাদায়) নিয়োগের পর ধীরে ধীরে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাপারে সমন্বয় অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্ভবত RAW তখন থেকে মুজিববাহিনীর রাশ টেনে ধরে। এরপর কর্নেল ওসমানীর জন্য, বিশেষ করে মুক্তিবাহিনীর চেইন অব কমান্ড বজায় রাখতে বড় কোনো অসুবিধা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।[২৩]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিএলএফ তথা মুজিববাহিনীর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি 'হিন্দু' যুবকদের আলাদা প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি স্বতন্ত্র বাহিনী তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন সুতার ও কালিদাস বৈদ্য। ভবিষ্যতে স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে কিংবা অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় এ ধরনের একটি বাহিনী প্রস্তুত রাখার গুরুত্ব তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। অবশেষে সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাটি হলো। ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিই ব্যবস্থা করে দিলেন। ট্রেনিং কার্যক্রম চালানো হয় গোপনে। সপ্তাহে

প্রায় ৬০০ তরুণকে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। এভাবে ২ হাজার ৫০০ জন যাওয়ার পর তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার আগেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রশিক্ষণের কাজও বন্ধ হয়ে যায়।[২৪] এ ব্যাপারে কালিদাস বৈদ্য বলেছেন :

> ট্রেনিংয়ের প্রস্তাবটি অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে এ বাহিনীকে আমি গণমুক্তি বাহিনী নাম দিই। যেহেতু একটি গোপন বাহিনী, সেহেতু নামও গোপন থাকল। এখানে উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে যে চিত্তবাবু আড়াল থেকে মুজিববাহিনী চালানোর দায়িত্ব নেন। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে সেই গণমুক্তি বাহিনীকে আড়াল থেকে চালানো। তবে মুজিববাহিনী শেষ পর্যন্ত গোপনীয়তা ত্যাগ করে সদরে এল, কিন্তু গণমুক্তি বাহিনী সদরে আসার সুযোগটি আর পেল না। কুম্ভকর্ণের ঘুমের মতো সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুম কবে ভাঙবে, তা কেউ জানে না।[২৫]

## ৭

অক্টোবরে বিএলএফের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৭০ জনের একটি সম্মেলন হয় দেরাদুনের পাশে কালশিতে। এটি ছিল একটি অস্থায়ী প্রশিক্ষণকেন্দ্র। বিএলএফের নেতারা জানতেন, তাঁরা তাঁদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে একটি বিশেষ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। জয়লাভের পর তাঁদের নেতা অনুপস্থিত থাকবেন, এটা কারও কাম্য ছিল না। তবে আশঙ্কা ছিল, তিনি জীবিত ফিরে না-ও আসতে পারেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র থেকে সম্ভাব্য যে বিরোধিতা বা আক্রমণ আসতে পারে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিএলএফ নেতারা একমত হন। সিদ্ধান্ত হয়, সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় শেখ মুজিবের রাজনৈতিক আদর্শ—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধারণ করে যে দর্শন, তাকে শেখ মুজিবের নামে পরিচিতি দিতে হবে। সিরাজুল আলম খান প্রস্তাব করেন, এই দর্শনের নাম হবে 'মুজিববাদ'। সবাই এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ওই সম্মেলনে বিএলএফের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিববাহিনী রাখা হয়।[২৬]

প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল মে মাসের শেষ দিকে। শেষ হলো অক্টোবরে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ছাত্রলীগের লাখ লাখ সদস্য বিএলএফের সন্ধান পাননি। সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ছাত্রসংগঠনের অনেক তরুণ মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র

প্রতিরোধপর্বে সরাসরি অংশ নেওয়ার জন্য মরিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই জানতেন না কোথায় বিএলএফ, কোথায় গেলে এর প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে। তাঁদের একটা বড় অংশ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোতে গিয়ে হাজির হতেন এবং প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে দেশের ভেতরে ঢুকতেন। এঁদের পরিচিতি ছিল 'ফ্রিডম ফাইটার' বা এফএফ নামে। অনেক জায়গায় বিএলএফ ও এফএফের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। আবার অনেক জায়গায় তাঁরা একই কমান্ড কাঠামোর অধীনে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এঁদের একজন ছিলেন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার খোদা বখশ চৌধুরী। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, থাকতেন জিন্নাহ হলে (সূর্য সেন হল)। আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এভাবে :

> একদিন খবর পেলাম সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা রাঙ্গুনিয়ায় এসেছে। এদের নেতৃত্বে আছেন আমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়। আমার ডাক পড়ল। আমি তাদের একজন সদস্য হিসেবে সব রকমের কাজে অংশ নিতে থাকি। মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর পার্থক্য স্থানীয়ভাবে ছিল না। সবার একটাই লক্ষ্য, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে। এ সময় আমার মনে একটা চিন্তা ঢুকল, সশস্ত্র যোদ্ধা হওয়া ছাড়া সিভিলিয়ান সমর্থক হয়ে সর্বোচ্চ অবদান রাখা যায় না। সিদ্ধান্ত নিলাম, ভারতে যাব এবং ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে যুদ্ধ করব।
>
> দুজন সঙ্গী ও একজন গাইড নিয়ে রাঙ্গুনিয়া থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বিরতিহীনভাবে পায়ে হেঁটে এক সন্ধ্যায় রামগড়ের পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্প এড়িয়ে ফেনী নদী পার হয়ে সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরার একটা ছোট বাজারে পৌঁছাই। কুপি বাতির আলোয় একটা চায়ের দোকানে দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত মুখ ভিপি আ স ম আবদুর রব, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরী এবং চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা এস এম ইউসুফ বসে আছেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, আমার আসতে এত দেরি হলো কেন। তারপর তিনজনের মধ্যে শুরু হলো কানে কানে কথা। অবশেষে রব ভাই বললেন, মুজিববাহিনীর সর্বশেষ দলটি ট্রেনিংয়ে চলে গেছে। আর ট্রেনিং হবে না। তাঁরা আমাকে ১ নম্বর সেক্টরে হরিণা ক্যাম্পে যেতে বললেন। সেখানে একটা তাঁবুতে ঠাঁই হলো।
>
> কয়েক দিন পর এক সন্ধ্যায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হওয়ার নির্দেশ পেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম ট্রেনিং শেষ করে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল অপেক্ষা করছে। তাদের জন্য একজন প্লাটুন

কমান্ডার নিয়োগ করা হবে। আমাকেই কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করা হলো। দলটির সবাই রাঙ্গুনিয়ার অধিবাসী, বেশির ভাগই রাঙ্গুনিয়া কলেজের ছাত্র। আমাকে নিয়ে সংখ্যা হলো ৩৯। কাকতালীয়ভাবে সেক্টর ওয়ানের এই গেরিলা প্লাটুনের নম্বরও হলো ৩৯। আমার সঙ্গে পুরো দলের এই প্রথম পরিচয়। আমার নেতৃত্বে আসা দলটির উপনেতা ছিলেন রাঙ্গুনিয়া কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের একজন প্রভাবশালী নেতা। দলের সদস্যদের বেশির ভাগই ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী-সমর্থক। ছাত্রলীগের কোনো কর্মী-সমর্থকের নেতৃত্ব ছাড়া দলটিকে দেশের ভেতরে পাঠানো হবে না, এমন সিদ্ধান্তই নেতারা নিয়েছিলেন। আমি সেই শূন্যস্থান পূরণ করলাম। দেশের ভেতরে এসে আমরা সবাই মুজিববাহিনীর সঙ্গে এককাট্টা হলাম।[২৭]

৮

বিএলএফের দুটি প্রশিক্ষণশিবিরে ৬ হাজার ৮০০ তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দেশের ভেতরে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের খুঁজে বের করা, চারটি ট্রানজিট ক্যাম্প বা বেস ক্যাম্প চালানো, প্রশিক্ষণের পর তরুণদের দেশের ভেতরে পাঠানো ইত্যাদি খরচ মেটানোর জন্য ৭৬ লাখ টাকার একটা বাজেট তৈরি করেছিলেন বিএলএফ নেতারা। বরাদ্দ হয়েছিল ৭০ লাখ টাকার কিছু বেশি। কয়েক কিস্তিতে টাকাটা দেওয়া হয়। ২ লাখ টাকার মতো বাকি ছিল। ওই টাকা দেওয়া হয় পরে। যুদ্ধ শেষে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ ঢাকায় মুজিববাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে আসা সদস্যদের যাতায়াতের জন্য ওই টাকা খরচ করা হয়েছিল।[২৮]

ছাত্রলীগের মেয়েদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল আগরতলায়। এসএফএফের কর্মকর্তারা এই প্রশিক্ষণ দেন।

এ সময় আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার। ইয়াহিয়া খান ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন। কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ সদস্যরা যাতে বেশি সংখ্যায় ঢাকায় ফিরে এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন, সে জন্য পাকিস্তানি গোয়েন্দারা গোপনে চেষ্টা চালায়। কলকাতায় বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্র আগে থেকেই ছিল। ভারত সরকারের ইঙ্গিতে কলকাতায় থাকা মুজিববাহিনীর সদস্যরা জাতীয় পরিষদ সদস্যদের পাহারা দিতে শুরু করে। তাদের এই বলে হুমকি দেওয়া হয় যে যারা ঢাকায় যাওয়ার চেষ্টা করবে, তাদের গুলি করে মারা হবে। অন্যদিকে ভারতীয় গোয়েন্দাদেরও বাংলাদেশের

আগরতলার লেম্বুছড়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে বিএলএফের নারী সদস্যরা। বাঁ থেকে মমতাজ, ঝর্না, ফোরকান, ঝুনু, প্রশিক্ষক মেজর আর সি শর্মা, বকুল, আলেয়া, সাকি ও ইকো

জাতীয় পরিষদ সদস্যদের চলাফেরার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে কেউ দেশে ফিরে যেতে না পারে।[২৯]

অনেক আওয়ামী লীগ নেতা শরণার্থীজীবনের কষ্ট এবং অনিশ্চয়তা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁরা অনেকেই ভারত সরকারের মনোভাব জানতেন না, জানতেন না কবে এই সংকটের নিষ্পত্তি হবে। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানেরও জানা ছিল না সামনের দিনগুলোতে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করছে। একাত্তরের ২০ ডিসেম্বর তিনি ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে ছিটকে পড়েছিলেন। ক্ষমতা ছেড়ে দেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতে।

বিএলএফের প্রথম সারির নেতারা সবাই সামরিক প্রশিক্ষণ নিলেও অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিতে দেশের ভেতরে যাননি। তাঁরা আগাগোড়া সংগঠকই থেকে গেছেন। ব্যতিক্রম ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি। বিএলএফের সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে দেশের ভেতরে ঢোকা শুরু করেন জুলাইয়ের শেষ দিকে। জেনারেল উবানের নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চলে ২৩ নভেম্বর শুরু হয় 'অপারেশন ইগল'। তাঁরা মিজোরাম হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢোকেন। বিএলএফের কয়েকজন সদস্য নিয়ে শেখ মনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।[৩০] বিএলএফের অন্য তিন কমান্ডার দেশে ঢোকেন ডিসেম্বরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং তাঁরা সামনে থেকে এর নেতৃত্ব

দেবেন, এমনটি তাঁরা ভেবে থাকলেও তার আগেই যুদ্ধ শেষ করার ভারতীয় পরিকল্পনাটি হয়তো জানা ছিল না।

মে মাস থেকে শুরু করে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত বিএলএফের কয়েকজন সিনিয়র সদস্য দেরাদুনের ক্যাম্পে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদের মূল কাজ ছিল প্রশিক্ষণ নিতে আসা তরুণদের জন্য পলিটিক্যাল মোটিভেটর হিসেবে কাজ করা। এঁদের মধ্যে ছিলেন হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক, মাসুদ আহমেদ রুমি প্রমুখ। এ বিষয়ে আমি কথা বলি আম্বিয়ার সঙ্গে :

> মহিউদ্দিন আহমদ : আপনি তো পুরো সময়টা তান্ডুয়াতে ছিলেন?
>
> শরীফ নুরুল আম্বিয়া : হ্যাঁ।
>
> মহি : ডিসেম্বরে বাংলাদেশে এলেন?
>
> আম্বিয়া : হ্যাঁ। বিজয় দিবসের পরে আমরা দেরাদুন থেকে রওনা দিয়েছি। আমি, ইনু, মাহবুব। রুমি আগেই চলে গিয়েছিল।
>
> মহি : দেরাদুনে আপনারা এত দিন কেন থাকলেন?
>
> আম্বিয়া : যুদ্ধের শেষ দিকে আমাদের দিকে নজর দেওয়ার ফুরসত বোধ হয় ওদের ছিল না। সন্ধ্যার পর আমরা ব্ল্যাকআউটে বসে থাকতাম। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা ১৫-১৬ জন ছিলাম। একে অন্যের খোঁজ রাখা আর চা খাওয়া, এই ছিল কাজ।[৩১]

একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর ভারতের সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে এবং পাকিস্তানিদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তাদের পরিচয় হয় 'মিত্রবাহিনী'। ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় ভারত। পরদিন ৭ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দেয় ভুটান। মুজিববাহিনীর মোটিভেটররা তখনো তান্ডুয়ায় অলস সময় কাটাচ্ছেন।

'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো' উচ্চারণে যাঁরা একদা সোচ্চার ছিলেন, তাঁদের নেতারা কেউ অস্ত্র হাতে নেননি। ছাত্রলীগের জ্যেষ্ঠ নেতা আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, মনিরুল ইসলাম—এঁরা সবাই যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আচরণ ছিল একই রকম। পৃথিবীতে অনেক দেশেই স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াই হয়েছে, হয়েছে জনযুদ্ধ। বাংলাদেশ সম্ভবত ব্যতিক্রম, যেখানে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেননি। সবাই সংগঠক। বাংলাদেশের ভেতরে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারীর চেয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে থেকে যুদ্ধ করা লোকের সংখ্যা বেশি।

সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হলো, মুজিববাহিনীর শীর্ষ নেতারা তাঁদের

# BANGLADESH
# বাংলাদেশ

Vol. 1, No. 16 | a weekly news bulletin | December 10, 1971

# INDIA & BHUTAN RECOGNIZE BANGLADESH DE JURE

## Bangladesh Foreign Minister Urges World Community To Recognize The 8th Largest Nation

**The People's Republic of Bangladesh was accorded de jure recognition by India on December 6. India's formal recognition came after the Bengali Mukti Bahini had liberated most of the territory of Bangladesh from the West Pakistani occupation forces. Bhutan, another close neighbor, accorded formal diplomatic recognition to Bangladesh on December 7.**

Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, in her statement of recognition told the Parliament in New Delhi that "The people of Bangladesh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves partners in the same cause."

Mrs. Gandhi said, "Our thoughts at this moment are with the Father of this new state—Sheikh Mujibur Rahman. I am sure that this house would wish me to convey to Their Excellencies the Acting President of Bangladesh and the Prime Minister and to their colleagues

See RECOGNITION, page 2

## U.S. Senators Urge Recognition of the Reality of Bangladesh

Speaking on the floor of the Senate on December 7, Senator Edward M. Kennedy emphatically urged the American Government "to recognize the fact that Bangladesh now exists, not only in the minds of the Bengali people, but in the reality of current events." He said "our government must come to understand that it is time for all of us" to recognize the reality of Bangladesh.

### Never Again

Challenging the pro-Pakistan bias of American policy, Senator Frank Church, who recently returned from an on-the-spot inspection tour of the subcontinent said, "I came away from that scene of tragedy and despair, knowing in my bones ... that the people of East Pakistan would never again submit to the rule of the West Pakistan government . . ."

See U.S. SENATORS, page 3

'Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills'—Walt Whitman

The material is prepared and circulated by the Bangladesh Mission, 1223 Connecticut Avenue, N.W., Fourth Floor, Washington, D.C. 20036, which is registered under the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, as an agent of the Government of Bangladesh, Mujibnagar, Bangladesh. This material is being filed with the Department of Justice where the required registration statement of the Bangladesh Mission is available for public inspection. Registration does not indicate approval of the contents of this material by the United States Government.

৬ ডিসেম্বর ভারত ও ৭ ডিসেম্বর ভুটানের স্বীকৃতিসংবলিত সংবাদ

যোদ্ধাদের পরিত্যাগ করেছেন। সামনে থেকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরে থাক, সদস্যদের তালিকাটি পর্যন্ত সংরক্ষণ করেননি। ফলে এই বাহিনীর অনেকেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাননি। অথচ ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও উদ্যোগের মাধ্যমে নেতারা অনেকেই নিজেদের জন্য স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। নেতৃত্বের এই আচরণ ছিল দুঃখজনক।

মনে হলো যুদ্ধটা হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে। দেশে অনেক লোকের হাতে অস্ত্র। কেউ কারও কথা শুনছে না। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ

ঢাকা স্টেডিয়ামে মুজিববাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে গুরু-শিষ্য বঙ্গবন্ধু ও সিরাজুল আলম খানের মিলন

বারবার অস্ত্রসমর্পণ করার আহ্বান জানালেও কেউ তাতে কান দিচ্ছে না। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে যে কোনো রকমের সংহতি নেই, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফিরে এলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২। দেশের হাল ধরলেন তিনি। সবাইকে অস্ত্র জমা দিতে বললেন। বিভিন্ন বাহিনী ঘটা করে অস্ত্র জমা দেওয়ার আয়োজন করল। কার কাছে কী পরিমাণ অস্ত্র আছে এবং কতগুলো অস্ত্র জমা পড়েছে, তার কোনো হিসাব রাখা হয়নি। কোথাও পেশাদারত্বের ছাপ ছিল না। প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে খোদা বখশ চৌধুরীর দেওয়া সাক্ষাৎকারে :

> পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শেষ হলো যুদ্ধ। মুজিববাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডার শেখ ফজলুল হক মনি আমাদের থানার মুক্তিযোদ্ধাদের স্কটের নিরাপত্তায় রাঙামাটি থেকে চট্টগ্রামে এলেন। পরদিন চট্টগ্রাম শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত অস্ত্র জমা না দেওয়ার জন্য কঠোর নির্দেশ জারি করলেন।
>
> বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসার পর ৩১ জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্রসমর্পণের তারিখ ঠিক হয়। আমরা নির্ধারিত তারিখে স্টেডিয়ামে

> হাজির হই এবং সব অস্ত্র জমা দিই। আমাদের বলা হলো, স্টেডিয়ামে সব অস্ত্র রেখে আমরা যেন খালি হাতে বেরিয়ে যাই। ১ নম্বর সেক্টরে দস্তখত করে আমি যে অস্ত্র গ্রহণ করেছিলাম, তা কেউ বুঝে নিল না। কেউ আমাকে কোনো প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদ দিল না। অস্ত্রসমর্পণের কোনো প্রমাণ ছাড়াই আমার মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলো।[৩২]

বাহাত্তরের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে মুজিববাহিনীর সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য সমবেত হন। মাঠের মধ্যেই একটা মঞ্চ বানানো হয়েছিল। গ্যালারি ছিল দর্শক-শ্রোতায় ভরা। শেখ মুজিব মঞ্চে ওঠার পর সিরাজুল আলম খান ডান হাত ওপরে তুলে স্লোগান দেন, 'বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু'। চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি হলো, 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'। এরপর তিনি কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে আওয়াজ তুললেন, 'মুজিববাদ মুজিববাদ'। আবারও শোনা গেল 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'। মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ এবং শ্রমিকনেতা আবদুল মান্নান। তাঁরা একে একে শেখ মুজিবের পায়ের কাছে স্টেনগান রাখলেন এবং পা ধরে সালাম করলেন। ছাত্রলীগের তরুণেরা বেশ কয়েক দিন স্লোগানে স্লোগানে ঢাকার রাজপথ মুখর করে রাখলেন—বিশ্বে এল নতুন বাদ, মুজিববাদ মুজিববাদ।

## তথ্যসূত্র

১. সিরাজুল আলম খান

২. তোফায়েল আহমেদ

৩. বৈদ্য, পৃ. ১৫৮-১৫৯

৪. ওই, পৃ. ১৫০-১৫১

৫. Raina, Ashoka (1981), *Inside Raw: The Story of India's Secret Service*, Vikas Publishing House, New Delhi, p. 50; বেগম, সাহিদা, পৃ. ৮৩

৬. Ramesh, Jairam (2018), *Interwined Lives: P. N. Haksar and Indira Gandhi*. Simon & Schuster India, New Delhi, p. 121-122

৭. Raina, p. 48

৮. Ibid, p. 50-51

৯. Ibid, p. 55

১০. Rehman, 1 (2017), *Himalayan Challenge: India's Conventional Deterrent and the Role of Special Operations Forces along the Sino-*

*Indian Border*, Naval War College Review, Winter 2017, p. 109-142; Sinha, D & Balakrishnan, R (2016). *Employment of India's Special Operation Forces*, ORE Issue Brief, No. 150, June 2016

১১. Ibid

১২. Raina, p. 54

১৩. উবান, মেজর জেনারেল (অব.) এস এস (২০০৫), *ফ্যান্টামস অব চিটাগাং : দ্য 'ফিফথ আর্মি' ইন বাংলাদেশ*, ঘাস ফুল নদী, ঢাকা, পৃ. ২০-২১

১৪. বিএলএফের সদস্য হিসেবে লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা

১৫. Raina, p. 55-57

১৬. *The Untold Story of Dr. Abu Hena*

১৭. আমির হোসেন আমু

১৮. তথ্য মন্ত্রণালয়, *ড. কামাল সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার*, পৃ. ২০৯-২১০

১৯. Raghavan, Srinath (2013), *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh*. Harvard University Press, Massachusetts, p. 182-183

২০. আমির হোসেন আমু

২১. বৈদ্য, পৃ. ১৫৯-১৬০

২২. *Untold story of Dr. Abu Hena*

২৩. ইমাম, এইচ টি (২০০৪), *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৭৯

২৪. বৈদ্য, পৃ. ১৬৩-১৬৪

২৫. ওই

২৬. ইসলাম, মনিরুল (২০১৩), *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র*, জ্যা পাবলিকেশনস, ঢাকা, পৃ. ১৯৩

২৭. খোদা বখশ চৌধুরী

২৮. সিরাজুল আলম খান

২৯. *বৈদ্য*, পৃ. ১৬৫-১৬৬; সিরাজুল আলম খান

৩০. উবান, পৃ. ১০৩

৩১. শরীফ নুরুল আম্বিয়া

৩২. খোদা বখশ চৌধুরী

# পর্ব ৩

# জাসদ

www.amarboi.com

# বিদ্রোহ

সিরাজুল আলম খান আরও অনেকের মতো ভেবেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত নেতারা বেরিয়ে আসবেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, আস্থা, আনুগত্য ও পক্ষপাত ছিল। আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের তিনি আমলে নিতেন না। যুদ্ধের সময় তাঁদের অনেকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাকে খোলামেলাভাবে কিছু কথা বলেছেন :

> জামায়াতে ইসলামী তো পাকিস্তানি ফোর্স। তারা পাকিস্তান রাখতে চেয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ কী চেয়েছে? ইলেকশন পর্যন্ত তো এক রকম ছিল। যখন এটা সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে টার্ন নিল, দে অপোজড ইট। তখন তো মিয়াভাইদের অবস্থা এমন হয়েছে—'যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে ফোর্স বের হবে, তখন তো আমরা নাই।' এসব নিয়ে আমাদের সঙ্গে তো তাদের কথাবার্তা হয়েছে। কোনো কারণ নেই, তবু বলি, কোনো কারণে যুদ্ধ যদি আরও এক বছর চলে, তাহলে ওরা তো বাদ পড়ে যায়। রিয়েল ফাইটিং ফোর্স চলে আসত সামনে। এটা ইন্ডিয়ান গভমেন্টও বুঝত। তারাও চাইত, যে করেই হোক ওই শক্তিটা যেন গ্রো না করে। দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল। এখন তো বলা যাবে না স্বাধীন হোয়ো না। সাড়ে আট মাসের বাচ্চা। বলা যাবে না যে এই বাচ্চা চাই না। ইট নিডস নার্সিং।[১]

সিরাজুল আলম খানের কথা হলো, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শুরুটা ভালো হয়নি। যেভাবে এটি গড়ে তোলা দরকার ছিল, তা হয়নি। আওয়ামী লীগ দল হিসেবে এ জন্য তৈরি ছিল না। এ যেন পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। হঠাৎ পেয়ে যাওয়া এক বিশাল সম্পদ, যার ব্যবহার তাঁরা জানেন না। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে এলেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি। ১১ জানুয়ারি তিনি 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। এই আদেশে ১৯৭০

সালে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিজয়ী এবং আইনের দ্বারা অন্য কোনো দিক দিয়ে অযোগ্য বিবেচিত নন', এমন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থার কথা বলা হলো। ১২ জানুয়ারি শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ পান। একই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। সিরাজুল আলম খান মনে করতেন, 'বঙ্গবন্ধুর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নেতা ছিলেন তাজউদ্দীন। তিনিই হলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ক্যাজুয়ালটি।'[২]

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাজউদ্দীনের বাদ পড়া কি অনিবার্য ছিল, নাকি এর পেছনে অন্য কিছু কাজ করেছে? এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বিশিষ্ট লেখক কামরুদ্দীন আহমদ এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতে মনে হয় সরকারপ্রধান হিসেবে শেখ মুজিবের কোনো বিকল্প ছিল না।

> ঢাকায় যেদিন মুজিব ফিরে এলেন, সেদিন তাঁর প্রথম কর্তব্যকাজ মনে হলো ড. কামাল হোসেনকে বাংলাদেশের বিরোধিতার অভিযোগ ও মুক্তিবাহিনীর সন্দেহ থেকে মুক্ত করা, যা তিনি প্রথম দিনকার জনসভায় বিচক্ষণতার সঙ্গেই করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর সারা দিন ধরে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার চলল। পরের দিনই তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট নানা অভিযোগ আসতে আরম্ভ করল। বিশেষ করে তাঁর ভাগনে ফজলুল হক মনি ও দলের অন্যদের পক্ষ থেকে। সব কথায় কান না দিলেও তাজউদ্দীনের নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে সরকার গঠন করা তাঁর মনঃপূত হয়নি। খন্দকার মোশতাক আহমদ আওয়ামী লীগে সবার চেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দাবি কেন বিবেচনা করা হয়নি, তা শেখের পক্ষে বোধগম্য হলো না। তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৫৩ সালে। নজরুল ইসলাম তাঁর চেয়ে পুরোনো। মনসুর আলী একমাত্র সংসদ সদস্য, যিনি ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করে নিজে প্রধানমন্ত্রী হওয়া শেখ সাহেবের খুব ভালো লাগেনি।
>
> তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে তাঁর মন্ত্রিসভার সবারই নালিশ ছিল। খন্দকার মোশতাকের নালিশ ছিল যে তাজউদ্দীন বরাবরই সমাজতন্ত্রবাদী—সংসদীয় গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা খুবই কম। অবিভক্ত

বাংলায় মুসলিম লীগ সংগঠনে তিনি ছিলেন পুরোপুরি আবুল হাশিম সাহেবের দলের লোক। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি তাঁর কোনো আনুগত্য ছিল না। অন্যদিকে তাজউদ্দীনের দাবি ছিল যে যদিও তিনি ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্য নড়বড়ে ছিল না। ১৯৫৪ সালে খন্দকার মোশতাক চিফ হুইপ পদের জন্য আবু হোসেন সরকারের দলে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে মনসুর আলী সাহেব দুর্নীতির মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং সেই মামলা উঠিয়ে না নিলে মামলায় তাঁর মুক্তি পাওয়া শক্ত ছিল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের সময় নিজেকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন—ওই কাজটা আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রমাণ করে না। সুতরাং ওই সব নেতার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা তাঁকে অপমান করারই শামিল।

শেখ মুজিব সব দিক বিবেচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে তিনি নিজেই হবেন প্রধানমন্ত্রী ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী হবেন রাষ্ট্রপতি। খন্দকার মোশতাক, মনসুর আলী, তাজউদ্দীন ও অন্যরা তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য হবেন, যাতে তাঁদের একে অন্যের প্রতি ঈর্ষা বা দ্বন্দ্ব না থাকে।[৩]

## ২

১৯৬০-এর দশকে সিরাজুল আলম খান যে চক্র বা সেল তৈরি করেছিলেন, যেটাকে তিনি পরে 'নিউক্লিয়াস' নামে প্রচার করেছেন, তা ছিল একটি রাজনৈতিক দলের ভ্রূণ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ভ্রূণটি আকারে ও প্রকারে বাড়তে থাকে। যেভাবেই হোক, তিনি একদল তরুণকে সঙ্গে পেয়েছিলেন, যাদের আন্তরিকতা ও আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। এটি তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল। তিনি ভাবলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তিনি দর-কষাকষির স্তরে পৌঁছে গেছেন। তিনি তলিয়ে দেখেননি বঙ্গবন্ধু তাঁকে কী চোখে দেখতে অভ্যস্ত। বঙ্গবন্ধুর কাছে তিনি একজন কর্মী। কর্মঠ, অনুগত, আস্থাভাজন শিষ্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুল ম্যান্ডেটের বলে শেখ মুজিব যে আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থেকে একজন রাজনীতিবিদের পক্ষে এ ধরনের অর্জন পৃথিবীতে বিরল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও দেশ তাঁর হাতে সমর্পিত হয়েছে। তিনি এখন অনেক

উঁচুতে, একেবারেই শিখরে। সিরাজুল আলম খানকে তিনি তখনো একজন কর্মী মনে করেন।

সিরাজুল আলম খান ভেবেছিলেন, শেখ মুজিব 'জাতির পিতা'। তিনি দল এবং সরকারের প্রধান হবেন না। বাইরে থেকে তিনি নির্দেশনা দেবেন, নৈতিক শক্তি জোগাবেন। দেশটি কীভাবে পরিচালিত হবে, এ বিষয়ে সিরাজ পয়েন্ট আকারে দফাওয়ারি কিছু সুপারিশ তৈরি করলেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন মনিরুল ইসলাম, যিনি একাত্তরে তাঁর সেক্টরে মুজিববাহিনীর উপ-অধিনায়ক ছিলেন। মনিরুল ইসলাম পরে একটি বই লিখেছেন, যেখানে শেখ মুজিবকে দেওয়া সিরাজুল আলম খানের চার দফা সুপারিশের কথা উল্লেখ আছে। এ নিয়ে আমি একদিন কথা বললাম সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে :

> মহিউদ্দিন আহমদ : মনিরুল ইসলামের বইতে আপনার দেওয়া চার দফার কথা আছে। এটাই কি সব?
>
> সিরাজুল আলম খান : চার দফা কেন হবে? দফা তো ছিল ১৫টা। *গণকণ্ঠ*-এ তো ছাপা হয়েছিল—পড়ো নাই?
>
> মহি : পড়েছি। ওটা তো ছাপা হয়েছিল। আপনারা জাতীয় সরকারের কথা বলেছিলেন।
>
> সিরাজ : হ্যাঁ, আরও অনেক কিছুই বলেছিলাম। কাগজ-কলম আনো, লিখে নাও।

আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। তিনি পয়েন্টগুলো বললেন, আমি টুকে নিলাম। তারপর সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে দাঁড় করালাম ১৫ দফা। তাঁকে খসড়াটি দেখালাম। তিনি অল্প পরিমার্জন করলেন। আমি এটি আমার লেখা *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি* বইয়ে উদ্ধৃত করেছি। পরে অবশ্য তিনি আমার বইয়ের ওই অংশটুকু হুবহু তুলে নিয়ে একটি চটি বই বের করেছেন। নাম দিয়েছেন 'সিরাজুল আলম খানের ১৫ দফা'। কিন্তু ওই দফাগুলোর কী হলো? এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

> মহি : আপনি কি ১৫ দফা লিখিত আকারে বঙ্গবন্ধুকে দিলেন?
>
> সিরাজ : আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তিনি বললেন, এটা তোফায়েলকে দাও। তোফায়েল তখন তাঁর পলিটিক্যাল সেক্রেটারি। আমি কী করে তোফায়েলকে দিই? এটা তো আমার জন্য বিব্রতকর। আমি তাঁর হাতেই দিতে চাইলাম। আমি চেয়েছিলাম, তিনি এটা পড়ে দেখবেন, আলোচনা করবেন।
>
> মহি : তারপর কী হলো?
>
> সিরাজ : তিনি এটা নিলেন, তারপর ড্রয়ারে রেখে দিলেন। ওখান থেকে ওটা সম্ভবত আর বের হয়নি।[৪]

কী ছিল ওই ১৫ দফায়? বাহাত্তরের ২৫ মে ডাকসুর সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ এবং ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়ার নামে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়েছিল। সিরাজুল আলম খানের দেওয়া প্রস্তাবগুলোর ভিত্তিতেই এই বিবৃতি তৈরি হয়েছিল। বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের পরিস্থিতি খুবই জটিল এবং 'কেবল বঙ্গবন্ধুই দেশকে নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।' বিবৃতিতে উল্লেখ করা দাবিগুলোর মধ্যে ছিল :

১. জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সকল ক্ষমতার উৎস বলে ঘোষণা করতে হবে।
২. বর্তমান মন্ত্রিসভা ও গণপরিষদ বাতিল করে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বোত্তম সদস্যদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে।
৩. বিপ্লবী সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট করে অন্তর্বর্তীকালীন একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করতে হবে।
৪. গণ-আদালতে দুর্নীতিপরায়ণ গণপরিষদ সদস্যদের প্রকাশ্য বিচার করতে হবে।
৫. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দালাল, রাজাকার, আলবদর, চোরাচালানি, কালোবাজারি ও সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের প্রকাশ্যে গুলি করে মারতে হবে।
৬. অসৎ ব্যবসায়ী এবং নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, লাল বাহিনী ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে দিতে হবে।
৭. সব রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ আমলার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।[৫]

বাহাত্তরের জানুয়ারিতে জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল লাল বাহিনী। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম ১৯৭০ সাল থেকেই শোনা গেছে। এর প্রধান ছিলেন আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা আবদুর রাজ্জাক। দুজনই একসময় সিরাজুল আলম খানের আস্থাভাজন ছিলেন। কিন্তু এই বিবৃতি তৈরি করল অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স। একই তারিখে (২৫ মে) জাতীয় শ্রমিক লীগের তিন নেতা—মো. শাহজাহান, আবদুল মান্নান ও রুহুল আমিন ভূঁইয়া একটি যৌথ বিবৃতিতে দেশে 'জরুরি


www.amarboi.com

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সালাম নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। পাশে বাহিনীপ্রধান আবদুর রাজ্জাক

অবস্থা ঘোষণা, মন্ত্রিপরিষদ ও গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার' গঠনের দাবি জানালেও পরে আবদুল মান্নান বিবৃতি থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন।[৬]

বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগের ভেতরে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ২৬ মে আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কোরবান আলী, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক এক বিবৃতিতে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও অতিবিপ্লবীদের মোকাবিলা করার জন্য' জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।[৭]

ব্যাপারটি বেশ গোলমেলে। একদিকে সিরাজুল আলম খান ও তাঁর অনুসারীরা চাচ্ছেন 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' কায়েম করতে, অন্যদিকে তাঁরা দেশে 'নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীদের' বিরুদ্ধে 'লাল বাহিনী' এবং 'আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'কে আরও ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন। আবার 'লাল বাহিনী' এবং 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র নেতারা সিরাজুল আলম খানদের উল্টো 'দুষ্কৃতকারী' বলেছেন। তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার

করছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁরা এক ছাদের তলায় আর কখনোই আসবেন না। মজার ব্যাপার হলো, উভয় গ্রুপই বঙ্গবন্ধুর ওপর আস্থাশীল এবং তাঁকেই নেতা মানেন। শেখ মুজিব তখন পর্যন্ত তাঁর নিরপেক্ষ অবস্থানটি বজায় রেখেছেন।

নানা কারণে ওই সময়ে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। তাঁর 'মুজিব ভাইয়ের' সঙ্গে কী কথা হয়েছিল সিরাজুল আলম খানের? এ প্রসঙ্গে তিনি আমাকে যা বলেছেন, তা এখানে তুলে ধরছি।

> মুজিব ভাই আমাকে বললেন, 'আমি তো কমিউনিস্ট হতে পারব না।' এ দেশটা সোনার দেশ হতো। ১৫ দফাতে যা আছে, তিনটা বছর যদি এভাবে চালানো যেত, থিংস উড হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট।
>
> নিউমার্কেটে যত অবাঙালি ছিল, সবাই তো চলে গেছে। যারা বাঙালি ছিল, তাদের নিয়ে একটা কো-অপারেটিভ করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে চলছে। একদিন দুপুরে এস এম হলে খেতে বসেছি। হঠাৎ নিউমার্কেটের জহির এসে হাজির। বলল, 'মন্ত্রী এম আর সিদ্দিকী তো সব প্রাইভেটে দিয়া দিছে।'
>
> মুজিব ভাইয়ের বাসায় চলে গেলাম। উনি মাত্র খাওয়া শেষ করে একটু শুয়েছেন।
>
> মুজিব ভাই, আপনি বলেছিলেন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সবকিছু ডেভেলপ করা হবে।
>
> হ্যাঁ হ্যাঁ, কী হয়েছে?
>
> জহির, তুমি বলো।
>
> স্যার, আজকে তো এখানে মিনিস্টারের মিটিং ছিল। উনি বলতেছেন, 'এগুলি আমরা প্রাইভেটে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কেউ যদি নিতে চান, কিনে নিতে পারেন।' এই কথাটা আপনাকে জানানো দরকার বলে মনে করতেছি।
>
> মুজিব ভাই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। টেলিফোনে বললেন, 'সিদ্দিকী সাহেব, এটা কী? এটা তো সিদ্ধান্ত না। এটা তো কো-অপারেটিভ হবে। প্রাইভেট ওনারশিপ হবে না।' আমাদের বললেন, 'তোরা যা। যা করার আমি করছি।'
>
> পরদিন বা তার পরদিন এম আর সিদ্দিকী আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলল, 'সিরাজ সাহেব, আপনাদের এগুলো হবে না। শেখ সাহেবের মাথায় ভর করে তো লাভ নেই। এভাবে ইন্ডাস্ট্রি-বিজনেস চলবে না। কো-অপারেটিভ দিয়ে কোথাও কিছু হয়েছে, শুনেছেন? প্রাইভেট ওনারশিপে দেন। দেখবেন, ভালো চলবে। আর কো-

অপারেটিভে দিলে যার যার পকেট ভরবে। এটা করবেন না। আমি এটা পারব না।'

বিকেলবেলা নোটিশ দিয়ে সকালে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া সার্কুলার নিগেট করে দিচ্ছে। পরে মুজিব ভাইকে বললাম। বললেন, 'সব কি আমি দেখতে পারব রে?' এ কথাতেই বোঝা যায় যে এটা তো উনি ব্যক্তিগত দেখার কথা বলছেন।

পারসোনালি হি ওয়াজ কেয়ারিং।[৮]

## ৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে সিরাজুল আলম খানের সম্পর্কটি এক দিনে বা একটি ঘটনায় নষ্ট হয়নি। তবে বোঝা যাচ্ছিল গুরুর সঙ্গে শিষ্যের ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে।

গণভবন ছিল প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন। তিনি থাকতেন ধানমন্ডিতে তাঁর নিজ বাড়িতে। গণভবনে তিনি অফিস করতেন। সারা দিন সেখানে নানা ধরনের লোকের যাতায়াত হতো। গণভবন হয়ে উঠল ক্ষমতার কেন্দ্র। মধু থাকলেই মৌ-লোভীদের ভিড় জমে। তারা আসে নানা উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে কামরুদ্দীন আহমদের ভাষ্য বেশ প্রাসঙ্গিক :

> শেখ সাহেব সম্বন্ধে যা-ই বলা হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে তাঁর সময় গণভবন একটা পুরোদস্তুর আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। শেখ সাহেবকে সাহায্য করতে তাঁর পাশে যারা অবস্থান করত, তারা প্রত্যেকেই মনে করত যে তারা আজীবন গণভবনের অধিবাসীই থাকবে। নানা রকম নির্দেশ যেত ওই গণভবন থেকে। থানার দারোগা থেকে সচিবালয়ের কর্মকর্তারা পর্যন্ত সবাই তটস্থ থাকতেন গণভবনের নির্দেশের ভয়ে। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে এটা প্রায়ই দেখা গেছে যে স্বাধীনতার পরপরই নেতারা তাঁদের দলের লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। দলের লোকজনের জন্য সেক্রেটারিয়েটে থাকে অবাধ যাতায়াতের অধিকার। ভারতে একসময় মাথায় খদ্দরের টুপি দেখলেই লোকে তাকে পারমিটশিকারি বা মাল পাচারকারী ভাবত। পাকিস্তান হওয়ার পর করাচিতে ওই অবস্থা কিছুটা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব বা লিয়াকত আলী খান রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না, তাই সেক্রেটারিয়েটে ভিড়টা হতো ব্যবসায়ীদের। বাংলাদেশের

> রাজনৈতিক কর্মীরা যেহেতু নব্য ব্যবসায়ী হয়ে উঠল, তাই তাদের ব্যস্ত থাকতে হতো শেখ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। মন্ত্রীদের ঘরে পারমিটশিকারিদের ভিড় লেগেই থাকত। ফলে মন্ত্রীদের পক্ষে কাজকর্ম করা ছিল সাধ্যের বাইরে। মন্ত্রীদের ঘরে চলত একে অন্যের ব্যাপারে কুৎসা রটনা। ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে লাগল।[৯]

সিরাজুল আলম খান নিজেই বলেছেন, কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। ষাটের দশকে নানান কাজকর্মে পরামর্শের জন্য তিনি তাঁর কাছে যেতেন। তাঁকে সবকিছু জানাতেন। ওই সময় দুই যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খান ক্ষমতার এক অদৃশ্য দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিষয়টি কামরুদ্দীন আহমদের নজর এড়ায়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> ছাত্রলীগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সিরাজুল আলম খান ও শেখ মনি। দুজনার মধ্যে আদর্শগত ও সংগঠনগত মতানৈক্য ছিল আগেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় মতানৈক্য আরও বৃদ্ধি পায়। দুঃখের বিষয় যে শেখ মুজিবও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন।
>
> ১৯৭২ সালে তিনি আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটিতে এই দুই নেতার মধ্যে শেখ মনিকে মনোনয়ন দিলেন। এর পরপরই একই সঙ্গে যখন ছাত্রলীগ দুই জায়গায় সম্মেলন করছিল, তখন তিনি শেখ মনির সমর্থিত ছাত্রলীগ সম্মেলনে যোগ দিলেন। ফলত তিনি শেখ মনির দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। সেই থেকে শেখ সাহেব ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে মতের আপস-নিষ্পত্তি হয়নি কোনো দিন।
>
> মুক্তিযুদ্ধের পর আমার সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের বার তিনেক সাক্ষাৎ হয়েছে। শেখ সাহেব একবার বিদেশে চিকিৎসা করতে যাওয়ার পূর্বে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আপসরফা করার জন্য আলোচনায় বসেছিলেন। সিরাজুল আলম খান এসেছিলেন সেই আলোচনার বিবরণ আমাকে জানানোর জন্য। বাকি দুবার এসেছিলেন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর তাঁর নিজস্ব মতামতের বিশ্লেষণ জানাতে। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরে বেশ কয়েক মাস আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তখন শুনেছিলাম যে সিরাজুল আলম খান জাতীয়তাবাদের আদর্শ ত্যাগ করে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত হয়েছেন। আবার কেউ বলেছিল যে মুক্তিযুদ্ধের সময় তারিক আলীর সংস্পর্শে এসে তিনি ট্রটস্কিপন্থী হয়েছেন।[১০]

ছাত্রলীগের 'মুজিববাদ' ও 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের পরপরই, বিশেষ করে ফেব্রুয়ারি মাসে,


www.amarboi.com

সংবাদ

ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের প্রতি বঙ্গবন্ধু

# তোমরা একযোগে কাজ কর

ন্যাপ ও জমিয়ত কর্তৃক

সীমান্তে স্ব-শাসন ঘোষণা

১১হাজার প্রতিনিধিঃ বিপুল উৎসাহে ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলন শুরু

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানালেন বঙ্গবন্ধু

যখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় 'সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রপন্থীদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। ওই সময় মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগের কাছাকাছি আসার এবং ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী হয়ে পড়ে। একদিকে ছাত্রলীগে ভাঙনের আওয়াজ, অন্যদিকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছাত্র ইউনিয়নের 'এসো মোরা দেশ গড়ি' স্লোগান ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে।

বাহাত্তরের ৯ এপ্রিল ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শুরু হয় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। প্যান্ডেলের পাশে খোলা জায়গায় হার্ডবোর্ড দিয়ে দুটো ঢাউস সাইজের মিসাইল বানিয়ে প্রদর্শন করা হয়। একটা মিসাইলের গায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং অন্যটাতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুংয়ের ছবি এঁকে রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া শেখ মুজিবের একটা বড় এবং মওলানা ভাসানী, মণি সিংহ ও মোজাফফর আহমদের অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল।

উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিব ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নুরুল ইসলাম 'ছাত্রলীগ ও সংগ্রামী ছাত্রসমাজে'র প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আসুন, আমরা একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ ও লড়াই করি। আমি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমার সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করতে রাজি

আছি। আসুন আমরা একটি দলে সমাজতন্ত্রের পক্ষে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে যাই।'[১১] নুরুল ইসলামের ঘোষণায় তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত ছিল। তিন বছর পর দুটি ছাত্রসংগঠন একীভূত হয়েছিল।

## ৪

শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খানকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের মধ্যে যে মেরুকরণ হচ্ছিল, তার প্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালের ৬ মে বটতলায় অনুষ্ঠিত আসন্ন ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত একটি সভায়। ওই নির্বাচনে ছাত্রলীগের বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ছাত্রলীগ দুটো আলাদা প্যানেল নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাদের মধ্যকার বিভক্তির সুযোগে ছাত্র ইউনিয়ন ডাকসু নির্বাচনে একটি ছাড়া সব কটি পদে জয় পায়। রোকেয়া হলের প্রতিনিধি হিসেবে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের একমাত্র মমতাজ বেগম ডাকসুর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ছাত্রলীগ যে ভাঙছে, এটা যে আর জোড়া লাগবে না, বাহাত্তরের মে মাসেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তখনই শুরু হয়েছিল দুই গ্রুপে বহিষ্কার আর পাল্টা বহিষ্কার। একাত্তরের ডিসেম্বর থেকেই ছাত্রলীগের তরুণেরা 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার স্লোগান দিয়ে আসছিল। সিরাজুল আলম খান এই স্লোগানের জন্মদাতা হলেও তাঁর অনুসারীরা পরে এটি বলা বন্ধ করে দেয় এবং সমালোচনা করে বলতে থাকে যে এ রকম একটি মতবাদ হতে পারে না।

বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এ বছর জুলাই মাসের ২১, ২২, ২৩ তারিখ কাউন্সিল অধিবেশন হবে। উভয় গ্রুপই তারিখ ঠিক রেখে সম্মেলনের আয়োজন করেছিল—একই দিন দুই জায়গায়। দুটো প্যান্ডেলই তৈরি করেছিল হাজি মো. চান মিয়া ডেকোরেটরস।

২১, ২২ ও ২৩ জুলাই পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সম্মেলনে সিরাজপন্থীরা সবাই জড়ো হন। দ্বিতীয় দিন শাজাহান সিরাজের নামে *সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী* শিরোনামে ৪০ পৃষ্ঠার একটি ছাপানো পুস্তিকা বিলি করা হয়। হুটহাট করে তো কিছু ছাপানো যায় না। অনেক দিন ধরেই এটির খসড়া তৈরি হচ্ছিল। এই পুস্তিকায় 'মুজিববাদ' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা ও মন্তব্য দেওয়া হয়, তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্য খুব স্বস্তিকর ছিল না। এটি লেখার সময় এই গ্রুপের প্রধান নেতা সিরাজুল আলম খান নিশ্চিত ছিলেন যে শেখ মুজিব

তাঁদের সম্মেলন উদ্বোধন করতে পল্টন ময়দানে আসবেন না, তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যদি 'নিরপেক্ষ' অবস্থানে থাকতেন এবং সবাই যদি তাঁর কাছ থেকে একটা মীমাংসা আশা করতেন, তাহলে শাজাহান সিরাজের রিপোর্টের ভাষা এত আক্রমণাত্মক হতো না। বঙ্গবন্ধুর এই অবস্থানের কথা কি তিনি আগে থেকেই জানতেন? সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণীর ভাষা এই ইঙ্গিত দেয় :

> জেলা শহরগুলো, এমনকি থানা ও গ্রামপর্যায়ে একদল রাজনৈতিক টাউট প্রকৃতির লোক রয়েছে, যারা আইয়ুব আমলে আইয়ুবভক্ত, ইয়াহিয়া আমলে ইয়াহিয়াভক্ত; বর্তমানে তারাই মুজিববাদের প্রধান প্রবক্তা। আরও দেখবেন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের যারা বর্তমানে লাইসেন্স, পারমিট শিকার, অসৎ ব্যবসা ও চোরাকারবারিতে লিপ্ত এবং লুটপাট ও বাড়ি-গাড়ি দখল করছে, তারাই মুজিববাদের ভক্ত। তা ছাড়া বর্তমান সমাজের বিত্তবান শ্রেণি, বড় বড় আমলারা মুজিববাদের সমর্থক সেজে নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত। অল্প দিন হলেও মাত্র দু-আড়াই মাসে বাংলাদেশে সকল শ্রেণির মানুষের মুখে একটি অতি সুন্দর কথা শোনা যায়, তা হলো 'রাতে লুটপাট, দিনে প্রতিবাদ, তারই নাম মুজিববাদ।'...
>
> ইতিহাসের পাতা ওলটালেই দেখা যায় যে এ পর্যন্ত যে কয়টি 'বাদের' সৃষ্টি হয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে ভিত্তি করে নয়, বরং কোনো একটি তত্ত্বকে কেন্দ্র করে 'বাদের' সৃষ্টি। যেকোনো 'বাদের' সৃষ্টির জন্য তত্ত্বের যে ভিত্তির প্রয়োজন, মুজিববাদে তা কোথায়? মুজিববাদীরা হয়তো বলবেন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাই হলো মুজিববাদের তত্ত্বগত ভিত্তি। আমাদের প্রশ্ন—গণতন্ত্র যেখানে ব্যক্তিসম্পদ মালিকানায় বিশ্বাসী, সেখানে সমাজতন্ত্রের স্থান কোথায়? আমাদের প্রশ্ন, জাতীয়তাবাদ বলতে যেখানে বাঙালির বাঙালিত্ব বোঝায়, সেখানে পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের জন্য কী ব্যবস্থা? আমাদের প্রশ্ন, সমাজতন্ত্রের বক্তব্য রয়েছে যেখানে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন আছে কি? আরও প্রশ্ন, যে ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়েছে, সে ভারতেও কংগ্রেস বহু পূর্ব থেকেই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার বক্তব্য রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে কার্যকরী করছে, সে চার নীতি 'নেহরুবাদ', 'ইন্দিরাবাদ' বা 'কংগ্রেসবাদ' না হয়ে 'মুজিববাদ' হয় কীভাবে? আমাদের প্রশ্ন, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নাম 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' না হয়ে 'মুজিববাদ' হয় কীভাবে। গণতন্ত্রের

মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ভারতে, চিলিতে, ইউরোপের বহু দেশে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে। আমাদের প্রশ্ন, সেসব দেশে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে যদি কোনো 'ব্যক্তিবাদ' নাম না দেওয়া হয়, তাহলে বাংলাদেশে কেন তা মুজিববাদ হবে?

এসব প্রশ্নের বিচারে আজ এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে মুজিববাদ পুঁজিবাদের নামান্তর মাত্র। মুজিববাদের মোড়কে পুঁজিবাদকে আমরা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে পারি না। কারণ, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বা কোনো ব্যক্তি বা দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য ৩০ লাখ লোক প্রাণ দেয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথা সার্বিক মুক্তি আনয়নের মধ্যেই ৩০ লাখ মানুষের রক্তদানের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।[১২]

এ তো গেল তত্ত্বের কথা। শেখ মুজিব তখন অবিসংবাদী নেতা, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু। দেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবের 'কাল্ট' প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার মূল হোতা ছিলেন সিরাজুল আলম খান। তিনি হঠাৎ করেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। শাজাহান সিরাজের পাঠ করা কার্যবিবরণীতে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ না করে তাঁকে ইঙ্গিত করেই বলা হলো :

এ দেশের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ দেশে কোনো দিনও কোনো রাজনৈতিক দল কোনো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়নি। বরং ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে ছাত্রসমাজ থেকে গড়ে ওঠা রাজনীতিবিদেরা এবং রাজনৈতিক দলগুলো শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। আজকে যে শিশু, ভবিষ্যতে তিনিই পিতা, এটাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও তা আবার প্রমাণিত হবে। আরও একটি কথা অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে হচ্ছে যে, এ দেশে কোনো রাজনৈতিক নেতা কোনো আন্দোলনের জন্ম বা নেতৃত্ব দেয়নি। বরং জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই 'নেতা' সৃষ্টি হয়েছে।[১৩]

সম্মেলন প্রস্তুতি পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন ছাত্রলীগের সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম (মার্শাল)। তিনি এটা নিশ্চিত করেছেন যে সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণীটি সিরাজুল আলম খানের লেখা। এই প্রতিবেদনে ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, ছাত্রলীগ লড়ছে 'শ্রেণিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে সামাজিক বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা' করতে।[১৪] সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্য

রাজনৈতিক দলগুলো থেকে যে তারা আলাদা, এর ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে এই প্রতিবেদনে :

> এবারে আসুন আমাদের দেশের 'মস্কোপন্থী' ও 'পিকিংপন্থী' দলগুলোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায় তা বিচার করি। এখানকার মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থীরাও বহুদিন ধরে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' কথা প্রচার করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের এই প্রচারের ফলেও তাদের বক্তব্য বা তাদের দল সাধারণ মানুষের মনে কোনো আঁচড় কাটতে পারেনি। তা থেকেই বোঝা যায় যে তাদের বক্তব্য বা দলীয় দুর্বলতা কোথাও না কোথাও রয়েছে। তাদের এ দুর্বলতাকে কয়েক অংশে ভাগ করা যায়।
>
> ১. বক্তব্য উত্থাপনে তাদের সময়জ্ঞানের অভাব মারাত্মকভাবে দেখা যায়। সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক সচেতন করে তোলার পূর্বেই তাদের অসময়োচিত বক্তব্য সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না।
>
> ২. রাজনীতিতে পর্যায়ক্রমিক রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে তারা বিশ্বাসী নয়। সে জন্যই তাদের কেউ মনেপ্রাণে এ দেশের ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শাসনতন্ত্র দাবির আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা তথা ১১ দফা তথা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে হয় বিরোধিতা করতে দেখা গেছে, নয় দেরিতে উপায়ান্তর না দেখে সমর্থন করতে হয়েছে।
>
> ৩. যেহেতু তাদের মূল উৎস রাশিয়া বা চীন, সেহেতু যে পর্যন্ত রাশিয়া বা চীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে না এসেছে, সে পর্যন্ত তারা আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করেনি।
>
> ৪. এ পর্যন্ত তারা কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেনি বা রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মস্কোপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্তে লেজুড় হিসেবে কাজ করছে এবং পিকিংপন্থী বিভিন্ন উপদল গণজাগরণ সৃষ্টি একেবারেই না করে গুপ্তহত্যা, রাজনৈতিক হত্যা ও অসংগঠিত বিক্ষিপ্তভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে।
>
> ৫. এরা জাতীয় রাজনীতিকে রাজনীতির মূল নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচনা না করে আন্তর্জাতিকতাবাদকে জাতীয় রাজনীতির মূল চাবিকাঠি মনে করে।[১৫]


www.amarboi.com
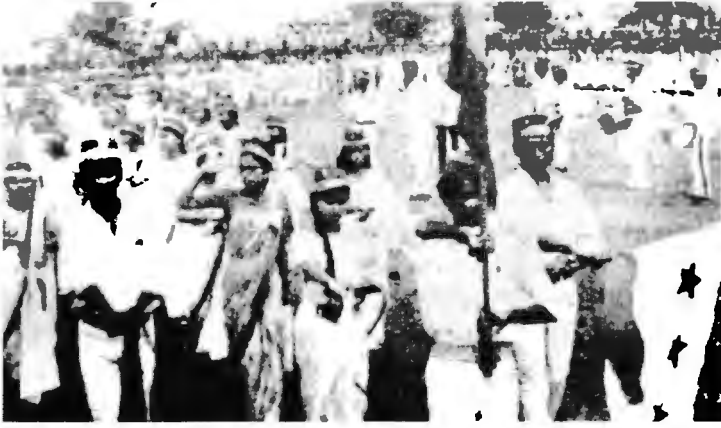
২১ জুলাই পল্টনে সম্মেলন শুরুর আগে ছাত্রলীগের র‍্যালি

ওপরের কথাগুলোতে অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দলের বিরুদ্ধে ঢালাও মন্তব্য ছিল। ফলে তারা শুধু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেই থেমে থাকেনি, অন্যান্য বাম দলের কঠোর সমালোচনা করে আরেকটি ফ্রন্ট খুলল।

পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সম্মেলন ছিল জমজমাট। কলকাতা থেকে কয়েকজন সংগীতশিল্পী নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁরা মাঝরাত পর্যন্ত গান শোনাতেন। দর্শক-শ্রোতার ভিড় উপচে পড়ত। একাধিকবার ছাত্রলীগের কাউন্সিল সভা আয়োজনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সিরাজুল আলম খান এবারের সম্মেলন অনুষ্ঠানে কোনো খুঁত রাখেননি। দ্বিতীয় দিন সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট আলোচনার পর বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাবেক নেতা এবং মুসলিম লীগের র‍্যাডিক্যাল ধারার প্রতিভূ আবুল হাশিম অতিথি আলোচক হিসেবে ভাষণ দেন। এরপর স্থানীয় শিল্পীরা গান শোনান। তরুণ গণসংগীতশিল্পী ফকির আলমগীর ঘণ্টাখানেক ধরে সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তাঁর একটি দীর্ঘ গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।[১৬]

সম্মেলনের সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ গ্রুপের একটি মিছিল এ সময় পল্টনের পথ দিয়ে গুলিস্তানের দিকে যাচ্ছিল। একেবারে ঘরের কাছ দিয়ে 'শত্রুপক্ষের' লোকেরা বীরদর্পে হেঁটে যাবে, এটি পল্টনে সমবেত ছাত্রলীগ কর্মীদের কাছে উসকানিমূলক মনে হলো। তাঁরা বেরিয়ে এলেন। প্রথমে একটু চেঁচামেচি, স্লোগান-পাল্টা স্লোগান, তারপর

ধাক্কাধাক্কি। মিছিলের সামনে ছিলেন সিরাজুল আলম খানের 'নিউক্লিয়াসের' একদা সদস্য আবদুর রাজ্জাক। তিনি কিছু কিলঘুষি হজম করলেন। পরে ওই মিছিলটি দ্রুত সরে পড়ে।

সৈয়দ রেজাউর রহমান ছিলেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি। ছাত্রলীগের মধ্যে এই 'বিদ্রোহ' তাঁর ভালো লাগেনি। আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন :

> ৩২ নম্বর এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটা ব্রিফিং ছিল। ওখান থেকে ডিকটেশন এলে ছাত্রলীগ পরিচালিত হবে কি না? তবে এটা ঠিক, সিরাজ ভাই কিন্তু ছাত্রলীগের একটা ভালো অংশকে নিতে পেরেছিল। কর্মী হিসেবে এরা কর্মঠ ছিল, অগ্রণী ছিল। এদের সিরাজ ভাই যেভাবেই হোক প্রভাবিত করতে সক্ষম হইছে।[১৭]

ছাত্রলীগের ঘর যখন ভাঙছে, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোন দিকে যাবেন, এ নিয়ে কিছুদিন আগে থেকেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের সদস্যরা কল্পনাও করতে পারেননি যে তিনি ইতিমধ্যে তাঁদের ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিষয়টি এই গ্রুপের শীর্ষ নেতা সিরাজুল আলম খানেরও কি অজানা ছিল? আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিরাজুল আলম খান বলেছেন :

> আগের রাতে একটা-দেড়টা পর্যন্ত আমি মুজিব ভাইয়ের বাসায় ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তিনি কোথাও যাবেন না। একপর্যায়ে বললেন, 'সিরাজ, আমি তো কমিউনিস্ট হতে পারব না?' তারপর আমি চলে আসি। শুনেছিলাম, মনি এসেছিল রাত দুইটার দিকে। সে মুজিব ভাইকে সরাসরি বলেছিল, 'আপনি যদি সিরাজের সঙ্গে যান, রাজনীতির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তা ঠিক আছে। যদি আমাকে সমর্থন দেন, তাহলে রাজনীতির উত্তরাধিকার তো আছেই, রক্তের উত্তরাধিকারও থাকছে। এখন আপনি ঠিক করেন, আপনি কোন দিকে যাবেন।'[১৮]

আমি সিরাজুল আলম খানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শেখ মুজিবকে শেখ মনি কী বলেছেন, এটা আপনি জানলেন কীভাবে? তিনি এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, 'ফ্রম হর্সেস মাউথ।'[১৯]

২১ জুলাই সকালে পল্টনের প্যান্ডেলে ছাত্রলীগ কর্মীদের ভিড় ছিল দেখার মতো। সাধারণ কর্মীরা অনেকেই আশা করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। অথচ শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে যোগ দিয়ে তাঁর অবস্থানটি স্পষ্ট করবেন। এ সম্পর্কে ছাত্রলীগ নেতা শেখ শহীদুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। এখানে

আমাদের মধ্যকার কথোপকথন তুলে ধরা হলো, যার মাধ্যমে বাহাত্তরের রাজনৈতিক বিভক্তির একটা ছবি পাওয়া যায় :

শেখ শহীদুল ইসলাম : মূল গোলমালটা তো বাধালেন মনি ভাই। মনি ভাই ছিলেন হাইলি অ্যাসপারেন্ট। উনি চাচ্ছিলেন, আফটার বঙ্গবন্ধু, উনি সাকসিড করবেন। উনি এ জন্য তাজউদ্দীনকেও টলারেট করতেন না। আলোচনার সময় সিরাজ ভাই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, 'রেভল্যুশন হলে পুরোনো কিছু রাখা হয় না। আপনি এই আইনকানুনের মধ্যে যাইয়েন না। আপনি দেশের নাম বদলায়া ফেলেন। এটাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ না বলে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অব বাংলাদেশ— সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলেন এবং ওয়ান পার্টি সিস্টেমে চইলা যান।'

মনি ভাই এইটা ডিজঅ্যাগ্রি করলেন। মনি ভাই বললেন, 'এই মুহূর্তে করা যাবে না। এটা করার দরকারও নাই। আমরা কমিটেড টু পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আপাতত চলুক।'

মনি ভাইয়ের কথা পার্শিয়ালি ট্রু। আমাদের ক্যাডার তো সমাজতান্ত্রিক না। এরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসেছে। এরা প্রিপেয়ার্ডও না। সিরাজ ভাইকে এই কথাটাই বললেন মনি ভাই। 'সিরাজ, তোমার ওই কয়েকজন লোক নিয়া তো সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে না। তোমার সেই প্রিপারেশন কই?' সিরাজ ভাই বললেন, 'কর্মক্ষেত্রে গেলে প্রস্তুতি হয়ে যাবে তাদের।'

মহিউদ্দিন আহমদ : এই যে দুই জায়গায় দুইটা সম্মেলন হলো, বঙ্গবন্ধু কি আপসেট হন নাই একটুও?

শহীদ : সত্যি কথা বলতে কি, আমি কোনো আপসেট দেখি নাই ওনাকে। ওনার একটা ধারণা ছিল যে উনি যেখানে থাকবেন, সেটাই মূল ছাত্রলীগ।

মহি : এই ডিসিশনটা উনি কত দিন আগে নিয়েছেন?

শহীদ : কনফারেন্সের ডেট হওয়ার পরপরই।

মহি : তাহলে এই কথা হয়েছে অ্যাট লিস্ট দুই-তিন সপ্তাহ আগে?

শহীদ : না না, তারও আগে।

মহি : বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করলে একটা প্যাচআপ করতে পারতেন না?

শহীদ : উনি চেষ্টা করছেন। মনি ভাই অ্যারোগেন্ট টাইপের লোক ছিলেন। সিরাজ ভাই ছিলেন, অ্যারোগেন্ট বলব না, হার্ডলাইনার। তার মূল পয়েন্ট থেকে কখনো সরতে চায় না।[২০]

ছাত্রলীগের ভাঙন নিয়ে নানা রকম ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। বেশির ভাগ নেতা-কর্মী ছিলেন অন্ধকারে। সিরাজুল আলম খানের প্রতি তাঁর অনুসারীদের ছিল অন্ধ ভক্তি, প্রশ্নাতীত আনুগত্য। তিনি যেভাবে বুঝিয়েছেন, অনুসারীরা সেভাবেই বুঝেছেন। এমনকি প্রতিপক্ষ গ্রুপে, অর্থাৎ সরকারি ছাত্রলীগে থেকে যাওয়া কয়েকজন নেতাও সিরাজুল আলম খানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই বিভক্তি এমনভাবে আসবে, এটি তাঁরা ভাবেননি। তাঁরা সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনুসারী। এখানে রাজনীতির চেয়ে নেতার নির্দেশ ছিল বেশি কার্যকর। তাঁরা কখনোই শেখ মুজিবকে ছেড়ে আসতে চাননি। এঁদের একজন ছিলেন কুমিল্লার মনিরুল হক চৌধুরী। তিনি অবিভক্ত ছাত্রলীগের (১৯৭০-৭২) সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ১৯৭৩ সালে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়। এখানে তা তুলে ধরা হলো :

মনিরুল হক চৌধুরী : মুক্তিযুদ্ধের যে জেনারেশনটা, তার শতকরা ৮০ ভাগ আপনারা নিয়া গেছেন। আমরা অবশিষ্ট কিছু পাইছি, ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট। এই টোয়েন্টি পার্সেন্টের অনেকেই লুণ্ঠনকারী হইল। চ্যালেঞ্জিং কিছু না থাকলে যা হয়। আপনারা যে ৮০ পার্সেন্ট, জীবন-যৌবন দিয়া শেষ হইছেন। আপনারা যদি সেদিন অ্যামবিশাস না হইতেন, 'দেশ ৯ মাসে স্বাধীন হইছে, আমরা ৯ মাসেই সমাজতন্ত্র কইরা ফেলব'—এমন একটা ভাব!

মহিউদ্দিন আহমদ : আমাদের কীই-বা করার ছিল। আমরা কীই-বা বুঝি। বঙ্গবন্ধু তখন একটা ইনিশিয়েটিভ নিলেই হতো।

মনিরুল : এইটা বইলেন না। এইটা বললে অন্যায় হবে। বিভিন্ন সভায় নেতাদের বক্তৃতা, বিশেষ কইরা রব ভাইয়ের। ছোট ছোট কর্মীদের কথা বাদ দেন, তাদের বাজে বাজে বক্তৃতা...। বঙ্গবন্ধু একদিন দুঃখ কইরা বলতেছিল, 'দেখো, এরা যদি আওয়ামী লীগের বিকল্প হইতে পারে, এর চেয়ে মঙ্গলজনক কিছু হবে না। না হইলে আমাকে স্বাধীনতাবিরোধীদের কাছে ক্ষমতা ছাড়তে হবে।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় তো আমাদের মধ্যে পার্থক্য হয় নাই। হ্যাঁ, আগে একটু পার্থক্য ছিল। তারা একটু এক্সট্রিম ছিল। আমি মনে করি, স্বাধীনতার প্রশ্নে তাদের বক্তব্য এক্সট্রিম ছিল। এইটা হইছে বইলাই তো হইছে। আবার এখনই করা যাবে না, এইটা বলছে বইলাই তো ব্যালেন্স হইছে।

মহি : যে বিভক্তিটা হলো, তার ইমিডিয়েট কারণ কী ছিল? প্রধান কারণ?

মনিরুল : ইন্ডিয়া। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটা ফোর্স বানাইতে চাইছিল। কারণ, বঙ্গবন্ধুকে হজম করতে পারতেছিল না। বঙ্গবন্ধু তখন বিশ্বব্যাপী একটা হটকেক।

মহি : আমার প্রশ্ন হলো, বাহাত্তর সালে যে গোলমালটা হলো, ডাকসু ইলেকশন, তারপর আলাদা সম্মেলন, এটা কি কোনোভাবে এড়ানো যেত না?

মনিরুল : বঙ্গবন্ধু শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। আমাদের কর্মীরা, র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল, যেভাবে তাদের পক্ষে ঝুইলা পড়ছে, তারা মনে করছে সবটা লইয়া তারা চইলা যাবে। আমরা তো টের পাইছি। আমরা তো মাঠেই মোকাবিলা করছি। বঙ্গবন্ধু সেই দিন স্ট্যান্ড না নিলে আমরা কিছুই পাইতাম না। এই যে এইটি পার্সেন্ট শক্তি অপচয় হইছে, এইটা হানড্রেড পার্সেন্ট হইত। সমঝোতার জন্য সিরাজ ভাই রাজি ছিল।

মহি : রাজি ছিল?

মনিরুল : হ্যাঁ, আমি সিরাজ ভাইকে ব্লেম করব না। বঙ্গবন্ধু সিরাজ ভাইকে ব্লেম করে নাই।[২১]

ছাত্রলীগের বিভক্তি এবং নেপথ্যের অনেক কিছু দেখেছেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আমির হোসেন আমু। তিনি শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খানের বন্ধু। ছাত্রলীগের বিভক্তি প্রসঙ্গে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন, তা এ রকম :

মহি : বাহাত্তর সালে ছাত্রলীগের ভাঙন কি এড়ানো যেত না?

আমু : না। তার কারণ, ইন্টারনালি তখন তো লিডারশিপ ক্ল্যাশ আইসা গেছে। ওইটা ভাগ না হইলে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্ব তো আরও বেশি শক্তিশালী হয় না।

মহি : বঙ্গবন্ধু যদি একটা ইনিশিয়েটিভ নিতেন?

আমু : নিতে দেয় নাই তো। এই ব্যাপারে তখন রাজ্জাক-মনি-তোফায়েল সব এক। আমারে কোট করিয়া কিন্তু সব কথা লেহা যাবে না।

মহি : শোনেন, ইতিহাস এ জন্যই বিকৃত হয়। আপনারা কেউ কিছু বলে যান না। সবাই তো মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখে। আমার ধারণা, বঙ্গবন্ধুর যে ব্যক্তিত্ব, উনি ডাইকা দুই-তিনটা ধমক দিয়া—ঠিক আছে, আমি প্যানেল বানায়া দেব, দুই গ্রুপ থেকে। একটা প্যাচআপ কি করা যেত না?

আমু : যাইত। ঠিকভাবে বললে বঙ্গবন্ধু শোনত। কিন্তু যারা বলবে, তারাই তো তারে উল্টা বুঝাইছে।

মহি : আমি যেটা রব ভাইয়ের কাছে শুনেছি, সিরাজ ভাইয়ের কাছে শুনেছি, মনি ভাই তো জীবিত নাই, রাজ্জাক ভাইও নাই।

আমু : তারা কী বলছে?

মহি : তারা যেটা বলছে, আগের দিন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ছিল, বঙ্গবন্ধু কোথাও যাবেন না।

আমু : এটা ঠিক।

মহি : কিন্তু রাতে এটা ঘুরে গেছে।

আমু : এইটা যে সিদ্ধান্ত ছিল, এইটা ঠিক। সিরাজুল আলম খান তো কিছুটা ডিটাচড। যাদের হাতে বঙ্গবন্ধু, এরা তো তখন সার্বক্ষণিক তার সঙ্গে। এরা বুঝাইছে, 'আপনি একটা জায়গায় গেলে বাধ্য হইয়া ওরা আসবে। আপনে কোনো জায়গায় যাবেন না, এইটা তো হয় না। আপনার লিডারশিপ তো থাকে না। আপনি যাবেন। আলটিমেটলি তারা আসবে। তারা আসতে বাধ্য। আপনার লোক হইলে তারা আসবে।' এইটা বুঝাইছে।

মহি : আমার মনে হয়, এটা একটা ডিজাস্টার হইছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এইটাই সবচেয়ে বড় ডিজাস্টার।

আমু : আমার বক্তব্য তো এইটা। আফটার লিবারেশন এইটা হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হইছে আওয়ামী লীগের।[২২]

একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যদি মনি গ্রুপকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন, তাহলে সেটা সাধারণ ছাত্রলীগ কর্মীদের কাছে গোপন করা হয়েছিল কেন? তিনি যদি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাবেন, এটা সাধারণ কর্মীদের কাছে কি ইচ্ছাকৃতভাবেই গোপন রাখা হয়েছিল?

আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে একাত্তরের শহীদ সাবেক ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরীর বাবাকে দিয়ে পল্টনের সম্মেলন উদ্বোধন করা হবে। বঙ্গবন্ধু পল্টনে আসবেন না, এই তথ্য গোপন করার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে কর্মীরা এটা জানলে হতাশায় ভেঙে পড়বে এবং এদের অনেকেই হয়তো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে যোগ দিতে চলে যাবে। এটা হলে তো শেখ মুজিবের লাভ ছাড়া ক্ষতি হতো না। তিনি নিজে কেন তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে আগেই জানান দিলেন না? তিনি কি ভিন্নমতাবলম্বীদের দল থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন? তিনি কি ভেবেছিলেন, এতে করে তাঁর নিজস্ব বলয় আরও সংহত হবে? অথবা তিনি কি চেয়েছিলেন যে তাঁর অনুগত মুক্তিযোদ্ধারা নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলুক, যাতে করে চরম ডানপন্থী ইসলামি দলগুলা বা উগ্র বাম দলগুলো প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠতে না

পারে? এটা কি একটা পাতানো খেলা ছিল? বাহাত্তরের বিভাজনের কারণে রাজনীতিতে পরে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার একটি বিশ্লেষণের জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া দরকার।

ছাত্রলীগের আনুষ্ঠানিক বিভক্তির পর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রপন্থী গ্রুপটি সব বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির পিতা' বলা বন্ধ করে দেয়।

## ৪

এটা বোঝা যাচ্ছিল যে ছাত্রলীগের 'বিদ্রোহীরা' সংগঠিত হয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেবে। প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ নিয়ে কৌতূহল যেমন ছিল, সন্দেহও ছিল। কেউ কেউ এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধও পেয়েছেন। রাজনীতিবিদ ও গবেষক বদরুদ্দীন উমর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব হতে যাচ্ছে। ১ অক্টোবর ১৯৭২ সাপ্তাহিক *স্বাধিকার*-এ তিনি লেখেন :

> আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসা অংশটি হয়তো ইতিমধ্যেই নিজেদের অপ্রকাশ্যে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগঠিত করেছে। তা না করে থাকলেও ভবিষ্যতে তাদেরকে সেটা করতেই হবে। ছাত্রলীগের রব-সিরাজ গ্রুপের ভাঙন পরিণতিতে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের জন্ম দান করতে বাধ্য এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পরিচালিত ন্যাপ নয়, এই নতুন পার্টিই বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক সংগঠন।[২৩]

সিরাজুল আলম খান একটি নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির চেষ্টা চালাতে থাকেন। ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব নতুন দলের সাধারণ সম্পাদক হবেন, এটা মোটামুটি স্থির করাই ছিল। সিরাজুল আলম খান একজনকে খুঁজছিলেন, যিনি এই দলের সভাপতি হবেন। তিনি তাঁর একসময়ের রাজনৈতিক গুরু শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। শাহ মোয়াজ্জেম ওই প্রস্তাব সম্পর্কে আমাকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> একদিন সিরাজ হঠাৎ এসে হাজির আমার বাসায়। সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীকে বলল, 'ভাবি, এক সের চালের ভাত রান্ধেন।' সে গোসল-টোসল সেরে খেতে বসল। গরুর মাংস দিয়ে এক সের

> চালের ভাত, সবটা খেল। তারপর ঘুম, একটানা তিন দিন। চতুর্থ দিন আমাকে বলল, 'নতুন দল বানাচ্ছি, আপনি প্রেসিডেন্ট।' বললাম, 'তোমরা তো মার্ক্সবাদী। আমি একজন ডেমোক্র্যাট। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।'[২৪]

নতুন দল তৈরির ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছিল।[২৫]

ছাত্রলীগের বিভক্তি সত্ত্বেও সিরাজুল আলম খান গণভবনে যাওয়া-আসা বন্ধ করেননি। ওই সময়ের একটি বিবরণ দিলেন তিনি :

> হঠাৎ একদিন শুনি, মনির শ্বশুর, সে হলো কৃষক লীগের প্রেসিডেন্ট। আর কাকে যেন সেক্রেটারি করেছে। এটা সম্ভবত বাহাত্তরের এপ্রিলে। মুজিব ভাই বললেন :
>
> সবই তো তুই করেছিস। সবাই বলল ভালো ভালো লোক আছে। ওপরের দিকেও একটা ভালো কমিটি করা দরকার। মনি তো সেভাবেই বলল।
>
> আমার অবস্থা তখন—না পারি নিজের কামড় খেতে, না পারি অন্যকে আক্রমণ করতে, শরীরের এমন অবস্থা হয় না? বললাম :
>
> আমি কিন্তু এটা অ্যাগ্রি করছি না।
>
> যা হবার হয়ে গেছে রে। কাজ কর।
>
> আমি বেরিয়ে আসলাম। আবদুল মালেক শহীদুল্লাহকে প্রেসিডেন্ট করে, ইনুকে সেক্রেটারি করে জাতীয় কৃষক লীগ নাম দিয়ে আরেকটা কমিটি করলাম।
>
> উনি বললেন, সংগঠন তো দুই ভাগ হয়ে গেল। বললাম :
>
> এটা তো আমি করিনি।
>
> এটা কে করেছে?
>
> মনি করেছে।
>
> মনি কী করে, না করে, সেটাও তো বুঝি না।
>
> আরেকটা ভালো কাজ উনি করেছেন। ক্যাবিনেট মিটিং হবে। বললেন, চারটা-সাড়ে চারটার দিকে আসিস তো?
>
> ক্যাবিনেট মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডা দেখালেন আমাকে। এ রকম তিন-চারবার উনি আমাকে ডেকেছেন।
>
> একবার ক্যাবিনেট মিটিং চলতেছে। হঠাৎ একজন বললেন, আচ্ছা, সিরাজের সঙ্গে আপনার এত খাতির কেন?
>
> ক্যাবিনেট মিটিংয়ের বিষয় নিয়ে তাঁর সামনে...। উনি তো আবার এসব জায়গায় দুই পক্ষের কথা শুনতেন। হি ওয়াজ গুড

আপ টু দ্যাট পয়েন্ট।

তাঁর গলব্লাডার অপারেশন হবে। উনি প্রতিদিন একটা প্রেসনোট দিতে বলতেন। মিনিস্টার, পার্টির লোক অ্যান্ড সিরাজুল আলম খান। এখানে আওয়ামী লীগের সবাই বলত—কেন তার কাছে এটা পাঠাও?

এর মধ্যে জাসদ হবে হবে। আমি বললাম, আমি একটা পার্টি ফরমেশন দেব।

হ্যাঁ, বাইরে কথা হচ্ছে, তুই কর্নেল ওসমানীর কাছে গেছিলি। আরও কোথায় কোথায় কথা বলছিলি। এগুলো করলে ইউনিটি থাকে কী করে?

তাজউদ্দীন ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, এটা আর উনি বলেন না।[২৬]

পরে সেনাবাহিনী থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল ও আ স ম আবদুর রবকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে দল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ৩১ অক্টোবর ১৯৭২ এই প্রক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামের নতুন একটি রাজনৈতিক দল। জন্মলগ্নেই জাসদ সরকার উৎখাতের ঘোষণা দেয়।[২৭]

ছাত্রলীগের যে অংশটি পরবর্তী সময়ে জাসদ প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে, একসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি তাদের অতিভক্তি ছিল লক্ষণীয়। বাহাত্তরের ২৫ মে এক বিবৃতিতে এই অংশটি শেখ মুজিবকে একচ্ছত্র নেতা ঘোষণা করে দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে প্রশাসন চালানোর আহ্বান জানিয়েছিল। তাদের এই অবস্থান ২০ জুলাই পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। এক রাতের মধ্যে তাদের অবস্থা একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে যায়।

ছাত্রলীগের কর্মী মহলে এবং জন-আলোচনায় মেজর জলিল ভালোভাবেই ছিলেন। ড. আলীম-আল রাজী সম্পর্কেও কানাঘুষা ছিল। অনেকের ধারণা ছিল, ড. রাজী জাসদে যোগ দেবেন, প্রেসিডেন্ট হবেন এবং জলিল যোগ দেবেন ভাসানীপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ)। পরে দেখা গেল, ড. রাজী ন্যাপকে (ভাসানী) এবং জলিল জাসদকে বেছে নিয়েছেন।

জলিলের জাসদে যোগদানের ব্যাপারটায় নাটকীয়তা ছিল। আগের দিন পর্যন্ত ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই জানতেন না যে তিনি জাসদে যুক্ত হবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে বেশ কয়েক মাস ধরেই দেখা করছিলেন এবং কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের একটি বয়ান পাওয়া গেল আওয়ামী লীগের সে সময়ের তরুণ

গণকণ্ঠ

শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াইয়ের শপথে উদ্দীপ্ত নতুন রাজনৈতিক সংগঠন

# জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

দেশব্যাপী সাড়া

বাহাত্তরের ৩১ অক্টোবর জন্ম নিল জাসদ

নেতা ও গণপরিষদ সদস্য আমির হোসেন আমুর কাছ থেকে। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

আমির হোসেন আমু : আমারে কিন্তু সিরাজুল আলম খান সব সময় বিশ্বাস করত। ইউ আস্ক হিম। আমারে সে পরিষ্কার বলছে, আপনার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমি জানি, একটা জায়গায় গিয়া আপনি ঠেইকা যান। আত্মীয়তার কারণে আসতে পারেন না। অনেক কথা বলতে পারেন না, বলবেন না।

মহিউদ্দিন আহমদ : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার রিলেশনশিপটা কী?

আমু : বঙ্গবন্ধুর মা আমার নানির ফার্স্ট কাজিন। আমার মা আর বঙ্গবন্ধু হইল একই স্টেপের ব্রাদার-সিস্টার।

মহি : তাহলে সম্পর্কে আপনার মামা।

আমু : আগে মামা। এরপরে ভায়রা। বঙ্গবন্ধুর ওয়াইফ আর আমার ওয়াইফ আপন মামাতো-ফুফাতো বোন। আমার শ্বশুর হইল বেগম মুজিবের আপন নানা। বঙ্গবন্ধু আমার তিন-চাইর রকমের আত্মীয়।

মহি : আচ্ছা, মেজর জলিল জাসদে গেল কেন? আপনার কী ধারণা?

মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল

আমু : এইটা একটা অবাক ব্যাপার। মেজর জলিল যেদিন জাসদে যাবে, তার আগের দিন বঙ্গবন্ধু তারে ১৫ হাজার টাকা দিছে, সে বিডিআরের প্রধান হবে। তারে ডিজি-বিডিআর করার কথা।

মহি : ১৫ হাজার টাকা আনছে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে?

আমু : হ্যাঁ, সন্ধ্যার সময়। পরের দিন তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে বিডিআরে। সকালবেলা দেহি তার নাম জাসদে। জাসদে যাওয়ার কথা তো রাজ্জাকের। রাজ্জাক যায় নাই।

মহি : কর্নেল সি আর দত্তকে বিডিআরের চিফ করা হয়েছিল।

আমু : জলিলরে বুঝাইছে। ও অ্যারেস্ট হইছে তো একবার? ওরে বুঝাইছে, তোমারে বিডিআরে ঢুকাইতেছে। পরে চিফ করবে না। যেহেতু তুমি অ্যারেস্ট হইছ। তোমারে বিশ্বাস করবে না। থাইক্যা লাভ নাই। এই দিকে আসো। আমার মনে হয়, এইভাবে বুঝায়া-টুঝায়া নিছে।

মহি : জাসদের ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়? এটা কি ইন্ডিয়ার কনসেন্ট ছাড়া হয়েছে?

আমু : ইন্ডিয়ার কনসেন্ট ফুল না। একটা সেকশনের।

মহি : আপনার কাছে কি কোনো এভিডেন্স আছে? নাকি অনুমান থেকে বলতেছেন?

আমু : আছে।

মহি : শোনেন, ইতিহাস হারায়া যাবে, যদি আপনারা না বলেন।

আমু : আমার ধারণাটা হইল, বঙ্গবন্ধু যখন ফেরে ১৯৭২ সালে, তখন তিনি ইন্দিরা গান্ধীরে বলছে, তোমার সৈন্য কখন ফেরত নেবা। অন দ্যাট ভেরি মোমেন্ট, দে আন্ডারস্টুড যে বঙ্গবন্ধু তাদের কন্ট্রোলের লোক না। বঙ্গবন্ধু তাদের রাইভাল হবে। তাদের পোষা লোক হবে না। সুতরাং তাঁকে সাইজে রাখতে হইলে, তাঁকে ঠিক রাখতে হইলে তাঁর ওপর প্রেশার রাখতে হবে। এই প্রেশার রাখার প্রশ্নে একটা গ্রুপ তখন ঠিক করছে—জাসদ। কিন্তু এর বাইরে

সিরাজুল আলম খানের লাইন ছিল। ইন্ডিয়ার লাইনের ওপর ভরসা কইরা সে আগায় নাই। অত সাহস সে পাইত না। কারণ, বঙ্গবন্ধুরে সে চেনে। ইচ্ছা করলে তখন তারে ফাঁসিও দিয়া দিতে পারত। পারত না? গুলি কইরা মাইরা ফালাইতে পারত। পারত না? বঙ্গবন্ধু যে তখন কোনো অ্যাকশনে যায় নাই, নিশ্চয়ই কোনো ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপার ছিল? বঙ্গবন্ধুরে যে ফাঁসি দিতে পারে নাই, সেটাও তো ইন্টারন্যাশনাল কারণে। নাকি?

মহি : কাজী আরেফ আহমদ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

আমু : কাজী আরেফ, এ তো বোগাস। বেশি কথা কয়। পরে তাত্ত্বিক টাইপ হইছিল। সিরাজুল আলম খানের খাস ট্যান্ডল ছিল।

মহি : বিএলএফের সঙ্গে তাঁর কি কোনো অফিশিয়াল সম্পর্ক ছিল?

আমু : না। ওই পারে যাওয়ার পর দেখতাম খুটমুট খুটমুট করে।[২৮]

জাসদের সাত সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হলো ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর। মেজর জলিল আর আ স ম আবদুর রব হলেন যুগ্ম আহ্বায়ক। আহ্বায়ক কমিটির অন্য পাঁচজন সদস্য হলেন শাজাহান সিরাজ, বিধান কৃষ্ণ সেন, সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নূর আলম জিকু ও রহমত আলী। এঁদের মধ্যে নূর আলম জিকু ও শাজাহান সিরাজ ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা। সুলতান উদ্দিন ও বিধান সেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। রহমত আলী আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা। তিনি ছিলেন জাসদে তাজউদ্দীন আহমদের 'নমিনি'। রহমত আলী অবশ্য এক দিনও জাসদে থাকতে পারেননি। শেখ ফজলুল হক মনির লোকেরা তাঁকে অপহরণ করে তাঁর কাছ থেকে একটি বিবৃতি আদায় করে নেয়। বিবৃতিতে তিনি বলেন, জাসদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।[২৯]

ছাত্রলীগে সিরাজুল আলম খানের অনুসারীরা জাসদে দলে দলে যোগ দিলেন। ছাত্রলীগের এই অংশটি হলো জাসদের মূল শক্তি। দলটি আওয়ামী লীগে ভাঙন ধরাতে পারেনি। গণপরিষদের মাত্র দুজন সদস্য জাসদে যোগ দেন। তাঁরা হলেন ময়মনসিংহের আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ এবং সাতক্ষীরার স ম আলাউদ্দিন। তাঁদের আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৭২ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ ফজলুল হক মনিকে দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য বানানো হয়েছিল। কিন্তু নিজের শক্ত ভিত তৈরির জন্য তাঁর দরকার হলো আলাদা

শাজাহান সিরাজ এবং আ স ম আবদুর রব

একটা প্ল্যাটফর্ম। জাসদ তৈরি হওয়ার পর এর যৌক্তিকতা আরও বেড়ে যায়। আওয়ামী লীগে নিজের প্রভাববলয় তৈরি করা এবং জাসদের অগ্রযাত্রা ঠেকানোর জন্য তিনি তৈরি করলেন আওয়ামী যুবলীগ। যুবলীগ তৈরি হলো ভারতের যুব কংগ্রেসের আদলে। এর আগে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে যুব সংগঠন ছিল না।

১৯৭২ সালের ১১ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে যুবলীগ গঠনের ঘোষণা দেন শেখ ফজলুল হক মনি। সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আবদুল কাদের সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন ও রাজিউদ্দীন। শেখ মনি একটি আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটির সদস্যরা হলেন আহ্বায়ক : শেখ ফজলুল হক মনি; সম্পাদকমণ্ডলী : নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আবদুল কাদের সিদ্দিকী, ইব্রাহিম, খন্দকার আবদুল হান্নান, ডা. আলী হাফিজ (সেলিম), সৈয়দ রেজাউর রহমান, সুলতান শরীফ, আকবর আলী ও মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া)।[৩০]

শেখ মনি আগে থেকেই সিরাজপন্থীদের বিরুদ্ধে হার্ডলাইনে ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোনো লুকোছাপা ছিল না। একদিন *দৈনিক বাংলায়* ফোন করে বললেন, রব ও শাজাহান সিরাজের কোনো সংবাদ যেন না ছাপানো হয়।[৩১]

১৯৭৩ সালের মে মাসে যুবলীগের সম্মেলন হলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

রোববারের বাংলার বাণী

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ গঠিত

দশ বছরের পুরানো আমলাদের অপসারণ করতে হবে

'৭২-এর ১১ নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ তৈরির ঘোষণা দেন শেখ ফজলুল হক মনি

সম্মেলনে যুবলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হলো। চেয়ারম্যান হলেন শেখ ফজলুল হক মনি, সাধারণ সম্পাদক হলেন নূরে আলম সিদ্দিকী। প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য হন গণপরিষদ সদস্য আমির হোসেন আমু। যুবলীগ তৈরির পটভূমি সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন আমির হোসেন আমু :

> আমি জানতাম, আবদুর রাজ্জাক অনেক দিন থিকা সিরাজুল আলম খানের লোক। আমি তারে কইলাম, তুমি কি বঙ্গবন্ধুর বাইরে রাজনীতি করতে পারবা?
>
> না।
>
> তুমি কি মনে করো সিরাজুল আলম খান শেখ মনির চেয়ে বঙ্গবন্ধুর বেশি আপন?
>
> না।
>
> তাহলে? সব যখন এক জায়গায় যাইয়া মেলবা, তহন তো এক হইতে হইবে। আগে থাকতে গ্রুপিং না কইরা তুমি তাদের মিলায়া দাও, নইলে মনির লগে থাকো। তুমি যখন সিরাজুল আলম খানের কাছ থিকা ছুইটা আইবা, তখন সে মনে করবে একলা। তখন সে মিলতে রাজি হইতে পারে।
>
> অনেক কওয়া-টওয়ার পর সে নিউট্রাল হইল। বাট পুরা আসল না। মোটামুটি নিউট্রাল করছি।

আমি যেটা মোটামুটি বুঝছিলাম, সিরাজুল আলম খান রাজ্জাকরে বুঝাইছে, তুই হইলি সংগঠনের লোক। মনি তো সংগঠন ছাইড়া দিছে। মনিরে নেতা বানায়া লাভ কী। নেতা তুই হবি। মনি পেপার নিয়া থাকবে। বঙ্গবন্ধু তারে মানিক মিয়া বানাবে। একটা ভাবসাব নিয়া থাকবে। যেইটা লিবারেশনের পরপর রাজ্জাক-তোফায়েল একসঙ্গে করছিল। সিরাজুল আলম খান চইলা যাওয়ার পর বুঝাইয়া মনিরে নির্বাসনে পাঠায়া মানিক মিয়া বানায়া দিছিল।

বঙ্গবন্ধু তো পয়লা যুবলীগ করতে রাজি হয় নাই। যুবলীগ তো করাইছি আমি। মনি তো ফেল করছিল। মনি যখন প্রস্তাব দিছিল, বঙ্গবন্ধু তো রাজি হয় নাই। মনি যে প্রস্তাব দিছে আর বঙ্গবন্ধু যে রাজি হয় নাই, এইটা আমি জানতাম না। আমি তো পার্লামেন্ট সেশন ছাড়া ঢাকায় আসতাম না। বরিশালে থাকতাম।

আসলাম। মনিরে কইলাম, যুবলীগ ঠিক করতে হবে। ওইখানে (কলকাতায়) বইসা ঠিক করছিলাম, যুবলীগ করতে হবে, করবা না?

মামা রাজি হয় না।

মামারে রাজি করাইতে হবে।

সে তহন কয় নাই যে পারে নাই। কয়, পারলে তুমি করো।

আমি দেখলাম, বাসায় বইয়া আলাপ করলে হবে না। গণভবনে গেলাম। সন্ধ্যার সময়। বঙ্গবন্ধু কাজটাজ সাইরা বলে, কী?

কথা আছে। আগে ছিল হকিস্টিক। বড়জোর চেইন। হেইয়া ব্যবহার হইত মাইরপিটে। এহন কিন্তু কথায় কথায় ইয়া...এর বায়রা কিচ্ছু নাই। ঘুষি-মুষি কিচ্ছু নাই। এদের সবাইরে তো আপনি চাকরি দিতে পারবেন না। এরা তো বিরাট বাহিনী। পলিটিক্যালি অ্যাবজরব করতে হইলে আপনারে তো ফ্রন্ট খুলতে হবে। আপনি তো সবাইরে আওয়ামী লীগে নেতে পারতেছেন না। পাঁচটা মার্ডার হবে রোজ। এহন তো হবে অস্ত্রের গ্রুপিং। পলিটিক্যাল গ্রুপিং নাই। এদের তো বিভিন্ন জায়গায় ঢুকাইতে হবে।

কী করব?

একটা গ্রুপ, যারা নিডি, তাদের চাকরি দিতে হবে। যারা পলিটিকস করবে, তাদের জন্য ফ্রন্ট খুইলা দিতে হবে। আপনি ফ্রন্ট খুইলা দেন?

আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকায়া রইল। কয়, তুই কাইল আসিস। এই জায়গায় আসিস।

আমি বাসায় যাইতাম রোজ। কিন্তু কথা কইতাম এহানে। পরের দিন আবার গেলাম। যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কয়, অনেক চিন্তা করছি। তুই ভালো কথা বলছস। কিন্তু মনিরে তো আমি মানা কইরা দিছি। একটা কাজ কর। তুই মনিরে নিয়া আয়।

তহন তো আমি বোঝলাম। মনিরে আইন্যা মনিরে দিয়া প্রস্তাব দেওয়াব। তহন রাজি হবে। তা না হইলে তো খারাপ দেহা যায়।

আমি মনিরে ভাইঙ্গা কইলাম না। বললাম, চলো। আইজ দুইজন একসঙ্গে যাই দেহি।

আমারে নিয়ো না, তুমি যাও।

না না, তোমার যাইতে হবে।

সে কিছুতেই যাইতে রাজি হয় না। বললাম, আমি বঙ্গবন্ধুর লগে কথা কইছি। সে তোমারে লইয়া যাইতে কইছে।

কী কও? চলো।

আইলাম। আসার পর, আমরা বসা, বঙ্গবন্ধু মনিরে কয়: কী বলবি?

আমি তো না, আমু মিয়া কী কইতে আইছে, আমি জানি না।

আমি বললাম যে এই যুবলীগের ব্যাপারটা আলোচনা করতেছিলাম।

মনি আমার সঙ্গে আলাপ করছিল। মনির সঙ্গে আলাপ কর। সে কী করতে চায়, করুক। আমি 'না' বলছিলাম। পরে চিন্তা করলাম, ঠিক আছে, তোমরা আলোচনা কইরা ঠিক করো।[৩২]

## ৫

মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে মুজিববাহিনীর দুই শীর্ষ নেতা এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী ও বন্ধু দুটি আলাদা দল তৈরি করলেন, জাসদ ও আওয়ামী যুবলীগ। যুবলীগের যৌক্তিকতা, সরকারের সঙ্গে এর সম্পর্ক, বিরোধী দল সম্পর্কে মন্তব্য—এসব উঠে এসেছে সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* ২৯ জুন ১৯৭৩ প্রকাশিত শেখ ফজলুল হক মনির এক সাক্ষাৎকারে। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন মাহফুজ উল্লাহ। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো:

> প্রশ্ন: আপনার রাজনৈতিক সংগঠন যুবলীগ কি যুব কংগ্রেসের প্রতিরূপ? এর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : যুবলীগ যুব কংগ্রেসের অনুপ্রেরণায় সংগঠিত হয়নি। এ দেশে চিরদিনের অসংগঠিত যুবশক্তিকে সংগঠিত করাই যুবলীগের উদ্দেশ্য। যুবশক্তি সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ। যুবলীগের মাধ্যমে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে আমি এই যুবশক্তিকে সংগঠিত করতে চাই। যুবলীগ ছাত্রলীগের মতোই আওয়ামী লীগের সংযুক্ত সংগঠন।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বিরোধী দল সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমাদের দেশে বিরোধী দল নেই। আমরা চাই দেশে সুষ্ঠু বিরোধী দল গড়ে উঠুক। আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত ভাসানী, অলি আহাদ, আতাউর রহমান খান, মুজাফ্ফর, জাসদ এরাই আজ বিরোধী দলের নেতৃত্ব করছে। এরা বিপ্লবের পতাকা বহন করেনি। যারা স্বাধীনতার পতাকা বহন করতে পারেনি, তাদের নিয়ে অন্য রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি জাসদ নেতাদের আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত বলছেন। কিন্তু জাসদ নেতৃবৃন্দ কখনো আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন না। যেমন মেজর জলিল এবং আ স ম আবদুর রব।

উত্তর : জাসদে সব ফালতু লোক এসে জুটেছে। তাদের নেতৃত্ব করছে দুর্নীতির অভিযোগে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত মেজর জলিল।

প্রশ্ন : আমরা যত দূর জানি মেজর জলিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

উত্তর : তার মায়ের কান্নার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে—তিনি প্রাণভিক্ষা পেয়েছেন। একদিন আমাদের সঙ্গে মহত্তর কাজে জড়িত ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে। আমাদের সহনশীলতা বেশি বলেই অনেককে ক্ষমা করে দিয়েছি।

প্রশ্ন : বর্তমানে যে হারে ভায়োলেন্সের সংখ্যা বাড়ছে, সে সম্পর্কে আপনার মত কী?

উত্তর : যে পরিমাণে ভায়োলেন্স হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। করার দরকার হয়নি। এখন শুধু আওয়ামী লীগ দলীয় লোকদের মারা হচ্ছে। দেশ এখন ক্রান্তিকালে অবস্থান করছে।

প্রশ্ন : আপনি কি রাজনীতিতে ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী?

উত্তর : প্রয়োজন হলে রাজনীতিতে ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী। তবে সে ভায়োলেন্সের ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিকতা।

প্রশ্ন : আপনার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কী?

উত্তর : আমার কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই।

প্রশ্ন : মুজিববাদ কি দেশে শান্তি আনবে?

উত্তর : মুজিববাদই শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। কেননা, এটাই সর্বশেষ মতবাদ।[৩৩]

শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে দ্বৈরথ জারি থাকল। শেখ মনি 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করলেন। সিরাজুল আলম খান 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নিয়ে আগুয়ান হলেন। তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক, সংঘাত কিংবা সমীকরণ মাও সে তুংয়ের বিখ্যাত উক্তিটি মনে করিয়ে দেয়—ঐক্য ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী।

## ৬

ছাত্রলীগ যদি না ভাঙত, জাসদ যদি আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ না হতো, তাহলে কী হতো? এ নিয়ে আছে নানা আলোচনা ও তর্ক। এ নিয়ে কথা বলেছিলাম সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা' মানেন না, 'বঙ্গবন্ধু' সম্বোধন করেন না। সূচনাটি হয়েছিল ছাত্রলীগের সিরাজপন্থীদের হাতে। এটি অনেক দূর গড়িয়েছে। সিরাজুল আলম খান তুলে ধরলেন তাঁর সাম্প্রতিক উপলব্ধির কথা :

> শেখ মুজিব শুড বি প্লেইসড ইন আ রাইট প্লেস—তারপর যারা আছে, তারা আসবে।
>
> সিরাজুল আলম খান যদি শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকত, তাহলে বাংলাদেশ নাকি আরও ভালো হতো। কথা তো ঠিকই। বিরোধী দল থাকত না। পিটায়া...সমান হইয়া যাইত সব। সেটা ভালো রাজনীতি হতো? আজকে যেটুকু স্বাধীনতা আমরা গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে, সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পাচ্ছি, সেটুকুও তো থাকত না।
>
> স্বাধীনতার কোশ্চেনটা মিসহ্যান্ডেলড হয়েছে, রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং। দেশে আসার দুদিন পর। ওই যে তিনি প্রাইম মিনিস্টার হবেন, ফ্রম দ্যাট ডে।
>
> ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো দেশে বিরোধী দল মানেই সরকারি দলের লেজুড়। এটা কি ওয়েস্টমিনস্টার? এটা ইংল্যান্ড মনে হচ্ছে, আমেরিকা মনে হচ্ছে—সেখানে অপজিশনটাই

গড়ে উঠেছে শত শত বছরের মধ্য দিয়ে। এখানে কে হবে বিরোধী দল? কয়েকটা লোক তো হতে হবে এবং সেটার গ্যারান্টি কে দিচ্ছে? আওয়ার কনস্টিটিউশন। ১৯৭২ সালের কনস্টিটিউশন।

গভমেন্টের বিরুদ্ধে কে থাকবে? আমি সরকারি দলে যাব না। তাহলে কে থাকবে? আমি বিরোধী দলে আসলাম। আমার বক্তব্য কী হবে? শেখ মুজিবকে বিরোধিতা করার অর্থ কী হবে? স্বাধীনতার বিরোধিতা করা? আচ্ছা, বাহাত্তর সালে সরকারের ভুলত্রুটিটা কী? সরকারটা কোথায় দেখলা তুমি? গভমেন্ট মানেই কি সরকার? একটা ইলেকশন হয়ে গেলেই কি গণতন্ত্র?[৩৪]

## তথ্যসূত্র

১. সিরাজুল আলম খান
২. ওই
৩. আহমদ (১৯৮২), পৃ. ১৫৯-১৬০
৪. সিরাজুল আলম খান
৫. *গণকণ্ঠ*, ২৫ মে ১৯৭২
৬. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪), *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৭-২৮
৭. *বাংলার বাণী*, ১৭ মে ১৯৭২
৮. সিরাজুল আলম খান
৯. আহমদ (১৯৮২), পৃ. ১৮৬
১০. ওই, পৃ. ১৭০-১৭১
১১. *সংবাদ*, ১০ এপ্রিল ১৯৭২
১২. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (১৯৭২), *সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী*, শাজাহান সিরাজ, পৃ. ৯-১০
১৩. ওই, পৃ. ১৩
১৪. ওই, পৃ. ৬
১৫. ওই, পৃ. ২০-২১
১৬. লেখকের স্মৃতি থেকে
১৭. সৈয়দ রেজাউর রহমান
১৮. সিরাজুল আলম খান
১৯. ওই

২০. শেখ শহীদুল ইসলাম
২১. মনিরুল হক চৌধুরী
২২. আমির হোসেন আমু
২৩. উমর, বদরুদ্দীন (১০১২), *রচনা সংগ্রহ-২*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৯৫
২৪. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন
২৫. আ স ম আবদুর রব
২৬. সিরাজুল আলম খান
২৭. *গণকণ্ঠ*, ১ নভেম্বর ১৯৭২
২৮. আমির হোসেন আমু
২৯. আহমদ (২০১৪), পৃ. ৮৯
৩০. *বাংলার বাণী*, ১২ নভেম্বর ১৯৭২
৩১. সেন, পৃ. ৫৪১
৩২. আমির হোসেন আমু
৩৩. *বিচিত্রা*, ২৯ জুন ১৯৭৩; উল্লাহ, মাহফুজ (২০১৮), *স্বাধীনতার প্রথম দশকে বাংলাদেশ*, দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৭-৩১
৩৪. সিরাজুল আলম খান

# বিপ্লব

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অন্য দলগুলো একজোট হচ্ছিল। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭২ মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে তৈরি হলো একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। তাদের ১৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল সরকারের পদত্যাগ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি ও সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠন। জাসদ এই জোটে যোগ দেয়নি।

৭ মার্চ ১৯৭৩ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলো। সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয় পেল ২৯৩টি আসনে। এটাকে 'প্রহসনের নির্বাচন' উল্লেখ করে জাসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দলের অফিসে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে রাজনৈতিক চরিত্রের দল ও ব্যক্তিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সেই দল ও ব্যক্তিরা আবার ক্ষমতাসীন হয়েছেন। সুতরাং চৌদ্দ মাসের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোকে সহজেই বলা যায় যে আওয়ামী লীগ সারা দেশ ও জাতিকে শেষ অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।...যে জনতা অস্ত্র দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই জনতাই সকল শোষণের অবসান করবে—উৎখাত করবে অত্যাচারী, ফ্যাসিবাদী শাসক ও দুর্নীতিবাজ সরকারকে।' দলের সভাপতি মেজর জলিল এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'বিরোধী দলের প্রার্থীদের পরাজিত হতে বাধ্য করা হয়েছে।'[১]

আওয়ামী লীগ সরকারকে সত্যিকার একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার সুযোগ এল ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ঠিক হলো, নির্বাচন হবে ৩ সেপ্টেম্বর। জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগ তখন খুব জনপ্রিয়। এদের ঠেকানোর জন্য আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে যৌথ প্যানেল দিল। জাসদ-সমর্থিতরা নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। তবে মেয়েদের ও অমুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের প্রভাব ছিল বেশি। তারাই বরাবর জগন্নাথ হল ও রোকেয়া হলে জিতত। এর সঙ্গে যোগ হলো শামসুন্নাহার হল। এ নিয়ে রণকৌশল ঠিক করতে বসলেন স্বয়ং

সিরাজুল আলম খান। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর আবু করিম মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্র, দৈনিক *গণকণ্ঠ* পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার। ডাকসু ইলেকশন নিয়ে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছে, সেটি তিনি এক আলাপচারিতায় আমার কাছে তুলে ধরলেন এভাবে :

আবু করিম : উনি বললেন, 'তোমাদের অ্যাসেসমেন্টটা বলো—শামসুন্নাহার হলে কত ভোট পাব, রোকেয়া হলে কত ভোট পাব, জগন্নাথ হল কত ভোট দিবে।'

মাহবুব ভাই (সহসভাপতি পদে জাসদ-ছাত্রলীগের প্রার্থী আ ফ ম মাহবুবুল হক) আমার পাশে বসা। আমরা প্রায় নয়জন ছিলাম, যারা ডাকসু ইলেকশনে শেষ পর্যন্ত থাকব বলে ঠিক করা ছিল।

তখন সিরাজ ভাই বললেন, 'তোমরা এ প্রসঙ্গটা বাদ দাও। সে রকম হলে আমরা সে রকম করব। হাতে সব রকম ওষুধ রাখতে হবে। আমরা তো একটা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি।'

মহিউদ্দিন আহমদ : এভাবে বলেছে?

করিম : আমার সাজেশন হলো, যে প্রেস থেকে লেনিন-গামার (আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী নূহ-উল আলম লেনিন ও ইসমত কাদির গামা) লিফলেট-ব্যাজ ছাপা হবে, এক্সট্রা পয়সা দিয়া ওই প্রেস থেকে আমরা লেনিন-গামার কিছু ব্যাজ ছাপায়া নেব। তারপর আমাদের হল ইউনিটগুলোকে বিলি করে দেব। আমাদের যারা হার্ডকোর এবং আননোন, তারা এই ব্যাজ লাগায়া ঘুরে বেড়াবে—লেনিন-গামা লেনিন-গামা বলতে বলতে। আর তলে তলে আমাদের কাজ করবে।

মহি : তারপর কী হলো?

করিম : আমরা তো ডেইলি মিট করতাম। দুই-তিন দিন পর আমরা আবার বসলাম।

মহি : কোথায়?

করিম : সিরাজ ভাইয়ের এক ভাইয়ের বাসায়, ওয়ারী। ওনার যে ভাই ডাক্তার ছিলেন। *গণকণ্ঠ* অফিসের কাছেই। সিরাজ ভাই আমাদের সবার কথা আলাদাভাবে শুনলেন। ইলেকশনের আর কয়েক দিন বাকি। উনি বললেন, 'আমরা জিতব।' সব জায়গায় জিতব। জগন্নাথ হল নিয়ে একটু ডাউট আছে। তবে সেখানেও জিতব।'

ওনার কাছে যে কত গুপ্ত খবর। ওরে বাবা! কে কেমন বক্তৃতা করে, কে কার সঙ্গে প্রেম করে, সব খবর ওনার কাছে।[২]

ডাকসু নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় এবং হলগুলোতে জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে ছিল। কোথাও কোথাও ভোট গণনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক ওই সময় লেনিন-গামার সমর্থকেরা দল বেঁধে গুলি ছুড়তে ছুড়তে সব জায়গায় আক্রমণ চালিয়ে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এ রকম ন্যক্কারজনক ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি।

জাসদ-ছাত্রলীগের ছেলেরা তৈরি ছিল। তারা পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারত। একটা রক্তারক্তি হতো। কয়েকজন নেতা সন্ধ্যায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ইউকসু) অফিসে বসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন। সিরাজুল আলম খান দেশে ছিলেন না। কাজী আরেফ আহমদ সিদ্ধান্ত দিলেন, 'আমরা পাল্টা আক্রমণে যাব না। এই মুহূর্তে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া যাবে না।' ওই দিন সশস্ত্র সংঘর্ষ হলে কারা জিতত, তা বলা কঠিন। তবে অনেকগুলো প্রাণ ঝরে যেত, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

## ২

জাসদ নেতারা আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন বিপ্লবের সহায়ক শক্তি। এটি একটি 'সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন'। প্রশ্ন হলো, মূল শক্তি কোথায়? শুরু থেকেই এটি গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এ জন্য বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা জাসদের বা অন্য কোনো গণসংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকেননি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমদ ও মনিরুল ইসলাম।

একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার জন্য চাই তাত্ত্বিক ভিত্তি। জাসদের নেতারা ছিলেন মূলত অ্যাকটিভিস্ট। অনেকের মধ্যেই অগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তা থাকলেও তা ছিল ভাসা-ভাসা। এ পর্যায়ে দলের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলেন নতুন দুজন—মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ও ড. আখলাকুর রহমান। তাঁদের সংযুক্তি দলকে অনেক সমৃদ্ধ করেছিল।

বিপ্লবের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করানোর কাজটি শুরু হয় ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে। মুবিনুল হায়দার চৌধুরী যুক্ত হন ওই সময়। তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান। এর আগে আমি পার্টি দলিলের একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলাম। সেটার সূত্র ধরেই আলাপ। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জাসদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরির

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
ছবি : লেখক

পটভূমি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন। এখানে তা উল্লেখ করা হলো :

মহিউদ্দিন আহমদ : আপনি কীভাবে এলেন?

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী : এটা তো আমার বাড়ি। খুব অল্প বয়সে আমার মা-বাবা মারা যায়। কলকাতায় আমার এক বড় ভাই থাকতেন। ওনার কাছে গিয়েছিলাম।

মহি : এটা কোন সালের কথা।

হায়দার : পার্টিশনের আগে। ১৯৪৬ সালে। ওখানে একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। লেখাপড়া করতে পারিনি। মা-বাবা না থাকার কারণে ছেলেবেলায় গাইড করার মতো কেউ ছিল না। এ সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, লাইব্রেরি-টাইব্রেরি এসব সার্কেলের মধ্যে।

একদিন বললেন, আমরা একটা স্টাডি সার্কেল করি, কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডে। ল্যান্সডাউন রোড আর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড়ে একটা বাড়িতে। যদি চাও, আসতে পারো। ভালো লাগবে।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। বেঁচে থাকার জন্য মোরাল কিছু তো চাই। উনি আমাকে নিয়ে গেলেন। একটা ঘরে বেশ কয়েকজন বসে আছেন। এঁরা যে কত উচ্চশিক্ষিত, আমি বুঝি নাই। কয়েকজন মহিলাও আছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ কোনায় একটা চেয়ারে বসা। উনি সেদিন নিউ ডেমোক্রেসির ওপর আলোচনা করছেন। এটা ১৯৫০ সালের কথা বলছি। তার এক বছর আগে চীনে বিপ্লব হয়েছে। এটা একটা টগবগে বিষয় ছিল। একধরনের আকর্ষণ বোধ করলাম, যা আমাকে এঁদের সঙ্গে জড়িয়ে দেয়। আমি আর কখনো এই চর্চা থেকে সরে আসিনি। ইট ওয়াজ সাচ আ ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন।

মহি : তখন আপনার বয়স কত?

হায়দার : আমি ১৯৩৪ সালে জন্মেছি।

মহি : তো আপনি ধীরে ধীরে এই পার্টির কাজ শুরু করলেন?

হায়দার : এগুলো বুঝতে আমার ৫-১০ বছর চলে গেছে। অ্যাকটিভিটিজ তখন থেকেই শুরু। এখানে-ওখানে মিটিংয়ে

বসতাম। পোস্টার লাগাতাম। প্রতি রোববার স্টাডি সার্কেল হতো।

মহি : পার্টির নাম কী ছিল?

হায়দার : সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া। পরে ব্র্যাকেটে 'কমিউনিস্ট' শব্দটি জুড়ে দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল।

মহি : আপনি খিদিরপুর জোনের দায়িত্ব নিলেন।

হায়দার : কিছুদিন ছিলাম। তারপর কমরেড শিবদাস আমাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায় যেতে বললেন। এসব করছি। কমরেডরা একসঙ্গে থাকতাম। তখন আমাকে বলা হলো, তুমি পার্টি অফিসে চলে এসো।

এসব চলতে চলতে বাংলাদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হলো। আমাকে ডেকে পাঠানো হলো। ইস্ট পাকিস্তান থেকে অনেক রিফিউজি এসেছে। এদের যত রকম প্রয়োজনীয় সার্ভিস দেওয়া যায়, আমাদের সাধ্যের মধ্যে থেকে।

আমি বর্ডার এলাকায় ঘোরাঘুরি করতাম। সব জায়গায় তো আওয়ামী লীগের লোক। ওদের যে কাণ্ডকারখানা, যে সুখী জীবন যাপন করছে, এ কেমন স্বাধীনতার আন্দোলন? তোয়াহা সাহেবের দলের দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। এর বাইরে বিশেষ কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি।

ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ (১৯৭১) তো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল।

২৪ এপ্রিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে বললেন, অনেক দিন তো দেশে যাও না। একটু ঘুরে আসো। কিছু বইপত্র নিয়ে যাও। এই আসলাম। বদরুদ্দীন উমর, রাশেদ খান মেনন, অমল সেন—এ রকম অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। চট্টগ্রামে আবুল বাশার সাহেব ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। ওনার সঙ্গে দেখা করেছি।

মহি : মস্কোপন্থী কারও সঙ্গে দেখা করেননি?

হায়দার : করেছি। সিপিবির অফিসে গেছি। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম মনে পড়ছে না। কয়েকজন ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আলাপ হয়নি। মেনন যেখানে থাকতেন, সেখানে গিয়ে দেখা করে বইটই দিয়েছি। অমল সেনসহ তাঁরা যে অফিস করেছিলেন, সেখানে গিয়েছি। দু-তিনবার গিয়ে কিছু তর্ক-বিতর্কও করেছি।

মহি : কত দিন ছিলেন বাংলাদেশে?

হায়দার : এপ্রিলের ২৭-২৮ তারিখে গিয়েছি। সোজা চট্টগ্রাম চলে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে আমার এক আত্মীয় ঢাকায় নিয়ে

এল। বদরুদ্দীন উমরকে খুঁজে বের করলাম। মে মাস পুরোটাই ছিলাম। জুনের শুরুতে আমি চলে এসেছি।

চলে আসার পর কলকাতায় পার্টি অফিসে একদিন দেখি *গণকণ্ঠ* নামে একটা কাগজ, মে দিবস সংখ্যা। ম্যাগাজিনের মতো, একটা বিশেষ সংখ্যা। ছাত্রদের স্লোগান আছে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, শ্রেণিসংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লব—এসব কথা। আমি একটু অবাক হলাম। ওখানে এত ঘুরলাম, ওদের খবর তো পেলাম না? কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, আবার ঘুরে এসো। দেখো এরা কারা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, মার্ক্সবাদের কথা বলছে। তো আবার গেলাম ঢাকা, সেপ্টেম্বর মাসে।

বদরুদ্দীন উমর সাহেবকে বললাম। উনি বললেন, কীভাবে সিরাজুল আলম খানের কাছে যেতে হয়, রহস্যজনক ব্যাপার-স্যাপার। সিআইএর লোকও হতে পারে, র-এর লোকও হতে পারে।

ঢাকায় একটা হোটেল আছে, সম্রাট হোটেল। ওখানে একটা বস্তি ছিল।

আমি ওই বস্তিতে থাকতে শুরু করলাম। আমার এক আত্মীয়া, মানে ভাগনি, তার ছেলে ঢাকায় ছাত্রলীগ করে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। মেডিকেলে পড়ত। তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কীভাবে দেখা করতে পারি।

বলতে পারব না। তবে তাঁর ফোন নম্বর জোগাড় করে দিতে পারি। *গণকণ্ঠ* অফিস।

হোটেল থেকে আমি *গণকণ্ঠ* অফিসে ফোন করলাম। প্রথম দিন পেলাম না। দ্বিতীয় দিন পেয়েছি। আমার পরিচয় দিলাম। বাড়ি কোথায় ছিল, সেটাও বললাম। উনি বললেন, 'আমি তো রাজনীতি করি না। আপনি আ স ম আবদুর রব অথবা শাজাহান সিরাজের সঙ্গে কথা বলুন।'

ওরা তখন আওয়ামী লীগারদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে আছে। হাসপাতালের ঠিকানা দিলেন।

আমি বললাম, আমি তো ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছি না। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। যদি তিন মাস পরেও দেখা হয়, আমি অপেক্ষা করব। কথা বলবেন না কেন?

আমি তো রাজনীতি করি না। আচ্ছা, ঠিক আছে।

এসইউসিআইয়ের সম্পাদক শিবদাস ঘোষ

ফিরে গেলাম চট্টগ্রামে। ওখান থেকে কুমিল্লায়। চট্টগ্রামে আমি কিছু বই রেখে এসেছিলাম। জাসদ নেতা হাবিবউল্লাহ চৌধুরী আমার ভাইপোকে পাঠিয়ে ওগুলো নিয়ে এসেছে। তখন আমি হাজীগঞ্জে এলাম হাবিবউল্লাহর কাছে। ওকে ছোটবেলায় দেখেছিলাম, ১৯৫৬ সালে। তখন একবার দেশে এসেছিলাম। ওকে বললাম, তোমাদের নেতা সিরাজুল আলম খান তো রহস্যজনক মানুষ। উনি নাকি রাজনীতি করেন না! হাবিবউল্লাহ বলল, ঠিক আছে, কালই আপনাকে ঢাকায় নিয়ে যাব। দেখা করাব।

সলিমুল্লাহ হলে দেখা করার জন্য এলাম। সিরাজুল আলম খান হলের কোনো এক কামরায় ছিলেন। আমি গেস্টরুমে বসে আছি। তারপর হাবিবউল্লাহ চৌধুরী এসে বলল, চলেন। একটা গাড়িতে উঠলাম। সেই গাড়িতে শরীফ নুরুল আম্বিয়া আর শ্রমিকনেতা মান্নান ছিল।

মহি : মান্নান তখনো ছিলেন? আপনি ঠিক বলছেন?

হায়দার : হ্যাঁ। মান্নান, লাল বাহিনীর মান্নান। আমাকে *গণকণ্ঠ* অফিসে নিয়ে গেল। কথাবার্তা হলো। বললাম, একটা বিপ্লবী পার্টি ছাড়া তো বিপ্লবী রাজনীতি হয় না। আপনারা স্লোগান দিচ্ছেন, কিছু বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা বললেন। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা আছে, এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তো কোনো স্লোগানের বিষয় না। এটা হলো প্র্যাকটিস করার জন্য একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ইউটোপিয়ার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।

এগুলো অত ভালো বোঝেননি তখন, আমার এটা মনে হয়েছে।

মহি : *গণকণ্ঠ*-এ যখন কথা বলছিলেন, তখন কাজী আরেফ আহমদ কি ছিলেন সেখানে?

হায়দার : না। শুধু আমি আর সে। পরে *গণকণ্ঠ* অফিসে কাজী আরেফের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অন্যরা বলে, উনি হলেন সেকেন্ড ম্যান। কথার একপর্যায়ে সিরাজুল আলম খান বললেন, 'আপনি কি

কয়েক দিন থাকবেন? প্রতিদিন যদি একবার করে আসেন, তাহলে কিছু কথাবার্তা বলতে পারি।'

'এসইউসিআই কেন একমাত্র সাম্যবাদী দল'—এটা *গণদাবি* পত্রিকায় প্রথম বেরিয়েছে। তখনো বই হয়নি। এর বেশ কিছু কপি নিয়ে এসেছিলাম। একটা দিলাম ওনাকে পড়ার জন্য। এই নিবন্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদী চিন্তার ফারদার ডেভেলপমেন্ট ঘটিয়েছেন। রেভল্যুশনারি পার্টি গড়ার জন্য যে লেনিনিস্ট ওয়ে অব বিল্ডিং আ পার্টি, সেখানে তিনি যৌথ নেতৃত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত বলেছেন। তারপর কীভাবে একদল পেশাদার বিপ্লবী তৈরি করতে হবে, যৌথ নেতৃত্ব যত দিন পর্যন্ত না হবে, তত দিন পর্যন্ত ব্যক্তিবাদকে সম্পূর্ণ ডিফিট দেওয়া যাবে না, যৌথ নেতৃত্বের পার্সনিফিকেশন, অর্থাৎ যৌথ চিন্তার সার্থক প্রয়োগ একজনের মধ্যে হতে পারে প্যারালালিজম-ইনডিভিজ্যুয়ালিজমকে বাদ দিয়ে—এসব কথাবার্তা। মার্ক্সবাদী আন্দোলনে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব কথায় তিনি খুব ইমপ্রেসড হন। তারপর আমাকে নিয়ে বসা, এর-ওর সঙ্গে বসানো, ক্লাস করানো, এসব করতে শুরু করলেন।

মহি : এটা কি বাহাত্তরের সেপ্টেম্বরেই?

হায়দার : বলতে ভুলে গেছি। একদিন তার মোটরসাইকেলের পেছনে বসে যাচ্ছি। এর আগে সকালে খবরের কাগজ পড়ে জেনেছি জাসদ নামে নতুন একটা পার্টি হয়েছে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। ওই দিনই। ওনার সঙ্গে কয়েক দিন ধরে যে আলোচনা হচ্ছে, আমাকে ঘুণাক্ষরেও উনি এ বিষয়ে কিছু বলেননি। বললাম, এটা কী ধরনের নাম। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তো ফ্যাসিস্ট পার্টির নাম। আপনি এ রকম নাম কেন দিলেন?

আমরা প্রচণ্ড একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এসেছি তো, 'জাতীয়' কথাটা না লিখলে এখানে রাজনীতিতে দাঁড়ানো মুশকিল আছে।

আমি কিন্তু অ্যাগ্রি করিনি। বলেছি, এটা কখনো হতে পারে না। এটা ঠিক না। যত রকমের বাধা থাকুক, সেটা মোকাবিলা করেই বিপ্লবী রাজনীতি করতে হবে।

এভাবেই কথাবার্তা হচ্ছিল। তখন উনি বললেন, এটা তো পার্টি না। ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, জাসদ—এদের থেকে বাছাই করা লোকদের নিয়ে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলব। জাসদ কোনো বিপ্লবী পার্টি না।

আমি এর মধ্যে একটু যুক্তি দেখলাম। এটা তাহলে একটা প্ল্যাটফর্ম। বাস্তবে তারা কী করে, সেটাই দেখার বিষয়।

এরপর আমি কলকাতায় ফিরে গেলাম।

মহি : কত দিন ছিলেন ওইবার?

হায়দার : প্রায় দুই মাস। ফিরে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষকে রিপোর্ট করলাম। সিরাজুল আলম খানকে বলেছিলাম, আপনি কলকাতায় আসেন। তাহলে কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে আপনাকে বসাতে পারি। তারপর উনি কলকাতায় গেলেন।

মহি : এটা কি ১৯৭২ সালেই?

হায়দার : না, এটা ১৯৭৩ সালে।

মহি : কোন মাসে, মনে আছে?

হায়দার : মনে নাই।

মহি : ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতা গিয়েছিলেন বলে আমি জানি।

হায়দার : হতে পারে, আমার মনে নাই। তা ছাড়া এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না।

মহি : টাইমিংটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

হায়দার : সে সময় মুশতাক নামে একজন ছিল...

মহি : রেজাউল হক মুশতাক?

হায়দার : সে কী করে?

মহি : এখন তো ব্যবসা করে। তখন ছাত্রলীগ করত। ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক ছিল। ছাত্রলীগের কনফারেন্সে আউট হয়ে গেল।

হায়দার : আরেকজন ছিল।

মহি : বদিউল আলম।

হায়দার : আমি একদিন বন্ধুদের নিয়ে 'সোসাইটি' সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গেছি। দেখি, ওরাও গেছে সেখানে।

মহি : সিরাজ ভাই আর ওই দুজন?

হায়দার : হ্যাঁ। কিন্তু ওরা আমাকে দেখে নাই। পরে অবশ্য বদিউলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল হাবিবউল্লাহ চৌধুরীর মাধ্যমে।

মহি : হ্যাঁ, ওদের দুজনের বাড়ি একই এলাকায়, হাজীগঞ্জে।

হায়দার : ওরা একটু দূরে, ব্যালকনিতে বসা। আমরা নিচে।

মহি : কী ছবি, মনে আছে? বাংলা না ইংরেজি?

হায়দার : হিন্দি ছবি। যাহোক, পরে তো ওনাকে কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে মিট করালাম।

মহি : আপনি তাঁকে পার্টি অফিসে নিয়ে গেলেন?

হায়দার : অফিসে না। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতাম। বিভিন্ন বাড়িতে।

মহি : সিরাজ ভাই তখন থাকতেন কোথায়?

হায়দার : অত তো জানতাম না। বলতেন না। আমি বেশি জিজ্ঞেস করতাম না। পরে জেনেছি, চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে থাকতেন। চিত্তরঞ্জন সুতার কে, এটা কিন্তু আমি জানি না। ভবানীপুরে, রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড, আমাকে এ পর্যন্ত বলেছে। আমি একদিন ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। কয়েকজন আমাকে রিসিভ করে বসাল। আমার খবর নিচ্ছে, আমি কে, কী। বললাম, সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে পরিচয় আছে তো। সে জন্য দেখা করতে এসেছি। উনি এসে আমাকে বললেন, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন? এখানে আসা তো আপনার ঠিক হয়নি।'

চিত্তরঞ্জন সুতারের নাম আগে শুনি নাই, ওই দিনও বুঝি নাই। তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়নি।

সিরাজুল আলম খান আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। তারপর আমার সঙ্গে বের হলেন। নানা জায়গায় ঘুরলাম। উনি দু-তিনবার কমরেড শিবদাস ঘোষকে মিট করেছেন।

সিরাজুল আলম খান পরে আখলাকুর রহমানকে শিবদাস ঘোষের কিছু বই পড়িয়েছেন। পরে শুনেছি, উনি এসব পড়ে খুবই বিস্মিত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন। তবে সেটা প্রকাশ করেননি।

মহি : একটু থামুন। ওখানে তো কয়েক দফা দেখা হলো, কথা হলো। তারপর উনি ফিরে এলেন। ওনার সঙ্গে আপনিও কি এসেছিলেন?

হায়দার : একসঙ্গে আসিনি।[৩]

## ৩

আখলাকুর রহমান একজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ। বেশ কয়েক বছর তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। ফিরে আসেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের সম্মেলনে অতিথি হিসেবে

তাঁর উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল, তিনি জাসদে যুক্ত হবেন। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সিরাজুল আলম খান আমাকে বলেন :

> উনি তো আসলেন পাকিস্তান না সৌদি আরব থেকে। ওখানে তিনি একটা ব্যাংকের চিফ ইকোনমিস্ট ছিলেন না? পাকিস্তানে না ঢুকে বাংলাদেশে আসলেন। সাম হাউ উনি শুনলেন আমাদের কথা। আমরাও একদিন শুনলাম। একদিন তাঁকে ইনভাইট করলাম যে আমরা কথা বলব। একদিন বসলাম। এ কথাটা আমি তুললাম, ভাই, আমাদের ইকোনমিক সাইডটা দেখেন। উই আর ভেরি উইক। খেপে গেলেন।
>
> শুধু আপনাদের ইকোনমিক সাইড দেখব? কেন?
>
> তাহলে তো আরও ভালো। থাকেন।
>
> ওনার মতো করে খোঁজখবর নিয়ে উনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। হি ওয়াজ কনভিন্সড। মানে এরা কিছু করতে পারবে। আমরা দেখলাম তাঁর নলেজটা খুব গভীর। তখন যে কাজটা আমাদের সামনে ছিল, আমরা যদি একটা রাজনৈতিক লাইন, পলিটিক্যাল থিসিস দাঁড় করাই—আমরা তো বলতামই, এটা হবে একটা সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব না। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো—সামন্তবাদী অবস্থা থেকে একটা বুর্জোয়া ও শ্রমজীবী পর্যায়ে যেতে হবে। বুর্জোয়াদের একটা ডেফিনিট রোল থাকবে। আমরা বুঝলাম, এটা হবে সোশ্যালিস্ট টেকওভার। বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিতে হবে। তবে অনেক ডেমোক্রেটিক আসপেক্ট নট ডান অর ফুলফিলড, এগুলোকে কভার করতে হবে। ইফ উই আর ইন দ্য পাওয়ার, তা হলেও। ইফ উই আর নট ইন দ্য পাওয়ার, তাহলে থ্রু পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম।[৪]

জাসদ সব সময় সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের দাবি করে এলেও চলছিল একা। অন্য কোনো দলের সঙ্গে জোটে যাওয়া বা যুগপৎ কার্যক্রমের ব্যাপারে জাসদের আগ্রহ ছিল না। অন্য দলগুলোও জাসদকে আস্থায় নেয়নি। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে জাসদের জনপ্রিয়তা ছিল বেশি। তরুণদের মধ্যে ছিল এর একচেটিয়া প্রাধান্য।

১৯৭৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাসদের জাতীয় কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'গণ-আন্দোলনের ভিত্তি ও কর্মসূচি' নামে একটি ২৯ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও লাল বাহিনীকে বেআইনি ঘোষণা করা এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে ভেঙে দিয়ে এর সদস্যদের নিয়মিত সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা।[৫]

চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ পল্টনে জাসদের জনসভা

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ জাসদ-সমর্থিত দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এ 'শাসকগোষ্ঠীর প্রতি জাসদের চরমপত্র : জনতার দাবি মেনে নাও : শেষ সময় ১৫ই মার্চ' শিরোনামে প্রথম পাতায় একটি সতর্কবাণী প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, ১৫ মার্চ ১৯৭৪-এর মধ্যে ২৯ দফা দাবি মেনে না নিলে দেশের সব জায়গায় 'ঘেরাও' আন্দোলন শুরু হবে। ঘেরাও কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় পর্যায়ের রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ও সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের ঘেরাও করা হবে বলে জানানো হয়। এ পর্যায়ে গণভবন, সচিবালয় ও বঙ্গভবন ঘেরাওয়ের ঘোষণা দেওয়া হয়।

১৭ মার্চ জাসদ ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা করে। জনসভা শেষে একটি জঙ্গি মিছিল মিন্টো রোডের দিকে যায় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসা ঘেরাও করে। সেখানে রক্ষীবাহিনী গুলি চালালে অনেকেই হতাহত হন। সরকারি প্রেসনোটে তিনজন নিহতের কথা বলা হলেও *ইত্তেফাক*-এ ছয়জন নিহত হওয়ার খবর ছাপা হয়। জাসদ দাবি করে, ঘটনাস্থলে ৫০ জন নিহত হয়েছেন। জন্মের পর জাসদের ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ঘটনা। ওই দিন আহত অবস্থায় কয়েকজন জাসদ নেতা গ্রেপ্তার হন। পরে আরও অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন মেজর জলিল, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, মোহাম্মদ শাহজাহান, মির্জা সুলতান রাজা, রুহুল আমিন ভূঁইয়া প্রমুখ। ওই রাতেই *গণকণ্ঠের* সম্পাদক আল মাহমুদকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৭ মার্চের ঘটনাটি জাসদের জন্য ছিল একটা বড় ধাক্কা।

জনসভা শেষে মিছিলটি শেষমেশ কোথায় গিয়ে থামবে, এটি মিছিলকারীরা জানতেন না। কয়েকজন সামনের দিকে ছিলেন। অন্যরা

*গণকণ্ঠ* সম্পাদক আল মাহমুদ

তাঁদের পেছন পেছন গেছেন। কাকরাইল মসজিদের কাছাকাছি যখন মিছিল আসে, তখন কারও হাতে চিরকুট পৌঁছে দেওয়া হয়। চিরকুটে মিছিলের গন্তব্য উল্লেখ করা ছিল। এটি সিরাজুল আলম খানের হাতের লেখা বলে শনাক্ত হয়।[৬]

১৭ মার্চ, নেতাদের অনেকেই ঢাকায় ছিলেন না। কাজী আরেফ ছিলেন সিলেটে, মনিরুল ইসলাম ছিলেন দাউদকান্দি, শরীফ নুরুল আম্বিয়া ছিলেন যশোর, মাসুদ আহমেদ রুমি ছিলেন রংপুর। ঘটনার আকস্মিকতায় রুমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। ঢাকায় এসে তিনি দলের এক সভায় অভিযোগ করেন, 'এ ধরনের সিদ্ধান্ত কীভাবে হলো? আমি তো জানি না?' চিরকুটের প্রসঙ্গ উঠল। সিরাজুল আলম খান বললেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

একটা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার লক্ষ্যে যাঁদের ছাত্রলীগ ও জাসদের কমিটির বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের একজন ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া। ১৭ মার্চের ঘটনার পূর্বাপর নিয়ে তাঁর মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া জানতে একদিন তাঁর মুখোমুখি হলাম। তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা ছিল এ রকম :

> মহিউদ্দিন আহমদ: ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাওয়ের পরিকল্পনাটা কার?
>
> শরীফ নুরুল আম্বিয়া: আমি এটা জানি না। আমি ছিলাম দক্ষিণবঙ্গে, খুলনা ডিভিশনে সাংগঠনিক দায়িত্বে। এত বড় টার্গেট হ্যান্ডেল করবে, এটা আমার ধারণায় ছিল না।
>
> মহি: পরে এটা নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি? কোনো অ্যানালাইসিস?
>
> আম্বিয়া: ওই সময় ইনুও বাইরে ছিল। সে কোথা থেকে আসছে। দুপুরের পর সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হইছে। সিরাজ ভাই নাকি তাকে বলেছে, নেতাদের দেইখা রাইখো। এতে বোঝা যায় না এটা সিরাজ ভাইয়ের ডিসিশন কি না। কেননা, আগের রাতেও এ ব্যাপারে ডিসিশন হয় নাই যে ঘেরাও করবে। ডিসিশন যেখানে হইছে, সেখান থেকে এইটা লিক হইয়া চইলা গেছে গভমেন্টের কাছে। এইটা আমার ধারণা। কেননা,

রক্ষীবাহিনী আইসাই তো মিছিলের ওপর ব্রাশফায়ার করছে।

মহি : ইনু ভাই গুলিটুলি করেছে বলে যে গসিপ আছে, এটা কি ঠিক না?

আম্বিয়া : এ ধরনের একটা বড় মুভমেন্টের মধ্যে অনেকেই অনেকভাবে ইনভলভড হইতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক।

মহি : সিরাজ ভাই আমাকে পরিষ্কার বলেছেন, ১৭ মার্চের ব্যাপারে উনি জানতেন না।

আম্বিয়া : উনি তো দলের নেতা। প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি যে-ই হোক, জাসদের নেতা তো উনিই। প্রকৃত নেতা উনি। তাহলে বলতে হবে, দলটা তাঁর কন্ট্রোলের বাইরে ছিল। এ প্রশ্ন তো আসবে।

মহি : অনুমানের কথা না। আপনি তো দলের ভেতরের লোক। দল তখন কারা কন্ট্রোল করত?

আম্বিয়া : পরে যখন আমরা ফোরাম করলাম, তখন উনি বলেন নাই 'আমি করছি'। আবার 'আমি করি নাই'—এ কথাও বলেন নাই। তবে কেন এটা করা হইল, এ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করা হইছিল। পরে এক মিটিংয়ে জিকু ভাইয়ের বাসায় অথবা—রাজমণি সিনেমা হলের মালিকের নাম কী?

মহি : মনি।

আম্বিয়া : মনির সদরঘাটের বাসায় আমাদের মিটিং হইছিল। এটা সিরাজ ভাইয়ের কন্ট্যাক্ট। কত রকমের লোকের সঙ্গে যে ওনার লাইন!

মহি : সিরাজ ভাই কী জবাব দিয়েছিলেন?

আম্বিয়া : উনি করছেন কি করেন নাই, ওই ইস্যুতে যান নাই। করা ঠিক হইছে কি না, এই ইস্যুতে উনি ডিফেন্ড করছেন। মার্শাল মনি আর আমি ছাড়া আর কেউ এর বিরোধিতা করছে বলে মনে পড়ে না।

মহি : মার্শাল মনি আর আপনি এটার বিরোধিতা করেছেন?

আম্বিয়া : বিরোধিতা মানে, বলছি এইটা ভুল কাজ হইছে। ইনু হইল সিরাজ ভাইয়ের পক্ষে এক নম্বর প্লেয়ার।

মহি : আর কে ছিল?

আম্বিয়া : সিরাজ ভাইয়ের পক্ষে ছিল এ বি এম শাহজাহান। বলছিল, এখন তো এটা হয়ে গেছে। সিচুয়েশনটা সেভ করা যায় কীভাবে।

মহি : এই আলোচনাটা কোন সময় হলো?

আম্বিয়া : ১৭ মার্চের ২০-২১ দিনের মধ্যে। এখন কথা হলো দলটা সেভ হবে কেমনে? এখন অস্ত্র হাতে নিয়ে নেওয়া ছাড়া বিকল্প থাকতেছে না। কেননা, আমরা ডেমোক্রেটিক্যালি অফিস করব, মিটিং

এ বি এম শাহজাহান

করব, মিছিল করব, আওয়ামী লীগ সে জায়গাটা রাখতেছে না। আওয়ামী লীগের তৈরি ফাঁদের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি। তখন বুঝি নাই। এখন বুঝি। জাসদকে এই অবস্থায় ঠেলে দিছে তো আওয়ামী লীগ। অপজিশন মানে তো উকিল-মোক্তার-দোকানদার আর ট্রেড ইউনিয়ন। তারা কি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইফ মেনটেইন করতে পারে?

মার্চের ২২-২৩ তারিখের মধ্যেই বাংলাদেশের সব জায়গায় জাসদের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারিদের বাসা থেকে তুলে নিয়ে আসল। তো বাকি লোক করবে কী? একটু নড়াচড়া করলেই তো ধরে নিয়ে যাবে? যারা ধরা পড়ছে, চার-পাঁচ বছরের আগে তো কেউ ছাড়া পায় নাই। জাসদ তো একটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ফ্যামিলি নিয়া বাঁইচা থাকাই কঠিন ছিল। অনেকেই তো ধ্বংস হয়ে গেছে। কতজনের বউ চলে গেছে!

১৭ মার্চের ব্যাপারে সিরাজ ভাই যদি বলে যে উনি এটা করান নাই। তবে আমার পক্ষে প্রমাণ করা কঠিন যে উনি এটা করাইছেন। তবে মিটিংয়ে উনি দায়িত্ব অস্বীকার করেন নাই। ডিসিশনটা উনি দিছেন কি না, নাকি এটা জলিল ভাইয়ের ডিসিশন, নাকি রব-জলিলের ডিসিশন...। আমাদের দেশে তো একটা সাইকোলজি আছে। নেতাদের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা থাকে, একজন যদি বলে এক পা যাবে, অন্য জন লাফ দিয়া দুই পা যাবে।[৭]

জাসদের ঘোষিত ঘেরাও কর্মসূচি গ্রাম থেকে শুরু হয়ে জেলা পর্যায় পেরিয়ে ঢাকায় বাস্তবায়নের কথা। কিন্তু ১৭ মার্চ পল্টনের জনসভা শেষ হতে না হতেই মিছিল ছুটল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির দিকে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা সবাই জানতেন না গন্তব্য কোথায়। তাঁরা পঙ্গপালের মতো ছুটেছিলেন সামনে থাকা নেতা-কর্মীদের পিছু পিছু। মিছিল একপর্যায়ে গিয়ে থামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের গেটের সামনে। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। কেন এমন হলো? এ নিয়ে কথা বললাম সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে।

মহিউদ্দিন আহমদ : ১৭ মার্চ তো একটা কাট অফ পয়েন্ট। ১৭ মার্চের আগের ও পরের পার্টি তো এক না। জাসদের ১৭ মার্চের মুভটা—এটা কি আপনারা ওভার প্লে করেছিলেন?

সিরাজুল আলম খান : এখন মনে হয়, ওয়ান ফর্ম অব ওভার প্লে হয়ে গেছে। কিন্তু ১৭ মার্চ তো ডেটটা ছিল না। ১৭ মার্চের কাছে-কিনারেও ডেটটা ছিল না। ডেটটা ছিল আরও পরে।

মহি : গণ-অভ্যুত্থানের?

সিরাজ : হ্যাঁ। সেটা, ওই যে কাট অফ পয়েন্ট বললা, সেটাই হয়ে গেল।

মহি : ১৭ মার্চের পর যে আঘাতটা এল, এটা বোধ হয় আর...

সিরাজ : আঘাত—সঙ্গে সঙ্গে ফোর্সেসগুলো তো ডেভলপ করতে পারছে না, রাইজ করতে পারছে না।[৮]

## ৪

জাসদের মূল শক্তি তখন এর তরুণেরা—ছাত্রলীগ। এর সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমাকে বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের সিদ্ধান্ত দলের পক্ষ থেকেই নেওয়া হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার খোলামেলা আলোচনা হয়। পুরো বিষয়টি তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। বেরিয়ে আসে নেপথ্যের অজানা সব চাঞ্চল্যকর কাহিনি, যা অন্য নেতারা এড়িয়ে গেছেন, কিংবা চেপে গেছেন। কেউ কেউ মিথ্যে বলেছেন।

মহিউদ্দিন আহমদ : ১৭ মার্চ প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করুন।

মাহমুদুর রহমান মান্না : একটা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ছিল। তেহাত্তরে ছাত্রলীগের সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান ছিল। সেই লক্ষ্যে একটা প্রক্রিয়া ছিল, যাকে আমরা বলতাম সেন্ট্রাল ফোরাম। সেন্ট্রাল ফোরামে বিষয়টা আলোচনায় এল। তখন বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে স্টেডিয়ামের টিকিটঘরের ওখানে প্রায় প্রতিদিনই মিটিং হতো। মিটিং শেষে মিছিল করে ফিরে আসার সময় পেছন থেকে হোয়াইট ড্রেসে ডিবির লোকেরা দু-একজনকে ধরে নিয়ে যেত। পাবনার ডা. কাদরি ছিলেন এ রকম একজন। তাঁর কোনো ট্রেস পাওয়া যাচ্ছিল না। এসব নিয়ে ফোরামে কথাবার্তা হচ্ছে। বলা হলো, আমরা ভালো রকম একটা প্রটেস্ট করব। যেহেতু এটা সন্ত্রাসবিরোধী বিষয়, অতএব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসায় যাব আমরা। সেভাবেই ১৭ মার্চের কর্মসূচি নেওয়া হয়।

মাহমুদুর রহমান মান্না

বাহ্যত দেখলে এটা গণ-আন্দোলনের একটা ধরন। ইতিমধ্যে কিছু কিছু সশস্ত্র তৎপরতার প্রবণতা ছিল। তখন শেখ কামালের কথিত ব্যাংক ডাকাতির কথা বেশ প্রচারিত হয়েছিল। বিবিসিসহ বিভিন্ন রেডিওতে রিপোর্ট হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী-তনয় শেখ কামাল ব্যাংক ডাকাতি করে ফেরার পথে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন। বটতলায় একটা সাধারণ ছাত্রসভায় আমি এ প্রসঙ্গটি তুলেছিলাম। এতে শেখ কামাল খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং ঘোষণা দিয়েছিলেন যে যেখানেই পাবেন, সেখানেই উনি আমাকে মারবেন। মানে আহত করবেন, হাসপাতালে পাঠাবেন। আমার ডেটটা মনে নেই। মধুর ক্যানটিনে একদিন ঘেরাও করে তারা আমার মাথায় আঘাত করেছে। আমি পড়ে গেছি। হসপিটালে ছিলাম। কিন্তু এত বড় ঘটনা ঘটবে আর আমি হাসপাতালে থাকব, এটা আমার পছন্দ হয়নি। হাসপাতাল থেকে রিলিজ না নিয়ে আমি ওই প্রোগ্রামে গেছি।
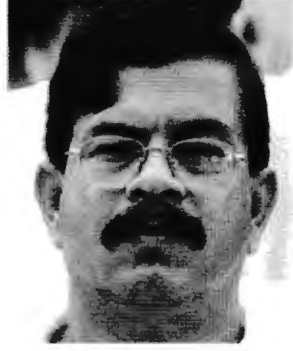
মহি : ঢাকা মেডিকেল থেকে?

মান্না : হ্যাঁ। আমার মাথায় তখন ব্যান্ডেজ ছিল না। পল্টনে যথারীতি বক্তৃতা হয়েছে। যা বলার সবই বলা হয়েছে। আমার মনে আছে, সবশেষে মেজর জলিল যখন বক্তৃতা করেন, তখন তিনি এই কর্মসূচিটা ঘোষণা করেছেন। বক্তৃতা করার সময় উনি খুবই উত্তেজিত ছিলেন। প্রায় ১০ ফুট উঁচু মঞ্চ থেকে তিনি লাফ দিয়ে নিচে নামেন।

মিছিল তো বেরিয়ে গেছে। মিছিলে কোনো কন্ট্রোল ছিল না। সামনের দিকে কে ছিল, দেখার উপায় নাই। অজস্র মানুষ। সেই মিছিলে আমি গেছি। একদম ফ্রন্টলাইনে না হলেও ফ্রন্টলাইনের কাছাকাছি ছিলাম। ওইখানে মনসুর আলীর বাসভবন কোনটা, আমরা বুঝতে পারছিলাম না। কেউ কেউ বলল, এটাই বাড়ি। এই সব বলতে বলতে। এর মধ্যে রক্ষীবাহিনীর ট্রাক এল। স্ট্রেট ফায়ারিং শুরু করল। অনেকেই তখন দৌড়ে পালাচ্ছে। আমি দৌড় দিয়ে মন্ত্রীপাড়ার মধ্যে কোনো একটা দেয়াল টপকে চলে গেছি। সরাসরি সাক্ষী হিসেবে এর বেশি আমি জানি না।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে ঘুরেফিরে আমরা প্রথমে ছাত্রলীগ অফিসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আ ফ ম মাহবুবুল হক এলেন। সেখানে আমরা ১০-১২ জন। খবর পেলাম জলিল ভাই-রব ভাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। ওখান থেকে আমরা মিছিল বের করেছি। নীলক্ষেতের রাস্তায় যখন ১০-১২ জন মিলে স্লোগান দিচ্ছি, 'জলিল-রবের কিছু হলে/ জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে', লোকজন ভয়ে দোকানপাট বন্ধ করতে শুরু করেছে। জাসদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল, দে ক্যান ফাইট ব্যাক। নেতারা যখন অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, তখন মানুষ ভয় তো পাবেই। নতুন করে কেউ আর মিছিলে যোগ দিল না।

মহি : এরপর আপনারা কী করলেন? মিছিল তো জমল না?

মান্না : কিছুক্ষণ পর আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ইউকসু অফিসে গেলাম। ওখানে আমাদের একটা কেন্দ্র ছিল। ওখানে কিছুক্ষণ বসার পর আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির মাঠে গিয়ে বসলাম। ওখানে সিরাজুল আলম খানও ছিলেন। এর মধ্যে খবর পেয়েছি হাসানুল হক ইনু অ্যারেস্ট হয়েছে। ওখানে আমরা যখন কথা বলছি, তখন হঠাৎ ইনু এসে হাজির। ইনু ভাইকে দেখে সিরাজ ভাই তো সাংঘাতিক উচ্ছ্বসিত—'ইনু চলে এসেছে, আমার আর কোনো কিছু লাগবে না।' সিরাজ ভাই তখন এতই প্রফুল্ল, মানে তাঁর চেহারার মধ্যে একটা উদ্ভাস-আনন্দ।

আমরা তো তখন মনমরা। এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে, জাফর মারা গেছে। শুনেছি আরও চার-পাঁচজন মারা গেছে। রব ভাইয়ের তো ফিটের ব্যারাম আছে। উনি নাকি চিৎকার করে রক্ষীবাহিনীকে বলছিলেন, 'স্টপ ফায়ারিং।' সব শুনে আমরা বিমর্ষ। সিরাজ ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কী মনে হয়, বলো।' আমরা সবাই আমাদের বিমর্ষতাই ব্যাখ্যা করছি। দুঃখের কথাই বলছি। সিরাজ ভাই বললেন, 'আমি তোমাদের কারও কথার সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি যে বাংলাদেশে প্রথম একটা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ঘটল।'

এ কথা শুনে আমরা চাঙা হয়ে গেলাম। সিরাজ ভাই তো আমাদের কাছে ডেমি-গড। আমরা ভাবছি, বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। আর উনি বলছেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। এত বড় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড করে ফেলেছি, বুঝতে পারিনি। এ জন্য লজ্জিত আমরা।

তারপর যেটা হলো, আমাদের সেন্ট্রাল ফোরাম বসল। কত দিন পরে মনে নেই। জাসদের ট্রেজারার ছিলেন কামরুল ইসলাম। তাঁর

বাসায়, ইস্কাটনের কাছে। সম্ভবত সেই মিটিংয়ে কর্নেল তাহেরও এসেছিলেন। ড. আখলাকুর রহমান ছিলেন। ওখানেই আমাদের একটা সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি করা হয়েছিল, আমরা যেটাকে সিওসি বলি। তখন মেম্বার ছিল ১৩ জন। সেখানেই এটা আলোচনা হলো যে গণ-আন্দোলনে ছেদ ঘটিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তর করতে হবে।

মহি : এটা ১৭ মার্চের কত দিন পরে?

মান্না : ঠিক মনে পড়ছে না। সম্ভবত মার্চ পার হয়ে গেছে অথবা মার্চের শেষের দিকে। সেখানে একটা বক্তব্য আসল—সংগঠন মানে সেনাবাহিনী, সংগ্রাম অর্থ যুদ্ধ। এটা নিয়ে পরে অনেক বিতর্ক হয়েছে। আমরা আগে গণ-আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান—মানে রাশিয়ান মডেলে বিপ্লব করতে হবে—এটাই বলতাম। এখন যে কথাটা বলা হচ্ছে, সেটা তো চীন বিপ্লবে মাও সে তুংয়ের বক্তব্য। তখন এই বিতর্ক হয়নি। পরে এটা এসেছে।

আমি ছাত্রলীগের সেক্রেটারি। আমাদের তো অনেক নেতা-কর্মী। কয়েকজন আমাকে বলেছে। আমি জানি না, এ কথা যদি ছাপা হয়, তারা এটা স্বীকার করবে কি না। দুজনের নাম বলব আমি, মুনির-হাসিব। খুব ক্যাটাগরিক্যালি তারা বলল যে ওই দিন রক্ষীবাহিনী গুলি করত না। কারণ, গুলিটা আগেই আমাদের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। আমি বিস্মিত হয়েছি। জিজ্ঞেস করেছি—কেমন করে? ওরা বলেছে, 'আপনি নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, ঢাকা থেকে তাদের ডিরেকশন দেওয়া হয়েছিল, আর্মস নিয়ে, আর্মড লোকজন নিয়ে আসতে। তারা হাসানুল হক ইনুর কমান্ডে ছিল এবং হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে এটা হয়েছে।' আমি তো দুজনের নাম বললাম। আমার ধারণা, আবুল হাসিব খান উইল বেইল মি আউট। স্বীকার করবে। বলবে না যে সে এ কথা বলেনি। এ ছাড়া জয়নাল বলে একজন ছিল, জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। থাকত বংশালের দিকে। সে আমাকে বলেছে, 'আমি তো নিজেই রাইফেল নিয়া আসছি। ইনু ভাই আমাকে বলছে।'

মহি : জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিল?

মান্না : হ্যাঁ। খুব ডেডিকেটেড কর্মী ছিল। পরে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক বছর ধরে আমেরিকার কোথাও আছে।

মহি : এখন তো আপনি এভাবে মূল্যায়ন করছেন। ওই সময় কি এটা নিয়ে কোনো আরগুমেন্ট করেছেন?

মান্না : তখন তো আরগুমেন্টের কোনো জায়গা ছিল না। আপনি আবুল হাসিব খানকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। সে বলেছিল, ‘আমি ইনু ভাইকে গুলি করতে দেখেছি।’

মহি : এ কথা সে আমাকেও বলেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে বলবে না। হয়তো কাউকে বিব্রত করতে চায় না।

মান্না : সামগ্রিক ঘটনা নিয়ে আমি লিখেছিলাম। একটা বুকলেটও বের করেছিলাম। জাসদের সেন্ট্রাল কমিটি এটা অনুমোদন করেছিল। পাবলিশও করেছিল। পরে সিরাজ ভাই জেল থেকে বেরিয়ে এলেন (১৯৮০ সালে), তখন এটা উইড্র করে নেওয়া হয়। এটা উনি ওউন করেন নাই। সেখানে আমি লিখেছিলাম, আমাদের নির্দেশে কী করে এটা করা হলো।

বাস্তব বিষয়টি হলো—এরপর থেকেই সংগঠন মানে সেনাবাহিনী আর সংগ্রাম মানে যুদ্ধ—এ লাইনে পুরো বিষয়টা তৈরি করা হয়েছে।[৯]

১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির সামনে গোলাগুলি প্রসঙ্গে হাসানুল হক ইনুর বক্তব্য অন্য রকম। প্রথম গুলি তিনি ছুড়েছেন বলে যে কথা উঠেছে, তিনি এটি অস্বীকার করেছেন। দৈনিক *প্রথম আলোর* মিজানুর রহমান খানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব বলেন :

প্রথম আলো : জাসদ সম্পর্কে মহিউদ্দিন আহমদের লেখা ‘প্রথমা’র বইটি পড়েছেন (*জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*)?

হাসানুল হক ইনু : (হাসি) মহিউদ্দিন জাসদপন্থী ছাত্রলীগের একজন কর্মী ছিলেন। তাঁর পঁচাত্তরের পরের অবস্থান আমি জানি না। তাঁর সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর বই লেখার অধিকার আছে। একটা মন্তব্য করব, এত বড় একটা বই লিখলেন, আমি জাসদের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কর্নেল তাহেরের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছি, দীর্ঘ পাঁচ বছর কারাগারে ছিলাম, পুনর্জাগরণে ভূমিকা রেখেছি, আমার সঙ্গে তিনি একবারও দেখা করেননি। আলোচনা করেননি। ওই বইটির আরেকটি সমালোচনা হলো, শোনা কথার ওপর বইটি লেখা।

প্রথম আলো : এই বই বলেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে আপনিই প্রথম গুলি ছুড়েছিলেন।

হাসানুল হক ইনু : মহিউদ্দিন ওখানে ছিল নাকি, ওখানে তো ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে কেউ অস্ত্র নিয়ে যায়নি। হাজার হাজার লোকের মিছিল গিয়েছে। বাহাত্তর সালে জাসদ করার পরে আমি

হাসানুল হক ইনু

প্রকাশ্যে কোথাও অস্ত্র নিয়ে কখনো নড়াচড়া করিনি। আমার এখন লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র আছে। সেই অস্ত্র কোনো দিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে কেউ দেখেনি। আমি রাজনীতির কর্মী, অস্ত্রবাজ নই।

আমি মাদারীপুরে ছিলাম। ১৭ মার্চের পল্টনে জনসভা শুরু হওয়ার পরে শেষ মুহূর্তে কোনোমতে জাসদ অফিসে ব্যাগ রেখে আমি জনসভায় ঢুকি। রব-জলিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি মিছিলে অংশ নিই এবং রব, জলিলসহ আমাদের ওপর যখন রক্ষীবাহিনীর গুলিবর্ষণ হয়, সেই রক্ষীবাহিনীর গুলিবর্ষণের প্রত্যক্ষদর্শী আমি। অল্পের জন্য রব, জলিলসহ আমি বেঁচে যাই। বরিশালের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা জাফরসহ অনেকেই নিহত হন। ওখান থেকেই রব-জলিল গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যান। আমি গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বেঁচে যাই। সুতরাং এই যে প্রথম গুলি ছোড়ার কথাটা বলল, (অথচ) সেখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ছিল। যদি এটা লেখা হয়, তাহলে এটা অপপ্রচার এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই বই লেখা হয়েছে।[১০]

## ৫

১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে জাসদের ঘেরাও অভিযান পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর হস্তক্ষেপে পণ্ড হয়ে যায়। যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি এটিকে তাঁর রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে দেখেছেন। এর দুই সপ্তাহ পর পয়লা এপ্রিল ১৯৭৪ শেখ মনির মালিকানাধীন ও তাঁর সম্পাদিত *বাংলার বাণী* পত্রিকায় আট কলামজুড়ে ব্যানার হেডলাইনে একটি প্রতিবেদন ছাপা হলো। এর শিরোনাম ছিল, 'দুশোরও বেশি কর্মী গ্রেফতার: হার্ডকোর সদস্যরা ধরা পড়েনি: জাসদ গুপ্ত সংগঠনে পরিণত হতে চলেছে।' প্রতিবেদনে বলা হয়:

> জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল একটি গুপ্ত সংগঠনে পরিণত হতে চলেছে। পুলিশ গত ১৭ মার্চ থেকে পনেরো দিন অভিযান চালিয়ে দেশের

> বিভিন্ন স্থান থেকে জাসদের প্রায় দুই শতাধিক কর্মীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু এই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দলটির হার্ডকোর সদস্যদের খুব কমই ধরা হয়েছে।
>
> জাসদসূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায়, জনাব সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটির ট্রটস্কিপন্থী কম্যুনিস্ট সদস্যদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। মেজর জলিলের সমর্থকদের এক বিরাট অংশ ধরা পড়েছে মাত্র।
>
> জানা যায়, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আবরণে দুটি রাজনৈতিক সংগঠন পাশাপাশি ও সমান্তরাল ধারায় কাজ করে যাচ্ছিল। একটি ধারার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান। বিক্ষিপ্তভাবে সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করে সরকারকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলার স্ট্রাটেজি নিয়ে এই গ্রুপটি কাজ করে। গ্রুপটি সম্প্রতি একটি গোপন বৈঠকে বসে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট লীগ নাম দিয়ে একটি গোপন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবছিলেন। এমনকি এই উদ্দেশ্যে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি হাইকমান্ড গঠন করা হয় বলে অসমর্থিত খবরে জানা যায়। জনাব সিরাজুল আলম খান কমান্ডের সভাপতি এবং জনাব আরেফ, জনাব মনিরুল ইসলাম, জনাব হাসানুল হক ইনু সভ্য ছিলেন। অপর ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। বিগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদের নির্বাচনের পর দলের এই গ্রুপটি সিদ্ধান্ত নেন, গোপন ক্যাডার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং দেশের বাস্তবতাকে নিজেদের স্বপক্ষে টেনে এনে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে হবে। এমনকি এদের একাংশ সম্পূর্ণ জাসদ দলটিকে একটি গুপ্ত সংগঠন হিসেবে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব রাখেন। তাদের এই নতুন রাজনৈতিক তৎপরতার স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের জন্য জনাব সিরাজুল আলম খান ভারতে যান। এক খবরে জানা যায় তিনি কলকাতায় সফররত ট্রটস্কিপন্থী পাকিস্তানের জনাব তারিক আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সাহায্য চান।[১১]

*বাংলার বাণীর* প্রতিবেদনের তথ্যগুলো একেবারে অমূলক ছিল না। জাসদ যে একটি বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করবে, এ ধরনের ঘোষণা দলের জন্মলগ্নেই দেওয়া হয়েছিল। জাসদ নেতারা বলতেন, একটি 'মূল শক্তি' অচিরেই গড়ে উঠবে, যার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। 'কমিউনিস্ট লীগ' নামটি বিবেচনায় ছিল। দলের আত্মগোপনে যাওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল ১৭ মার্চের ঘেরাও অভিযান। তবে এটা ঠিক, জাসদের

বাংলার বাণী

দু'শোরও বেশী কর্মী গ্রেফতার॥ হার্ডকোর সদস্যরা ধরা পড়েনি
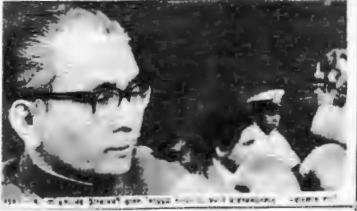
জাসদ গুপ্ত সংগঠনে পরিণত হতে চলেছে

জাসদকে নিয়ে *বাংলার বাণী*র ব্যানার হেডলাইন, ১ এপ্রিল ১৯৭৪

কেন্দ্রীয় কমিটিতে না থেকেও সিরাজুল আলম খান দলটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর প্রধান সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন কাজী আরেফ আহমদ, মনিরুল ইসলাম, শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও হাসানুল হক ইনু। তাঁরা এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও জাসদের কোনো কমিটিতে ছিলেন না। *বাংলার বাণী*র প্রতিবেদনে কলকাতায় ট্রটস্কিপন্থী নির্বাসিত পাকিস্তানি লেখক তারিক আলীর প্রসঙ্গটি কষ্টকল্পিত। কলকাতায় সিরাজুল আলম খানের যোগসূত্র ছিল দুটি। একটি হলো ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্য আওয়ামী লীগের নেতা চিত্তরঞ্জন সুতার। কলকাতায় সিরাজুল আলম খানের দ্বিতীয় সংযোগটি ছিল শিবদাস ঘোষের সঙ্গে। শিবদাস ঘোষ ছিলেন সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়ার (এসইউসিআই) সম্পাদক। অন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলো শিবদাস ঘোষকে ট্রটস্কিপন্থী মনে করত। তবে তিনি এটা বরাবর অস্বীকার করেছেন।

## ৬

মাহমুদুর রহমান মান্নার ভাষ্য অনুযায়ী, বিপ্লবী গণবাহিনীর একটি কাঠামো তৈরি হয় ১৯৭৪ সালেই। এ নিয়ে তিনি আমাকে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তা এখানে তুলে ধরা হলো :

মান্না : কামরুল ইসলাম ভাইয়ের বাসায়ই গণবাহিনীর একটা কাঠামোর কথা বলা হলো, যার কমান্ডার হলেন কর্নেল তাহের, ডেপুটি কমান্ডার হলেন হাসানুল হক ইনু।

মহি : সময়টা বলতে পারেন?

মান্না : কামরুল ভাইয়ের বাসায় এই মিটিংয়ে সিদ্ধান্তটা হলো, নাকি পরে কোনো একটা মিটিংয়ে হলো, এটা আমি স্মরণ করতে পারছি না। তখন আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে মিটিং করতাম।

মহি : এটা তো ১৯৭৪ সালেই?

মান্না : হ্যাঁ, চুয়াত্তর তো বটেই।

মহি : আমি পার্টি লিটারেচারে পেয়েছি, চুয়াত্তরের জুনের ২৭-২৮ তারিখের সভায় গণবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

মান্না : কামরুল ভাইয়ের বাসায় সিদ্ধান্ত হয়, এটা মনে আছে।

মহি : ওনার বাসা কোথায়?

মান্না : এখন যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ওই গলির মধ্যে। মিটিংয়ে কর্নেল তাহের ছিলেন।

মহি : অ্যানাউন্সমেন্টটা কে করলেন?

মান্না : সিরাজ ভাই বললেন। উনি তো আমাদের প্রিন্সিপাল ফিগার ছিলেন। সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে উনি থাকতেন।

মহি : ওই মিটিংয়ে আর কে কে ছিলেন?

মান্না : কাজী আরেফ আহমদ, মার্শাল মনি, আ ফ ম মাহবুবুল হক, মোহাম্মদ শাহজাহান, নূর আলম জিকু—এঁরা ছিলেন। রওশন জাহান সাথীও ছিলেন। সবার নাম মনে নেই।

মহি : মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ছিলেন?

মান্না : না। শেষমেশ এটাই হলো, আমিও আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম, গণবাহিনীর কাজে। একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি। ময়মনসিংহে গেছি। রাতে ছাড়া দিনে তো বেরোনো যাচ্ছে না। তারপরও কোনো কোনো সময় বেরোতে হয়। আমাকে দেখলেই লোকের ভিড় জমে যেত। একদিন সিরাজ ভাই বললেন, এসব কী হচ্ছে?

কী হচ্ছে মানে?

সবাই ছাত্রলীগ বাদ দিয়ে গণবাহিনীতে চলে যাচ্ছে? তুমিও নাকি গেছ?

আমাকে তো সিদ্ধান্ত দিয়েই পাঠানো হয়েছে।

না না, তুমি ছাত্রলীগ করো। তুমি আর কোথাও যেয়ো না। ছাত্রলীগ গোছাও।

কথাটা এ জন্য বললাম যে গণসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে, সিরাজ ভাই এটা মনে করতেন না। কিন্তু উনি যে আমাকে নির্দেশটা দিলেন—আমি যাকেই ডাকি, সে-ই তো গণবাহিনীতে ঢুকে গেছে। সবার এককথা—আরে, কী ছাত্রলীগ করব? পরে আমি তাঁকে এটা বলেছি। ঢাকা মহানগরের থানার যে কর্মী, সে-ও তখন ককটেল বানানো শিখছে। ওর তখন ছাত্রলীগ করার কোনো আগ্রহ নেই। এন্টায়ার অর্গানাইজেশন ওদিকে চলে গেছে। আমরাই আগে বলেছি, এ দেশে গেরিলাযুদ্ধের কোনো সুযোগ নেই। এটা হঠকারী। অথচ সেদিকেই গেলাম। এটার একটা এভিল করোলারি হিসেবে এসেছে ক্যু-বাদ।[১২]

বিপ্লবী গণবাহিনীর জন্ম কখন, এ নিয়ে দলের মধ্যে ভিন্নমত আছে। তিন দশক পর জাসদের একটি অংশ যখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যায়, তখন তাদের মধ্যে ইতিহাস বদলে ফেলার একটা প্রবণতা দেখা যায়। যখন গণবাহিনী তৈরি হয়, তখনো সংসদীয় রাজনীতি বহাল ছিল। কিন্তু জাসদের যাঁরা নতুন ইতিহাস লিখতে বসেছেন, তাঁদের বয়ান হলো, আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসন কায়েম করার পর গণবাহিনী তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে কথা হলো জাসদ নেতা শরীফ নুরুল আম্বিয়ার সঙ্গে।

মহি: সিরাজ ভাইকে বলেছিলাম, গণবাহিনী কেন করতে গেলেন? উনি বললেন, এটা ওনার সিদ্ধান্ত না।

আম্বিয়া: তখন তো গণবাহিনী করার বিকল্প কিছু ছিল না।

মহি: আমি তাঁকে বললাম, জাসদ যে পার্লামেন্টারি পলিটিকসটা করে, পিকিংপন্থী লাইনের বাইরে গিয়ে, সেখানে তো গণবাহিনীকে জাস্টিফাই করা যায় না।

আম্বিয়া: বাকশাল হয়ে যাওয়ার পরে তো গণবাহিনী?

মহি: বাকশাল তো হলো পঁচাত্তরের জানুয়ারির পর। গণবাহিনী তৈরি করা হবে, এ সিদ্ধান্ত তো হয়েছে চুয়াত্তরের জুনে।

আম্বিয়া: জুনে না।

মহি: এটা তো জাসদের লিটারেচারেই আছে?

আম্বিয়া: কোন লিটারেচারে আছে?

মহি: *সাম্যবাদ*-এ আছে, জুনের ২৭-২৮ তারিখ গণবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গণবাহিনী কেন দরকার, কী করা দরকার, এ বিষয়ে *সাম্যবাদ*-এর একটা সংখ্যা আছে। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় গণবাহিনীর কাজকর্ম তো শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আম্বিয়া: ডিস্ট্রিক্টে গণবাহিনী হয় নাই। সেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধ

হইছে। আওয়ামী লীগ যতটা করছে, আমরা তো অতটা করি নাই। অস্ত্রও ওদের বেশি, লোকও ওদের বেশি, বাহিনীও ওদের বেশি।

মহি : গণবাহিনী নামে হয়তো ফরমেশনে যায় নাই।

আম্বিয়া : ফরমেশন হইছে, কমান্ড স্ট্রাকচার হইছে ১৯৭৫ সালে। প্র্যাকটিক্যালি এটা মুভ করছে ইমার্জেন্সি হওয়ার পরে।

মহি : ইমার্জেন্সির পরে সিরাজ ভাই তো চলে গেলেন কলকাতায়। তাহলে তো উনি এই ডিসিশনের পার্ট না?

আম্বিয়া : না, এটা ঠিক না। ইমার্জেন্সি যখন হয়, আমরা সরকারের সঙ্গে যাব কি যাব না, এটা নিয়ে আমাদের একটা মিটিং হয় বাংলামোটরে, জাসদের ট্রেজারারের বাসায়। উনি কন্ট্রাক্টারি ব্যবসা করত। সিরাজ ভাই ওপেন মাইন্ডে ছিল, যাব কি যাব না। তখনকার পজিশন হইল—দল তো ডিভাইড হইয়া যাইত। অর্ধেক লোক জেলে। অন্যদের নামে কেস। এটা প্র্যাকটিক্যাল না। দল যেভাবে আওয়ামী লীগের মুখোমুখি হইয়া আছে বিভিন্ন জায়গায়, এটা তখন বাকশালে যাওয়ার অবস্থায় নাই। লাস্টলি ডিসিশন হইল, উই আর নট গোয়িং।

মহি : গণবাহিনীর ফরমেশনটা হলো কখন?

আম্বিয়া : সম্ভবত পঁচাত্তরের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে। আমরা তো এলাকা থেকে আসতে পারতেছি না। সিরাজ ভাই ফোন কইরা জানাইল—টুকু ভাই (কামরুজ্জামান টুকু) হইল কমান্ডার, আর আমি হইলাম পলিটিক্যাল কমিসার, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের।

মহি : সিরাজ ভাই তো তখন কলকাতায়?

আম্বিয়া : না, উনি ঢাকা থেকে কল করছেন। ফোন করে দায়িত্ব দিছেন। যখন ইমার্জেন্সি হয়, তখন আমি সাতক্ষীরায় বিভিন্ন ফোরামের যৌথ সভা করছি। সেই মিটিংয়ে আখলাক স্যার গেছিল। যেদিন ইমার্জেন্সি হয়, ওই দিনই আখলাক স্যার যশোর পৌঁছান। তার পরদিন আমাদের মিটিং। আখলাক স্যার বললেন, 'টিভি খোলো তো দেখি, শুনি।' তারপর বললেন, 'ব্যাটা মরল।'

১৭ মার্চের পর ওই লাইনে যাওয়া ছাড়া—মাস মুভমেন্ট ব্যাকড বাই আর্মস। দলের মধ্যে যারা অস্ত্র চালাচালি করে, তারাই দলকে টেকওভার করল।

আওয়ামী লীগ তো তখন জনবিচ্ছিন্ন। অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী নামিয়ে মপিং-আপ অপারেশন চলছিল। সেখানে আমাদের লোকজনও ধরা পড়ছিল। কিন্তু যুবলীগের লোকেরা ধরা

পড়ছিল অনেক। তাদের হাতে অস্ত্র পাওয়া গেছে এবং তাদের ভালো করে ধোলাই দেওয়া হইছে। ধোলাই ওরা বেশি খাইছে। আমরা খুব কম। আমাদের লোক কম। সোশ্যাল স্ট্যাটাসও কম। ওরা ভাবছে, এদের মাইরা-ধইরা লাভ নাই। মাইর ওরাই বেশি খাইছে। এইটা দেখে আওয়ামী লীগের প্রেশারে আর্মি উইড্র করা হয়। আমরা বরং অনেক ডিসিপ্লিনড ছিলাম। আমরা মানুষের ওপর অত্যাচার করি নাই। নড়াইলে গণবাহিনী হয় নাই। কিন্তু যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ঝিনেদা, মাগুরা—এসব অঞ্চলে সশস্ত্র প্রতিরোধ হইছে। রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে ফাইট হইছে চুয়াডাঙ্গায়। তখনো গণবাহিনী ফর্মড হয় নাই। দেশব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধ উইথ আ সেন্ট্রাল কমান্ড, এটা হইছে বাকশাল হওয়ার পর। জেলায় জেলায় যেটা হইছে, এটা আমাদের ফোর্স করছে বলে হইছে।

শরীফ নুরুল আম্বিয়া

তেহাত্তর সালে নূরে আলম সিদ্দিকীর বাহিনী রবিউল-রশিদরে মাইরা রাস্তায় ফালায়া দিল, বেলা সাড়ে চারটার সময়। আমি তখন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট। রবিউল আর রশিদ হইল ঝিনেদা ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারি আর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। তখন ঝিনেদার পলিটিকস নূরে আলম সিদ্দিকীর কন্ট্রোলে। মসিউরের বাহিনী দিয়া করাইছে। আওয়ামী লীগ আমাদের কোন জায়গায় নিয়া গেছে, চিন্তা করা যায় না।

চিটাগাংয়ে গণবাহিনী হয় নাই। নোয়াখালীতে লেট ডেভেলপমেন্ট হইছে। সিলেটে কিছু হয় নাই।

আওয়ামী লীগের বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিভিন্ন জায়গায় গণবাহিনী হইছে। গণবাহিনী হইল একটা প্রতিক্রিয়া। আওয়ামী লীগ যদি জাসদকে গর্তে ফালাইতে না চাইত—শেখ সাহেব বা তাঁর পক্ষে যারা প্ল্যান করে, তারা একটা গ্রস প্ল্যানিং করছে। সিরাজুল আলম খানের তো কোনো আন্তর্জাতিক কানেকশন নাই। শেখ সাহেব জানে। একমাত্র ইন্ডিয়ান কানেকশন। পরে তারাও পিছায়া গেছে। প্রথমে

তারা চাইছিল দুইটা এক বাস্কেটে না, দুই বাস্কেটে থাকুক। পরে শেখ সাহেব প্রেশার-ট্রেশার দিয়া বা অন্য কোনোভাবেই হোক, মেন্যুভার কইরা এইটা কাইটা দিছে।

মহি : জাসদের ফরমেশনে ইন্ডিয়ার ভূমিকার কথা বলছেন?

আম্বিয়া : এটা আমার ধারণা। ওই লেভেলে তো তখন আমার প্রেজেন্স নাই। পরে তারা সইরা গেছে। সিরাজ ভাই আমারে একটা কথা কয়—নেভার ট্রাস্ট ইন্ডিয়ানস অ্যান্ড আওয়ামী লীগ। তার মানে শেখ সাহেবের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। সেটা উনি রাখেন নাই। ইন্ডিয়াও কথা রাখে নাই।

মহি : তার মানে, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সিরাজ ভাইয়ের কথা হয়েছিল?

আম্বিয়া : ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা তো ছিলই। ওরা তো নিয়মিতই, যখনই ফিল করত, *গণকণ্ঠ* অফিসে বসত। কিন্তু তাদের সঙ্গে কন্টিনিউ করে নাই। অথবা সিরাজ ভাইকে তারা ম্যানেজ করতে পারে নাই। উনি তো তখন একটা ফিগার। শেখ সাহেব আর তাজউদ্দীনের পরে তো তিন নম্বরেই উনি। এটা আমার বিবেচনায়।

মওলানা ভাসানীকে শেখ সাহেব ম্যানেজ করছে, অথবা মওলানা নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শেখ সাহেবকে বলছে, আন্দোলন করব, সব করব, কিন্তু তোমাকে ডিস্টার্ব করব না। অ্যান্ড হি উইল ম্যানেজ চায়না। মওলানা যদি চায়নাকে ম্যানেজ করে আর শেখ সাহেবকে ডিস্টার্ব না করে, তাহলে সিরাজুল আলম খানের আর কোনো জায়গা আছে?

১৭ মার্চের ঘটনাতেই আমরা ওই ফাঁদে পইড়া গেছি। সেখান থেকে রিকভার করার জন্য...হ্যাঁ, গণবাহিনী করার প্রশ্নে আমিও মত দিছি। কারণ, এ ছাড়া আর পথ ছিল না। আমি ১৭ মার্চের বিরোধিতা করছি। কিন্তু তখন মনে হইছে, গণবাহিনীই ছিল বাঁচার একটা রাস্তা।[১৩]

## ৭

বাংলাদেশে প্রথাগত কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনগুলো বেশির ভাগই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) থেকে জন্ম নেওয়া। সিপিআই

ভাঙলে এ দেশেও একই ধারায় দল ভাঙে। প্রায় সব কটি দল-উপদলে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের তত্ত্ব নিয়ে মোটামুটি ঐকমত্য ছিল। যেমন কৃষিব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়নি। এটি আগে সম্পন্ন করতে হবে। কীভাবে সম্পন্ন হবে, এ নিয়ে মস্কো ও পিকিং বর্গের দলগুলোর মধ্যে মতভেদ সুস্পষ্ট। পিকিংপন্থীরা মনে করেন, বিপ্লবের স্তর হলো গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত করতে হবে। তারপরে সমাজতন্ত্র। মস্কোপন্থীরা বলছেন অধনবাদী বিকাশের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। বিতর্কের বিষয় ছিল 'মোড অব প্রোডাকশন'। জাসদ এই বিতর্কে হাজির করল নতুন তত্ত্ব।

অধ্যাপক আখলাকুর রহমান তত দিনে জাসদের প্রধান তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। তিনি ও সিরাজুল আলম খান নেতা-কর্মীদের জন্য সমাজতন্ত্রের ক্লাস নেন। বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত জাসদ অফিসের দোতলায় এই ক্লাস চলে। অংশগ্রহণকারীরা বেশির ভাগই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী। একপর্যায়ে আখলাকুর রহমান দলের তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করালেন একটি পুস্তিকার মাধ্যমে, *বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ*। বইটির কাঠামোবিন্যাস লেনিনের লেখা *রাশিয়ার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ* গ্রন্থের আদলে। আখলাকুর রহমানের বিশ্লেষণের চুম্বক অংশটি হলো :

> মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে সর্বজনীন পণ্যোৎপাদনই ধনবাদী উৎপাদনব্যবস্থার প্রধান ও প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।
>
> বাংলাদেশের কৃষিতে মজুরি-শ্রমের আবির্ভাব ও নিযুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধনতন্ত্র হচ্ছে পণ্যোৎপাদনের সেই স্তর, যেখানে শ্রম পণ্যে রূপান্তরিত হয়। তাই বাংলাদেশের কৃষিতে মজুরি-শ্রমের ব্যবহার কৃষি বিকাশের বৈশিষ্ট্যকেই শুধু ধনতান্ত্রিক করে না, ধনতন্ত্রের বিকাশের পথও প্রশস্ত করে।
>
> এখানে আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে মজুরি-শ্রম ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে; ধনতন্ত্রের ত্বরান্বিত বিকাশ ও উন্নয়ন জনসংখ্যার অধিকাংশকে মজুরি-শ্রমিকে পরিণত করে; কিন্তু বিকাশের কোনো স্তরেই ধনতন্ত্র মজুরি-শ্রমের পূর্ণ বিনিযুক্তি প্রদান করতে পারে না। তা সম্ভব কেবল নির্ভেজাল সমাজতন্ত্রে।[১৪]

আখলাকুর রহমানের বইটি ছাপা হয়েছিল ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি। জাসদ-সমর্থিত জাতীয় শ্রমিক জোটের নেতা মেসবাউদ্দীন আহমেদের সম্পাদনায় *সমীক্ষণ*-এর আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) সংখ্যায় এটি আবারও ছাপা হয়। একই সময় চলছিল জাসদের 'বিপ্লবী পার্টি'

তৈরির প্রক্রিয়া। মডেলটি এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর প্রথাগত মডেল থেকে নেওয়া। এই মডেল অনুযায়ী মূল সংগঠন হলো একটি কমিউনিস্ট পার্টি, যার নেতৃত্বে বিপ্লব হবে। সমাজে নানা পেশা-শ্রেণির স্বার্থ নিয়ে কাজ করবে এই পার্টির অঙ্গসংগঠনগুলো, যা চলতি ধারায় 'গণসংগঠন' বলা হতো। জাসদের ক্ষেত্রে বিষয়টা হলো একটু উল্টো। প্রথমে হলো ছাত্রসংগঠন, তারপরে জাসদ, তারপর শুরু হলো বিপ্লবী পার্টি গড়ার প্রক্রিয়া। একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে ওঠে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর। কী সেই ভিত্তি, কী তার ব্যাখ্যা—এ নিয়ে চলছিল আলোচনা এবং একটি থিসিস তৈরির চেষ্টা।

মস্কো ও পিকিংপন্থী দলগুলোর বিপরীতে একটি আলাদা রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করার জন্য তত্ত্বের তালাশ করতে গিয়ে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়ার (এসইউসিআই) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য মনে হলো। ব্যাখ্যাটি পাওয়া গেল এসইউসিআইয়ের নেতা শিবদাস ঘোষের কাছে। চীনা ধারার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব যে এ দেশে অচল, এ প্রসঙ্গে শিবদাস ঘোষের বক্তব্য হলো :

> মাও সে তুংয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রাক্‌বিপ্লব চীনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল আধা ঔপনিবেশিক-আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং তার চরিত্র ছিল প্রি-ক্যাপিটালিস্ট ডিসেন্ট্রালাইজড মেডিয়াভ্যাল নেচারের। অর্থাৎ চীন ছিল প্রাক্-পুঁজিবাদী বিকেন্দ্রীভূত মধ্যযুগীয় চরিত্রের রাষ্ট্র। উপরন্তু, গোটা চীনে অখণ্ড সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না। সমগ্র চীন দেশটা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রভাবিত অঞ্চল হিসেবে আলাদা আলাদা টুকরোতে বিভক্ত ছিল এবং এই সশস্ত্র অঞ্চলগুলো আলাদা আলাদাভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার কতগুলো ওয়ারলর্ডদের দ্বারা শাসিত হতো।...ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনব্যবস্থার সাথে কি এর কোনো মিল আছে? বরং ভারতবর্ষে যেকোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ন্যায় একটি অত্যন্ত সুসংহত কেন্দ্রীভূত আধুনিক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমান এবং অত্যন্ত আধুনিক সুসংহত কেন্দ্রীভূত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতোই এখানে একটি অত্যন্ত সুসংহত জাতীয় সেনাবাহিনী এবং একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টের অস্তিত্ব বর্তমান আছে, যার সাথে প্রাক্‌বিপ্লব চীনের কোনো মিল নেই। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, না রাষ্ট্রের চরিত্রে, না জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির গঠনে বা প্রকৃতিতে, না গ্রামীণ অর্থনীতির চরিত্রে এবং মূল শ্রেণিদ্বন্দ্বে শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে, কোনো দিক থেকেই আমাদের দেশের বিপ্লবের তত্ত্ব চীনের বিপ্লবের তত্ত্বের সাথে এক হতে পারে না।[১৫]


www.amarboi.com

শিবদাস ঘোষ চীনের মতো এ দেশের গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা তৈরি করে শহর দখল করার কৌশলটিকে ভুল বলেছেন। তাঁর মতে, চীনপন্থীরা গেরিলাযুদ্ধের নীতির সঙ্গে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' তত্ত্বকে এক করে ফেলেছেন। তাঁর মন্তব্য হলো :

জাসদের পাঠচক্রে সমাজতন্ত্রের পাঠ দিতেন অধ্যাপক আখলাকুর রহমান

> জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হোক অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোক—লড়াইটা যে দেশেই শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেবে, সেই দেশেই গেরিলাযুদ্ধের নীতি ও সংগ্রামকৌশল সেই দেশের বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া প্রতিটি দেশের নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য যেখানেই বিপ্লবী শ্রেণি শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে এই গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করবেন, তাঁরাই গেরিলাযুদ্ধের তত্ত্বে ও কৌশলে কিছু না কিছু সংযোজন ঘটাতে বাধ্য হবেন। তা না হলে তাঁরাও গেরিলাযুদ্ধকে কেবল 'কপি' করে চালাতে পারবেন না। ফলে আপনারা বুঝতে পারছেন, গেরিলাযুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে শহর দখল করার সংগ্রামকৌশল এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব গ্রহণের, যা নকশালপন্থীরা এক করে ফেলেছেন, তার কোনো সম্পর্ক নেই।[১৬]

বিপ্লবী পার্টি গড়ার একপর্যায়ে লেখা হলো *খসড়া থিসিস*। ১৯৭৪ সালের ২৭ জুন 'সমভাবাপন্ন একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর দীর্ঘ গবেষণা, আলোচনা ও সমবেত প্রচেষ্টা'র ভিত্তিতে 'শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা' করার উদ্দেশ্যে এটি প্রথমবার উপস্থাপন করা হয় ১৯৭৪ সালের ২৭ জুন। এটি লিখেছিলেন আখলাকুর রহমান। খসড়া থিসিসের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক হয়, যা উঠে এসেছে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর দেওয়া সাক্ষাৎকারে :

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী : 'পটভূমি' নামে একটা থিসিস বের

করেছিলাম। আখলাকুর রহমান যেটা লিখেছিলেন। সেটা ভুল। ভুল মানে, বিপ্লব-টিপ্লব সম্পর্কে আখলাকুর রহমানের সঠিক ধারণা নেই।

মহিউদ্দিন আহমদ: খসড়া থিসিস যেটা প্রথমে সার্কুলেট করা হয়েছিল?

হায়দার: হ্যাঁ। উনি বলতেন, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাঝখানে আরেকটা বিপ্লব আছে। বাংলাদেশে সেই বিপ্লব হবে। আমি বললাম, না। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো, যে দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়নি, বুর্জোয়ারাই যেটা করতে পারত, সেটা সর্বহারা শ্রেণি করছে। তখন এটা হয়ে গেল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এটা অন্তর্বর্তীকালীন কোনো বিপ্লব না। আখলাকুর রহমান ট্রটস্কিবাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মানে সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন ছাড়া অন্য কোনো রেভল্যুশনে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না।

মহি: কিন্তু এটা তো এসইউসিআইয়ের লাইন ছিল?

হায়দার: এসইউসিআই যে ট্রটস্কিবাদী না, এর অনেক প্রমাণ আছে।

মহি: আমি ট্রটস্কিবাদীদের কথা বলছি না। আমি বলছি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব...।

হায়দার: লেনিনের মত অনুযায়ী কৃষিভিত্তিক সমাজ হওয়া সত্ত্বেও 'এপ্রিল থিসিস'-এ লেনিন বললেন—জার রোমানভের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় বসল, যেটা হলো ফেব্রুয়ারি বিপ্লব। এখন যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতে, ফিউডাল ল্যান্ডলর্ডদের প্রতিনিধি জার রোমানভের হাতে না, ফলে বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভল্যুশনের ওই পর্যায় পার হয়ে গেছে। এখন বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। এ জন্যই এটা হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এপ্রিল থিসিসের এই কথা রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অনেকেই প্রথমে বুঝতে পারেননি।

লেনিন বললেন, কোন শ্রেণি বা শ্রেণিগুলো কোন শ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করবে, সেটাই হচ্ছে প্রতিটি বিপ্লবের মূল প্রশ্ন। লেনিনের এই তত্ত্ব যে একটা পশ্চাৎপদ দেশেও প্রয়োগ হতে পারে...কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে বলেই দিয়েছিলেন, 'ওখানে গিয়ে যা দেখবে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কিছু উপাদান, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্ট্রাগল থাকবে। কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতায় বুর্জোয়ারা এসেছে, তখন তাকে উচ্ছেদ করতে গেলেই সমাজতান্ত্রিক

খসড়া থিসিসের প্রচ্ছদ

বিপ্লব করতে হবে। কারণ, বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল।

তো এর ওপর যে 'পটভূমি' লিখেছিলাম, সেখানে বলেছিলাম, বিপ্লব একটা পলিটিক্যাল পার্টিই শুধু করে না। বিপ্লব করে জনগণ। জনগণকে সুসংগঠিত হতে হবে। বিকল্প রাষ্ট্রশক্তি তৈরি করতে হবে। লড়াই করতে করতে পিপলস পলিটিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপ করবে। এই পাওয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে, নেতৃত্ব দেবে পার্টি। কোনো সময় একটা পার্টি একা বিপ্লব করে না। বিপ্লব জনগণ করবে।[১৭]

পরে পরিমার্জিত আকারে খসড়া থিসিস ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অনুমোদন করা হয়। ১৯৭৪ সালের খসড়া থিসিসে বর্তমান রাজনৈতিক লাইন 'মূলত অভ্রান্ত' দাবি করা হয়েছিল।[১৮] খসড়া থিসিসে বাংলাদেশকে একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বা জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে শেখ মুজিবুর রহমান এবং শাসক দল সম্পর্কে বলা হয় :

> শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি, যারা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের দ্বারা অবদমিত ছিল, তাদেরই স্বার্থের প্রতিভূ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই শেখ মুজিব স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শক্তিগুলিকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গড়ে তোলার পরিবর্তে কেবলমাত্র তাঁর দল আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে সকলের সম্মিলিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত ফল আত্মসাৎ করেন এবং জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করেন। পরবর্তীকালে কারচুপি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে পুঁজিবাদের স্বার্থে তিনি

> বাংলাদেশে বাস্তবে একটি একদলীয় স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করেন। তারপর থেকেই শুরু হয় আওয়ামী লীগ সরকারের গণবিরোধী স্বৈরাচারী শাসনের দেশ ও জাতি বিধ্বংসকারী ইতিহাস।[১৯]

খসড়া থিসিসে 'রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়া শ্রেণিকে উচ্ছেদ এবং তার পরিবর্তে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা' প্রবর্তনের কথা বলা হয়। এ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পৌঁছানোর জন্য 'বাংলাদেশের মতো একটি পশ্চাৎপদ দেশে অতি সন্তর্পণে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অনেকগুলি মধ্যবর্তী স্তরকে অতিক্রম করে' এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কর্মসূচিগুলোকে 'ডেরিভেটিভ' কর্মসূচি হিসেবে সম্পূর্ণ করার আহ্বান জানানো হয়।[২০]

৮

জাসদ গোপনে সামরিক সংগঠন তৈরি করেছিল আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। এ ব্যাপারে দলটির রাখঢাক ছিল না। দলের প্রকাশিত একটি দলিলে বলা হয়, 'শেখ মুজিবের নির্যাতন, গেস্টাপো বাহিনী ও রক্ষীবাহিনী ইত্যাদির মোকাবিলার জন্য এবং যেকোনো প্রকার বিদেশি শক্তির হামলা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, শ্রমিক এলাকায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমবায়ে গড়ে ওঠে "বিপ্লবী গণবাহিনী"। শুধু সেখানেই শেষ না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিপাহিদের মধ্যেও অতি গোপনে ও সতর্কতার সঙ্গে সাংগঠনিক কাজ চালানো হয়। ধীরে ধীরে প্রতিটি সেনানিবাসে গড়ে ওঠে স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের মধ্যে "বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা"। সিপাহিরা তো সাধারণ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তেরই সন্তান।'[২১]

জাসদের মধ্য দিয়ে যে গণবাহিনী তৈরি হয়েছিল, তার কমান্ড-কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন হাসানুল হক ইনু। গণবাহিনী গঠনের সময় ও যৌক্তিকতা নিয়ে সাপ্তাহিক *সমীক্ষণ*কে তিনি যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> প্রশ্ন : ১৯৭৪ সালে আপনাদের গঠিত গণবাহিনী তো একটা সশস্ত্র সংগঠন? এবং '৭৪ সালের শেষের দিকে একে মূল সংগঠন বলা হয়েছে?
>
> উত্তর : এ রকম কোনো দলিল নেই। '৭৪-এর শেষের দিকে জরুরি আইন যখন ঘোষণা হয়ে যায়, বাকশালের একদলীয় শাসন

যখন কায়েম হয়, সকল দলের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং বিরোধী নেতা-কর্মীদের বা কোনো বিরোধী পক্ষকে অস্ত্রের মাধ্যমে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে যে দমন করার নীতি সরকার গ্রহণ করে, তখন আত্মরক্ষার খাতিরে যে সশস্ত্র সংগ্রাম সারা দেশে গড়ে ওঠে—সেটাকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিপ্লবী গণবাহিনী গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন : কিন্তু একদলীয় শাসন কায়েমের আগেই তো গণবাহিনী গড়ে ওঠে—'৭৪-এর মাঝামাঝি থেকে গণবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়।

উত্তর : '৭৪-এর মাঝামাঝি গণবাহিনীর নামে কোনো তৎপরতা ছিল না। জাসদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা আত্মরক্ষার জন্য কিছু কিছু সশস্ত্র সংগঠন—যে সশস্ত্র প্রতিরোধ চলছিল চারদিকে—তাকে একটা সংগঠিত রূপ দেয়। বিপ্লবী গণবাহিনী একটা স্বাধীন সংগঠন, যাকে জাসদ সমর্থন দিয়েছিল।[২২]

বিপ্লবী পার্টির একটি কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছিল। ১৯৭৩ সাল থেকেই কাজ করছিল একটি সমন্বয় কমিটি। ১৯৭৪ সালে ১৭ মার্চের পর পার্টি গঠন প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়। চুয়াত্তরের ২৭-২৮ জুন এক সভায় গৃহীত হয় খসড়া থিসিস। একই সঙ্গে সমন্বয় কমিটিকে আরও বিস্তৃত করা হয়। কমিটির অন্যতম সদস্য খায়ের এজাজ মাসুদ এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন :

আমি তো ছাত্রলীগ ঘরানার মধ্যে ছিলাম না। নোয়াখালী জিলা স্কুলে পড়ার সময় ওখানে ছাত্রলীগের একটি কমিটি করা হয়েছিল। আমি ছিলাম তার আহ্বায়ক। ব্যস, ওই পর্যন্তই। ১৯৭৩ সালে আমি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক হই। আগে থেকেই আমার চিন্তাভাবনায় ছিল ইসলামিক সোশ্যালিজম। আবু জর গিফারি ছিলেন আমার আইডল। এখানে পেলাম সিরাজুল আলম খানকে।

মগবাজারে এক জাহাজ ব্যবসায়ীর বাড়ির ছাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় গঠন করা হয় সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি। সংক্ষেপে এর নাম হলো সিওসি। এটা হলো বিপ্লবী পার্টির ভ্রূণ। ২১ সদস্যের কমিটিতে ক্রম অনুযায়ী নামগুলো হলো : ১. সিরাজুল আলম খান, ২. আখলাকুর রহমান, ৩. মোহাম্মদ শাহজাহান, ৪. হারুনুর রশিদ, ৫. হাসানুল হক ইনু, ৬. মনিরুল ইসলাম (মার্শাল), ৭. খায়ের এজাজ মাসুদ, ৮. মেজর এম এ জলিল, ৯. আ স ম আবদুর রব, ১০. কাজী

আরেফ আহমদ, ১১. শরীফ নুরুল আম্বিয়া, ১২. আ ফ ম মাহবুবুল হক, ১৩. শাজাহান সিরাজ, ১৪. এ বি এম শাহজাহান, ১৫. খন্দকার আবদুল বাতেন, ১৬. মির্জা সুলতান রাজা, ১৭. কামরুজ্জামান টুকু, ১৮. আবদুল মালেক শহিদুল্লাহ, ১৯. আবদুল্লাহ সরকার, ২০. মুস্তাফিজুর রহমান মুকুল ও ২১. মাহমুদুর রহমান মান্না। এর আহ্বায়ক হলেন সিরাজুল আলম খান। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কারাবন্দী।

সিওসির প্রথম সাতজনকে নিয়ে তৈরি হলো স্ট্যান্ডিং কমিটি। প্রথম চারজনকে নিয়ে হলো ইমার্জেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি। আমি ইমার্জেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির বিকল্প সদস্য হিসেবে থাকলাম। সিদ্ধান্ত হলো বিপ্লবী গণবাহিনী তৈরির। গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিসার হলেন মোহাম্মদ শাহজাহান। লে. কর্নেল আবু তাহেরকে ফিল্ড কমান্ডার এবং হাসানুল হক ইনুকে সেকেন্ড ইন কমান্ড (টুআইসি) করা হয়। পার্টির সদস্যদের জন্য *সাম্যবাদ* নামে একটি পুস্তিকা বের হতো। এটাই ছিল পার্টির মুখপত্র।[২৩]

গণবাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে জাসদ নেতাদের অধিকাংশের মন্তব্য প্রায় একই রকম। *প্রথম আলোর* মিজানুর রহমান খানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গণবাহিনী ডেপুটি কমান্ডার হাসানুল হক ইনু বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

প্রথম আলো : তিয়াত্তরে আপনারা সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল (তিন সাংসদ নিয়ে) ছিলেন। সেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক অবস্থায় সরকারি চাকরিজীবী কর্নেল তাহেরকে প্রধান এবং আপনাকে ডেপুটি কমান্ডার করে কী করে সশস্ত্র সংগঠন গণবাহিনী গঠন করতে পেরেছিলেন? এই স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যা কী?

হাসানুল হক ইনু : আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমাদের তত্ত্বটা ছিল এ রকম, একটি সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে। সেখানে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কৌশলগতভাবে কাজে লাগাতে হবে।

প্রথম আলো : তার মানে আপনারা বঙ্গবন্ধুর সরকারের উৎখাত চেয়েছিলেন?

হাসানুল হক ইনু : আমরা যখন তত্ত্ব দিই, আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আর্থসামাজিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়ে একটা বিপ্লবী সরকার কায়েম করতে চাই। এ রকম লক্ষ্য নিয়ে পৃথিবীর অনেক মার্ক্সবাদী দল

কাজ করে থাকে। সেই হিসেবে আমরা বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরোধিতা করেছিলাম। কারণ, দেশ সমাজতান্ত্রিক পথে সঠিকভাবে যাচ্ছে না।

প্রথম আলো: আজ কি মনে হয় (বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে) গণবাহিনী করাটা ভুল ছিল?

হাসানুল হক ইনু: গণবাহিনীর জন্মটা হয়েছিল যখন বঙ্গবন্ধুর সরকার একদলীয় সরকারে চলে যায় এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে...

প্রথম আলো: না, আপনার এ কথা ঠিক নয়। কারণ, বাকশাল হলো পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে, আর গণবাহিনী করলেন '৭৪ সালের জুনে।

হাসানুল হক ইনু: বাকশালের আগে জরুরি আইন জারি হয় এবং আমাদের সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বাকশাল হলে তাতে জাসদ অংশ নেয় না, জাসদ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন আত্মরক্ষার জন্য গণবাহিনীর একটি তৎপরতা শুরু হয়। গণবাহিনী জাসদের অঙ্গসংগঠন নয়, এটা এলাকাভিত্তিক আত্মরক্ষার জন্য কাজ করেছে। আমি মনে করি, তৎকালীন পরিস্থিতিতে সেই সিদ্ধান্ত সঠিকই ছিল।[২৪]

গণবাহিনী গঠন সম্পর্কে সিরাজুল আলম খান ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ নামে একটি বাহিনী তৈরির ব্যাপারে তখন সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি দাবি করেন, এটি গড়ে উঠেছিল তাঁর অজান্তে। আমার সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ আলাপে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর দায়দায়িত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। আমাদের কথোপকথন ছিল এ রকম:

সিরাজুল আলম খান: গ্রামের লোক তখনো অনেক বেটার। বগুড়া পুরোটাই জাসদের, ইনক্লুডিং একটা স্টেশনমাস্টার। রক্ষীবাহিনী আসবে। ওরা তো আসবে ট্রেনে করে। হেঁটে তো আসবে না ১০-২০ মাইল। তাহলে স্টেশনমাস্টার জানবে, কীভাবে সিগন্যাল দেবে আমাদের, যাতে আমরা পালাতে পারি। ওরা লাইট দিয়ে সিগন্যাল দেয় না রাতে? কী রকম মজবুত সংগঠন ছিল?

বিপদটা হয়ে গেল, যখন গণবাহিনী হলো। গণবাহিনী তো প্রথমে ছিল না। এটার নাম ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। পরে চারজনকে চারটা জোন করে দেওয়া হলো। আম্বিয়া হলো খুলনা-যশোর, মনি হলো নর্থ বেঙ্গল। ওখানে সে একাত্তরে আমার সঙ্গে ছিল। এদিকে হলো আরেফ, আর ইনু মনে হয় ঢাকাসহ সিলেট। উইদাউট মাই নলেজ...। এগুলো হলো খারাপ।

মহিউদ্দিন আহমদ : গণবাহিনীর ব্যাপারটা বলুন।

সিরাজ : যারা ভিলেজ ওয়ার্কার্স, মার্জিনাল কৃষক, এদেরকে সাহায্য করা। এরা তো গভমেন্ট থেকে কোনো হেল্প পেত না। তখন সিদ্ধান্ত হলো যে মেলামেশা করার জন্য—যেটা ভিয়েতনামিজরা করেছে। এটাও আমার মাথায় ছিল। একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে আমরা পিপলের সঙ্গে মিলে যেতে পারব। ভোটের জন্যও কাজে লাগবে, ডেভেলপমেন্টের জন্যও কাজে লাগবে। এটাই হলো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য।

যখন দেখা গেল যে গভমেন্টের ডিসিশন অনুযায়ী শেখ সাহেব থাকতেই, জাসদকে যদি নাজেহাল করা না যায়, তাহলে সরকার চালানো এককথা—দল তো গড়ে উঠবে না। দে ডিসাইডেড যে জাসদকে ধরো। এটা করতে গিয়েই—রেসিস্ট্যান্সের প্রশ্নেই হোক বা পাল্টা আক্রমণের প্রশ্নেই হোক, ছোট ছোট জায়গায় এরা রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে আর্মস কনফ্লিক্টে গেল। করতে যেয়েই, অল দিজ থিংস ওয়ার নট ইন মাই নলেজ—নলেজ ইন দ্য সেন্স, ইট ওয়াজ নট পার্ট অব ডিসিশন, এটা হয়ে গেল গণবাহিনী, উইথ আর্মস। উইথ আর্মস তো সারা বাংলাদেশে ছিল না ছিল কুষ্টিয়াতে, বগুড়াতে, কিছুটা রংপুরে। এগুলোই প্রধান। সিলেটে ছিল না, নোয়াখালীতে ছিল না। জোর করে আর্মস ব্যবহার করতে গিয়ে গরিব মানুষদের হিট করা হয়েছে। এ রকম একটা ফর্মে চলে গেছে, উইদাউট মাই নলেজ, দ্যাট ওয়াজ আ ডিজাস্টার।

পরে যখন গণবাহিনীর অ্যাকটিভিটিজ বন্ধ করা হলো, সাসপেন্ড করা হলো, তখন অলরেডি ব্যাড নেম, যেটা পাওয়ার, সেটা হয়ে গেছে। আর কন্ট্রোলে না থাকলে যা হয়, সেটা ঘটে গেছে।

মহি : কিন্তু লিটারেচারে, যেমন *সাম্যবাদ*—যেখানে গণবাহিনীকে জাস্টিফাই করা, এসব কে ড্রাফট করত?

সিরাজ : এগুলো আমার হাত দিয়ে যেত না।

মহি : কে করত এসব?

সিরাজ : একজাক্ট বলতে পারব না। চিন্তা করে বলতে হবে। *সাম্যবাদ*—তাই না?

মহি : হ্যাঁ।

সিরাজ : এ নিয়ে একদিন কথা হয়েছিল, যখন আমরা সিওসিতে বসলাম। এগুলো আসছে কীভাবে? বলা হলো, এগুলো পরে আর আসবে না, যাবে না ইত্যাদি।

মাসুদের হাত দিয়ে গেছে—আই ডোন্ট থিংক। মাসুদ আমাকে না বলে ড্রাফট করবে? যা-ই হোক, সেগুলোতে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আমি শুধু সংগঠনের পয়েন্ট অব ভিউতে না, পলিটিক্যাল পয়েন্ট অব ভিউতে বলছি। আমি তো ওই জায়গায় আর্মস স্ট্রাগল করতে পারছি না। আরেকটা হলো—আমাদের রণকৌশলটা হলো, আমরা বিপ্লবী অভ্যুত্থানে যাব। আমরা তো সশস্ত্র বিপ্লবে যাব না।

মহি: এটাই তো প্যারাডক্স। পিকিংপন্থীদের যে জিনিসটা আমরা...

সিরাজ: অপোজ করলাম, এটাই আবার আমরা করলাম। সুতরাং থিওরেটিক্যালি এটা তো রং। রং মানে কী? এটা তো করাই হয়নি। ইন প্র্যাকটিস, অনেক সময় যেটা আমি চাই না, সেটাই হয়। ক্ষুধার জ্বালায় যেমন চুরি করা। চুরি করতে চাই না। কিন্তু তাকে না জানিয়ে নিয়ে গেলাম।

ডিসিশনটা হলো যে ঢাকার চারপাশে ৩০ থেকে ৩২টা, সারা বাংলাদেশে ৪২টা জোন ঠিক করা হলো, যেখান থেকে মাস-বেইজড মাস আপসার্জ করা হবে। ঢাকার চারপাশে যে জায়গাগুলো স্ট্রং ছিল—মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী—এই নরসিংদীর বাবুল—কী ফেরোশাস, কী তার লিডারশিপ! সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বগুড়া তো আছেই, কুষ্টিয়া—এ রকম ৪০-৪২টা জায়গা রেডি হচ্ছে। আর ঢাকায় হবে মিছিল, মিটিং, হরতাল। এগুলো স্ট্রিক্ট ডিসিশন। এগুলো করার মধ্য দিয়ে...।

এদিকে আমরা তখন সোলজারদের মধ্যে সৈনিক সংস্থা গড়ে তুলেছি। ঢাকার বাইরেও আছে—বগুড়ায়, কুমিল্লায়। ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন তো ভেরি গুড। অন্যদের তো কোনো সংগঠন নাই। শ্রমিক তো আগে থেকেই অর্গানাইজ করা আছে। সবাই তো আওয়ামী লীগে যায়নি, শ্রমিক লীগেই আছে।

একটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিতিতে যাব। টেকওভারের দুইটা প্রভিশন—হয় ইলেকশন দেবে। আমার হিসাব হলো, ইলেকশন দিলে আমরা ১৭০টা জায়গায়, উইথ নো কোশ্চেন...আরও ৪০-৫০টা জায়গায় টাফ কনটেস্টের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসব। মানে টু হানড্রেড। বাকিটা আওয়ামী লীগ, ন্যাপ-ট্যাপরা পাবে।

মহি: আপনি কি ১৫ আগস্টের আগের সিনারিও বলছেন?

সিরাজ: আগের সিনারিও অবশ্যই। একেবারে হিসাব-নিকাশ

করা। ১৭০টা জায়গায়—কোনো কোনো জায়গা, যেখানে বেইজ আছে। সেটা নালিফাই হয়ে গেল ১৭ মার্চের কারণে।

মহি : ১৭ মার্চের কারণে ডিস্টার্বও হয়ে গেল?

সিরাজ : শুধু ডিস্টার্বড না, দ্যাট প্ল্যান ওয়াজ নট অ্যাট অল ওয়ার্কড আউট। প্ল্যানটাই কাজ করল না।[২৫]

জাসদের মধ্য থেকে একটি 'বিপ্লবী পার্টি' গড়ে তোলার পটভূমি ও প্রক্রিয়া এবং গণবাহিনী গঠন সম্পর্কে একাধিক ও বিপরীতধর্মী এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে আসছেন দলের কেউ কেউ। দায় অস্বীকারের প্রবণতা এখানে লক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারে দলের আনুষ্ঠানিক ভাষ্যটি জানা জরুরি। ১৯৭৪ সালের পরিস্থিতি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জাসদের কর্মকাণ্ডের একটি লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় দলের মধ্য থেকে বিকাশমান বিপ্লবী পার্টির মুখপত্র *সাম্যবাদ-চার*-এ। ১৯৭৬ সালের ২৭, ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় পার্টির কেন্দ্রীয় ফোরাম ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের বৈঠকে ফোরামের পক্ষ থেকে যে 'রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট' পেশ করা হয়, তাতে পার্টির অবস্থানটি ব্যাখ্যা করা হয়। রিপোর্টে বলা হয় :

> জাসদ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ ও কৃষক লীগের জন্ম যেহেতু শোষণ নির্যাতন বৈষম্য ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, যেহেতু এই চারটি সংগঠনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠতে থাকল দেশীয় শাসক-শোষকগোষ্ঠী এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী আধিপত্যবাদী দোসরদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ। এবং স্বভাবতই প্রথম থেকেই শাসক-শোষকগোষ্ঠীর রুদ্ররোষের কেন্দ্রবিন্দু হলো এই চারটি সংগঠন। সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও কর্মীদের ওপর নেমে এল ভয়াবহ শ্বেতসন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস চূড়ান্ত রূপ নিল ১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। এই দিন পল্টনের বিশাল জনসভার রায়ের ভিত্তিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে কয়েক হাজার মানুষ মিছিল করে গিয়েছিল তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে জনগণের ন্যায়সংগত দাবিদাওয়াসংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করার উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, এরূপ স্মারকলিপি পেশ করার অধিকার জনগণের একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সেদিনের ক্ষমতাসীন সরকার এই গণতান্ত্রিক অধিকারের কোনো মর্যাদাই রাখেনি। তারা নিরস্ত্র জনতার ওপর চালিয়েছে দানবীয় হামলা। করেছে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। ফলে সংগঠনের কর্মীসহ প্রায় ৫০ জন মিছিলকারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হন মহিলাসহ শত শত

মানুষ। গ্রেপ্তার হন মেজর এম এ জলিল, আ স ম আবদুর রবসহ অসংখ্য নেতা ও কর্মী। রাতে *গণকণ্ঠ*-এর সম্পাদক কবি আল মাহমুদকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেদিন রাত্রেই মেহনতি মানুষের মুখপত্র *গণকণ্ঠ* অফিস তছনছ করা হয়, পরদিন জাসদ অফিস ভস্মীভূত করা হয়, অগ্নিসংযোগ করা হয় ছাত্রলীগের অফিসে। কয় দিন পরই হামলা চালানো হয় জাতীয় শ্রমিক লীগের অফিসে।

১৭ই মার্চের ঘটনা এ দেশের আন্দোলনের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘটনা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে শাসক-শোষকগোষ্ঠী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সামান্য সুযোগটুকুও আর দেবে না। ওই ঘটনা আরও প্রমাণ করে যে জনগণের সশস্ত্র শক্তি অতিসত্বর গড়ে না উঠলে শাসক-শোষকগোষ্ঠীর বর্বরোচিত সশস্ত্র হামলার মোকাবিলা করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর হবে না। মেহনতি মানুষের সামগ্রিক আন্দোলনকে পরিচালিত করার জন্য একটি সঠিক বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও এ সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অনিবার্যতার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় বিপ্লবী শক্তিকে একটি কাঠামোগত রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়া।...

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৭৩ সালেই জাসদ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ ও কৃষক লীগ—এই চারটি গণসংগঠনের স্ব স্ব কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি। ১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চের ঘটনার পর এই সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সমন্বয় কমিটির একটি বর্ধিত বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের বর্ধিত সভা ২৭শে ও ২৮শে জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই বর্ধিত সমন্বয় কমিটির সদস্য ছিলেন তৎকালে জেলে আটক ৫ জন নেতাসহ মোট ৩২ জন।

৩২ জনের বৈঠক দুদিনব্যাপী ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যথাসম্ভব সত্বরতার সঙ্গে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি খসড়া থিসিস ও খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে। সিদ্ধান্ত হয় যে আগামীতে যখন পূর্ণাঙ্গ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে, তখনই এই খসড়া থিসিস ও গঠনতন্ত্রকে প্রয়োজনীয় সংশোধন সংযোজন-পরিমার্জন সাপেক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন ও গ্রহণ করা হবে।

এই বৈঠক আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় নয়া ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এই বৈঠকের ৩২ জন সদস্য বিপ্লবী পার্টি গঠনসহ সমগ্র ব্যাপারের কেন্দ্রীয় ফোরাম হিসাবে কার্যকর থাকবে। এই বৈঠকের তরফ থেকে পাঁচজন সদস্যের ওপর বিপ্লবী সংগঠন গড়ার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং আরও দুজন সদস্যকে এই পরিষদের বিকল্প (অল্টারনেট) সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। এই বৈঠক কেন্দ্রীয় পত্রপত্রিকা ও দলিলসমূহ প্রণয়ন করার জন্য পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদকীয় বোর্ডও গঠন করে। এ ছাড়া এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটিকে আরও কার্যকর রূপে ঢেলে সাজানো হয়।...

এই ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র দেশজুড়ে শুরু হয় বিপ্লবী পার্টি গঠনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। সমগ্র দেশকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি অঞ্চলের সার্বিক কার্যক্রম তদারক করার জন্য একজন করে কেন্দ্রীয় সংগঠক নিযুক্ত করা হয়।... প্রতিটি জোনের অধীনে প্রত্যেক জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিপ্লবী ফোরাম গড়ে তোলার জন্যও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়।...

প্রক্রিয়াকে যথাযথ ও ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ১৭ই মার্চের পরপরই বিপ্লবীদের মুখপত্র হিসাবে *সাম্যবাদ* প্রকাশ করা হয়। এরই পাশাপাশি গণসংগঠনসমূহের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় *লড়াই*।...

শ্রেণিসংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হিসাবে সর্বহারা শ্রেণির নিজস্ব বাহিনীর সংগঠন অপরিহার্য। সুতরাং মুজিব আমলের প্রথম থেকেই সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুধাবন করা হয়। মুজিবের নেতৃত্বাধীন শাসক-শোষকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান শ্বেতসন্ত্রাস—বিশেষত ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চের পর সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থ ও শক্তির রক্ষা ও বিকাশকল্পে অবিলম্বে সর্বহারা শ্রেণির নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং ২৭শে ও ২৮শে জুনের বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিপ্লবী গণবাহিনী গঠন করা হয়।....

শেখ মুজিবের আমল থেকেই সামরিক বাহিনীসমূহের মধ্যে সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্মী সৃষ্টির প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় বিকাশের একপর্যায়ে সামরিক বাহিনীসমূহের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা দেশের সকল সেনানিবাস ও ছাউনীসমূহে অত্যন্ত সঙ্গোপনে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যেতে থাকে।[২৬]

উপরিউক্ত ভাষ্যসহ দলিলটি সিরাজুল আলম খানের উপস্থিতিতেই সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছিল। গণবাহিনী গঠনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। গণবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত চুয়াত্তরের জুন মাসেই নেওয়া হয়। তখনো কেউ জানেন না কবে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হবে এবং একদলীয় সরকারব্যবস্থা কায়েম হবে।

## ৯

গণবাহিনী নিয়ে যে যা-ই বলুন না কেন, একটা সামরিক সংগঠন গড়ে তোলা হবে এবং এ জন্য তরুণদের বাছাই করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে—এ চিন্তাটা নেতৃত্বের মধ্যে ছিল। এমনই একজন তরুণ হলো আবু আলম মো. শহীদ খান। রংপুরের ছেলে আবু আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। পড়াশোনায় ছিল খুবই মেধাবী। ধীরে ধীরে সে জড়িয়ে পড়ল ছাত্রলীগ-জাসদের কর্মকাণ্ডে। এ রকম অসংখ্য তরুণ জড়ো হয়েছিল বিপ্লবের স্বপ্নে সওয়ার হয়ে। আবু আলম তাদের একজন। আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় সে মেলে ধরল তার স্বপ্নযাত্রার কথা।

মহিউদ্দিন আহমদ : তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি গণবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলে এবং এই ইউনিটের কমান্ডারও হলে। এ প্রক্রিয়ায় তুমি কীভাবে এলে?

আবু আলম : আমি তো তখন গ্রাম থেকে এসেছি, রংপুর থেকে। ঢাকায় এসে মুহসীন হলে উঠলাম। আসলে আমি তো ছিলাম ছাত্রলীগে। হারিসউদ্দিন সরকার ছিলেন আমাদের নেতা। তারপর ইলিয়াস ভাই, মনসুর সাহেব, পরের দিকে অলোক সরকার, জেলা মুজিববাহিনীর কমান্ডার মুস্তাফিজুর রহমান মুকুল—এঁরা ছিলেন ছাত্রলীগের নেতা।

মহি : ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তুমি ভর্তি হলে কখন?

আলম : ১৯৭৩ সালে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়েই কিন্তু আমরা কাজ করছিলাম। বাহাত্তরের জুলাই মাসে ছাত্রলীগের কনফারেন্সে দেখলাম, আমরা বিভক্ত। মুহসীন হলে মুশতাক ভাই, আপনারা ছিলেন। রংপুরে মুকুল ভাই, অলোকদার সংস্পর্শের কারণে জাসদ-ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম।

মহি : একটু স্পেসিফিক বলো। যারা ছাত্রলীগ করত, তারা সবাই তো গণবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল না?

আলম : ১৭ মার্চ (১৯৭৪) হলো। আপনাকে একটু ডিটেইলস বলছি, আমরা কী করতাম। মিটিংয়ে আমরা পেছনে বসে বাদাম খেতাম। সামনে যারা দাঁড়িয়ে থাকত, তাদের বলতাম, বসেন বসেন। আমাদের কাজ ছিল, ডিসিপ্লিনড ওয়েতে যেন পুরো পল্টন ময়দান ভরে থাকে। কিন্তু ১৭ মার্চ হঠাৎ একটা ইনস্ট্রাকশন এল, ইনস্ট্রাকশন ডাইরেক্টলি ফ্রম মাহবুব ভাই যে আজকে মাঠে লোক বসানোর কাজ করতে হবে না, আজ তোমরা গেটের কাছে থেকো। তোমাদের অন্য কাজ আছে।

অন্য কাজটা কী?

সেটা সময়মতো জানানো হবে। গো দেয়ার অ্যান্ড স্ট্যান্ড দেয়ার। আমরা, ঢাকা ইউনিভার্সিটির কর্মীরা গেটের কাছে দাঁড়ায়া আছি। আ স ম আবদুর রবের বক্তৃতা তখনো শেষ হয়নি। আমরা স্লোগান শুরু করলাম। ঘেরাও হবে, দখল হবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসা ঘেরাও হবে। চলো চলো, ঘেরাও করো, দখল করো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন। এভাবে আমরা স্টার্ট করেছি। এখন যে জিরো পয়েন্ট, ওখানে আমরা আসার পর রব ভাইয়ের বক্তৃতা শেষ হয়েছে। ততক্ষণে কিন্তু আমরা চলে এসেছি। ওই দিন ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। তারিখটা কী জন্য ঠিক করা হয়েছিল, জানি না। তারপর তো সেখানে ধাক্কাধাক্কি হলো, গুলি হলো। তখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটা এক্সিবিশন চলছিল। আমরা ওই দিকে পালায়া গেলাম। এর এক-দুই মাস পরে ইউনিভার্সিটিরই একজন বলল, তোমাকে অন্য কাজে যুক্ত হতে হবে।

মহি : কে বলল?

আলম : ইউনিভার্সিটি লিডারদেরই একজন। বলল, তোমাকে একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

কীভাবে দেখা করতে হবে?

তুমি নিউমার্কেটে যাবা। ভেতরে একটা লোক, হাতে লাল রুমাল, তার একটা কোড আছে। সেখানে গেলাম। আমার একটা কোড ছিল। তার কোডের উত্তর দিলাম।

মহি : মানে পাসওয়ার্ড।

আলম : হ্যাঁ। না হলে চিনব কীভাবে। হাতে রুমালের কথা বলে দেওয়া ছিল। তখনো আমি জানি না আমাকে আর কোথায় যেতে হবে। এটুকু জানি, আমাকে একজনের কাছে নিয়ে যাবে। যাহোক, সেই ছেলেকে আমি চিনি না। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র না। সেখান থেকে আমরা রিকশায় চড়ে ফার্মগেটের দিকে গেলাম। ওখানে একটি

হোটেল ছিল। ওখানে বসলাম। ওখানে আরেকজন লোক এসে বসল। আমার সঙ্গের তরুণটি বলল, আপনি ওনার সঙ্গে যান।

কোথায় যাব?

উনি আপনাকে নিয়ে যাবেন।

উনি আমাকে নিয়ে গেলেন বনানীতে। সেখানে একটা বাসায় দেখা হলো ইনু ভাইয়ের সঙ্গে। একটা গাড়িতে উনি আমাকে ওঠালেন। বললেন, চলো, আমরা আরেক জায়গায় যাব। দেখলাম, উনি আমাকে নিয়ে ধানমন্ডিতে আসলেন। ধানমন্ডিতে ওনার এক খালার বাসা ছিল। তাঁর খালাতো বোন বোধ হয় ইংলিশ নিউজ-টিউজ পড়ত। তাঁর ছোট বোন একটা বিড়ালকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। বাসাটাও খুব সুন্দর, পশ। ওটাই ধানমন্ডির কোনো বাসায় জীবনে আমার প্রথম যাওয়া। খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো বাসা। দামি আসবাবে ঠাসা। আমি ভাবতে থাকলাম, আমি চাই সমাজতন্ত্র। গরিবের রাজ হবে। তো আমি এখানে কী করতেছি? হোয়াট অ্যাম আই ডুয়িং হিয়ার? বিড়ালকে খাওয়ানোর যে খরচ, তা তো গরিব মানুষকে খাওয়ানো যেত? এই বিত্তের মধ্যে আমি সমাজতন্ত্র দেখছি না।

ওখানে আমাদের চা দিল। চা খেয়ে উনি আমাকে নিয়ে গেলেন আজিমপুর। ওখানে চায়না বিল্ডিং আছে না? বাসাটার একটা নাম ছিল। নামটা ভুলে গেছি। দোতলায় একটা রুমে গেলাম। সিরাজ ভাই এখানে থাকেন, জানতাম না। আগে দেখেছি। সরাসরি তাঁর সামনাসামনি কখনো হইনি।

ইনু ভাই বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে এসেছি। এর নাম আবু আলম। সিরাজ ভাই হেসে বললেন, তোমাকে তো একটা বিশেষ কাজের জন্য ডেকেছি। ওপেন মিটিং-মিছিলে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি ওখান থেকে আস্তে আস্তে সরে আসো। বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য তোমাকে মেম্বার করা হবে। ইনু তোমাকে সবকিছু জানাবে। তুমি ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কাজ করবে।

দ্যাট ওয়াজ মাই ইনক্লুশন। তখন পর্যায়ক্রমে আনোয়ার ভাই এবং আরও অনেকের সঙ্গে কথা হলো। আমরা ইউনিভার্সিটিতে ইউনিট করলাম। আবুল বারাকাত দুলাল ভাই ছিল পলিটিক্যাল কমিসার।

মহি : তুমি কমান্ডার আর দুলাল পলিটিক্যাল কমিসার?

আলম : পরে একটা ব্যক্তিগত ঘটনার কারণে আমাকে ইউনিভার্সিটি এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হলো। আমি কেরানীগঞ্জ,

আদমজী, পোস্তগোলা—এসব জায়গায় থাকা শুরু করলাম। তখন আমি ঢাকা সিটি গণবাহিনীর পাবলিসিটি উইংয়ের দায়িত্বে। তখন তো সবাই কমান্ডার। পাবলিসিটি কমান্ডারের দায়িত্ব পেলাম।

মহি : ঢাকা সিটি গণবাহিনীর যে ফোরামটা ছিল, এটাতে রফিক, আনোয়ার, তুমি ছাড়া আর কে কে ছিল?

আলম : বাহার ছিল (২৬ নভেম্বর ১৯৭৫ মারা গেছে), আবু বকর সিদ্দিক ছিল।

২৬ নভেম্বরের যে হরতাল, তার আগে তো আমরা ককটেল মারতাম। ককটেলের মুখে তো একটা কাপড় থাকে। এটাকে আগুন লাগিয়ে ছুড়ে মারতে হয়। আনোয়ার ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা এর একটা উন্নত সংস্করণ বের করার চেষ্টা করলাম। ঠিক হলো আমরা আর আগুন লাগাব না। ককটেলের গায়ে একটা জ্যাকেট পরানো হলো। কাপড়ের জ্যাকেট। এর মধ্যে চারটা পকেট রাখলাম। পকেটে ডিস্টিল ওয়াটারের যে ইয়ে থাকে না...

মহি : অ্যাম্পুল।

আলম : হ্যাঁ, তার মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড রাখলাম। আর জ্যাকেটটাকে চিনি মেশানো পানিতে জ্বাল দিয়ে তাতে ভেজালাম। জ্যাকেটের মধ্যে চিনি চলে আসল। ককটেল ছুড়ে মারলে অ্যাসিডের অ্যাম্পুল ভেঙে চিনির সঙ্গে মিশলেই আগুন লাগবে। এটা উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে সুন্দর করে তৈরি করতেন।

২৬ নভেম্বর হরতালের আগে আমাদের ককটেল ছোড়ার সিদ্ধান্ত হলো, *দৈনিক বাংলার* মোড়ে।

মহি : এটা তো ১৯৭৪ সালের ২৬ নভেম্বরের কথা?

আলম : ওই দিন হরতাল ডাকা হয়েছিল।

মহি : ওই দিনই বোমা বানাতে গিয়ে নিখিল চন্দ্র সাহা মারা গেল।

আলম : আমাদের ককটেল মারার টার্গেট দেওয়া হলো। আমি আর ওরা দুজন।

মহি : ওরা দুজন কে?

আলম : মুশতাক আর একজন, নাম ভুলে গেছি। ফখরুল হতে পারে। *দৈনিক বাংলার* কাছে গিয়ে দেখলাম রক্ষীবাহিনীর ট্রাক। ওখানে ককটেল মারা সম্ভব না। দেয়াল অনেক উঁচু।

মহি : এটা কি ২৬ নভেম্বরেই?

আলম : না, আগে। ওই সময়েরই ঘটনা। ককটেল তো মারতে হবে আগের দিন, যাতে মানুষ জানতে পারে। ওখানে তো ককটেল মারা গেল না। ফিল্ডে তো সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করতে হয়। তো সিদ্ধান্ত চেঞ্জ হলো। তাহলে চলো আমরা *বাংলার বাণী*তে যাই। একটা গেট দিয়ে *বাংলার বাণী*তে ঢুকতে হয়। দেখি ওখানেও রক্ষীবাহিনীর একটা ট্রাক। তার মানে দুটো টার্গেটেই মারা যাচ্ছে না। তখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম বঙ্গভবনের দিকে। দেখলাম বঙ্গভবনের গেটের কাছে রক্ষীবাহিনীর ট্রাক। কিন্তু *ইত্তেফাক*-এর সামনে কোনো কিছু নেই। তখন উই টুক আ কুইক ডিসিশন। আমাদের তো দরকার প্রচার। *দৈনিক বাংলা* বা *বাংলার বাণী*তে মারলে যা হবে, *ইত্তেফাক*-এ মারলে আরও বেশি হবে। তখন তো আই ওয়াজ আ ইয়াং পারসন। তো ডিসিশন নিলাম, *ইত্তেফাক* তো আরও বেশি লোকে পড়ে। ভালো প্রচার হবে।

*ইত্তেফাক*-এর দেয়ালটা নিচু ছিল। রক্ষীবাহিনী যেহেতু উল্টা পাশে আছে, তো আমি মুশতাককে বললাম, এখানে ডাম্প করে দাও। মানে ফেলে দাও। মুশতাক এটা ফেলে দিল। আমরা বাদাম খেতে খেতে হাঁটছি।

ককটেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাম করে আগুন লেগে গেল। আমরা তো জাস্ট টেস্ট করেছি। আমরা হেঁটে বঙ্গভবন পার হয়ে গুলিস্তানে চলে এলাম। হলে ফেরার তো সুযোগ নাই। আরেকটা কোথায় মারা যায়। দু-চার মিনিটের মধ্যে আমরা টিঅ্যান্ডটি অফিসের ওখানে আরেকটা মারলাম। পরদিন তো *ইত্তেফাক*-এ বিশাল নিউজ, তাদের অফিসে ককটেল।

মহি : তারিখটা তোমার মনে আছে? ২৬ নভেম্বরের কয় দিন আগে?

আলম : এক দিন আগে, অথবা কোনো একটা হরতালের আগের দিন। তারিখটা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।

এরপর তো যথারীতি ডাক পড়ল, কেন *ইত্তেফাক*-এ মারা হলো। বললাম, আমরা তো কাউকে মারতে চাইনি। আমাদের টার্গেট হলো পাবলিসিটি।

মহি : এটা কারা মারল, সেটার কি পাবলিসিটি হয়েছে?

আলম : এটা তো হরতালের আগের দিন। সবাই তো জানে কারা হরতাল ডেকেছে। মানে হলো, তোমরা কেউ কাল গাড়ি-টাড়ি বের কোরো না। আগুন লাগতে পারে। এটা হলো মানুষকে একটা বার্তা

দেওয়া। কে মেরেছে, তা জানার তো দরকার নেই। যারা হরতাল ডেকেছে, এটা তাদের কাজ, এটাই মানুষ বুঝবে।

পরে বুঝলাম, *ইত্তেফাক*-এর সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক। সে জন্য *ইত্তেফাক* তো টার্গেট হতে পারে না।

মহি : আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের তো খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

আলম : আমি জানি না, এটা কোন লেভেলের সম্পর্ক। তবে টপ লেভেলে যে একটা সুসম্পর্ক ছিল, এটা আমরা বুঝতে পারলাম।

মহি : এটা তো অনেক পরের কথা।

আলম : যাহোক, ওটা থেকেই বুঝতে পারি, সম্পর্ক ভালো ছিল।

শেখ কামাল তখন অনেককে নিয়ে গাড়িতে চলাফেরা করে। এখন কী করে তাদের ভয় দেখানো যায়। কামাল ভাই তো গাড়ি রেখে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। গাড়ি কখনো থাকে সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টের সামনে, কখনো-বা লাইব্রেরির সামনে। ভাবলাম, কামাল ভাইয়ের গাড়িতেই এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে দেওয়া যায় কি না। নট টু হার্ম কামাল ভাই, বাট টু লেট এভরিবডি নো দ্যাট আমাদের টার্গেটের মধ্যে এটাও আছে। আমরা এটুকু করতে পারি এবং আমরা আরও বড় কাজ করতে পারি। ছোট একটা কাজ হিসেবে গাড়িটাতে আগুন-টাগুন লাগিয়ে দেওয়া যায় কি না। এই প্ল্যানটা হায়ার লেভেলে পাঠানো হলো এবং হায়ার লেভেল থেকে টপ লেভেলে গেল। আমি জেনেছি যে সিরাজ ভাই এটা শোনার পরে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেছিলেন এবং জিজ্ঞেস করেছিলেন, এসব প্ল্যান কাদের মাথা থেকে আসছে? আসলে এটা তো একটা ইউনিটের প্ল্যান, কারও ব্যক্তিগত প্ল্যান না।

মহি : প্ল্যানটা আসলে কার মাথা থেকে এসেছিল?

আলম : এটা আমার মনে নেই। এটা আসলে ফান ছিল। ফান করতে করতে...পরে এটা অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে। তখন বাকশাল হয়ে গেছে। নির্যাতন চলছে আমাদের ওপর। দেখাতে চেয়েছি, আমরা বড় কিছু করতে পারি কি না। এটা করব, একেবারে স্পেসিফিক কিছু না, তবে করা যায় কি না। যাহোক, সিরাজ ভাই খুব ফিউরিয়াস। কে এটা করতে বলেছে? তখন তো পার্টির ভেতরে তর্ক-বিতর্কের একটা জায়গা ছিল। এটা তো কাউকে কিল করার জন্য না। ভয় দেখানোর জন্য। আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলছি। আমাদের ১০টা লোক যদি আজ মারা যায়, তাহলে আমরা কী করব? এ রকম চিন্তা থেকেই

প্ল্যানটা এসেছে। তখন উনি স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি, তাদের হার্ট করে এমন কোনো কিছু করবে না। তারপর থেকে কামাল ভাই এবং তাঁদের ছাত্রলীগের নেতাদের টার্গেট করে কোনো কিছু করা হয়নি। ঢাকা শহরে কিন্তু কিছু টার্গেট করা হয়েছিল। কিছু অপারেশনও হয়েছিল—কিছু পুলিশের লোক বা পুলিশের দালাল। কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মুজিববাদী ছাত্রলীগের কোনো নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কিছু করা হয়নি।[২৭]

## ১০

জাসদের বিপ্লবী পার্টি গঠনপ্রক্রিয়ার অন্যতম বাহন ছিল *সাম্যবাদ* নামে একটি প্রকাশনা। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চের পরপর এর প্রথম সংখ্যাটি বের হয়েছিল। এ সংখ্যায় 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছেদ ঘটিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরের আহ্বান' জানানো হয়। ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের ঘটনাটিকে কিউবার বিপ্লবে ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও তাঁর সহযোগীদের মনকাডা দুর্গে অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

*সাম্যবাদ* লেখার কাজে বিভিন্ন সময়ে জড়িত ছিলেন সিরাজুল আলম খান, মো. শাহজাহান, খায়ের এজাজ মাসুদ, হারুনুর রশিদ প্রমুখ। এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় চুয়াত্তরের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা জারির পরপর। এ সংখ্যায় 'বিপ্লবী গণবাহিনী' সম্পর্কে দলের অবস্থান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। মূল খসড়াটি খায়ের এজাজ মাসুদের লেখা। বিরাজমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা এবং করণীয় সম্বন্ধে বলা হয় :

> আজ সামগ্রিক পরিস্থিতি এক যুগ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। পতনোন্মুখ আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক ক্ষমতা বহাল রাখার জন্য মরিয়া হয়ে চালাচ্ছে শেষ প্রচেষ্টা। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে তারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্র খতম করে ফ্যাসিস্ট কায়দায় একদলীয় একনায়কত্ব কায়েম করার ষড়যন্ত্র করছে। অস্ত্রবলে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও প্রতিরোধকে ভেঙে চুরমার করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।
>
> এসব করা হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রেক্ষিতে। মুজিব সরকার বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রকে প্রতিহত করে ধনতন্ত্র স্থাপনে বিশ্বাসী। এ সরকারের বড় বড় আমলারা সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে

সাম্যবাদ

বিপ্লবীদের মুখপত্র

*সাম্যবাদ-দুই* এর প্রচ্ছদ

বদ্ধপরিকর। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা স্বৈরাচারী 'আইয়ুবতন্ত্রের' কায়দায় বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

বিপ্লবীদের আজ অবশ্যই এরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনসাধারণ আজ মৌলিক পরিবর্তন চায়, চায় কার্যকরী পরিবর্তন। জনসাধারণের এ মনোভাবকে বিপ্লবের সপক্ষে টেনে আনতে হবে। তার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করতে হবে। যেখানে তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার নেই, সেখানে জনগণের প্রত্যেকটি প্রতিবাদকে নিঃশব্দ করে দেওয়া হয় অস্ত্রের ঝংকারে, সেখানে অস্ত্রই হবে 'গণতান্ত্রিক' রাজনৈতিক আন্দোলনের একমাত্র রূপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই আমাদের 'সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে যুদ্ধ আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী।' গণসংগঠন ও গণসংগ্রামের মতো অন্যান্য সমস্ত কিছুও গুরুত্বপূর্ণ ও নিতান্ত অপরিহার্য; কোনো অবস্থাতেই এদের উপেক্ষা করা যাবে না; কিন্তু এগুলো সবই যুদ্ধের জন্য।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীর কর্তব্য হচ্ছে বিপ্লবী গণবাহিনীতে যোগ দেওয়া, এ বাহিনীকে গঠন করা, সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা। বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে সশস্ত্র করা; সশস্ত্র সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া; জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে সপক্ষে টেনে এনে সশস্ত্র যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো; বিপ্লবী গণবাহিনীকে সংগঠিত ও পরিচালনা করা।...[২৮]

পুরো লেখাটিতে লেনিন এবং মাও সে তুংয়ের রচনা থেকে অনেকগুলো উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মাওয়ের 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা' এবং 'দীর্ঘায়িত যুদ্ধ সম্পর্কে' প্রবন্ধের ছাপ ছিল স্পষ্ট। উল্লেখ্য যে পিকিংপন্থী

কয়েকটি দল তাদের 'সশস্ত্র সংগ্রামের' পক্ষে যে যুক্তিগুলো দিত, এখানেও তার মিল পাওয়া যায়। মস্কো ও পিকিংয়ের রাজনৈতিক লাইনের বাইরে স্বতন্ত্র একটি পথ বের করে নেওয়ার জন্য জাসদ বাহাত্তরেই ঘোষণা দিয়েছিল। অথচ নিজেদের অজান্তেই তারা ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের পিকিংপন্থার কাছে নিজেদের সঁপে দিল।

*সাম্যবাদ-দুই* সংখ্যাটি লেখা হয়েছে শুধু বিপ্লবী গণবাহিনী সম্পর্কে। এর একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম হলো 'শৃঙ্খলা ও আচরণের আবশ্যিক নীতিমালা'। এটি লেখা হয়েছে মাও সে তুংয়ের 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা' নিবন্ধ থেকে কপি করে। গণবাহিনীর সদস্যদের কেমন হতে হবে, এ নিয়ে বলা হয়েছে যে, 'মাও সে তুং বর্ণিত নীতিগুলো প্রায় সর্বজনীন এবং বিপ্লবী গণবাহিনীর জন্য অবশ্যই করণীয়।' এগুলো হচ্ছে :

শৃঙ্খলার নীতি :

১. সকল কাজে আদেশ মেনে চলা।
২. জনসাধারণের একটি সূচও আত্মসাৎ না করা।
৩. ধৃত অথবা সংগৃহীত সবকিছুই জমা দেওয়া।

আচরণের নীতি :

১. নম্রভাবে কথা বলা।
২. খরিদে যথোপযুক্ত মূল্য প্রদান না করা।
৩. কর্জ ফেরত দেওয়া।
৪. নিজে কোনো ক্ষতিসাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া।
৫. জনসাধারণকে আঘাত না করা।
৬. ফসল নষ্ট না করা।
৭. নারীর প্রতি অনাচার না করা।
৮. বন্দীদের প্রতি অসদ্ব্যবহার না করা।[২৯]

কিন্তু চার বছর আগে একই আচরণবিধি তৈরি করেছিল পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। এটি ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে উত্থাপিত সর্বহারা পার্টির খসড়া সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে সর্বহারা পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে।[৩০] *সাম্যবাদ*-এর খসড়া যিনি তৈরি করেছিলেন, তিনি মাও সে তুংয়ের মূল রচনা অনুসরণ করেছিলেন, নাকি সর্বহারা পার্টির দলিল থেকে ভাষা একটু অদলবদল করে ঢুকে নিয়েছিলেন, তা বোঝা মুশকিল।

বিপ্লবী গণবাহিনীর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা এবং সদস্যদের আচরণবিধি নিয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে *সাম্যবাদ-তিন*। আচরণবিধিতে ৩০টি অনুশাসন

উল্লেখ করে বলা হয়, 'একজন সত্যিকার বিপ্লবী হচ্ছে সে-ই যার মধ্যে মহত্তম গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। মহত্তম গুণাবলী বলতে আমরা বুঝি সর্বহারার সঙ্গে একাত্মতা, বিপ্লবী চরিত্র ও সাহস, সংস্কারমুক্ত তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং আবেগহীন প্রয়োগ ক্ষমতা।' *সাম্যবাদ-তিন* পড়লে একজন সাধারণ পাঠকের মনে হতে পারে, গণবাহিনীর কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না। এখানে তার কিছু নমুনা সংক্ষেপে তুলে ধরছি:

> নারী পুরুষ সম্পর্ক: কোনো সাথি যদি বিয়ে করতে চান, তাহলে পার্টির অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারেন। তবে প্রতিটি সাথির দাম্পত্যজীবন, প্রেম বা বিয়ের ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই পার্টিকে অবহিত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে পার্টির সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করতে হবে।
>
> ব্যক্তিগত সম্পত্তি: একজন বিপ্লবীকে অবশ্যই সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করতে হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত যাবতীয় চিন্তা-চেতনা।
>
> পারিবারিক বন্ধন: একই পরিবারের একজন সদস্য হয়তো বিপ্লবী আন্দোলনে এলেন; কিন্তু আর এক সদস্য রয়ে গেলেন শাসকগোষ্ঠীর দলে। এরূপ সমাজে বহু ক্ষেত্রেই একজন বিপ্লবী একজন শ্রেণিশত্রুর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে বের করে ফেলেন এবং আত্মীয় নিধনের প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একজন বিপ্লবীকে অবশ্যই এসব প্রতিক্রিয়াশীল আবেগ ও সামন্তবাদী বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে।[৩১]

একটা বিষয় পরিষ্কার যে ১৯৭৪ সালের জুন মাসের ২৭-২৮ তারিখের সভায় একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হলেও সামরিক সংগঠনের বিক্ষিপ্ত কাজকর্ম শুরু হয়ে যায় তার আগেই। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চের পর দল সংসদীয় রাজনীতির ধারা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। সামরিক সংগঠনটি 'বিপ্লবী গণবাহিনী' নামে যাত্রা শুরু করে। ধীরে ধীরে তার একটি কমান্ড-কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়।

## ১১

একসময় সিরাজুল আলম খান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডান হাত। তাঁদের মধ্যকার সম্পর্কের রসায়ন তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে সবটা বোঝা কঠিন।

এ প্রসঙ্গে সিরাজুল আলম খান নিজে যেটুকু বলবেন বা অন্য কোনো চাক্ষুষ সাক্ষীর বয়ান থেকে যা জানা যাবে, সেটুকুই ইতিহাসের উপাদান হতে পারে।

জাসদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর একটা মার মার-কাট কাট সম্পর্ক তৈরি হলেও একদা গুরু-শিষ্যের মধ্যকার সম্পর্কটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। সিরাজুল আলম খানের বিশ্বস্ত সহযোগী মনিরুল ইসলাম (মার্শাল) আমাকে বলেছেন, শেখ মুজিব নিয়মিতই সিরাজুল আলম খানের খোঁজখবর রাখতেন। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্ক বা তাঁকে শেখ মুজিব কী চোখে দেখতেন, তার একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন মনিরুল হক চৌধুরী। এটা ১৯৭৪ সালের কথা। তাঁর বয়ানটি এ রকম :

> একরাম (জাসদ-ছাত্রলীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক একরামুল হক) আমার রুমে থাকে। আমি তখন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট। বঙ্গবন্ধু আমারে ‘নেতা’ ডাকতেন। ‘ওই নেতা, সিরাজের খবর রাখো?’ আমি দেখলাম যে উনি জানে। তখন সিরাজ ভাই হইল ডিপ আন্ডারগ্রাউন্ড। চরম অবস্থা। বললাম, আমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। সিরাজ ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ একজন তো আমার রুমেই থাকে। সে জন্য আমি খবর পাই। আমি একবার দেখাও করছি।
>
> ভালো করছ। তুমি জানো সিরাজের জ্বর?
>
> না, আমি তো জানি না।
>
> তুমি দেখা করতে পারবা?
>
> হ্যাঁ, পারব।
>
> দাঁড়া।
>
> শামসু না কী একটা পিয়ন আছে না, তারে ডাকল। ডাইকা আমারে একটা টাকার প্যাকেট, খুব সম্ভব লাখখানেক বা ৫০ হাজার হইতে পারে, আমারে দিয়া বললেন...। আমি বললাম, এইটা আমার দেওয়া উচিত হবে না। আমি দিলে আই উইল বি মিসআন্ডারস্টুড। এটা ঠিক না। এইটা আপনার ব্যাপার, আমার জানা উচিত না।
>
> ঠিক কইছস তো তুই?
>
> রাতেই আমি একরামরে বললাম, সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু আমি তো ভয় পাই। সিরাজ ভাই তো আন্ডারগ্রাউন্ড। কোন দিক দিয়া কী হয়। তুমি সিরাজ ভাইরে জিজ্ঞাসা কইরা আসো।
>
> যা-ই হোক, একরাম এক দিন বা দুই দিন পরে আমারে নিয়া গেল। দেখলাম একটা লেপের মতো গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। জ্বর।
>
> কী মনে কইরা?

আপনারে দেখতে আসলাম।

আমারে দেখবা?

পরশুদিন বঙ্গবন্ধুর কাছে গেছিলাম। বঙ্গবন্ধু বলল, অ্যাই, সিরাজের খবর রাখো?

আমি মাঝেমধ্যে তো যোগাযোগ রাখি। আমার যে জ্বর, উনি জানে।

আপনারে যোগাযোগ করতে বলছে। আমার কাছে একটা কী দিতেছিল, আমি আনতে সাহস করি নাই।

সিরাজ ভাইয়ের চোখে পানি। সাত দিন পরে গেছি বঙ্গবন্ধুর কাছে।

অ্যাই নেতা, থ্যাংক ইউ।

আর কিছু বলল না। আমার সঙ্গে লোকজন আছে। গণভবনে।

সিরাজ ভাইরে বঙ্গবন্ধু যে আদর করত, কোনো দিন একটা গালি দেয় নাই। আমারে তো বঙ্গবন্ধু বলছে, 'সিরাজ একটাই হয়। ওর যত গুণ আছে, তোমাদের সব মিলায়া তার অর্ধেকও নাই। সিরাজ নিজেই অনেকরে পালে। এগুলা হইল বাটপার।' বিশেষ করে রব ভাইরে বঙ্গবন্ধু দেখতে পারত না। রব ভাই সম্পর্কে ওনার ধারণা...ফটকামি করত। মনি ভাই আবার নৈতিক দিক দিয়া খুব কঠোর ছিল। ইউ ক্যান নট ইমাজিন। সিরাজ ভাইরে বঙ্গবন্ধু ভীষণ আদর করত বঙ্গমাতা বেগম মুজিব কোনো দিন কোনো খারাপ মন্তব্য করে নাই অন্তত আমি জানি না। কিন্তু কোনো গন্ডগোল যখন লাগে, দ্বিমত যখন হইয়া যায়, তখন চতুর্মুখী প্লেয়ার পয়দা হয়। তারা এইটা জোড়া লাগতে দেয় না।

বঙ্গবন্ধু বলছিল, 'জাসদ যদি বড় সংগঠন হয়, আমার পরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় থাকবে। না হইলে রাজাকাররা ক্ষমতায় আসবে।' মনসুর আলীর বাড়ি অ্যাটাকের পর বঙ্গবন্ধু খেই হারায়া ফেলল।[৩২]

## ১২

রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে জাসদ কর্মীদের ধরপাকড় ও নির্যাতনের অভিযোগ ছিল। অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতারা প্রশাসনকে ব্যবহার করে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করত বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

কিছু কিছু খবর পত্রপত্রিকায়ও ছাপা হতো। কোথাও কোথাও পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। পাবনা তার একটি উদাহরণ। অভিযোগের তির ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর পরিবারের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে ভয়াবহ তথ্য দিয়েছেন নির্মল সেন।

> এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল পাবনায়। আমার এক বন্ধুর শ্যালকের বিয়ে। নাম গোবিন্দ দত্ত। ঢাকা থেকে বিমানে ঈশ্বরদী হয়ে পাবনা পৌঁছালাম। দুপুরের দিকে একটি গুলির শব্দ শুনলাম। কৌতূহল হলো। শুনলাম পাবনায় ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে একটা রিজার্ভ হাউস আছে। এই রিজার্ভ হাউসে নাকি যেকোনো লোককে ডেকে এনে যখন-তখন হত্যা করা যায়। আমাকে আরও বলা হলো, দীর্ঘদিন ধরে পাবনার আদালতে নাকি কোনো বিচার বসছে না। বিচারকেরা শঙ্কিত। তাঁদের নাকি কোনো বিচারের কাজ করতে দেওয়া হয় না। জেলা ছাত্রলীগের নির্দেশে রায় দিতে হয়।
>
> এ কথা শুনে আমি খানিকটা অবাক হলাম। মনে হলো এ আমি কোন দেশে আছি। একটি জেলা শহরে যেকোনো সময় যে কাউকে ডেকে এনে গুলি করা যায়! আদালতে বিচার বসে না। অথচ দেশে একটি সরকার আছে। সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কোনো কথা বলে না। অর্থাৎ ওই শহরে বিরাজ করছে একমাত্র ভয়, শঙ্কা আর সন্ত্রাস। এ ব্যাপারে আমি নিজেই কিছুটা খবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম মহকুমা হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর দপ্তরে ঢুকেই আমার আক্কেলগুড়ুম। তিনি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। কথা বলছেন আটঘরিয়া থানার একটা অভিযান নিয়ে। ওই থানা নাকি জাসদের ঘাঁটি। সেই থানা অভিযান নিয়ে বিস্তারিত কথা শুনলাম। কিছুক্ষণ পর মহকুমা হাকিমের সঙ্গে কথা হলো। আমি কথা না বাড়িয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। *দৈনিক বাংলায়* উপসম্পাদকীয় লিখলাম। যত দূর মনে আছে, শিরোনাম ছিল 'পাবনায় একটি রিজার্ভ হাউজ'। আমার লেখার পরে মনে হলো সকলের ভয় ভাঙল। সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা বিবৃতি দিলেন সংবাদপত্রে। সরকারি মহলেও কিছু প্রতিক্রিয়া হলো। শুনেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কথা তুলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নাকি বলেছিলেন, আমার সাথে নয়, নির্মল সেনের সাথে কথা বলো। আমার সঙ্গে কেউ কোনো দিন কথা বলেনি।
>
> তবে আমার লেখার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল পাবনায়। আমার লেখায় ক্ষুব্ধ হয় ছাত্রলীগ। আমাকে তারা প্রেসক্লাবে খুঁজতে যায়। সেখানে

> না পেয়ে গোবিন্দ দত্তের বাড়িতে চড়াও হয়। গোবিন্দ ওরফে রণজিৎ দত্ত পাবনা শহরে তখন দুটি রেশন দোকানের মালিক। শুনেছি আমাকে আশ্রয় দেওয়ার খেসারত হিসেবে তাঁকে একটি রেশন দোকানের মালিকানা ছেড়ে দিতে হয়। পরবর্তীকালে রণজিৎ দত্ত দেশান্তরী হন। কয়েক বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩৩]

পাবনায় জেল থেকে বের করে এনে জাসদ কর্মীদের খুন করা হয় বলে তথ্য দিয়েছেন সিরাজুল আলম খান। তাঁর এ কথার সত্যতা মেলে ১১ জুন ১৯৭৩ সালে সরকারি পত্রিকা *দৈনিক বাংলায়* প্রকাশিত রিপোর্টে। নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো রিপোর্টে বলা হয় :

> **পাবনা, ১০ই জুন :** আজ সকালে পুলিশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নয়া ভবন প্রাঙ্গণ থেকে চারটি লাশ উদ্ধার করেছে। এর আগে পাবনা শহরের সর্বত্র নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। অকুস্থল পরিদর্শনকারী অনেক ছাত্রই এ চারটি লাশ শনাক্ত করে। লাশগুলো হচ্ছে শেখর, রফিক, স্বপন ও আসমত আলী বাদশার। এদের সবাই পাবনা জেল থেকে পলাতক বিচারাধীন আসামি ছিল। এদের বিরুদ্ধে ছিল বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগ। চারটি লাশেই অসংখ্য বুলেট ও ছুরিকাঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। চারজনেরই হাত-পা এবং একজনের শুধু হাত বাঁধা ছিল।[৩৪]

## ১৩

এ সময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাসদের একটা সমঝোতার চেষ্টা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেই এটা চেয়েছিলেন। জাসদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটি করেন তাঁর আস্থাভাজন সাইদুর রহমান। শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। একই সঙ্গে তিনি জাসদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাসদের যোগাযোগের এই পর্বটি সম্পর্কে দুই দলের কোনো নেতা আজ পর্যন্ত মুখ খোলেননি।

সাইদুর রহমানের কথার সূত্র ধরে আমি সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কথা বলেছি। জাসদের জন্য সময়টা তখন বৈরী। নেতাদের অনেকেই জেলে। অনেকেই আত্মগোপনে। বিভিন্ন জায়গায় সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন দলের নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগে শেখ ফজলুল হক মনির অবস্থান তখন তুঙ্গে।

তিনি এলেন তাঁর পুরোনো বন্ধু সিরাজুল আলম খানের কাছে। সিরাজুল আলম খান আমাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

তখন বাকশাল হবে-টবে। মনি এসেছে অন বিহাফ অব শেখ মুজিব। বলছে, হি ইজ নট আ ম্যান, হি ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশন। হি ইজ নট অ্যান অর্ডিনারি ম্যান, হি ইজ আ সুপারম্যান। তাঁকে পারসোনালাইজ করতে হলে—আর সুপারম্যানরা তো কোনো নিয়মনীতির মধ্যে থাকে না।

তুই কী বলতে চাচ্ছিস?

আয়, একসাথে থাকি।

আমি তো একসাথে থাকতে চেয়েছিলাম। তুই তো তোর শ্বশুরকে দিয়ে দল ভাগ করে ফেললি, পাল্টা কৃষক লীগ বানালি। এখন বলতেছ একসাথে কাজ করব?

এরপর মুজিব ভাই আমাকে ডাকলেন। বললেন, স্বাধীনতার পরপর তোরা একটা জাতীয় সরকারের কথা বলছিলি। আমি এ রকম একটা করছি।

আমি বললাম, এ রকম করলে তো জাতীয় সরকার হয় না। এটা হলো আওয়ামী লীগের সরকার। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন যোগ দিয়েছে।

না, মুজিব ভাই, এটা হয় না। আচ্ছা, আমি আরেক দিন আসব।

সাত-আট দিন পরে...সাইদ ভাই যোগাযোগ রাখতেন। ওই একই কথা—আমি সবাইকে নিয়া একটা পার্টি করব।

বাসার তিনতলায় বসেছি। সামনে *অবজারভার* পত্রিকাটা রাখা। বললাম, বুলগেরিয়ায় এ রকম আছে—গভমেন্ট অব ন্যাশনাল ইউনিটি।

না, এটা বলবি না। কোয়ালিশন গভমেন্ট নিয়ে আমার ওয়ার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স আছে।

এটা কোয়ালিশন গভমেন্ট না। এটা হবে গভমেন্ট অব ন্যাশনাল ইউনিটি।

না রে, না। এটা হবে না। তার চেয়ে তুই জলিল আর রবকে দিয়ে দে। আরেক দিন আয়।

আরেক দিন। সিরাজ সিকদারকে মেরে ফেলছে। সাইদ ভাই এসে বলল যে মিটিংটা হবে না। আপনাকে দেশের বাইরে চলে যেতে বলছে।

তিনি আমাকেও দেশের বাইরে চলে যাওয়ার কথা বলেন—মানে, কী সর্বনাশ দেশের ওপর নেমে আসতেছে। এর আগে উনি পুলিশকে

> অনেকবার বলেছেন—তোমরা যা-ই করো, শুধু আমার সিরাজের ওপর যেন কোনো আঘাত না আসে। লাস্টে তো 'আমার সিরাজ' আর নাই। আমাকে বলছেন, তুমি তোমার পথ দেখো।
>
> টুকটাক কত কথা বলব? বড় মনের লোক ছিল। ক্যাস্ট্রো তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'একজন মুক্তিযোদ্ধা থাকতে স্বাধীনতাবিরোধী কাউকে আপনি সঙ্গে রাখবেন না। ওদের মধ্যে দক্ষতা খোঁজার দরকার নাই। আপনি দেখবেন হোয়েদার দে আর লয়্যাল টু দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড টু ইউ।'[৩৫]

বাকশালে যোগ দেওয়া, না দেওয়ার ব্যাপারে দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন সিরাজুল আলম খান। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি চিরকুট পাঠিয়েছিলেন আ স ম আবদুর রব ও মোহাম্মদ শাহজাহানের কাছে। তিনি তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। রব বলেছিলেন, এটা যদি রাষ্ট্রপতির ডিজায়ার হয়ে থাকে, তাহলে এটা বিবেচনা করে দেখা দরকার। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খানের ওপর। ওই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে শরীফ নুরুল আম্বিয়া আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> জানুয়ারিতেই আমরা বসলাম বাংলামোটরে কামরুল ইসলামের বাসায়। সিওসির মিটিং। আরও অনেকে এসেছিলেন। একটা বর্ধিত সভার মতো হইছিল। আলোচনা হইল, এখন আর যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সিরাজ ভাই ওপেন মাইন্ডে ছিলেন, মডারেটরের রোলে।[৩৬]

শেখ মুজিব তরুণ নেতাদের অনেককেই বাকশালে নিতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে সিরাজুল আলম খান ও কাজী জাফর আহমদকে। এ প্রসঙ্গে কিছু তথ্য পাওয়া যায় আওয়ামী যুবলীগের অন্যতম নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টুর কাছ থেকে। তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় অনেকেরই যাতায়াত ছিল। সেখানে অনেকের সঙ্গে গোপন বৈঠক হতো। এক সাক্ষাৎকারে তিনি ওই সময়ের একটা বিবরণ দিয়েছেন।

> মহিউদ্দিন আহমদ : আপনি একবার বলেছিলেন এবং সিরাজ ভাইও আমার কাছে এটা কনফার্ম করেছেন। ইমার্জেন্সি দেওয়ার পর তো সিরাজ ভাই ইন্ডিয়া চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আপনার বাসায় মনি ভাইসহ মিটিং হয়েছিল। আমার ধারণা ছিল, সিরাজ ভাই ইমার্জেন্সি দেওয়ার পরের দিনই ইন্ডিয়া চলে যান। কিন্তু পরে জানলাম, মনি ভাইয়ের সঙ্গে ওনার মিটিং হয়েছে। ঘটনাটা আমাকে বলুন তো? ২৮ ডিসেম্বর রাতে ইমার্জেন্সি হলো।

মোস্তফা মোহসীন মন্টু: এটা তো প্রমিজ করে রেখেছিলাম, কাউকে বলব না, প্রকাশ করব না। সিরাজ ভাই যখন প্রকাশ করে দিয়েছে, তখন আমিও বলতে পারি।

মহি: বলেন। ইতিহাসের স্বার্থে বলেন। টুডে অর টুমরো এগুলো অন্যরা লিখবে। কিন্তু তারা লিখবে ভুল। সাধারণ মানুষ তো জানবে না?

মন্টু: মনি ভাই আমাকে বলল, 'আমি দুইটা লোকের সঙ্গে বসতে চাই। এটা তুই অ্যারেঞ্জ কর। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না জানে।'

দুজন কে কে?

সিরাজুল আলম খান আর কাজী জাফর।

মহি: ইমার্জেন্সি দেওয়ার পরে, না আগে?

মন্টু: আগে। আমি বললাম, কী ব্যাপার? মনি ভাই বললেন, 'দেখি ওদের ফেরত আনা যায় কি না। সবাইকে আবার একসঙ্গে করতে পারি কি না। বঙ্গবন্ধু তো একটা বড় কিছু পদক্ষেপ নিয়ে ফেলল। এটাকে যদি রক্ষা করতে হয়, এখান থেকে তো আর পেছনে ফেরা যাবে না। রক্ষা যদি করতে হয়, সবাইকে নিয়া রক্ষা করতে হবে। তা না হলে একটা বিপর্যয় ঘটবে।' এটা উনি ক্যাটাগরিক্যালি বলেছেন।

এটা কিন্তু প্রথম না। মনি ভাই এর আগেও বলেছিলেন, মোনায়েমি প্রশাসন দিয়ে স্বাধীন বাংলায় বঙ্গবন্ধুর প্রশাসন চলতে পারে না। এটা নিয়ে খুব বিতর্ক হয়েছিল। উনি কিন্তু আওয়ামী লীগের সেন্ট্রাল কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। শুধু যুবলীগের চেয়ারম্যান ছিলেন। একটা পর্যায়ে মন্ত্রীরা মনি ভাইকে ঠান্ডা করতে বঙ্গবন্ধুর কাছে গেছে। রিফটটা খুব শার্প হয়ে গিয়েছিল। জীবনের সবচেয়ে ক্ষতিকর অধ্যায়—ইংরেজিতে একটা শব্দ বলেছিল—'সেটব্যাক, আমি শেখ মুজিবের ভাগনে। উনি যখন জেলের ভেতরে, আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ বলে যখন কিছু ছিল না, তখন আমি শাহ মোয়াজ্জেমকে নিয়ে সারা বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে আওয়ামী লীগের পক্ষে সেন্টিমেন্ট দাঁড় করিয়েছি। আজকে আমাকে দোষারোপ করা হয় আমি আওয়ামী লীগবিরোধী। আমি আর আওয়ামী লীগ করব না। শ্রমিক ফ্রন্টে থাকব, আমার যুব ফ্রন্টে থাকব। তাঁর সঙ্গে আর থাকব না।' এই কথাগুলো কিন্তু...।

মহি: এটা রেকর্ডে আছে। উনি একবার সব পোস্ট থেকে

নিজেকে উইড্র করেছিলেন। আপনার দায় তো ইতিহাসের কাছে। তথ্যবিকৃতি না হলেই হলো।

মন্টু : এমন তথ্য যেন জনগণের কাছে না যায় যে তাঁদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে তাঁরা মারা গেছেন।

মহি : সিরাজ ভাই আর কাজী জাফরের প্রসঙ্গে আসুন।

মন্টু : আমার সব যোগাযোগ করত আমার ছোট ভাই। সিরাজ ভাই তখন আজিমপুরে চায়না বিল্ডিংয়ের কাছে থাকে। ওখান থেকে তাকে নিয়া আসলাম। মনি ভাইকেও নিয়া আসলাম। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা কথা বলেছে।

মহি : এই বাসায়?

মন্টু : হ্যাঁ, সামনের দিকে দোতলায় দুজনকে ঘরে আটকে আমি বাইরে চলে এলাম। কিছু কান্নাকাটি হলো। সিরাজ ভাই কিন্তু একপর্যায়ে রাজি হয়ে গেছে। বলছে, 'আর কেউ আসুক আর না আসুক, আমি চলে আসব। আমাকে কি সে (বঙ্গবন্ধু) সেভাবে বিশ্বাস করবে? আমি পদে যাব না। মন্ত্রিত্বে যাব না। সংগঠনে থাকব। কিন্তু আমার এই সব শর্ত আছে।'

মনি ভাই বলেছে, 'তোমার আর আমার এই সব নিয়া তো অনেক দিন ফাইট করেছি। সারা জীবন তো আমরা এটা নিয়েই কাটালাম। আমিও তো তোমার এইটা চাই। এ জন্য তো আওয়ামী লীগ ছাড়লাম। আমিও তোমার এটা সাপোর্ট করি।'

মানসিকভাবে তারা কিন্তু একমত, তারা দুজন সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবে। দুজন সংগঠনের লোক, প্রশাসনে যেতে চায় না। লালবাগে আমাদের যে হারুন আছে, তার সঙ্গে কাজী জাফরের ভালো সম্পর্ক। পরে জাতীয় পার্টি করেছে। বাকী নামে একটা ছেলে ছিল। তাকে পাঠালাম হারুনের কাছে। হারুনকে ফোন করে বললাম, তুমি জাফর ভাইয়ের খবর জানো?

মহি : কাজী জাফরের সঙ্গে মিটিংয়ের ব্যাপারটা বলেন।

মন্টু : জাফর ভাই আসলেন। মনি ভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। জাফর ভাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার, ফরেন মিনিস্টার হতে চেয়েছিলেন। মনি ভাই বললেন, বঙ্গবন্ধু মরে গেলেও এটা করবে না, যতক্ষণ কামাল হোসেন আছে।

সে তো এখানে নাই? সে তো নিচ্ছে না?

না থাকলেও...তুমি স্টেট মিনিস্টার হতে পারো। আমি চেষ্টা করব। বলব তোমার কথা। ডিসিশন বঙ্গবন্ধুই নেবেন। হয়তো

কামাল হোসেনের সঙ্গে আলোচনা করে ডিসিশন নেবেন।

আমরা কামাল হোসেনকে তেমন ইয়ে করি না। আমাদের বয়স প্রায় কাছাকাছি। যদিও সে আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে চলে গেছে।

তারপর জাফর ভাই চলে গেল।

মহি : উনি অ্যাগ্রি করে গেলেন?

মন্টু : হ্যাঁ, অ্যাগ্রি করলেন। স্টেট মিনিস্টার, ফরেন।

মহি : পরে এটা ওয়ার্ক আউট হলো না কেন?

মন্টু : তখন তো ক্যাওস। তারপর আমার এই ঘটনা ঘটল।

মহি : তার মানে কী? আপনাকে গভর্নর করল না?

মন্টু : না, ঢাকার সেক্রেটারি থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হলো। আমাদের ছেলেদের মধ্যে একটা উত্তেজনা, আনরেস্ট হয়ে গেল।

মহি : যুবলীগের সেক্রেটারি হওয়ার কথা ছিল আপনার?

মন্টু : না। যুবলীগের সেক্রেটারি তো তোফায়েল আহমেদ। যেহেতু তোফায়েল আহমেদ যুবলীগের সেক্রেটারি, সেহেতু মনি ভাই আমাকে যুবলীগে রাখবে না। এখন আমাকে সিটি আওয়ামী লীগের (বাকশাল) জয়েন্ট সেক্রেটারি করা হলো। পরে আমাকে চেঞ্জ করে এলাহিকে করা হলো।

মহি : মনি ভাই যে সিরাজ ভাই, জাফর ভাই, এদের সঙ্গে ডায়ালগ করছেন, এটা কি বঙ্গবন্ধুর নলেজে ছিল?

মন্টু : হ্যাঁ।[৩৭]

## ১৪

গণবাহিনীর কেন্দ্রে ছিলেন ফিল্ড কমান্ডার আবু তাহের এবং ডেপুটি কমান্ডার হাসানুল হক ইনু। রাজনৈতিক প্রধান হিসেবে মোহাম্মদ শাহজাহানকে পলিটিক্যাল কমিসার নিয়োগ করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের (খুলনা বিভাগ) পলিটিক্যাল কমিসার ও কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে শরীফ নুরুল আম্বিয়া এবং কামরুজ্জামান টুকু। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (রাজশাহী বিভাগ) পলিটিক্যাল কমিসার এবং কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মনিরুল ইসলাম এবং এ বি এম শাহজাহান। পূর্বাঞ্চলের (চট্টগ্রাম বিভাগ) পলিটিক্যাল কমিসার হন কাজী আরেফ আহমদ। এখানে কোনো আঞ্চলিক কমান্ডার নিয়োগ দেওয়া হয়নি। মধ্যাঞ্চলের দায়িত্ব হাসানুল হক ইনুর কাছেই ছিল। ঢাকা নগর

গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিসার ছিলেন রফিকুল ইসলাম (লিটল কমরেড নামে পরিচিত) এবং কমান্ডার ছিলেন আনোয়ার হোসেন।

গণবাহিনীর জেলা ও স্থানীয় শাখাগুলো নিজ নিজ শক্তি নিয়ে তাদের মতো করে 'প্রতিরোধ' লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। জেলা পর্যায়ের কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন মাহবুবুর রব সাদী (সিলেট), খন্দকার আবদুল বাতেন (টাঙ্গাইল), শাহজাহান খান (মাদারীপুর), অলোক সরকার (রংপুর), গোলাম মোস্তফা (ঝিনাইদহ), আবদুল কাইয়ুম (খুলনা), মতিয়ার রহমান মন্টু (চুয়াডাঙ্গা), মাহফুজুর রহমান (রাজশাহী), আবদুল মতিন মিয়া (রাজবাড়ী), মোস্তাফিজুর রহমান (নোয়াখালী), মারফত আলী (কুষ্টিয়া), মইন উদ্দীন খান বাদল (চট্টগ্রাম), রবিউল আলম (যশোর), আনিসুর রহমান খান (মানিকগঞ্জ) প্রমুখ।

গণবাহিনী অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছিল। ওই সময় কুষ্টিয়ায়, বিশেষ করে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় গণবাহিনীর কমান্ডার মতিয়ার রহমান মন্টু প্রতিপক্ষের কাছে রীতিমতো আতঙ্ক। কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ছিলেন মোফাজ্জল করিম। মন্টু সম্পর্কে তাঁর বয়ান থেকে জানা যায়, একশ্রেণির তরুণ কী অবলীলায় এই বিপজ্জনক পথ বেছে নিয়েছিলেন, কী ছিল তাঁদের প্রণোদনা। মোফাজ্জল করিমের ভাষ্যে জানা যায় একটি বিয়োগান্ত চরিত্রের নাম—মতিয়ার রহমান মন্টু।

> মন্টুর বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায়। লেখাপড়া সে বেশি করেনি বা হয়তো করতে পারেনি দারিদ্র্যের কারণে। তবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তার সাহসিকতার কথা সবার মুখে ফিরত।
>
> তারপর দেশ স্বাধীন হলো। মন্টু তখন এক আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক তরুণ। চোখে তার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন। কিন্তু অচিরেই সে ভীষণ রকম আশাহত হলো কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতার ক্রিয়াকলাপে। এরা মুখে দেশ গড়ার কথা, আদর্শের কথা বললেও রাতের অন্ধকারে দেশের সম্পদ সীমান্তের ওপারে পাচার করত। এ ধরনের একটা বড় পাচার মন্টু হাতেনাতে ধরে ফেলে, কোনো কোনো নেতার মুখোশ উন্মোচন করে দেয় জনগণের কাছে। ব্যস, আরকি। এমন 'সন্ত্রাসী' ছেলেকে তো আর বাড়তে দেওয়া যায় না। টগবগে তরুণকে একদিন যাঁরা স্বাধীনতার উষালগ্নে দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই যুবককে তাঁরা জেলে পুরলেন নানা অভিযোগ তুলে। অথচ চুয়াডাঙ্গাবাসী তথা বৃহত্তর কুষ্টিয়াবাসী জানত মন্টু নির্দোষ। তার একমাত্র অপরাধ, সে ওই সব ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অপকর্মে বাধা দিয়েছিল।

কিন্তু অসমসাহসী দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা মন্টুকে বেশি দিন জেলে আটকে রাখা যায়নি। হাতে-পায়ে বেড়ি নিয়ে একদিন সে জেলখানা থেকে চম্পট দিল সবার চোখে ধুলো দিয়ে। জেল থেকে কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে গিয়ে এক কামারশালায় নাকি হাত-পায়ের বেড়ি কাটিয়ে নিয়ে গা-ঢাকা দেয় পাকাপোক্তভাবে।

এরপর শুরু হলো মন্টুর আরেক জীবন। তার ছোট ভাই লাল্টু এবং আরও অনেক তরুণকে নিয়ে সে গড়ে তোলে মন্টু বাহিনী। এই বাহিনীর সবাই ছিল অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত গ্রামের ছেলে, কেউ কেউ ছিল মুক্তিযোদ্ধা। এরা, তাদের ভাষায়, শ্রেণিশত্রু নিধনের কর্মসূচি শুরু করে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর মহকুমা ও আশপাশে ঝিনাইদহ-হরিণাকুণ্ডু এলাকায়।

ওদিকে ছিল আবার আরেক উপদ্রব। মূলত রাজনৈতিকভাবে বিরুদ্ধচারী গোপন সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে সরকার গড়ে তুলেছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী, সংক্ষেপে জেআরবি। তবে মাঝেমধ্যে প্রয়োজনবোধ করলে কোনো কোনো অপারেশনে তারা পুলিশের সাহায্য নিত। কিন্তু পুলিশ সাহায্য করবে কি! থানা আক্রমণ, অস্ত্র লুট, পুলিশ খুন ইত্যাদি কারণে তারা এমন ডিমরালাইজড ছিল যে আমার মনে হয় ওই সব অপারেশনে গিয়ে পুলিশ 'ক্যাচ ফিশ, নো-টাচ ওয়াটার' পলিসিই নিত।

তা একবার পুলিশ কিন্তু দারুণ সাহস দেখিয়ে ফেলল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা চুয়াডাঙ্গার পরের রেলস্টেশন জয়রামপুরের কাছেই গ্রামের একটি বাড়িতে ঘেরাও দিল। ওই বাড়িতে মন্টু, তার স্ত্রী এবং দলের লোকজন দিনেদুপুরে খাসি জবাই করে বিরানি-টিরানি সাবড়াচ্ছিল। মন্টু অবস্থা বেগতিক দেখে সোজা ফায়ার করতে করতে পালিয়ে গেল পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে। কিন্তু পালাতে পারল না তার বউ এবং আরও দু-চারজন সঙ্গী। পুলিশ সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে এদেরই হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে এল চুয়াডাঙ্গায়।

মন্টু গ্রামের বাইরে এসে দেখে তার বউ সঙ্গে নেই। সে তখন আবার ফিরে গেল ওই গ্রামে। গিয়ে দেখে পুলিশ তখনো গিজগিজ করছে চারদিকে। তার চোখে পড়ল গ্রামের বাইরে লাইন করে দাঁড় করানো পুলিশের গাড়িগুলোর দিকে। ওই সব গাড়ির চালক এবং সেন্ট্রিরা জমির আলের ওপর বসে বসে সুখ-দুঃখের কথা বলছিল আর আনমনে জমি থেকে মটরশুঁটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবুচ্ছিল। হায়! ওটাই তাদের জীবনের শেষ খাওয়া। এক ব্রাশফায়ারে আটজন পুলিশ

কনস্টেবল খতম। সেদিন ছিল ১৩ মার্চ ১৯৭৫। রাতে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনসে সারিবদ্ধ লাশগুলো দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এর তিন দিন পর ১৭ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী হেলিকপ্টারে কুমারখালী এলেন উপনির্বাচনের সভায় যোগ দিতে। কিছুদিন আগেই ওখানকার এমপি গোলাম কিবরিয়া সাহেব ঈদের জামাতে নিহত হন আততায়ীর গুলিতে। প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় দিয়ে সন্ধ্যার একটু পরে শহরের কাছে গড়াই নদের ফেরি পার হয়ে ফিরে এলাম কুষ্টিয়ায়।

রাত তখন প্রায় আটটা। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। অপারেটর বলল, স্যার, মুন্সিগঞ্জ বাজারের পিসিও (পাবলিক কল অফিস) থেকে মন্টু বলে একজন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বললাম, দিন লাইন। এরপর প্রায় ৪৫ মিনিট কথাবার্তা হলো আমাদের। মন্টু কখনো আবেগে-উচ্ছ্বাসে, কখনো রেগে গিয়ে যা বলল, তার সারকথা হচ্ছে, আমরা কেন তার স্ত্রীকে আটকে রেখেছি।

মার্চ মাসের ২০ তারিখ। ঘড়ির কাঁটা রাত ১২টা পার হয়ে ১টা ছুঁই ছুঁই করছে। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন বাজল। ফোন ধরতেই ওপার থেকে শোনা গেল, স্যার, আমি মেহেরপুর এক্সচেঞ্জ থেকে অপারেটর বলছি। আপনার এসডিও অফিসে অ্যাটাক হয়েছে।

উল্কাবেগে গাড়ি চালিয়ে ছুটে চললাম সাদা শার্টের ওপর ক্রসবেল্ট বাঁধা অ্যাডিশনাল এসপিকে পাশে বসিয়ে। শহরে যখন ঢুকলাম, তখন আর গুলির আওয়াজ নেই। কোর্ট ভবন জ্বলছিল দাউ দাউ করে। এসডিওকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ট্রেজারির 'ডাবল লকের' কী খবর? শুনলাম ওটা ভাঙতে পারেনি।

সে সময় মেহেরপুর ট্রেজারি ও বরগুনা ট্রেজারি ছিল বাংলাদেশের একমাত্র ক্যাশ ট্রেজারি। ভয়টা ছিল সে জন্যই। তাড়াতাড়ি এসডিওর বাসা থেকে চাবি আনিয়ে ট্রেজারির ডাবল লক খোলা হলো। এক ফাঁকে সবাই মিলে দেখে নিলাম সেদিনকার ক্লোজিং ব্যালান্স ১ কোটি ৭ লাখ কয়েক শ টাকা। তবে দুঃখের বিষয়, ট্রেজারির কোয়ার্টার গার্ডে তখন প্রায় ৭০-৮০টি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ছিল। এগুলোর প্রায় সব কটি নিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতকারীরা। আসলে ওটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।

মেহেরপুর ট্রেজারি আক্রমণের দু-তিন দিন পর উড়ো উড়ো শোনা গেল মন্টু মারা গেছে ওই অপারেশনে। আরও ভালো করে

তথ্য-তালাশ নিয়ে জানা গেল সত্য ঘটনা। নিশ্চিত হওয়া গেল, ওই আক্রমণ মন্টুর দলই করেছিল। দলে ছিল প্রায় ১০০ লোক। মন্টু সবার আগে আগে গুলি চালাতে চালাতে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল ট্রেজারির দিকে, তখনই আচমকা তলপেটে গুলিবিদ্ধ হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একটুক্ষণ পরেই সে মারা যায়।

মন্টু মারা যাবে, এটা যেন বিশ্বাসই করা যায় না। কদিন পরই আমরা খোঁজ পেয়ে গেলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার ভেতর মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশে টুঙ্গী গ্রামে এক বাড়ির সবজিখেতে মন্টুকে তড়িঘড়ি করে মাটিচাপা দিয়ে ওই ভোরবেলায়ই কবরের ওপর ডাঁটাশাক, লালশাক ইত্যাদি গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন মেহরাব আলী চৌধুরী ছুটলেন দলবল নিয়ে মন্টুর দেহাবশেষ কবর থেকে তুলে নিয়ে আসতে।

স্বাধীনতার পর মন্টু যে জীবন বেছে নিয়েছিল, তার পরিণতি এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধার এই করুণ পরিণতি কেন হলো? স্বাধীনতার এত বছর পরও এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। মিলবে কী করে? প্রশ্নই যে করা হয় না।[৩৮]

## ১৫

এর মধ্যে ঘটে গেল ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড। এক সেনা-অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবার নিহত হলেন। বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হলেন। মন্ত্রিসভার অল্প কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছাড়া সবাই খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। গণবাহিনীর কমান্ডার আবু তাহের এবং ডেপুটি কমান্ডার হাসানুল হক ইনু ঢাকা বেতার কেন্দ্রে গিয়ে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাহের খন্দকার মোশতাকের কাছে অবিলম্বে সামরিক শাসন জারি এবং বাকশালকে বাদ দিয়ে একটি জাতীয় সরকার ঘোষণার দাবি জানান। তাহেরের কথায় কান দেননি মোশতাক। তবে তিনি ২০ আগস্ট সামরিক আইন জারি করে ১৫ আগস্ট থেকে তা বলবৎ হবে বলে প্রজ্ঞাপন জারি করেন। অভ্যুত্থানের ৯ দিন পর ২৪ আগস্ট মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে সরিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হয়। ভারতে প্রশিক্ষণে থাকা অবস্থায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান নিযুক্ত করা হয়।

জাসদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিকল্পনা হোঁচট খায় আগস্ট অভ্যুত্থানের কারণে। ওই সময় সিরাজুল আলম খান ছিলেন কলকাতায়। অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেমনটি তাঁরা চেয়েছিলেন, সেটি হয়নি। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চের কারণে অনেক হিসাব-নিকাশ আগেই বদলে গিয়েছিল। ১৫ আগস্ট সব এলোমেলো করে দিল।[৩৯]

সিরাজুল আলম খান জানুয়ারি (১৯৭৫) মাসে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন পঁচাত্তরের মার্চে। জুলাইয়ের শেষ দিকে তিনি আবারও কলকাতায় চলে যান। ফিরে আসেন সেপ্টেম্বরে। সে সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। ওই সময়ে সিরাজুল আলম খানের গতিবিধি সম্পর্কে মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আমাকে যা বলেছেন, তা এখানে তুলে ধরা হলো :

> মুবিনুল হায়দার চৌধুরী : বাকশাল যেদিন হলো, ২৫ জানুয়ারি বোধ হয়, সিরাজুল আলম খান সেদিন কলকাতায় ছিলেন। বাকশাল হবে, এটা তিনি জানতেন।
>
> মহিউদ্দিন আহমদ : সিরাজুল আলম খান আমাকে যেটা বলেছেন—২৮ ডিসেম্বর (১৯৭৪) দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলো। এরপর শেখ মুজিবের সঙ্গে ওনার একটা মিটিং হওয়ার কথা ছিল—২ জানুয়ারি (১৯৭৫)। মিটিংটা ক্যানসেল হয়ে যায়। তারপর তিনি কলকাতায় চলে যান।
>
> হায়দার : যেদিন ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করে, তার পরদিনই উনি কলকাতায় যান।
>
> মহি : আমি কার কাছে যেন শুনেছিলাম, কোথাও লিখি নাই, যেহেতু এটা ভেরিফায়েড না। উনি আর আপনি নাকি ইমার্জেন্সি দেওয়ার পর একসঙ্গে কলকাতা গিয়েছিলেন?
>
> হায়দার : আমি যশোর পর্যন্ত ওনার সঙ্গে গেছি। তারপর ওনাকে বাসে তুলে দিয়ে আমি ব্যাক করে চলে এলাম।
>
> মহি : বেনাপোলের বাসে?
>
> হায়দার : হ্যাঁ।
>
> মহি : আপনি ঢাকায় চলে এলেন?
>
> হায়দার। না। আমি খুলনায় গেলাম। সেখান থেকে পরে পরিচিত লোক সঙ্গে নিয়ে ভেড়ামারা এসে শিকারপুর দিয়ে বর্ডার পার হলাম। তারপর কলকাতায় ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছে।
>
> মহি : ভবানীপুরে?
>
> হায়দার : না। উনি পার্টি অফিসে এসেছিলেন—এসইউসিআই।

তারপর যোগাযোগ করলেন আমার সঙ্গে।

মহি : পার্টি অফিস কোথায়?

হায়দার : ৪৮ লেনিন সরণি। আগে এটা ছিল নন্দলাল স্ট্রিট।

মহি : সিরাজ ভাই আমাকে যে স্টোরিটা বলেছেন—উনি ইমার্জেন্সি দেওয়ার পর কলকাতা চলে যান। মার্চে কিছুদিনের জন্য ফিরে এসেছিলেন। তারপর আবার চলে যান। সেকেন্ড টাইম উনি আসেন সেপ্টেম্বরে। ওই সময় তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছিল।

হায়দার : প্রথম যেবার বেনাপোল দিয়ে গেলেন, তারপর তো ওনার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাসপোর্ট আর ব্যবহার করার মতো ছিল না। বেশ কিছুদিন থাকার পর আমরা আবার কলকাতা গেলাম। এবার বিলোনিয়া-আগরতলা হয়ে।

মহি : এটা কি ১৫ আগস্টের আগে?

হায়দার : হ্যাঁ। শেখ মুজিব যেদিন নিহত হলেন, সেদিন কিন্তু উনি আমাদের সঙ্গে কলকাতায়। বললাম, কী ব্যাপার, কিছু জানেন নাকি? উনি বললেন, এ রকম তো হওয়ার কথা ছিল না? আমাকে পরিষ্কার করে কিছু বললেন না।

মহি : এরপর আপনারা সেপ্টেম্বরে আবার ঢাকায় ফিরে এলেন?

হায়দার : ওনাকে নিয়ে ব্যাক করলাম। পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে আমাদের পার্টির একজন, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, এসইউসিআইয়ের একজন কমরেড, নাম জালাল, তার বাসায় উঠলাম। সেখান থেকে হলদিবাড়ি। হলদিবাড়ি হলো কোচবিহার জেলার একটা এলাকা। রাতে এক বাড়িতে ছিলাম। উনি দাড়ি শেভ করে ফেললেন। ওখান থেকে চিলাহাটি হয়ে আমরা ভেতরে আসি।

আমাদের কাছে ১০-১৫ হাজার টাকা ছিল। সব ১০ টাকার নোট। বেশ বড় বোঝা। তখন ভোর। আমরা এক জায়গায় বসলাম। বর্ডার পার হওয়ার ব্যাপারে আমি তো ওনার চেয়ে বেশি এক্সপার্ট। বললাম, একজন লোক আমাদের অবজার্ভ করছে। হকচকিত হবেন না। নরমাল থাকেন। যাহোক, অসুবিধা হয় নাই। সেই লোকের সাহস হয়নি আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের একটু ভিন্ন ধরনের লোক মনে হচ্ছে তো? নজরে পড়তেই পারে। জালালকে দিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটালাম। আমরা ট্রেনের একটা কামরায় উঠলাম।

মহি : এটা কোন জায়গায়?

হায়দার : চিলাহাটি রেলস্টেশন। বাংলাদেশের রেলপথ ওখানেই শেষ। ওখান থেকেই দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা।

ট্রেনের কামরায় এক ভদ্রলোক এসে আমাদের পাশে বসলেন। বললেন, 'আমি কাস্টমস অফিসার। কোত্থেকে এসেছেন?'

উনি বললেন, 'আমাদের তো এই গ্রামে বাড়ি।' অনর্থক একটা স্টোরি বানানোর চেষ্টা। ওরা এই এলাকায় থাকে না? সবাই সবাইকে চেনে। বললাম, না না, আমরা দার্জিলিং গিয়েছিলাম বেড়াতে। এখন ফিরে যাচ্ছি। আমার কথা ওই লোকের কাছে রিজনেবল মনে হলো। আমাদের বলল, 'কাস্টমস সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব আপনাদের একটু ডেকেছেন।'

চলেন যাই। ট্রেন থেকে নামলাম।

আমাদের কাছে টাকা দেখে বলল, 'এত টাকা?' এই সব প্রশ্ন, হাবিজাবি কথা। তখন নিরাপত্তা বাহিনীর কেউ একজন ওনাকে ভালো করে দেখছে। ওনার তো তখন দাড়ি নেই। হঠাৎ ওই লোক বলে উঠল, 'আপনি সিরাজুল আলম খান না দাদা?'

আমরা তাকে টাকাপয়সা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারতাম। কোনো ঝামেলা হতো না। মনে মনে ঠিকও করে ফেলেছিলাম। কিন্তু সুপারিনটেনডেন্ট চিনে ফেলেছে। তার ছেলে আবার জাসদ করে। তখন উনি আমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে নীলফামারী গেলাম। জালালের এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলাম সেখানে তাকে নিয়ে যেতে এক লোক এসেছে। আমাকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে, মোটরসাইকেলে করে। আমি আর তার সঙ্গে গেলাম না। আমি ওখান থেকে দিনাজপুর চলে গেলাম। কয়েক দিন পর গেলাম ঢাকায়।

মহি : এটা কি ৭ নভেম্বরের আগে?

হায়দার : আগে।

মহি : ঢাকায় এসে আবার ইন্ডিয়ায় গেলেন কেন?

হায়দার : সেটা ওনার প্রয়োজন। আর আমি তো আসা-যাওয়া করিই।

মহি : কলকাতায় উনি কোথায় কোথায় যেতেন? কী করতেন?

হায়দার : আমি তো সবটা জানি না। আমার সঙ্গে দেখা হলে কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে যেতাম। এ ছাড়া মেট্রো সিনেমা হলের পেছনে একটা রেস্তোরাঁয় আমরা মাঝেমধ্যে আড্ডা দিতাম।

সেখানে বাংলাদেশের একটা ছেলে—তার বাবা কলকাতা করপোরেশনে চাকরি করত। একটা বাচ্চা ছেলে। খুব মিষ্টি চেহারা। সে এসেছিল ঢাকা থেকে। পরে সে ইন্ডিয়ান হাইকমিশনে একটা ঘটনায় মারা যায়।

মহি : এটা কি বাচ্চু?

হায়দার : না। বাচ্চু না। বাচ্চুকে আমি চিনতাম। সে তো সিরাজুল আলম খানের সঙ্গেই থাকত আজিমপুরের একটা বাড়িতে। আমিও কিছুদিন সে বাড়িতে থেকেছি।

মহি : তাহলে বাহার, মাসুদ কিংবা হারুন?

হায়দার : মাসুদ। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে বোমা মেরে কলকাতায় চলে এসেছে। এখানে রাস্তায় দেখা হয়েছে। ও একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি তাকে কলকাতায় চিকিৎসা করিয়েছি। ওর জন্য খুব কষ্ট হয়। একেবারে কচি ছেলে।

মহি : সিপাহি বিদ্রোহের সময় আপনি কোথায়?

হায়দার : তখন আমি ঢাকায়। আমি একটা বস্তিতে থাকি।[৪০]

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পালাবদল নিয়ে জাসদের ভেতরে আলাপ হয়েছিল। দলের মূল্যায়ন ছিল, এর ফলে ভারত-সোভিয়েত প্রভাব থেকে দেশ কিছুটা মুক্ত হবে। তবে তাতে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বাড়বে। পঁচাত্তরের অক্টোবরে প্রকাশিত জাসদের একটি দলিলে এ তথ্য উঠে এসেছে। এখানে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করা হলো :

> শেখ মুজিবের হত্যার মধ্য দিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশে যে সরকার গঠিত হয়েছে, তার দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের কোনোই পরিবর্তন সাধিত হয়নি। শেখ মুজিব এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ—দুজনই বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। মিলিটারি, পুলিশ প্রশাসন, সরকারি আমলা, কর্মচারীদের মধ্যে মুজিব ও তাঁর পরিবারের চূড়ান্ত ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের জন্য যে চরম মুজিববিরোধী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল, তারই পরিণতিতে খন্দকার মোশতাক আহমদকে সামনে রেখে কার্যত সামরিক বাহিনী শেখ মুজিবকে অপসারণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। এর দ্বারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় বুর্জোয়া বা প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রেসিডেনশিয়াল শাসনপদ্ধতি চালু করার মারফত শেখ মুজিব কর্তৃক সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী সোভিয়েত এবং ভারতের পুরোপুরি সাহায্য ও সমর্থনের ফলে শেখ

> মুজিব যতটুকু পরিমাণে সোভিয়েত ও ভারতের শাসকগোষ্ঠীর চাপের কাছে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, এই পরিবর্তনের ফলে বৈদেশিক ক্ষেত্রে তাঁর হাত থেকে বাংলাদেশ খানিকটা মুক্ত হবে এবং ততটুকু অর্থে বাংলাদেশে পশ্চিমি, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ সহজতর হবে।[৪১]

## ১৬

৩ নভেম্বর ভোরে সেনাবাহিনীর একটি অংশ সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান ঘটায়। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করা হয়। খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হন। খালেদ মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি নিয়ে সেনাপ্রধান হন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবুসাদাত মো. সায়েম রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন। জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়।

বঙ্গভবনে যখন ক্ষমতার পালাবদল চলছে, তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ চারজন জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। এঁরা হচ্ছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান। হত্যাকাণ্ডের দায় বর্তায় খন্দকার মোশতাক ও ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীদের ওপর। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীরা ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় একটি বিশেষ বিমানে করে ঢাকা থেকে ব্যাংকক চলে যান। এটা ছিল ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যকার সমঝোতার একটি অংশ।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে সাধারণ সৈনিকেরা ভালোভাবে নেননি। সারা দেশে একধরনের চাপা উত্তেজনা ছিল। অভ্যুত্থানকারীরা ভারতের দালাল হিসেবে প্রচার পান। ওই সময় জাসদ ছিল বেশ তৎপর। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সেনানিবাসে লিফলেট বিতরণ করে খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানায়। ৬ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা সেনানিবাসে ঘটে যায় 'সিপাহি অভ্যুত্থান'।

৬ নভেম্বর মাঝরাত থেকে লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে ইংরেজি সাপ্তাহিক *ওয়েভ*-এর সম্পাদক কে বি এম মাহমুদের বাসা থেকে অভ্যুত্থান পরিচালনা করছিলেন। সৈনিক সংস্থার হাবিলদার আবদুল হাইকে তিনি দায়িত্ব দিলেন 'জিয়াকে মুক্ত করে' তাঁর কাছে

নিয়ে আসতে। এ পর্যায়ের একজন অভিজ্ঞ সামরিক কর্মকর্তা হয়েও তাহের কী করে ভাবলেন একজন হাবিলদার-সিপাহির কথায় একজন জেনারেল তাঁর নিজস্ব ভিত সেনানিবাস ছেড়ে চলে আসবেন? এ ধরনের চিন্তা নিতান্তই স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক, একেবারেই বালখিল্য।

৭ নভেম্বরের 'বিপ্লব' নিমেষেই পরিণত হলো অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সে। সকালে শহীদ মিনারে জাসদের তরুণেরা অপেক্ষা করছিলেন, তাহের ও জিয়া আসবেন এবং ভাষণ দেবেন। তাঁরা কেউ আসেননি। জিয়া ও মোশতাকের ছবি নিয়ে সৈনিকেরা ট্রাক মিছিল করেছিলেন। জাসদের তরুণেরা মোশতাকের ছবি ট্রাক থেকে টেনে নামাতে গেলে সৈনিকদের সঙ্গে বচসা হয়। পরদিন বায়তুল মোকাররমে জাসদের জমায়েতে সেনাসদস্যরা হামলা করেন, গুলি ছোড়েন। গুলিতে আ ফ ম মাহবুবুল হক আহত হন।

সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে পথচারীরা লাঞ্ছিত হন। লম্বা চুলওয়ালা তরুণেরা যথেষ্ট দুর্ভোগের শিকার হন। *গণকণ্ঠ*-এর স্টাফ রিপোর্টার মোস্তাফা জব্বার সহকর্মী ডালিমকে সঙ্গে নিয়ে মোটরবাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঢাকা ক্লাবের সামনে তাঁরা সেনাসদস্যদের বাধার মুখে পড়েন। দুজনের মাথায় লম্বা চুল। সৈন্যরা তাঁদের মাথায় সিঁথি বরাবর ক্ষুর চালিয়ে চুল কামিয়ে দিলেন। সে এক কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা! দুজনের মাথায় দুই পাশে লম্বা চুল ঝুলছে, মাঝখানটা একেবারে ফাঁকা। তাঁরা তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন সেখান থেকে। পরে পুরো মাথা ন্যাড়া করে তবে স্বস্তি।[৪২]

এ অভ্যুত্থানে সেনানিবাসের সর্বস্তরের সৈনিকেরা ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের অবস্থান ছিল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে। অন্তরীণ জিয়াউর রহমানের প্রতি তাঁদের সমর্থন, আস্থা ও ভালোবাসা ছিল। এটাই ছিল জিয়ার শক্তি। এ শক্তির বলেই তিনি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর অবস্থান সংহত করতে সক্ষম হন। তাহেরকে তখন জিয়ার সঙ্গে দর-কষাকষিতে নামতে হয়। একজন সাবেক কর্মকর্তা ও 'বহিরাগত' হিসেবে সেনানিবাসে তাহেরের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মেজর জিয়াউদ্দিন ছাড়া আর কোনো সেনা কর্মকর্তাকে তিনি পাশে পাননি।

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম জাসদের বিপ্লবী পার্টির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিসার মনিরুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি ৭ নভেম্বরের বিপর্যয়ের একটা ব্যাখ্যা দিলেন :

> মহিউদ্দিন আহমদ : জাসদ বিপ্লব করল। রেডিওতে ঘোষণা দিয়ে গণবাহিনীর কথা বলা হলো। আপনারা ক্ষমতা নিলেন না কেন?



www.amarboi.com

মনিরুল ইসলাম

মনিরুল ইসলাম : আমরা যে দাবিই করি না কেন, আমাদের একক শক্তিতে তো অভ্যুত্থান হয়নি।

মহি : তাহলে অভ্যুত্থান ঘটাতে গেলেন কেন? আরও অপেক্ষা করতেন? আপনাদের সামনে উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের মডেল তো ছিল?

মনিরুল : আমরা কীভাবে অপেক্ষা করব? ঘটনা তো ঘটে যাচ্ছে? আমরা পার্টিসিপেট না করলেও ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থান হতো।

মহি : তাহলে এই অভ্যুত্থানে আপনাদের অংশ নেওয়ার রাজনৈতিক লজিকটা কী?

মনিরুল : লিফলেট দিয়ে তো সৈনিকদের উসকে দেওয়া হয়েছে, উত্তেজিত করা হয়েছে। এখান থেকে ফেরা যেত না।[৪৩]

জিয়াউর রহমানকে সামনে রেখেই ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাহের। জাসদকে বুঝিয়ে রাজিও করিয়েছিলেন। কিন্তু জিয়ার সঙ্গে কী সমীকরণ দাঁড়াবে, এ নিয়ে তাহেরের হিসাব ছিল নিতান্তই অপরিপক্ক। অভ্যুত্থানের মূল শক্তিকেন্দ্র যে জিয়া, এটা পরে প্রমাণিত হয়েছে।

ওই সময় তাহের এবং জাসদ ভারতবিরোধী জিগির তুলে খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে অতি-জাতীয়তাবাদী মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছিল। সেনা মনস্তত্ত্বে কাল্পনিক বা সম্ভাব্য 'ভারতীয় আগ্রাসন' সম্পর্কে ভীতি ছিল। ফলে জাসদের প্রচার জিয়াউর রহমানের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করে। সেনাবাহিনী এবং সাধারণ মানুষের ধারণা হলো, জিয়া ভারতবিরোধী। তিনি জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং জাসদ বিশৃঙ্খলা তৈরি করে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দেশের ক্ষতি করতে চাইছে।

৬ নভেম্বর রাত এবং ৭ নভেম্বর ভোরের মধ্যবর্তী অংশের একজন সাক্ষী এবং অংশগ্রহণকারী ছিলেন সাপ্তাহিক *ওয়েভ* পত্রিকার সম্পাদক কে বি এম মাহমুদ। ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে তাঁর বাসাটি ছিল জাসদের অনেক নেতা-কর্মীর রীতিমতো এক আড্ডাখানা। ওই রাতে তাহের সেখানেই ছিলেন। *সাপ্তাহিক* পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কে বি এম মাহমুদ বলেন :

আমি প্রথম সাইফুল বারীর বাড়ি গেলাম। তিনজন বা চারজন

সৈনিক আমার গাড়িতে ছিল। আমি বললাম, বারী ভাই, চলেন বেতার খুলতে হবে। তখন চারদিকে নানা রকম গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে। বারী ভাইয়ের সহধর্মিণী আমার পায়ে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ভাই, আমার তিনটে বাচ্চা পিতৃহারা হবে। আপনি মাফ করে দেন। ওনাকে মাফ করে দেন।' আমি বললাম, ভাবি, আমার সাতটা বাচ্চা যদি পিতৃহারা না হয়, আপনার তিনটে বাচ্চাও পিতৃহারা হবে না।

সৈনিকেরা বলছে, ধরে নিয়ে যাব। আমি বললাম, না, থামেন, উনি আমার বড় ভাইয়ের মতো। পেশায় দুই বছরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। একসঙ্গে চাকরি করেছি। আমি তখন বললাম, বারী, আমাকে বলেন কী করা যাবে। বললেন, 'তুমি একটু মহাপরিচালক জামান সাহেবকে অনুরোধ করো।' আমি বললাম, আমার তো ওনার সাথে কোনো পরিচয় নেই। বলল, 'আমি ফোন লাগিয়ে দিচ্ছি, তুমি কথা বলো।' তিনি ফোন লাগিয়ে দিলেন জামান সাহেবকে। তিনি থাকেন ঢাকা কলেজের বিপরীতে। আমি ওনাকে বললাম, ভাই, আমি মাহমুদ বলছি। একটা আকস্মিক ঘটনা আছে। বাংলাদেশ বেতার খুলতে হবে। বলে আমি একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমার তো পরিবহন নেই, কী করে যাব?' বললাম, আসছি আপনাকে এগিয়ে নিতে।

গেলাম ওনাকে বেতারকেন্দ্রে নিয়ে যেতে। ততক্ষণে শামসুদ্দিন বলে একটা ছেলে ছিল, *গণকণ্ঠ*-এ চাকরি করত, ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। ওখানে বসে আমরা পাণ্ডুলিপি তৈরি করে একটা ক্রুকে পাঠালাম জিয়াউর রহমানের বক্তৃতা ধারণ করার জন্য। অপেক্ষা করলাম। সিরাজুল আলম খান দূরালাপনীতে আমাকে শ্রুতিলিপি বলে দিলেন, যেটা আমি সম্প্রচার করিনি। কোনো যৌক্তিকতা নেই। আগে যেসব কথা হয়েছে, সেগুলো বাদই দিতে হয়। এখন আমি বুঝি ওটা কেন বলেছিল।[৪৪]

মাহমুদের ভাষ্যে আরও কিছু কথা ছিল, যেগুলো ব্যক্তিগত, মন্তব্যমূলক। পরে তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে সিরাজুল আলম খান চেয়েছিলেন 'সবাইকে ধ্বংস করে' দিতে। 'তারপরে যে একাধিক হত্যাচেষ্টা কর্নেল তাহেরের ওপর হয়েছে, যেগুলো আমি মনে করি এ ধরনের ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ।'[৪৫]

মাহমুদ পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন তিনি কারাগারে তাহেরের সহবন্দী ছিলেন। জলিল-রব-তাহেরদের বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছিল, তার

বিচার চলেছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে একটি বিশেষ সামরিক আদালতে। মাহমুদ অবশ্য বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন। জেলে থাকা অবস্থায় তাহেরের সঙ্গে তাঁর কথার সূত্র ধরে মাহমুদ বলেন, 'যখন আমি কর্নেল তাহেরের সঙ্গে বিচারাধীন, তখন তার সঙ্গে আমার একান্তে কিছু কথা হয়। তার কতগুলো মন্তব্যে আমার মনে হয়েছিল জেলে যাওয়ার পর উইথ হাইন্ডসাইট (ফিরে দেখা) তিনি অনুভব করেছিলেন, ৭ নভেম্বর আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা যা ঘটানো হয়েছিল, তার আলটিমেট উদ্দেশ্য ছিল আমাদের অজান্তে একটি প্রতিবিপ্লব ঘটানো।' মামলা চলাকালে (জুন ১৯৭৬) মাহমুদের সঙ্গে তাহেরের একান্ত কথাবার্তা উঠে এসেছে *সাপ্তাহিক*-এ ছাপা হওয়া এই সাক্ষাৎকারে।

> তাহের: মি. মাহমুদ, ইতিহাসে আমাদের ৭ নভেম্বর একটি প্রতিবিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?
>
> মাহমুদ: আজ অবধি যা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় এ সম্ভাবনা ভালোমতোই আছে।
>
> তাহের: এ রকম যাতে না হয়, এ জন্য কি কোনো পথ বের করা যায়? (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) আমি কিছু একটা করব।
>
> মাহমুদ তখন বুঝতে পারেননি, 'কিছু একটা করা' সম্বন্ধে তাহের কী বলতে চেয়েছিলেন? 'পরবর্তী কয়েক দিনের কোর্ট প্রোসিডিংসে তাহেরের দৃঢ় অবস্থান ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। তাহের ফাঁসির কাঠগড়ায় যাবার জন্য যে প্রস্তুত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠল। যাতে তার জীবনের বিনিময়েও অন্তত ৭ নভেম্বরের কাউন্টার রেভল্যুশন চরিত্রটি কিছু পরিমাণে হলেও মুছে ফেলা যায়।'[৪৬]

৭ নভেম্বর এবং পরের বিয়োগান্ত পরিস্থিতির জন্য মাহমুদ দায়ী করেন সিরাজুল আলম খানকে। তাঁর মতে, ৭ নভেম্বর কী ঘটতে যাচ্ছে, তার পূর্ণ রাজনৈতিক উপলব্ধি তাহেরের ছিল না। তাঁকে যেটা করতে বলা হয়েছিল, তিনি সেটাই করেছিলেন। এর ফল কী দাঁড়াবে, এর লক্ষ্য কী, ৭ নভেম্বরের আগে এটা জানতেন শুধু সিরাজুল আলম খান। মাহমুদের মূল্যায়ন হলো:

> অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে একটি যুবশক্তির উদ্ভব হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। যাঁরা তাঁদের শ্রেণিচরিত্র ভুলে সংগঠিত হয়েছিলেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে। ওই সময় পৃথিবীর কোনো দেশেই এত অল্প সময়ে এই মাপে ও কলেবরে কোনো বিপ্লবী শক্তির উত্থান হয়নি, যা বাংলাদেশে সম্ভব হয়েছিল। কারণ,

আমাদের তরুণেরা কোনো আদর্শের সন্ধান পেলে তার জন্য মরতে ভয় পায় না।

দুর্ভাগ্য এই যে বাংলাদেশের এই অবিশ্বাস্য উত্থানের যে কারিগর ও রূপকার ব্যক্তিটি, তিনিই আমাদের ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে পর্দার অন্তরালে এক নীলনকশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যার দায় মেটাতে অবশেষে নিজেই যবনিকা টানেন বাংলাদেশের প্রথম প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের, সেই নীলনকশার চার্টেড কোর্স অনুযায়ী। সফলভাবে নিক্ষেপ করেন এক প্রজন্মের পুরো যুবশক্তিকে বঙ্গোপসাগরে, যার সঙ্গে তুলনীয় হ্যামিলিনের বংশীবাদকের সেই কাহিনিটি।[৪৭]

## ১৭

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে কর্নেল তাহেরের সব সময় যোগাযোগ ছিল। অভ্যুত্থানকারীরা ৩ নভেম্বর দেশ ত্যাগ করেন। ওই দিন তাহের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে দিনভর বঙ্গভবনে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সমঝোতা হয় যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে জিয়াউর রহমান আবার সেনাপ্রধান হবেন এবং আগস্ট অভ্যুত্থানের কুশীলবরা দেশে ফিরে আসবেন।[৪৮] তাহেরের পরামর্শে ৬ নভেম্বর রাতে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র নামে যে ১২ দফা দাবিনামা তৈরি করা হয়েছিল, তার ১০ নম্বর দফায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়—যেসব সামরিক অফিসার ও জওয়ানকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এর অর্থ হলো, ৩ নভেম্বরের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া। এ তথ্যটি জাসদের হাজার হাজার তরুণের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। তাঁরা অনেকেই ১২ দফা পড়েও দেখেননি। ৭ নভেম্বর সকালে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ছিটকে পড়ে তাহের ব্যাকফুটে চলে যান এবং জিয়াবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

৭ নভেম্বর নিয়ে জনমনে যেমন ধোঁয়াশা ছিল, দলের মধ্যেও ছিল বিভ্রান্তি। সবাই সবটা জানেন না। বোঝা যায়, চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে একাধিক কেন্দ্র ছিল। সবাই ঘটনাটি যাঁর যাঁর মতো ব্যাখ্যা করেছেন। এ নিয়ে দলের সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ কখনোই হয়নি। কোনো রকম ভুল বা বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তার অকপট স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়নি। একজন অন্যজনের ওপর দায় চাপিয়ে নিজেকে সাফ রাখতে চেয়েছেন। জয়ের কৃতিত্বের অনেক দাবিদার, কিন্তু ব্যর্থতার দায় কেউ নিতে চান না।


www.amarboi.com

জাসদের সভাপতি মেজর জলিল জেল থেকে ছাড়া পান ৮ নভেম্বর রাতে। ২৩ নভেম্বর তিনি আবার গ্রেপ্তার হন। মাঝের সময়টুকু তিনি দলের কাজে সময় দিয়েছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন। কী বুঝেছেন, তা তিনিই ভালো বলতে পারবেন। ওই সময় তিনিও কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৮০ সালে সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উঠে এসেছে :

> প্রশ্ন : '৭৫-এর ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
>
> উত্তর : ৭ নভেম্বর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো ঘটনা ঘটেনি। এটা একটা সংগঠিত ঘটনা ছিল এবং জাসদ তা সংগঠিত করে। এ সম্পর্কে আপনারা পরে জানতে পারবেন। আমার মনে হয় এখনো সময় আসেনি।
>
> প্রশ্ন : প্রেসিডেন্ট জিয়া কি তখন আপনাদের সঙ্গে ছিলেন?
>
> উত্তর : আমাদের সঙ্গে ছিলেন না। তবে ওয়াদা করেছিলেন, আমাদের সঙ্গে আসবেন।
>
> প্রশ্ন : ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য না থাকলে জাসদ ৭ নভেম্বরের ঘটনাকে সংগঠিত করল কেন?
>
> উত্তর : রুশ-ভারতের হামলাকে প্রতিহত করার জন্য। লক্ষ্য ছিল জাতীয় সরকার গঠন করা।
>
> প্রশ্ন : জাতীয় সরকার গঠনের জন্য অন্য কোনো দলের সঙ্গে আপনারা কি আলোচনা করেছিলেন?
>
> উত্তর : ৭ নভেম্বরের ঘটনার গতি এত তীব্র ছিল যে আমাদের কোনো কন্ট্রোল ছিল না। ১১ নভেম্বর মোশতাক সাহেবের (খন্দকার মোশতাক আহমদ) বাসায় আমি একটি বৈঠক করি জাতীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে। কিন্তু ২৩ নভেম্বর পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে।[৪৯]

জাসদের বিপ্লব পরিকল্পনা, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি, সেনানিবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন—এসব বিষয়ে ভিন্নমতের একটি বয়ান পাওয়া যায় কে বি এম মাহমুদের কাছ থেকে। *সাপ্তাহিককে* দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জাসদের লক্ষ্য ও কৌশল সম্বন্ধে যে তথ্য দেন, তা হলো :

> জাসদ একসময় আমাকে সমঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে তারা একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করছে। একটা দৃশ্যমান পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭৬ সালের প্রথমার্ধে একটা অভ্যুত্থান হওয়ার কথা। এর চরিত্রটা ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান থেকে অগ্রসর হবে। এতে সশস্ত্র বিশ্বস্ত অনুচরেরা এবং সেনাবাহিনীতে জাসদের সশস্ত্র ক্যাডাররা অংশ

> নেবে। এ গণ-অভ্যুত্থানের পর একটা মোর্চা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, যেটাতে জাসদ কৃষি ও স্বরাষ্ট্র—এই দুটো মন্ত্রণালয় নেবে। এটা একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা, যেটা ১৯৭৩-এর শুরুতে বিশ্বাস করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছিল।
>
> জিয়ার সঙ্গে দুটো বৈঠকে গিয়েছিলাম। এক বৈঠকে আ স ম আবদুর রব উপস্থিত ছিলেন এবং আমার সহযোগিতা চেয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে সিরাজুল আলম খান আমাকে অনুরোধ করলেন, 'মাহমুদ ভাই, আপনার বন্ধু জিয়াউর রহমানের সঙ্গে একটু আলাপ শুরু করেন।' জিয়ার সঙ্গে স্বাধীনতার পরে পরিচয় হলেও ওই সময় সেনাবাহিনীতে যাঁরা ছিলেন, তাতে জিয়ার মধ্যে দুর্নীতি ছিল না। জিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উদ্দেশ্য কী—যদি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে একসময় আমাদের গণবাহিনীতে আসবেন। যদি সমাজতন্ত্রের শত্রু হন, তাহলে তাঁকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আর যদি নিরপেক্ষ হন, নিরপেক্ষ জায়গায় রেখে দেব, ছোঁব না। এটাই ছিল রণকৌশল।[৫০]

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের অনুঘটক হিসেবে জাসদ কৃতিত্ব দাবি করলেও তারা কেন ক্ষমতা দখল করল না, এ নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এটা কি তারা চায়নি, নাকি ক্ষমতা দখল করার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না? এ নিয়ে দলের নিজস্ব মূল্যায়নটি এ রকম :

> অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে এতই যদি প্রস্তুতি ছিল, আর এসব কথা যদি সত্যিই হয়ে থাকে তবে জাসদ ও বিপ্লবী গণবাহিনী ৭ তারিখে ক্ষমতা দখল করল না কেন? এর উত্তর অতি সহজ। ৭ নভেম্বরের জরুরি পরিস্থিতিতে জাসদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তৎক্ষণাৎই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারী ভারতীয় দালালদের কুমতলবকে নস্যাৎ করে দেওয়া—একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে এককভাবে ক্ষমতা দখল করা নয়। দেশবাসীর সামনে মেজর জলিল ও আ স ম আবদুর রবের বক্তব্যই এ কথা প্রমাণ করেছে। মেজর জলিল ও আ স ম আবদুর রব দাবি করেছিলেন :
>
> ক) বাকশাল ব্যতীত সকল প্রকাশ্য ও গোপন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠন করা হোক।
>
> খ) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হোক এবং নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

গ) ভারত-রাশিয়া-আমেরিকার অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মারফত জাতিসংঘে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হোক।

ঘ) ভারতের আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে 'জনতার প্রতিরক্ষা কমিটি' গঠন করতে হবে।

চ) সকল রাজবন্দীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। (সংক্ষেপিত)[৫১]

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সময় মাহমুদুর রহমান মান্না ঢাকায় ছিলেন না। ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হল ছিল 'বিপ্লবে'র একটি কেন্দ্র। এ নিয়ে মান্নার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

মাহমুদুর রহমান মান্না : আমি সিওসির মেম্বার। মজার ব্যাপার হলো ৬ নভেম্বর রাতে যে মিটিং হলো, সেখানে আমি ছিলাম না। ৬ নভেম্বর বিকেলে বায়তুল মোকাররমের সামনে আমাদের একটা মিটিং এবং মিছিল ছিল। আমি ওই মিটিংয়ে গেছি, কিন্তু মিছিলে যাইনি। রাতের ট্রেনে আমার চিটাগাং যাওয়ার কথা। আমি বাসায় চলে এসেছি। তারপর চিটাগাং রওনা হয়েছি। ঘটনা হলো, ওই রাতে নেতারা বসেছে। সেখানে এ প্রশ্নটা এসেছে—আর্মির মধ্যে এই অবস্থা।

মহিউদ্দিন আহমদ : এর বর্ণনা মাসুদ আমাকে দিয়েছে। সে ওই মিটিংয়ে ছিল। এটা ইএসসির (ইমার্জেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি) মিটিং ছিল।

মান্না : আমি ৭ তারিখ সকালে চিটাগাং পৌঁছেছি। রাঙ্গুনিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গেছি। সবাই তো আমাকে দেখে অবাক।—মান্না ভাই, আপনি আসছেন? খবর জানেন না? বিপ্লব হয়ে গেছে!

খুব বিব্রতকর অবস্থা আমার। ডা. করিমের বাসায় গেলাম। ওই দিন বা পরের দিন ঢাকায় ফিরে এসেছি। মাসুদ আপনাকে কী বলেছে জানি না। ওই দিন সিরাজ ভাই সম্ভবত হেজিট্যান্ট ছিলেন। মাসুদ ওয়াজ নট ইন ফেবার অব দিস অন দ্যাট নাইট। তাহের ভাই বোধ হয় বলেছিলেন, আজকেই হতে হবে।

মহি : টুনাইট অর নেভার।

মান্না : তাহের ভাই—কী বলব—হি ওয়ান দ্য ডিসিশন ইন হিজ ফেবার। ইনু ভাই তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। সিরাজ ভাই পরে বলেছেন, উনি এসবের কিছু জানেন না। আসলে জানেন, কিন্তু ডিজঅ্যাগ্রি করেন নাই। পরে তাঁর ভূমিকা দেখে মনে হয়েছে, উনি এটা

অ্যাপ্রুভ করছিলেন না। কিন্তু উনি এটা রেজিস্টও করেন নাই। তাহের ভাই খুব পারসুয়েসিভ ছিলেন।

মহি : *সাম্যবাদ* কারা ড্রাফট করত?

মান্না : সিরাজ ভাইয়ের নেতৃত্বে—আমার ধারণা—কখনো মাসুদ লিখেছে, কখনো মধু লিখেছে। এটা আমার অনুমান।

মহি : আমি যাকেই জিজ্ঞেস করি, সে-ই বলে, 'আমি জানি না।'

মান্না : সংগঠন মানে সেনাবাহিনী আর সংগ্রাম মানে যুদ্ধ—এই লিটারেচার ড্রাফট করেছে মাসুদ। মাসুদ এর মধ্যে ছিল।

মহি : এটা *সাম্যবাদ-দুই*।

মান্না : হ্যাঁ। মাসুদ কিন্তু এই লাইনের পক্ষে ছিল।[৫২]

## ১৮

১৫ আগস্ট হয়েছিল বলেই ৩ নভেম্বর ঘটেছিল। আর ৩ নভেম্বরের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই হয়েছিল ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ১৫ আগস্ট আর ৭ নভেম্বরকে একসূত্রে গাঁথা যায়। সব কটি ঘটনার সুলুকসন্ধান করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসবে। বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। যেখানেই পেরেছি, সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছি।

১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বর এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে গণবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নেতা শরীফ নুরুল আম্বিয়া ঢাকায় ছিলেন না। এক সাক্ষাৎকারে তিনি ওই সময়টি নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করছি :

মহিউদ্দিন আহমদ : কর্নেল তাহেরের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সমীকরণটি কী ছিল? বিশেষ করে ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ব্যাপারে?

শরীফ নুরুল আম্বিয়া : সিরাজ ভাই তাহেরকে ডিজওউনও করেন নাই, ফেসও করেন নাই। আবার নিজেও কোনো পথ বাইর করেন নাই।

মহি : আমার অনুসন্ধান বলে, তাহের ওয়াজ ইনভলভড ইন ফিফটিনথ আগস্ট। তিনি ফিল্ড লেভেলে অ্যাকশনে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর নলেজে ছিল।

আম্বিয়া : থাকতে পারে।

মহি : ট্রাইব্যুনালে দেওয়া তাহেরের স্টেটমেন্টে এটা আছে। সকালে মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ তাঁকে ফোন করেছে। তারপর তাহের রেডিও স্টেশনে গেছেন। রশিদ তাঁকে ফোন করে কেন?

আম্বিয়া : যোগাযোগ না থাকলে ফোন করবে কেন?

মহি : উনি এসে খন্দকার মোশতাককে যে সাজেশনগুলো দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন—প্রথমটাই হলো, ডিক্লেয়ার মার্শাল ল। একটা পলিটিক্যাল পার্টি তো মার্শাল ল দিতে বলতে পারে না? খন্দকার মোশতাক তো মার্শাল ল দিল পাঁচ দিন পরে?

আম্বিয়া : নলেজে ছিল, এটা প্রমাণ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু উনি প্ল্যানিংয়ে ছিল, এটা প্রমাণ করা কঠিন। হয়তো ঠিক, হয়তোবা না।

মহি : অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের *লিগ্যাসি অব ব্লাড* বইয়ে আছে, শেখ মুজিব নিহত হন ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে। তাহের আগের দিন রাতে ডিসাইড করেছেন, পরদিন ভোর পাঁচটায় তিনি ঢাকায় আসবেন। যদিও তিনি একটু দেরি করে এসেছেন।

আরেকটা ব্যাপার হলো জিয়ার সঙ্গে তাঁর কানেকশনটা। তাহের তো নিজেই নিজেকে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। তাঁহের কিন্তু ফেঁসেছেন জেলখানায় দেওয়া তাঁর স্টেটমেন্টের কারণে। তখন তাঁরা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি, আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর পাওয়ারে ফিরে আসবে। তাঁরা ভেবেছেন, আর্মি এদের ক্রাশ করে দিয়েছে। তা না হলে ওই স্টেটমেন্ট উনি এভাবে দেন না।

জিয়া যখন গৃহবন্দী হলেন, তখন তিনি তাহেরকে ফোন করেছেন তাঁকে হেল্প করার জন্য। যারা সার্ভিং অফিসার, যারা জিয়ার খুব ক্লোজ, যেমন মনজুর, মীর শওকত আলী, আমিনুল হক—এরা তো জিয়ার লোক। এদের কাউকে উনি ফোন করেন নাই। উনি করেছেন তাহেরকে, যিনি আর্মিতে আর নাই। আদৌ জিয়া তাঁকে ফোন করেছেন কি না। কারণ, জিয়াকে যখন ইনটার্ন করা হয়, তখন তাঁর রুমের টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল।

আম্বিয়া : এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

মহি : জিয়া যে তাহেরকে ফোন করেছেন, এই কনভারসেশনের সাক্ষী কে?

আম্বিয়া : তাহের নিজেই হয়তো গুল মাইরা দিছে।

মহি : হতে পারে। জিয়ার অনুরোধে আমি তাঁর প্রাণ বাঁচাতে গেছি—এই ধারণা দেওয়ার জন্য। জিয়াকে যখন ইনটার্ন করা হয়, তাঁকে যে মারা হবে না, এটা তো অলরেডি এনসিওর করা হয়েছে। এ দায়িত্বটা ছিল মেজর হাফিজের। মেজর জিয়াউদ্দিন ছাড়া আর কোনো অফিসার তো তাহেরের সঙ্গে ছিল না? এবং পরবর্তী সময়ে তাহেরের ফাঁসির ব্যাপারে এভরিবডি ওয়াজ আনঅ্যানিমাস। জাসদ যে পরে তাহেরকে ক্যারি করেছে, এটা জাসদের জন্য আরও বেশি ডিজাস্টার হয়েছে। এ জন্য জাসদকে আরও পে করতে হবে।

আম্বিয়া : বিচার করবে?

মহি : আস্তে আস্তে এগুলো বের হবে তো? এই যে খালেদ মোশাররফকে ইন্ডিয়ান এজেন্ট হিসেবে ব্র্যান্ডিং করা, ক্যান্টনমেন্টে লিফলেট ছড়ানো—সবকিছু তো জিয়ার পক্ষে করা হয়েছে?

আম্বিয়া : ৭ নভেম্বরের পরে তাহেরের দ্বিতীয় অভ্যুত্থানটা করতে যাওয়া...মামলা তো হইল সে কারণেই। এটা করা উচিত হয় নাই। সিরাজ ভাইয়ের একটা পজিশন নেওয়া উচিত ছিল। এরপর দ্বিতীয় অভ্যুত্থান হওয়ার সুযোগ নাই। কোনো ফোর্সই নাই তোমার। কোন শক্তিতে তুমি দ্বিতীয় অভ্যুত্থানে যাও। দেশে কোনো ফোর্স নাই। ইন্টারন্যাশনাল কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই, সাপোর্ট নাই, আর তুমি অভ্যুত্থানে চইলা যাও?

সিরাজ ভাই পরে জিয়ার সঙ্গে ইয়া করতে গেছিল। দ্যাট ওয়াজ টু লেট। তাহেরকে তো তাহলে ডিজওউন করতে হবে। সে রকম অবস্থা দলের আছে কি না তখন? আনোয়ারের নেতৃত্বে সিটি গণবাহিনী তো তখন আমারে মাইরা ফেলার ডিসিশন নিছে।

মহি : কেন?

আম্বিয়া : এরা তো সব বিপ্লবী। আমার কারণেই নাকি তারা কোনো বিপ্লব করতে পারতেছে না!

৭ নভেম্বরের পর সিরাজ ভাইয়ের উচিত ছিল জিয়ার সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেন্টে যাওয়া। এই যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, এদের জীবন-জীবিকারও তো একটা দায়দায়িত্ব আছে। জিয়ার পার্টি না হয়েও জিয়াকে প্যাসেজ দিয়া ডেমোক্রেটিক লাইনে পার্টি ডেভেলপ করা; রিপ্লেসিং আওয়ামী লীগ, যেহেতু জিয়ার অপজিশন নাই।[৫৩]

পঁচাত্তরের টালমাটাল দিনগুলো নিয়ে রয়ে গেছে অনেক ধোঁয়াশা, অনেক বিভ্রান্তি। সবাই সবটা জানেন না। যাঁরা জানেন, তাঁরা সবটা বলেন না। বিষয়টি নিয়ে আমি সিরাজুল আলম খানের মুখোমুখি হলাম। আমাদের

কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি :

মহিউদ্দিন আহমদ : ৭ নভেম্বরে আপনাদের প্ল্যানটা কী ছিল?

সিরাজুল আলম খান : ওই যে বললাম না, ৪০-৪২টা জায়গা থেকে...শহরের মধ্যে আন্দোলন রাখা—মিছিল, মিটিং, স্ট্রাইক, হরতাল ডাকা এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা মিলিয়ে একটা অভ্যুত্থানমূলক, একটি বিপ্লবী অভ্যুত্থান, বিপ্লবী সশস্ত্র অভ্যুত্থান, ক্ষমতা দখল। হয় ক্ষমতা দখল, না হয় ইলেকশন দিতে বাধ্য করা, আর ন্যাশনাল গভমেন্ট ফর্ম করা। কোনোটাই হলো না। লিডাররা সবাই তো জেলে চলে গেল। অন্যরা আন্ডারগ্রাউন্ডে। সেটাই ইন ডিফারেন্ট ফর্ম আবার ওয়ার্ক আউট করা হলো সেভেনথ নভেম্বর। একই শক্তিগুলো। সেভেনথ নভেম্বরের ফোর্সেসগুলো, আমরা ছাড়াও দেয়ার ওয়ার আদার ফোর্সেস ইন দ্য ফিল্ড। চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত তো আমরা ছাড়া ফিল্ডে কোনো ফোর্স নাই। কিন্তু বাই সেভেনটি ফাইভ, ১৫ আগস্টের পর অন্যান্য ফোর্স ভেরি মাচ অ্যাকটিভ। তারা ফ্যাক্টর। সেগুলোকে সমন্বয় করা, সেগুলোকে ডিফিট দেওয়া, সেগুলোর পরিবর্তে পজিটিভ ফোর্স গ্রো করানো—এটা হলো না। না হওয়ার কারণে সেভেনথ নভেম্বর একটা সাকসেস হওয়ার পরেও ইট ওয়াজ আ কাইন্ড অব অ্যাবরশন।

তারপর তো হোল স্টোরি ওয়াজ ডিফারেন্ট। আমি অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম। সেভেনটি সিক্সে ২৬ নভেম্বর অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ার পর বোঝাই গেল, ওই গেম আর চলবে না। সোসাইটি হ্যাজ চেঞ্জড। পিপলস মাইন্ড হ্যাজ চেঞ্জড। সোশ্যাল ফোর্সেস আর ডিফারেন্ট। পলিটিক্যাল পার্টিজ লুক অ্যাট দ্য প্রবলেম ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে।

সাত নভেম্বরের পরে—কলকাতার একটা ইংরেজি পত্রিকা ছিল না?

মহি : *ফ্রন্টিয়ার?*

সিরাজ : *ফ্রন্টিয়ার*। পড়েছ সেই রিপোর্টটা?

মহি : কোনটা?

সিরাজ : ৭ নভেম্বরের ওপরে? এডিটর নিজে লিখেছিলেন। ১৯১৭ সালের লেনিনের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর সেভেনথ নভেম্বর পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকটি অনন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছিল। বাট ইট ওয়াজ ফয়েলড।

লে. ক. আবু তাহের

মহি: একটা প্রশ্ন কিন্তু উঠেছে। জাসদ এবং ১৫ আগস্ট। এখন রেকর্ডে যেসব কথা আসছে, কর্নেল তাহের ওয়াজ ভেরি মাচ আ পার্ট অব ফিফটিনথ অগাস্ট। হি হ্যাড অল দ্য লিয়াজোঁ উইথ ডালিম, রশিদ। এবং ওই সময় উনি মুভও করেছেন জিয়াকে প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্য। এ জিনিসগুলো এখন আসতেছে। এবং নূর-টুর এদের সবার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বিকজ অব হিজ ওল্ড অ্যাসোসিয়েশন। আবার একই সঙ্গে তিনি সেনাবাহিনীর কাছে জাসদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। কর্নেল তাহেরকে জাসদ যদি ক্যারি করে, তাহলে ১৫ আগস্টের একটা...

সিরাজ: ইন্টারপ্রিটেশন?

মহি: একটা লায়াবিলিটি চলে আসে।

সিরাজ: চলে আসে?

মহি: অবভিয়াসলি চলে আসে।

সিরাজ: জাসদের ওপর না আসলেও কর্নেল তাহেরের ওপর আসে।

মহি: জাসদের ওপর আসে, যেহেতু জাসদ তাহেরকে ওউন করেছে।

সিরাজ: হতে পারে। একজনের একটা ইনডিভিজুয়াল রোল থাকতে পারে না?

মহি: কর্নেল তাহের তো সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি করত।

সিরাজ: সেটাই তো বলছি। আলাদা রোল হতে পারে। আলাদা আইডেন্টিটি থাকতে পারে।

মহি: ইভেন তাহের যেদিন অ্যারেস্ট হন, চারজন একসঙ্গে অ্যারেস্ট হয়েছিলেন—তাহের...

সিরাজ: এস এম হল থেকে, হাউস টিউটরের বাসা থেকে।

মহি: হ্যাঁ। মোস্তফা সরোয়ার (বাদল) ছিলেন হাউস টিউটর। যেহেতু তাঁর ওখানে মিটিং হচ্ছিল, সেখান থেকে তাহের অ্যারেস্ট হলেন। বাদল ভাইও অ্যারেস্ট হলেন। তাঁর সঙ্গে সৈনিক সংস্থার

জোবায়ের আনসারি ছিলেন। তিনি পরে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। তিনিও অ্যারেস্ট হন। আরেকজন যিনি অ্যারেস্ট হয়েছিলেন, তিনি সর্বহারা পার্টির লোক। ফাররোখ আহমদ নাম। তিন বছর জেলে ছিলেন। তার মানে ওখানেও তাঁর সঙ্গে সর্বহারা পার্টির লোক ছিল। জিনিসটা খুব...

সিরাজ : সিম্পল ইকুয়েশন।

মহি : সিম্পল না। বেশ জটিল। উনি অনেক দিকে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে জিয়া তো জাসদকেই টার্গেট করল। এ জন্যই আমি বলি, ১৫ আগস্টে জাসদের কোনো ভূমিকা নাই—এটা ১৫ আগস্ট থেকে নভেম্বরের সেকেন্ড উইক পর্যন্ত, জিয়ার সঙ্গে হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জাসদের যে সমস্ত লিটারেচার—সেখানে ১৫ আগস্ট সম্পর্কে কোনো ক্রিটিক্যাল কথাবার্তা নাই।

সিরাজ : নাই তো? এর সঙ্গে জাসদের তো কোনো কানেকশন নাই?

মহি : এ রকম কোনো বিশ্লেষণ নাই।

সিরাজ : শেখ মুজিবের পতন চেয়েছে, বাট নট ইন দিস ওয়ে। রাজনৈতিক পতন চেয়েছে।

মহি : নট ইন দিস ওয়ে—এর মধ্যে এই কথাটা আসে নাই। এটা হচ্ছে পরবর্তীকালের বয়ান।

সিরাজ : কিলিংয়ের মধ্যে এটা আসে না। জাসদ আসে না। ইনডিভিজুয়ালি একজন হতে পারে। জাসদ কেন এ রকম করবে যে শেখ মুজিবকে ফ্যামিলিসুদ্ধ মেরে ফেলতে হবে? কেন?

মহি : না না না। ফ্যামিলির ব্যাপারটা তো কেউই বলবে না। যারা মেরেছে, তারাও এটা বলবে না।

সিরাজ : এটার আর আলোচনার দরকার নাই। (রেকর্ডিং) স্টপ করো।

মহি : ঠিক আছে, ওই বিষয়টাই আর আলাপ করব না।

সিরাজ : না না, আলাপ করতে পারি।[৫৪]

(এ পর্যায়ে আমি রেকর্ডিং বন্ধ করলাম)।

## ১৯

জলিল-রব জেল থেকে ছাড়া পেলেন পঁচাত্তরের ৮ নভেম্বর। ৯ নভেম্বর তাঁরা ঢাকায় এলেন। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নায়েক সিদ্দিক ৭ নভেম্বরেই ঢাকা

কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে গেট খুলে ভেতর থেকে জাসদের কেন্দ্রীয় নেতা এম এ আউয়াল এবং মোহাম্মদ শাহজাহানকে বের করে নিয়ে আসেন। ভেতরে জাসদের আরও অনেক কর্মী ছিলেন। আউয়াল আর শাহজাহান তাঁদের বললেন, 'আপনারা অপেক্ষা করুন। আমরা বাইরের পরিস্থিতি দেখেশুনে পরে আপনাদের রিলিজ করার ব্যবস্থা করব।' এ কাজটি তাঁরা আর করেননি। অথচ তখন ওই পরিস্থিতিতে সবাই বেরিয়ে আসতে পারতেন। যাঁরা ভেতরে থেকে গেলেন, তাঁরা বের হয়েছিলেন কয়েক বছর পর।[৫৫]

৭ নভেম্বর সকালেই জাসদের বিপ্লবের মৃত্যু হয়েছিল। জেনারেল জিয়া সেনানিবাসে তাঁর অবস্থান সংহত করতে সক্ষম হন। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বিদ্রোহী সৈনিকেরা ধীরে ধীরে সবাই কাজে যোগ দেন। তাহেরের অনুগত বেশ কয়েকজন তখনো বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর। তাঁরা রয়ে গেলেন বাইরে।

১৩ নভেম্বর ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে তাহেরের বড় ভাই ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) আবু ইউসুফের বাসায় একটি সভায় জিয়ার বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হয়। ১৫ নভেম্বর রায়েরবাজারে একটা কাঠের আড়তে তাঁরা আবারও বৈঠক করেন। সিরাজুল আলম খান এ দুটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর অজান্তেই আরেকটি অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ বৈঠকের খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বিপদ নেমে আসে।[৫৬]

নেতারা সবাই একে একে গ্রেপ্তার হতে থাকেন। জলিল, রব, ইনু, আবু ইউসুফ গ্রেপ্তার হন ২৩ নভেম্বর। ২৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম হল থেকে গ্রেপ্তার হন তাহের। ধরপাকড় চলতে থাকে। গ্রেপ্তারকৃতদের একজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণবাহিনীর সাবেক কমান্ডার আবু আলম মো. শহীদ খান। আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে অনেক কথা বলেছে। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম :

> মহিউদ্দিন আহমদ : তুমি বলেছিলে, তুমি অ্যারেস্ট হয়েছিলে পঁচাত্তরের ডিসেম্বরে।
>
> আবু আলম : ৯ ডিসেম্বর।
>
> মহি : তুমি একটা অস্ত্রসহ ধরা পড়েছিলে। কী একটা রিভলবার ছিল।
>
> আলম : মেজর আজিজ বা আজিম, এ রকম একটা নাম খোদাই করা ছিল। পারসোনাল রিভলবার, যেটা চলে এসেছিল, ৭ নভেম্বর সৈনিক সংস্থা যে অভ্যুত্থান করে, তাদের মাধ্যমে আমাদের ইউনিটে। রিভলবারটা আসলে আমার কাছে থাকত না। কোথাও থাকত। ওই দিন আমার কাছে ছিল।

মহি : এটা তোমাকে কে দিল? রফিক?

আলম : না। এটা মধুর ক্যানটিনে হ্যান্ডওভার করা হয়। আমাদের তো অনেক লোক। তার মধ্যে কেউ হয়তো এটা মধুর ক্যানটিনে নিয়ে এসেছিল। রফিক ভাই মধুর ক্যানটিনে ছিল এবং উনি জানে, আমরা কোথায় যাই, কী কাজ আমাদের। আমাদের কোনো বড় কাজ ছিল না। চিঠি বিলিটিলি করা, এ ধরনের কাজ ছিল। কোনো কারণে কেউ যদি আমাদের আটকে ফেলে, তাহলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য ওটা ব্যবহার করতে পারব, এ রকম চিন্তা।

মহি : আমি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছি। ৭ নভেম্বর সারা দিন তো ক্যান্টনমেন্টে উত্তেজনা ছিল। রাতে গোলাগুলি হয়েছে। কিছু অফিসার মারা গেছে। নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন মেজর আজিম। কিছু লোক ভেগে গেছে। কিছু আর্মস বাইরে চলে এসেছে।

আলম : ওই আর্মসের কিছু আমরা পেয়েছি। ইউসুফ ভাইয়ের বাসায় সৈনিক সংস্থার অনেকেই এসেছিল। তারা কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিল। ওগুলো রেখে তারা আবার চলে গেছে। ওখান থেকেই আমাদের এখানে চলে আসে।

৬ নভেম্বর রাত থেকেই আমরা জানতাম, আজ ক্যান্টনমেন্টে কিছু একটা ঘটতে পারে। খায়ের এজাজ মাসুদসহ মুহসীন হলে আমরা সবাই রেডি ছিলাম যে আমরা জিরো আওয়ারে মিছিল বের করব। আমরা কিন্তু মিছিল বের করেছিলাম। সব হল থেকে মিছিল বের হয়েছিল। সকালে শহীদ মিনারে জিয়াউর রহমান এবং তাহের এসে বক্তব্য দেওয়ার কথা। শহীদ মিনারে আমরা মাইক-টাইক লাগিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। সে সময় খন্দকার মোশতাকের সমর্থনে একটা মিছিল এসেছিল। মিছিল ঠিক না। কয়েকটা ট্রাক আর বেবিট্যাক্সি। সেখানে মোশতাকের ছবি আর নিচে বসে একজন চোঙা ফোঁকাচ্ছে। আমরা দেখলাম, আরে এই খন্দকার মোশতাক তো ব্লাডি খুনি, বঙ্গবন্ধুকে শুধু না, গণবাহিনীর অনেককেই সে মেরেছে তার ৮২ দিনের শাসনে। সুতরাং আমরা কী করলাম—এদের মিছিল করতে দেওয়া যাবে না। তখন ওই গাড়ির বহরে আমরা ইন্টারভিন করলাম। তারা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। এর ১০ মিনিটের মাথায় আর্মির দুটো জিপ এসে শহীদ মিনারে নির্বিচার গুলি করল। আমাদের বেদম পেটাল, ৭ তারিখ সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত।

মহি : জিয়াউর রহমান জাসদের সঙ্গে আছে, সাপোর্ট দেবে, পার্টিতে এ ধারণা তো দিয়েছিল তাহের। তাই না?

আলম : এটা তো অবশ্যই তাহেরের কাছ থেকে এসেছে। আমি তো ওই লেভেলে ছিলাম না। কনফার্ম করতে পারব না।

মহি : জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল দুইজনের। আমার অনুসন্ধানে যেটুকু পেয়েছি। একটা ছিলেন তাহের, আরেকটা যোগাযোগ সিরাজ ভাইয়ের নিজের। ওটা ডিফারেন্ট চ্যানেলে। সিরাজ ভাইয়ের যোগাযোগটা আরও কয়েক দিন কন্টিনিউ করেছে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে ১৯৮১ সালে সিরাজ ভাই জিয়ার সঙ্গে একবার দেখাও করেছেন। তার কিছুদিন পরেই জিয়া নিহত হন।

আলম : আমি সিরাজ ভাইয়েরটা জানি না, তাহের ভাইয়েরটা জানি।

মহি : ৭ নভেম্বর ভোরবেলা তাহের এবং ইনু যখন ক্যান্টনমেন্টে যান, জিয়ার তো প্রথম প্রশ্নই ছিল, 'সিরাজুল আলম খান কোথায়?' জিয়া তো সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে ডিসকাস করতে চেয়েছিল। সে জানে যে পার্টি তার। সমস্যা হলো, আমরা অনেক সময় আবেগ দিয়ে বিচার করি, আর সম্পর্ক দিয়ে। জাসদ প্রথম থেকেই একটা অবস্থান নিয়ে নিয়েছে যে জিয়া বিট্রেয়ার আর তাহের হিরো। ফলে জাসদ যেটাই বলবে, ওই কেমিস্ট্রিকেই ভিত্তি করে। তাই না? যেমন অবস্থানগত কারণে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত আছে বলে আমরা ভারতে চলে গেছি। ফলে একটা সমীকরণ তৈরি হয়ে গেছে। এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারব না। আমরা তখন থেকে দিল্লির চোখ দিয়ে অনেক কিছু দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পুরো ক্যানভাসটা কিন্তু আমাদের সামনে নাই। এটা বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল। এবং তিনি এ বিষয়গুলো বুঝতেন। যেটা তাজউদ্দীনও বোঝেন নাই, আমরাও বুঝি নাই।

জিয়াকে তাহের ধারণা দিয়েছেন, 'আমার পেছনে বিশাল পার্টি আছে।' আর তাহের জাসদকে ধারণা দিয়েছেন, 'আমার পেছনে জিয়া আর তার সেনাবাহিনী আছে।' এটা প্লে করতে গিয়ে তাহের...

আলম : ওখানে আরও বিষয় থাকতে পারে। তাহের তো ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ছিলেন। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের বিষয়গুলো কন্ট্রোল করার জন্য ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের কাউকে থাকতেই হবে। আপনি কাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন? জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে নিয়ে আসার দায়িত্ব আপনি দিলেন নায়েক সিদ্দিক, হাবিলদার আবদুল হাই আর তার কয়েকজন লোককে!

মহি : নায়েক-হাবিলদারের কথায় জিয়া আসবে?

আলম : জিয়া হচ্ছেন একজন মেজর জেনারেল।

মহি : আর্মির চিফ।

আলম : একজন হাবিলদার তাঁকে উদ্ধার করে এলিফ্যান্ট রোডে নিয়ে আসবে। এটা তো হয় না? বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার উচিত ছিল ক্যান্টনমেন্ট দখল করা। সেখানে তাহের বসে থাকবেন। পলিটিক্যাল লিডাররা যদি যেতে হয়, সেখানে যাবেন। প্রথম মিসটেক এটাই। আপনি একজন নায়েক বা হাবিলদারকে দায়িত্ব দিলেন জিয়াকে নিয়ে আসার জন্য। ততক্ষণে বিভিন্ন বাহিনীর বড় সাহেবরা জিয়ার কাছে চলে গেছে। জিয়া অন্য জায়গা থেকেও মেসেজ পাচ্ছেন। বন্দী অবস্থায় জিয়া কোনো মেসেজ পাচ্ছিলেন না। যেই তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন, তাঁর লোকজন অর্গানাইজড হয়ে গেল।

মহি : জিয়াকে সৈনিক সংস্থার লোকেরা মুক্ত করেছে, এটাও তো ঠিক না। ওরা যাওয়ার আগেই তিনি মুক্ত হয়ে গেছেন।

আলম : ওরা যাওয়ার আগে কারা মুক্ত করল?

মহি : সৈনিকেরাই করেছে, জেসিওরা করেছে, বাট দে আর নট পার্ট অব সৈনিক সংস্থা। সুবেদার মেজর আনিসুল হক অর মেজর মুহিউদ্দিন করেছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যত সিপাহি, এনসিও, জেসিও ছিল—এদের একটা বড় অংশ জিয়ার প্রতি সিমপ্যাথেটিক ছিল, তারা ইনভলভড হয়ে গিয়েছিল খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে, জিয়ার পক্ষে। প্রত্যেকেরই তো আলাদা আলাদা স্বার্থ আছে। তারাই এটা করেছে এবং তারাই জিয়াকে নিয়ে এসেছে। সৈনিক সংস্থার ওরা যাওয়ার আগেই জিয়া সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসে বসে গেছে, সারাউন্ডেড বাই অল অফিসার্স।

আলম : কথা সেটাই। আপনি যদি সেনাবিদ্রোহ ঘটান, তাহলে আপনাকে হেডকোয়ার্টার্সে থাকতে হবে। সেই রিস্ক নেওয়া উচিত ছিল, অথবা তাহের সাহেব ওই জুডিশিয়াস ডিসিশনটা নিতে পারেন নাই। সুতরাং পরে এসে আপনি তো জোর করে কিছু করাতে পারবেন না। ততক্ষণে জিয়া তো তাঁর ফরম্যাটের মধ্যে ঢুকে গেছেন।

মহি : ৭ নভেম্বর ফার্স্ট আওয়ারেই তো বিপ্লব শেষ। এরপর রাতে যে কিলিংগুলো হয়েছে, ওটা সুইসাইডাল হয়েছে। ওটা না হলে কিন্তু তাহেরের ফাঁসি হতো না। ১০-১২ জন অফিসার কিলড হয়েছে। এরা একেবারেই ইনোসেন্ট।

জেলে তোমার বন্ধুবান্ধব কে কে ছিল?

আলম : ঢাকা জেলে হেলাল ছিল সব সময়। বদিউল আলম ভাই ছিল। শাহজাহান খান, মোহাম্মদ শাহজাহান ছিল। আ স ম আবদুর রব একটু দূরে থাকত। জিকু ভাই ছিল, লতিফ মির্জা ছিল। আরও অগুনতি নেতা-কর্মী। জাসদের লোকে তো জেল তখন ঠাসা। জিকু ভাই সুন্দর আবৃত্তি করতেন।

মহি : উনি তো সিনেমার নায়ক ছিলেন। সিনেমা বানাতেন। আমি তাঁর ছবি দেখেছি। সেখানে তিনি নায়ক। তখন তো তাঁকে চিনতাম না।

আলম : জেলখানায় আমাদের সবার তো ডিভিশন ছিল না। যাদের ডিভিশন ছিল, তাদের বাজার একসঙ্গে করে আমরা রান্না করে খেতাম।[৫৭]

## ২০

জাসদের যে জনভিত্তি ছিল, ১৫ আগস্টের পর সেটা দুর্বল হয়ে যায়। জাসদ তখনো কেন সরকারের বিরোধিতা করছে, এটা মানুষের বোধের মধ্যে ছিল না। মানুষ দেখছে, আওয়ামী লীগ নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে, কিন্তু জাসদ আগের মতোই 'বিপ্লব' বলে স্লোগান দিচ্ছে। ৭ নভেম্বরের পরও গণবাহিনীর কাজকর্মে ভাটা পড়েনি। বিভিন্ন জেলায় যাঁরা সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা অনেকে 'অ্যাকশনে' গেছেন।

টাকাপয়সার টানাটানি। গণবাহিনীর আঞ্চলিক ইউনিটগুলোকে ঢাকা থেকে প্রায়ই চাপ দেওয়া হতো—টাকা পাঠাও। ঢাকার কাছেই কালীগঞ্জ। সেখানে গণবাহিনীর একটি দল আছে। কমান্ডার হলেন আলী হোসেন। ডেপুটি কমান্ডার এমদাদ। সবাই ডাকে ইমদু। ইমদু পার্টি-অন্তঃপ্রাণ। কোনো উপায় না দেখে একবার সে রেলের ওয়াগন ভেঙে সরিষা লুট করল। সরিষা বেচে যে টাকা পাওয়া গেল, সেটা ঢাকায় গিয়ে দিয়ে এল কাজী আরেফ আহমদের হাতে। আরেফ তখন ঢাকার দায়িত্বে।

ইমদু পরে বদলে গিয়েছিল। আলী হোসেনের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছিল না। একবার তাকে ঢাকায় মধুর ক্যানটিনে ডেকে এনে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। টের পেয়ে ইমদু পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে গুলি করা হয়। ইমদুর পায়ে গুলি লেগেছিল। পরে সে এর শোধ নেয়, আলী হোসেনকে খুন করে। দলের যখন দুঃসময়, তখন আত্মরক্ষার

জন্য সে বিএনপির সঙ্গে ভিড়ে যায়। বিএনপির বৃহস্পতি তখন তুঙ্গে। সরকারি দলের প্রশ্রয়ে সে হয়ে ওঠে ভয়ংকর সন্ত্রাসী। অনেক ডাকাতি-খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তার পরিণাম হয়েছিল ভয়ংকর। বিএনপি সরকারের শেষ দিকে যুবমন্ত্রী আবুল কাসেমের বাসা থেকে সে গ্রেপ্তার হয়। বিচারে তার ফাঁসি হয়েছিল। রাজনীতি একজন তরুণকে কীভাবে বদলে দেয়, ইমদু তার একটি উদাহরণ।

ঢাকা নগর গণবাহিনীর ১২ নম্বর ইউনিট ছিল চকবাজারে। এর পলিটিক্যাল কমিসার ছিলেন খোরশেদ আলম, কমান্ডার আবু বকর সিদ্দিক—তাঁদের ওপর আদেশ এল টাকা জোগাড়ের। তাঁরা আটজনের একটা দল নিয়ে একটা অভিযানে বের হলেন। সঙ্গে দুটি মোটরবাইক আর দুটি বাইসাইকেল। তাঁরা ডাবল-রাইডিং করে গেলেন মগবাজারে এক চাকরিজীবীর বাড়িতে। ওই বাড়ির লোকজনের এক আত্মীয়ের মারফত গণবাহিনীর দলটি খবর পায়, সেখানে গেলে কিছু পাওয়া যাবে। যাহোক, তারা ওই বাড়িতে ঢুকে রীতিমতো লুটপাট করে। সেখানে পাওয়া গেল ৩৭ ভরি সোনা এবং ৭৫ হাজার টাকা। লুট করা টাকা এবং সোনা তুলে দেওয়া হলো নগর কমান্ডারের হাতে। তিনি এর বিলি-ব্যবস্থা করলেন। চকবাজার ইউনিটটি কোনো কিছু পায়নি।

জাসদের তখন দুঃসময়। সংগঠন চালানো তো দূরের কথা, সংগঠক ও কর্মীরা বেঁচে থাকার সংস্থানও করতে পারছিলেন না। জনবিচ্ছিন্নতার কারণে চাঁদা সংগ্রহের সম্ভাবনা তলানিতে ঠেকে। অনেক জায়গা থেকে জবরদস্তি করে টাকা আদায় করা হতো। যেসব জেলা থেকে ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে বেশি টকা পাঠানো হতো, ওই জেলার সংগঠনকে বেশি শক্তিশালী মনে করা হতো। এ সময় দুটি ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। একটি রাজশাহীতে, অন্যটি কক্সবাজারে। রাজশাহীর নিউমার্কেট শাখা পূবালী ব্যাংক থেকে দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে আনে গণবাহিনীর সদস্যরা। টাকা জমা দেওয়া হয় রাজশাহী জেলা গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিসার ডা. এম এ করিমের হাতে। তিনি তখন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগে কাজ করেন। থাকেন শহরের হেতিমখাঁ এলাকায় অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ৩২ নম্বর কামরায়। এত টাকা দেখে তিনি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েন। ভয়ে কাঁপতে থাকেন। শেষে টয়লেটের মধ্যে সব টাকা ফেলে দিয়ে ফ্ল্যাশ করে দেন।

ছিয়াত্তরের অক্টোবর-নভেম্বরে গণবাহিনীর একটি দল কক্সবাজারের চকরিয়া থানায় রূপালী ব্যাংকের ঈদগাহ শাখায় আক্রমণ চালিয়ে পৌনে চার লাখ টাকা সংগ্রহ করে। চট্টগ্রাম জেলা গণবাহিনীর কমান্ডার মইন উদ্দীন খান

বাদল ঢাকায় খবর পাঠান যে ৩০ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। ঢাকায় সিওসির সমন্বয়কের দায়িত্বে তখন ছিলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া। বাদল তাঁর হাতে ১০ হাজার টাকা জমা দেন। বাকি টাকার হিসাব পাওয়া যায়নি।

সশস্ত্র রাজনীতির নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। এটা একবার শুরু হলে শিগগির তাতে ছেদ পড়ে না। ওই সময়ের একটি পর্যালোচনা করেছেন মাহমুদুর রহমান মান্না। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন ছিল এ রকম :

> মাহমুদুর রহমান মান্না : ১৯৭৬ সালে যখন জেলে গেলাম, জেলের ভেতরে মেজর জিয়াউদ্দিনকে পেলাম। আরও পেলাম হাবিলদার আবদুল হাই, সার্জেন্ট রফিক—৭ নভেম্বরে অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত অনেককেই পেলাম।
>
> মহিউদ্দিন আহমদ : কত তারিখে অ্যারেস্ট হলেন?
>
> মান্না : ১৯৭৬ সালের ১৮ মার্চ। আমাদের যে ফারাক্কা মিছিল ছিল, তার আগে। জেলখানায় ওদের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো, ওরা বিপ্লবের ধারেকাছেও নাই। তারা মনে করে, 'সব অফিসার মাইরা ফেলতে হবে, শুধু কর্নেল তাহের থাকবে।' এ রকম কথাবার্তা।
>
> জেলে তখন ছিল বদিউল আলম। সে নিউ জেলে আসল। তার সঙ্গে শেয়ার করতে শুরু করলাম। তার সঙ্গে আমার মতের মিল পেলাম। আরেকজন ছিল—সুলতান। বুয়েটের। আমরা তো স্টাডি সার্কেল করতাম।
>
> মহি : জেলের ভেতরে?
>
> মান্না : হ্যাঁ। তখন তো কেউ মানা করত না। জেলের মধ্যে পরিবেশ অন্য রকম ছিল। ওইখানে সুলতান আমাকে বলেছে—মান্না ভাই, ভাবলে আমার তো এখনো গা ছমছম করে।
>
> কেন?
>
> বিশ্বাসবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওটা টার্গেট ছিল হিট করার।
>
> মহি : বিশ্বাসবাড়ি?
>
> মান্না : মানিকগঞ্জের কোনো একটা থানায় একটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চতুর্দিকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গণবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক, গায়ে আগুন, সে দৌড়ে বেরোনোর চেষ্টা করছে। তাকে গুলি করা হয়েছে। সে পড়ে গেছে, মরে গেছে। কয়েকটা লোক আগুনে পুড়ে মারা গেছে। ওই বাড়ির মালিক, বিশ্বাস, তাকে গণদুষমন ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল। এটা বলতে গিয়ে সুলতান শিউরে উঠছিল।

মহি : মানিকগঞ্জের আনিসও আমাকে এ ধরনের একটা ঘটনার কথা বলেছিল। এক দোকানদারের কাছে ৫০০ টাকা চাঁদা চেয়েছিল। সে দেয়নি বলে ঠুস করে গুলি—তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

মান্না : আনিস তো ছিল কমান্ডার আর সুলতান ছিল বোধ হয় ডেপুটি কমান্ডার। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। আমাকে বলত—মান্না ভাই, আমার কী হবে। এটা কি কোনো দিন মাফ হবে?

মহি : গিল্টি ফিলিং?

মান্না : এ রকম ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। এসব করে যে পারা যাচ্ছে না, সরকারের কিছুই হচ্ছে না, তখন...

মহি : জাসদের যে অরিজিনাল স্ট্যান্ড, সেখান থেকে যে শিফট, সেখানে সিরাজ ভাই কি ইনস্ট্রুমেন্টাল ছিলেন? নাকি তাহের ওয়াজ ইনস্ট্রুমেন্টাল?

মান্না : ইনস্ট্রুমেন্টাল মানে কী? সিরাজ ভাই ওয়াজ দ্য মাস্টারমাইন্ড। উনিই করেছেন। কিন্তু হি ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই হাসানুল হক ইনু, আর একেবারে শেষের দিকে, তাহের ভাই। আমি এ ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার নই।[৫৮]

## ২১

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সফল হলো না। ২৬ নভেম্বর ঢাকার ধানমন্ডিতে ভারতীয় হাইকমিশনে হাইকমিশনার সমর সেনকে জিম্মি করতে গিয়েছিল ছয়জন তরুণের একটি দল। এদের চারজন—বাহার, বাচ্চু, মাসুদ ও হারুন নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়। আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয় বেলাল ও সবুজ। দলের জন্য এটা ছিল একটা বিরাট ধাক্কা।

খন্দকার মোশতাক আহমদ এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন, পরের বছর (১৯৭৬) ১৫ আগস্ট থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমোদন দেওয়া হবে এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে বিচারপতি আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম একই অঙ্গীকার করেন। এর কিছুদিন পর জাসদের শীর্ষ নেতাদের অনেকেই গ্রেপ্তার হন এবং অন্যরা আত্মগোপনে চলে যান। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মামলা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে সামরিক আদালতে শুরু হয় গোপন বিচার। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে পারে, সে সম্পর্কে জাসদ নেতাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না।

সামনে যে ভয়ংকর দিনগুলো তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে, তার আভাস তাঁদের চিন্তায় ছিল না বললেই চলে। ১৯৭৬ সালের পয়লা জুলাই প্রকাশিত হয় *সাম্যবাদ*-এর ষষ্ঠ ও শেষ সংখ্যা। এখানে জাসদ নেতৃত্বের তখনকার মূল্যায়নের একটি প্রতিফলন দেখা যায় :

> ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অঙ্গীকার করেছে যে ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ উন্মুক্ত করে দেবে। সম্ভাব্য নির্বাচন ও অবাধ রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক জনগণের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের আশা, কল্পনা ও অনুমান কার্যকর রয়েছে। অনেকেই আশা করছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের একটি পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। নির্বাচন ও রাজনীতি-সংক্রান্ত এরূপ চিন্তাচেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও অনুমানের মধ্যে কোনো ভ্রান্তি থাকলেও জনগণ তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবে ১৫ আগস্ট (১৯৭৬) তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে। সুতরাং এমতাবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে গায়ে পড়ে কোনোরূপ শক্তি পরীক্ষায় যাওয়া আমাদের উচিত হবে না; উচিত হবে না এমন কোনো কর্যক্রম গ্রহণ করা যাতে শত্রুরা অপপ্রচারের সুযোগ পায় এবং সে অপপ্রচারের দরুন জনগণেরও মনে হতে পারে যে জাসদ বুঝি সত্যি সত্যিই ঐক্যবিরোধী এবং জাসদই বুঝি গণতন্ত্র, নির্বাচন ও শান্তির অন্তরায়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের আজকের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে জনগণের মধ্যে থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রধানত নিঃশেষ করে আনা। এমতাবস্থায় আমাদের কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ :
>
> ১. সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য যেহেতু একটি তাত্ত্বিক ও বাস্তব অপরিহার্যতা, সেহেতু এরূপ ঐক্যের জন্য সকল পর্যায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া...
>
> ২. সম্ভাব্য ভারতীয় হামলা ও বাকশালীদের চক্রান্ত সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়ে এদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা...
>
> ৩. বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনালে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে নেতাদের শাস্তিদানের জঘন্যতম চক্রান্তের ব্যাপারটিকে সামনে নিয়ে আসা;...এই বিচারের প্রহসন যে জাতীয় ঐক্যকে ব্যাহত করবে, গণতন্ত্রকে মিথ্যা প্রমাণ করবে এবং সর্বোপরি বিদেশি চক্রান্ত, বিশেষত ভারতীয় হামলা ও ভারতীয় চরদের গোলযোগের পথকেই সুগম করে দেবে—এ ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করে

তোলা; এবং এরূপ ভয়াবহ চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা...

৪. সকল অংশের জনগণের সঙ্গে ব্যাপক সংযোগ গড়ে তোলা...

৫. গণসংগঠনসমূহ কার্যকররূপে পুনর্গঠিত করা...

আন্দোলনের স্লোগানসমূহ : স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা; ভারতীয় হামলা ও ভারতীয় চরদের চক্রান্ত প্রতিহত করা; ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করা; নেতাদের বিচারের নামে প্রহসন বন্ধ করা... ।[৫৯]

ওই সময় সামরিক সরকার আওয়ামী-বাকশাল ও ভারতবিরোধী জিগির তুলে একধরনের উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা করছিল। জনমত ছিল আওয়ামী লীগ এবং ভারতবিরোধী। সামরিক শাসকদের সুরে সুর মিলিয়ে জাসদও একই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছিল। সামরিক ট্রাইব্যুনালে জাসদ নেতাদের বিচারের বিষয়টি গৌণভাবে দেখা হচ্ছিল।

১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল ট্রেনিং ডাইরেক্টরের বাসায় জাসদ-গণবাহিনীর নেতারা আবার বৈঠকে বসলেন। প্রস্তাব এল, রণকৌশল বদলাতে হবে। সব জায়গা থেকে খারাপ খবর আসছে। রাজশাহীতে গণবাহিনীর ১১ জনকে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলেছে। 'যেহেতু জনবিচ্ছিন্নতা এসে গেছে, অতএব সশস্ত্র সংগ্রাম স্থগিত রাখতে হবে।' খায়ের এজাজ মাসুদ এই প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে বললেন, 'যারা বিপ্লবকে ভয় পায়, তারাই এ ধরনের কথা বলে।'[৬০]

১৭ জুলাই বিশেষ সামরিক আদালতের রায়ে কর্নেল তাহেরের ফাঁসির আদেশ হলো। মেজর জলিল ও সার্জেন্ট আবু ইউসুফ পেলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২১ জুলাই তাহেরের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় নেতারা অক্টোবরের ২৪ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত সিওসির এক সভায় বিপ্লবী পার্টি গড়ার প্রক্রিয়া থামিয়ে দেন। সিদ্ধান্ত হয়, গণসংগঠনগুলোকে আবারও সক্রিয় করতে হবে। দলের সমস্ত দায়িত্ব 'এক ব্যক্তি'র হাতে সমর্পণ করে' পার্টি বিলোপ করা হয়। ওই ব্যক্তি হলেন সিরাজুল আলম খান।

## ২২

পঁচাত্তরের ২৬ নভেম্বরের পর সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটে। নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ

ছিল। এ প্রসঙ্গে মুবিনুল হায়দারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। আমাদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ : আপনাদের মধ্যকার বিরোধের মূল কারণ কী?

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী : কিছুদিন আগে ৭ নভেম্বর স্মরণে একটা অনুষ্ঠানে বলেছি, বিপ্লব হলো জনগণের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ফলে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান। আর এরা কিছু গোলাগুলি করে মিলিটারিকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চেয়েছিল। এটা কোনো বিপ্লবের ধারণাই না। সিরাজুল আলম খানকে আমি এটা বলেছি। ওনার সঙ্গে আমি ব্রেক করলাম কবে? আমি বলেছিলাম, আপনি যে থিসিস সঠিক মনে করেছিলেন, সেই থিসিসে বিপ্লব সম্পর্কে যে ধারণা, তাকেই আপনি ডিফাই করলেন। ভায়োলেট করলেন। সম্পূর্ণ ভুল রাজনীতির দিকে চলে গেছেন। এটাই আপনার প্রবণতা। ১৭ মার্চ (১৯৭৪) যে ঘটনা ঘটালেন, সেটাও আপনার একটা ভুল। এটা যদি একটা মাস মুভমেন্ট হয়, তাহলে লাখো জনতা নিয়ে ঘেরাও করতে হতো। আপনি জাসদের কিছু লোক নিয়ে ঘেরাও করলেন। মাঝখানে ৫০টা লোক মরে গেল। একদম ভুল রাজনীতি। এসব পর্যালোচনা করা, ভুল হলো কি না খতিয়ে দেখা, ওনার মধ্যে এসব একদমই ছিল না।

মহি : ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে যে ইন্টারভেনশন হলো, এর আগে যে ডিসিশনটা হলো, এখানে আপনি যুক্ত ছিলেন না?

হায়দার : না। কিচ্ছু জানতাম না।

মহি : এই যে বিপ্লবী পার্টি গড়ার একটা প্রক্রিয়া চালু ছিল, আপনি তো এর মধ্যে যুক্ত ছিলেন?

হায়দার : আমি কোনো দিন জাসদ করিনি। তবে ওইটার মধ্যে ছিলাম।

মহি : আমি তো জানতাম আপনি থিওরেটিশিয়ান।

হায়দার : আলোচনা করেছি, কথা বলেছি।

মহি : ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে শুনলাম যে এই প্রসেসটা ডিজলভ করে দেওয়া হলো। ওই মিটিংয়ে আপনি ছিলেন?

হায়দার : ডিজলভ করার প্রক্রিয়া কি আমি সমর্থন করতে পারি?

মহি : আপনার সঙ্গে ওনার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছেদ হলো কখন?

হায়দার : ওই যে, ছেলেগুলি যখন মারা গেল।

মহি : ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫।

হায়দার : আমি বললাম যে আর কোনো দিন এরা ঠিক পথে চলতে পারবে না। এটা ভুল পথ।

মহি : ইন্ডিয়ান হাইকমিশন রেইডের সিদ্ধান্তটা এল কোথা থেকে?

হায়দার : ওরা নিজেরা নিজেরা করেছে। বিধানকৃষ্ণ সেন তখন জাসদের অস্থায়ী দায়িত্বে। আবদুল্লাহ সরকার আর বিধান সেন তখন হাটখোলায় একটা বাড়িতে থাকে। সেখানে আমি মাঝেমধ্যে দেখা করতে যেতাম। ওই দিনও গেছি। হঠাৎ টেলিফোন। শরীফ নুরুল আম্বিয়া আসছে। আমি ছাড়া আর কেউ বের হতে পারছে না। ওরা তো পরিচিত। আমি বেরিয়ে এসে আম্বিয়াকে ঘরে নিয়ে আসলাম। ঘরে ঢোকার পথেই আম্বিয়া বলল, আমরা সমর সেনকে হাইজ্যাক করছি।

কী হাইজ্যাক করছেন?

তাকে এখান থেকে হাইজ্যাক করে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

সমর সেনকে আপনি কেমন করে হাইজ্যাক করবেন?

আমাদের লোক ওখানে ঢুকেছে। তারপর হেলিকপ্টার আসবে। এসে নিয়ে যাবে।

ঘরে ঢুকেই আমি কিছু বলিনি। বললাম, রেডিও খোলেন। রেডিওতে শোনা যাচ্ছে, দুষ্কৃতকারীরা এই এই কাজ করেছিল, তাদের অমুক অমুক মারা গেছে। আম্বিয়াকে বললাম, এই বিপ্লব করছেন তো? আমি আর আপনাদের সঙ্গে নেই।

মহি : আম্বিয়ার রিঅ্যাকশন কী?

হায়দার : কী রিঅ্যাকশন? এক কোনায় বসে আছে। কোনো জবাব দিতে পারে? কী বলবে?

মহি : উনি আমাকে অন্য রকম স্টোরি বলেছেন। উনি বলেছেন, উনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

হায়দার : কনস্পিরেসি...ওই কাণ্ডটা যে করবে, এটা সে না-ও জানতে পারে, যদি তার কথা সত্য বলে ধরে নিই। কিন্তু সে এসে আমাকে যে রিপোর্ট করল, এটা তো সত্য।

মহি : আম্বিয়া আপনাকে বলেছেন, সমর সেনকে হাইজ্যাক করে বগুড়ায় নিয়ে যাবে। তার মানে হাইজ্যাকিংয়ের একটা প্ল্যান আছে। হোস্টেজ করে বগুড়ায় নিয়ে গিয়ে হয়তো কিছু দাবিদাওয়া আদায় করবে। এ বিষয়টা তিনি জানেন। এটা তো তাহলে তাঁর কাছে গোপন না?

হায়দার : হয়তো যারা পরিকল্পনা তৈরি করেছে, তিনি তার মধ্যে ছিলেন না।

মহি : সে হয়তো প্ল্যানারদের কেউ না। কিন্তু তার নলেজের বাইরে না। জাসদের ওপর বই লেখার সময় আমি তাঁর ইন্টারভিউ করেছি। উনি বলেছেন, উনি কিচ্ছু জানেন না। আনোয়ার হোসেন এটা প্ল্যান করেছে। পরে আম্বিয়ারা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আনোয়ারকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দেবেন। পরে আনোয়ারকে ঢাকা সিটি গণবাহিনীর কমান্ডারের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এরপর সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়নি?

হায়দার : আমি চট্টগ্রাম চলে গেলাম। উনি বারবার খবর দিচ্ছেন, হায়দার ভাই যেন আসেন। তারপর ঢাকায় এলাম। দেখা হলো। আমি জানিয়ে দিলাম, আমি আপনার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখব না। কারণ, আপনি বিপ্লবী রাজনীতির যে প্রতিশ্রুতি, যা কিছু যুক্তিসংগত, তার সবকিছু ভায়োলেট করেছেন। আপনি কয়েকটা বাচ্চা ছেলেকে হাইজ্যাকার বানিয়েছেন। তারা মারা গেল। উনি আমার হাত ধরে বললেন, আমার কি কষ্ট হচ্ছে না? আমি তাদের কত ভালোবাসতাম?

ভালোবাসার ছেলেদের এভাবে পাঠায় কেউ? ওদের কি বিপ্লবী কাজকর্ম করার মতো বয়স হয়েছে? ম্যাচিউর কাউকে তো আপনি পাঠালেন না? আপনি জঘন্য ধরনের ভুল রাজনীতি করেছেন। আপনি এতগুলো লোককে বিভ্রান্ত করেছেন। আপনার সব ভুলের কনফেশন হওয়া দরকার। আপনি তো কোনো জায়গায় থাকতে পারেন না। এ রকম ভুলভ্রান্তি করা লোক কি শীর্ষ স্থানে বসে থাকতে পারে?

মহি : উনি এসব অভিযোগের কী জবাব দিলেন?

হায়দার : উনি আর কী বলবেন। কাতর হয়ে আছেন। কাতর!

তারপর আমি এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম—মাহবুব, মান্না, বাদল, মুস্তাফিজ, একরাম। বদিউল তো তখন জেলে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে করতে তারা একটা সার্কেল হিসেবে গড়ে উঠল। এটাই পরে বাসদ হলো।

ডাকসু ইলেকশন করার পরে (১৯৭৩) অত তাড়াতাড়ি পার্টি তৈরি করার প্রয়োজন ছিল না। আরও অনেক ভাঙা-গড়া, সাংস্কৃতিক লড়াই, তাত্ত্বিক লড়াই করার মধ্য দিয়ে পার্টি গড়ার প্রশ্ন আসে। এদের ওস্তাদেরা যে রাজনীতি শিখিয়েছিল, তা ভোলাতে

আরও ১০ বছর লাগবে বলে আমি মনে করতাম। ভুলিয়ে আবার নতুন করে গড়ে তোলা। ব্রেনওয়াশ বলে একটা কথা আছে না? এদের ব্রেনওয়াশ হওয়া দরকার ছিল। এরা সঠিক চিন্তাভাবনা দ্বারা কখনো পরিচালিত হয়নি। সব ইনডিভিজ্যুয়ালিস্টিক ওয়ে অব থিংকিং দ্বারা পরিচালিত। কোনো কালেকটিভনেস ডেভেলপ করেনি। কোনো লক্ষ্য তৈরি করতে পারেনি। শুধু কথার ফুলঝুরি।

মহি: ১৯৭৬ সালের পর সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়নি?

হায়দার: হয়েছে। ১৯৮০ সালে যখন আমরা পার্টি করি (বাসদ), তার দুই দিন আগে দেখা হয়েছে। বলেছি, আপনাদের সাথে মতের মিল না হওয়ায় আমরা আলাদা পার্টি করছি। বললেন, আপনি বাসায় আসবেন। মা আপনাকে খুব ভালোবাসে। আমি যেতাম না। রাস্তায় হঠাৎ একদিন দেখা। কলাবাগানের ওখানে। হাত ধরে বললেন, একদম যোগাযোগ রাখেন না? এই আরকি। কারও সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। আমরা শুধু একমত নই। আর আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না।[৬১]

## ২৩

দলের অনেক নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলেও সিরাজুল আলম খান তখনো ঢাকায়, আত্মগোপনে। আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কম নয়। আজ এক শেল্টারে থাকেন, তো কাল অন্য একটায়। তাঁর ভক্তরা এসব শেল্টার জোগাড় করে দেয়। কারও সঙ্গে যোগাযোগ না হলে বিপদে পড়ে যান তিনি। পলাতক জীবনের একটি ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে। আশ্রয়ের খোঁজে মাঝরাতে তিনি গিয়েছিলেন তাঁর পূর্বপরিচিত ইকবাল আনসারি খানের বাসায়। আনসারির ডাকনাম হেনরি। ওই নামেই তাঁকে পরিচিতজনেরা চিনতেন। শোনা যাক সিরাজুল আলম খানের কথা:

> আমি হেনরি ভাইয়ের বাসায় গেলাম। নক করলাম। বাবুর্চি-কাম-কাজের ছেলে দরজা খুলে বলল, দাঁড়ান, স্যারকে বলি। কতক্ষণ পর সে ১০ টাকা নিয়ে এসে—স্যার বলেছে, এই টাকাটা রাখতে, আজকে অন্য জায়গায় থাকতে।
>
> মহি: কখন?

সিরাজ : জিয়াউর রহমানের কারফিউয়ের সময়, রাত ১২টায়।

মহি : ওই সময়?

সিরাজ : আমাদের সালাম আছে না? ওর বউ বানু। ও ছিল আমার কুরিয়ার। ১২টা বেজে গেছে। কোথায় যাব? শ্রমিকদের কোর্ট থাকে না?

মহি : লেবার কোর্ট?

সিরাজ : হ্যাঁ। এখানে একজন লোক আছে। তার সঙ্গে বানু যোগাযোগ করেছে। বলল, 'আপনি তো ওনাকে চেনেন?'

বললাম, তুমি চলে যাও। আমার সঙ্গে থাকা লাগবে না। তোমার দেরি হয়ে যাবে। ওই লোক কাছে-কিনারেই থাকে।

সে দরজা খুলে বলে, ভাই, আমার ওয়াইফকে আমি বোঝাতে পারিনি। রাত তো ১২টা বেজে গেছে।

তর্ক তো আর করা যায় না। বের হয়ে একটা স্কুটার পেলাম। কিন্তু থাকব কোথায়? তখন আমার মা-ভাইরা থাকে ইস্কাটনে। ভাবলাম, ওখানেই থাকব। পরদিন জায়গা চেঞ্জ করব। বাংলামোটর ক্রস করার সময় পুলিশ থামাল। আমি ডানে বসা, বাঁয়ে বানু।

কে উনি?

বানু বলল, হুজুর।

ও, আচ্ছা।

গেলাম বাসায়। গিয়ে দেখি বাসা তালাবদ্ধ। সবাই দেশের বাড়ি গেছে। এটা ঈদের আগে। কীভাবে ঢুকব এখন? যে ছেলেকে রেখে গেছে, সে তো খাবারদাবারসহ ঘরের মধ্যে। ৮-১০ দিন থাকবে, বের হবে না, এ রকম একটা হিসাব-নিকাশ করে দিয়ে গেছে। দুই-তিন ঘণ্টা ওই অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। গ্রামে, বগুড়া এবং ঢাকার রূপগঞ্জ এলাকায় তো আমি বেশির ভাগ সময় থাকতাম।[৬২]

জাসদ নেতাদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মোহমুক্তি ঘটেছে। অনেকেই বিরক্ত, অনেকেই ক্ষিপ্ত। মাঝেমধ্যে সিরাজুল আলম খানের শেল্টার জোগাড় করে দিতেন রেজাউল হক মুশতাক।[৬৩] এমনই এক শেল্টার হলো মোহাম্মদপুরে হুমায়ুন রোডের এক বাসায়। সেখানে থাকেন খোদা বখশ চৌধুরী, আনসার আহমদ ও ডা. সালাম। খোদা বখশ ও আনসার সূর্য সেন হলে থাকতেন। ছাত্রলীগের। এখন চাকরি করেন। সিরাজুল আলম খান সেখানে কয়েক দিন গেছেন। তাঁর সঙ্গে থাকতেন রীনা, তাঁর কুরিয়ার। তাঁরা সকালের দিকে আসতেন। সন্ধ্যার পর আবার

চলে যেতেন অন্য কোথাও। একদিন অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার একটু আগে খোদা বখশ, আনসার ও সালাম বাইরে বেরোলেন চা-নাশতা খেতে। বাসায় তখন সিরাজুল আলম খান ও রীনা। ঘণ্টা দুয়েক পর তাঁরা বাসায় ফিরে শুনলেন, পুলিশের লোক তাঁদের দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে। দিনটা ছিল ২৬ নভেম্বর ১৯৭৬।[৬৪]

সিরাজুল আলম খানের গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে জাসদের একটি পর্ব শেষ হলো।

## তথ্যসূত্র


১. *গণকণ্ঠ*, ১০ মার্চ ১৯৭৩
২. আবু করিম
৩. মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
৪. সিরাজুল আলম খান
৫. *গণকণ্ঠ*, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৩
৬. এম এ করিম
৭. শরীফ নুরুল আম্বিয়া
৮. সিরাজুল আলম খান
৯. মাহমুদুর রহমান মান্না
১০. 'আমি আগুন-সন্ত্রাসীদের মাইনাসের পক্ষে: হাসানুল হক ইনু', বিশেষ সাক্ষাৎকার, *প্রথম আলো*, ৮ জুলাই ২০১৮
১১. *বাংলার বাণী*, ১ এপ্রিল ১৯৭৪
১২. মাহমুদুর রহমান মান্না
১৩. শরীফ নুরুল আম্বিয়া
১৪. রহমান, আখলাকুর (১৯৭৪), *বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ*, সমীক্ষণ পুস্তিকা, ঢাকা; *সমীক্ষণ*, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১, পৃ. ৬৮-৬০
১৫. ঘোষ, শিবদাস (১৯৮৯), *কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই একমাত্র সাম্যবাদী দল*, এসইউসিআই, কলকাতা, পৃ. ৪২-৪৪
১৬. ওই
১৭. মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
১৮. *খসড়া থিসিস (পরিমার্জিত)*, ২৭ জুন ১৯৭৪ প্রণীত খসড়া থিসিসের মুখবন্ধ।
১৯. ওই, পৃ. ২৮

২০. ওই, পৃ. ৪৫-৪৬
২১. *সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়ান: জঙ্গি জনতার ঐক্য গড়ে তুলুন,* জাসদ-ছাত্রলীগ-শ্রমিক লীগ-কৃষক লীগ বিপ্লবী গণবাহিনী, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১২-১৩
২২. *সমীক্ষণ,* 'জাসদের রাজনীতি : তিন নেতার সাক্ষাৎকার', সুমন মাহমুদ ও জহিরুল আহসান, বর্ষ ১, সংখ্যা ১৪, ৩১ অক্টোবর ১৯৯১
২৩. খায়ের এজাজ মাসুদ।
২৪. *প্রথম আলো,* ৮ জুলাই ২০১৮
২৫. সিরাজুল আলম খান
২৬. *সাম্যবাদ-চার,* ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ১০-১৯
২৭. আবু আলম মো. শহীদ খান
২৮. *সাম্যবাদ-দুই,* পৃ. ১১-১২
২৯. ওই, পৃ. ৮
৩০. *সিরাজ সিকদার রচনা সংগ্রহ,* শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৮-৬০
৩১. *সাম্যবাদ-তিন,* পৃ. ৬-৭, ১৭-১৯
৩২. মনিরুল হক চৌধুরী
৩৩. সেন, পৃ. ৫৮০-৫৮১
৩৪. *দৈনিক বাংলা,* ১১ জুন ১৯৭৩
৩৫. সিরাজুল আলম খান
৩৬. শরীফ নুরুল আম্বিয়া
৩৭. মোস্তফা মোহসীন মন্টু
৩৮. 'মন্টুকাহিনী', মোফাজ্জল করিম, *প্রথম আলো,* ১ এপ্রিল ২০০৫
৩৯. সিরাজুল আলম খান
৪০. মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
৪১. *বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিপ্লবের পর্যায় (খসড়া থিসিসের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা),* সম্পাদনা : রায়হান আলম, ২৬ অক্টোবর ১৯৭৫; *খসড়া থিসিস (পরিমার্জিত),* পৃ. ৩৩
৪২. মোস্তাফা জব্বার
৪৩. মনিরুল ইসলাম
৪৪. 'বিস্তৃত নিয়তি : কে বি এম মাহমুদ, আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার', সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আসাদুজ্জামান, *সাপ্তাহিক,* ঈদসংখ্যা ২০১৫
৪৫. ওই
৪৬. ওই
৪৭. ওই

৪৮. Dalim, Shariful Haq (2015), *Bangladesh: Untold Facts*, Jumhoori Publications, Lahore, p.440-441
৪৯. *বিচিত্রা*, ৮ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১৮ এপ্রিল ১৯৮০
৫০. 'বিস্তৃত নিয়তি : কে বি এম মাহমুদ'
৫১. সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়ান : জঙ্গি জনতার ঐক্য গড়ে তুলুন, পৃ. ১৪-১৬
৫২. মাহমুদুর রহমান মান্না
৫৩. শরীফ নুরুল আম্বিয়া
৫৪. সিরাজুল আলম খান
৫৫. সুমন মাহমুদ
৫৬. শরীফ নুরুল আম্বিয়া
৫৭. আবু আলম মো. শহীদ খান
৫৮. মাহমুদুর রহমান মান্না
৫৯. *সাম্যবাদ-ছয়*, পৃ. ২২-২৪
৬০. খায়ের এজাজ মাসুদ
৬১. মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
৬২. সিরাজুল আলম খান
৬৩. রেজাউল হক মুশতাক
৬৪. খোদা বখশ চৌধুরী

# বিভক্তি

একসময় দলের মধ্যে সিরাজুল আলম খানের প্রতি সবার আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর কথাই ছিল চূড়ান্ত। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর দল সংকটে পড়ে। অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে বছরের পর বছর জেলে থাকেন। অন্যরা গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপনে চলে যান। অনেকের মধ্যেই নতুন চিন্তা ও উপলব্ধি দেখা যায়।

১৯৭৮ সালে সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতার পর অনেকেই জেল থেকে ছাড়া পেতে থাকেন। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাসদ অংশ নেয়। তারপর সামরিক শাসন উঠে যায়। অন্য কারাবন্দীরাও ছাড়া পান। জাসদের মূল শক্তি তখনো তার ছাত্রসংগঠন। ১৯৭৯ সালে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের মান্না-আখতার প্যানেল জয়ী হয়। ১৯৮০ সালের শুরুতে তৈরি হয় সরকারবিরোধী ১০-দলীয় জোট। জোটে আওয়ামী লীগ এবং জাসদও ছিল।

তাঁরা অতীতের কাজকর্মের মূল্যায়ন করতে থাকেন। প্রকাশ্যেই তাঁরা সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। এটি একসময় অচিন্তনীয় ছিল। সিরাজুল আলম খান এ ধরনের রাজনৈতিক বিতর্কে অভ্যস্ত নন। ভিন্নমতকে তিনি 'বিদ্রোহ' হিসেবে দেখলেন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ডানা ছেঁটে দিতে চাইলেন। তাঁর প্রথম কোপটা গিয়ে পড়ল বিপুল ভোটে জেতা ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না ও আখতারউজ্জামানের ওপর। তাঁরা ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এর জের ধরে জাসদেও কিছুটা ধস নামল। জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাতজন নেতা বহিষ্কৃত হলেন। এঁরা হলেন সহসভাপতি আবদুল্লাহ সরকার, সহসম্পাদক একরামুল হক, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া, আইন সম্পাদক আসাফউদ্দৌলা, মহিলা সম্পাদক মমতাজ বেগম, সদস্য আ ফ ম মাহবুবুল হক ও হাবিবুল্লাহ চৌধুরী।

দলের ভেতরে রাজনৈতিক বিতর্কের মূল বিষয়গুলো ছিল সরকারবিরোধী ঐক্যজোটে আওয়ামী লীগের সঙ্গী হিসেবে জাসদের যাওয়া, না যাওয়া।

জাসদের দেওয়া ১৮ দফা কর্মসূচি নিয়ে সিরাজুল আলম খান যে নীতি ও কৌশল পাল্টাচ্ছেন, এটা কারও কারও কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। একসময় বিদ্রোহীদের প্রতিভূ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলেন মান্না-আখতার। ১৯৮০ সালে সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* ছাপা হওয়া এক সাক্ষাৎকারে মান্নার দেওয়া ভাষ্যটি ছিল এ রকম :

> ...কিছুদিন আগে জেল থেকে সিরাজ ভাই আন্দোলন, সংগঠন সম্পর্কে একটা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ জিনিসটা অবশ্যম্ভাবী এবং তিনটা ধাপে হবে। প্রথম ধাপে সরকারে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে বুর্জোয়া নেতৃত্ব, তারপর বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েত শক্তির ভারসাম্য করতে হবে এবং তারপরে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারা থাকবে। এখানেও আমাদের একটা প্রশ্ন, বুর্জোয়া নেতৃত্বে যদি সরকারে যোগ দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে সিপিবির বাকশালে যোগ দেওয়া বা জিয়ার ফ্রন্টে যেসব বামপন্থী বলে কথিত দলগুলো যোগ দিল, তারা কি ভুল করল? আমরা যখন বলছি বিপ্লবের পর্যায় চলছে, তখন এ ধরনের বক্তব্য কখনোই রণনীতির সঙ্গে খাপ খায় না। এটা একটা বিতর্কের দিক।...
>
> সিরাজ ভাই যখন জেলে ছিলেন, তখন তিনি লিখেছিলেন (কাগজগুলো আমাদের কাছে আছে) ১৮ দফা কর্মসূচি একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। এটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বড়জোর একটা দলের ম্যানিফেস্টো হতে পারে। তিনিই বেরিয়ে এসে বললেন, এই ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বিবৃতি দিয়েছেন, আমরা ১৮ দফা মানি না বলে আমাদের বহিষ্কার করা হয়েছে।
>
> আমি এগুলোর বিরোধিতা করছিলাম সংগঠনের ভেতর থেকে। কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রাম ছাড়া বাকশালের সঙ্গে ঐক্য গঠনের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সাংঘাতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের দুটো বর্ধিত সভা হয়। একটাতে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেন। ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় ১৮ দফার পক্ষে প্রস্তাব পাস হয়নি। বর্ধিত সভায় প্রস্তাব আসলেও জাসদ তো এখনো সাংগঠনিকভাবে তেমন শক্তিশালী নয়। শক্তিটা মূলত ছাত্রসংগঠনের। এই ছাত্রসংগঠন যখন বিরোধিতা করল, তখন তাঁরা সাংঘাতিক বিব্রত বোধ করলেন। এরপরে কোনো কারণ

> ছাড়াই, কোনো সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই ছাত্রলীগ কর্মীদের বহিষ্কার করা হলো। কিন্তু পাস হলো না। এরপর সভা মুলতবি হলো। রাত ১০টা পর্যন্ত আমি খবর জানলাম, সভা বসেনি। কিন্তু সকালে কাগজে দেখলাম আমরা দুজন বহিষ্কৃত।[১]

মান্নার ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, সিরাজুল আলম খান তাঁর আগের অবস্থান বদলেছেন। পরিস্থিতি যে আমূল পাল্টে গেছে, এটা তিনি উপলব্ধি করেছেন। জিয়াউর রহমানের বিএনপি সরকারকে সবাই বলছেন ফ্যাসিবাদী। এর বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক জোট হলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ থাকবে। সেখানে জাসদের যোগ দেওয়াটা তিনি সমস্যা মনে করেন না। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে অন্য জায়গায়। কয়েক বছর ধরে একটি 'বিপ্লবী পার্টি' গড়ার প্রক্রিয়া থেকে তরুণদের মনোজগতে যে পরিবর্তন এসেছে, হঠাৎ করে তাতে ছেদ ঘটানো সম্ভব নয়। 'আওয়ামী-বাকশালী' আমলের নির্যাতনের ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। আওয়ামী লীগের সঙ্গে এক ছাতার তলায় যাওয়ার বিষয়টি তাঁদের মনঃপূত হয়নি। তখন ছাত্রলীগের অন্যতম প্রধান স্লোগান ছিল, 'রুখো বাকশাল হটাও জিয়া, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া'। তরুণেরা অনেকেই দলের এই নতুন রণনীতি মেনে নিতে পারেননি। 'বিপ্লব' নিয়ে অনেকের মনে একধরনের ভাববিলাস ছিল। সেটা কাটতে বেশি দিন সময় নেয়নি। মান্না-আখতার দুজনই পরে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন।

আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মান্না এই সংকটের পূর্বাপর তুলে ধরেন। দলের মধ্যকার বিতর্কের পুরো বিবরণ পার্টি দলিলে থাকে না। মান্নার সঙ্গে আলাপচারিতায় বেরিয়ে এসেছে জানা-অজানা কিছু তথ্য।

> মাহমুদুর রহমান মান্না: জেলে বসে বদিউল আলম আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সিরাজ ভাইকে চিঠি লিখব। আমাদের ধারণাগুলো জানাব। বদিউল বলল, 'আমাদের বক্তব্য অন্য জায়গাগুলোতেও পাঠাই।' সব জায়গায় পাঠালাম। সিরাজ ভাই এ সম্পর্কে কোনো কমেন্ট করলেন না। পরে আখলাক ভাইয়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, বলেছেন, 'পড়েছি তো?' উনি তো সিরিয়াস আলোচনা কখনো করেন না। সব সময় একটা জোক করার টেনডেন্সি। বেশির ভাগ জায়গা থেকেই আমাদের বক্তব্য সমর্থন করা হয়েছিল। শাজাহান সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে তো জেলে একসঙ্গে ছিলাম। উনি আমার সঙ্গে পুরো একমত। এটা নিয়ে পরে লিখলাম 'শুধুমাত্র সদস্যদের জন্য'। ৩২ পৃষ্ঠার বই। আমার দুর্ভাগ্য, বইটা নাই। কোথাও আর পাইনি।

মহি : এসব থাক। আপনাকে ছাত্রলীগ থেকে এক্সপেল করা হলো কেন? আবুল হাসিব খান আমাকে বলেছে। তাকে দিয়েই বোধ হয় প্রস্তাবটা পাস করানো হয়।

মান্না : প্রস্তাবটা তুলেছিল নাজমুল হক প্রধান। সে কিছুদিন আগে পঞ্চগড় থেকে এসেছে। সে ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির জুনিয়রমোস্ট মেম্বার। ঢাকার পলিটিকস কিছুই জানে না। সম্ভবত মার্শাল মনি তাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল। পুরো কমিটিই ছিল আমার এক্সপালশনের বিপক্ষে। এটা করিয়েছে সিরাজ ভাই। হাসিব খুব হেজিট্যান্ট ছিল। আরও অনেকেই হয়তো দ্বিধায় ছিল। আসলে আমাকে তো এক্সপেল করা যায় না। আমি তো ছাত্রলীগের কেউ নই। প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে আমি পদাধিকারবলে সদস্য। তখন আমি ডাকসুর ভিপি। কনস্টিটিউশনালি করতে পারে না। সিরাজ ভাই তখন নাকি একটা ডায়ালগ দিয়েছিলেন,'কেটে ফেলে দিতে হবে, আজ রাতের মধ্যেই এটা আমি চাই।'

মহি : বডিতে টিউমার হলে কেটে ফেলে দিতে হবে।

মান্না : এ রকমই বলেছিল, রাতের মধ্যেই করতে হবে। তো ওই রাতের মধ্যেই ওরা এটা করেছিল। এর আগের ঘটনা হলো, জেল থেকে বের হওয়ার পর—আমি একটু স্টুপিড টাইপের ছিলাম। পার্টি যে রকম বলত, আমি সে রকম বিশ্বাস করতাম। থিওরেটিক্যাল স্ট্রাগল করা উচিত, এ রকম আমিও বলেছি।

মহি : জেল থেকে বেরোলেন কবে?

মান্না : '৭৮ সালের এপ্রিলে। বেরোনোর পর আমি এটা বলতে শুরু করলাম। সিরাজ ভাই জেল থেকে বেরিয়ে এসে নতুন একটা তত্ত্ব বের করলেন—গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার, ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল গভমেন্ট (ডিএনজি)। তত্ত্বটা হয়তো ঠিক ছিল। কিন্তু আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করি নাই। কারণ, তখন আমি বুঝি নাই। আমি মনে করেছি এটা হবে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া। আগে ছিল পুরো লেফট, এখন পুরা রাইটে চলে আসল। এখন আমি মনে করি, স্বাধীনতার পর থেকেই ডিএনজির (ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল গভমেন্ট) তত্ত্ব গ্রহণ করা উচিত ছিল। তখন আমি এটাকে আক্রমণ করেছিলাম। এই আক্রমণে ছাত্রলীগ তো সম্পূর্ণ আমার সাথে। আমাকে এক্সপেল করার পর মুনীর-হাসিব তো ছাত্রলীগ অফিসে যেতেও সাহস পায়নি। ইউনিভার্সিটিতে তো তাদের কেউ নেই। আমি ছাত্রলীগ অফিসে গিয়ে কোনো ঝামেলা করিনি। কারণ, ওরা

হলো অফিশিয়াল লিডারশিপ। আমি ছাত্রলীগ অফিস ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় গেছি।

এই থিওরেটিক্যাল স্ট্রাগলটা যখন চলছে, আমি বক্তৃতা করছি, লিখছি, আলোচনা করছি। অনেস্টলি বলি সিরাজ ভাই, জলিল ভাই, রব ভাই তখন আমার সামনে দাঁড়ায় নাই। দাঁড়াতে পারে নাই। ছাত্রদের মধ্যে তো ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আবেগ ইত্যাদি বেশি কাজ করে। আমি তখন ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট পপুলার। সবাই যখন আমার পক্ষে এসে যাচ্ছে এবং তারা হেরে যাচ্ছে, তখন তারা একদিন আমাকে আর আখতারকে ডাকল। জলিল ভাইয়ের বাসা তখন রাজারবাগের ওখানে। সেখানে সিরাজ ভাই, জলিল ভাই, রব ভাই, মোহাম্মদ শাহজাহান, জিকু ভাই, মুনীর-হাসিব ছিল। আর কে ছিল মনে নাই।

কিছুক্ষণ দমটম নিয়ে মোহাম্মদ শাহজাহান বলল, তোমাদের মধ্যে যা-ই হচ্ছে, এগুলো বন্ধ করতে হবে। মান্না-আখতার আর মুনীর-হাসিব এই দ্বন্দ্ব আমরা চাই না। তোমাদের অঙ্গীকার করতে হবে এটা এখন থেকে আর হবে না।

শাহজাহান ভাই, যে কথাটা আপনি বললেন, মুনীর-হাসিবের সঙ্গে তো আমার বা আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নাই। ওদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। এ নিয়ে আপনাদের কাছে অঙ্গীকারনামা দেওয়া, এটা আবার কী সিস্টেম? কী নিয়ে আমাদের বিতর্ক? যা নিয়ে আমরা ঝগড়া বা বিতর্ক করব না, তা যদি চিহ্নিত না হয়, তাহলে—এটা কী কথা?

তাহলে এটা অ্যাগ্রি করছ না?

এটা শাহজাহান ভাই অথবা সিরাজ ভাই, কে বলেছিলেন মনে নেই। আমি বললাম, সিরাজ ভাই, একটা কথা বলি। আমি তো চট্টগ্রামে ছিলাম। ভেবেছিলাম, পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলে রাজনীতির পথে থাকব—এটাও ঠিক করিনি। আজ রাজনীতিতে আমার যেটুকু অবস্থান, সবই আপনাদের জন্য। জেএসডি ইজ মাই ফার্স্ট লাভ। আই ওয়ান্ট দ্যাট ইট উইল বি মাই লাস্ট লাভ। আপনাদের যদি মনে হয় আমার কোনো কাজ সংগঠনবিরোধী হচ্ছে, সংগঠনের ক্ষতি করছে, তাহলে বলেন, চুপচাপ বসে যাব। বলেন, কত দিন? এক বছর? দুই বছর? কিন্তু আমি মনে করি, যে লাইনে আপনারা যাচ্ছেন, আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। এর কোনো ফিউচার নাই। আমাকে যদি পলিটিকস করতে দেন, আই উইল বি ফাইটিং অ্যাগেইনস্ট দিস।

তখন সিরাজ ভাই অন্যদের শুনিয়ে বললেন, 'ওরা তো মানছে না।' মুনীর-হাসিব কোনো কথা বলে নাই। মিটিংটা এভাবেই শেষ হয়ে গেল। বেরিয়ে চলে এসেছি। তার কত দিন পরে এক্সপেলড হয়েছি মনে নাই।

মহি: মেজর জলিল জেল থেকে ছাড়া পেলেন '৮০ সালের ২৪ মার্চ, সিরাজ ভাই ছাড়া পেলেন পয়লা মে। আর জাসদ ভেঙে বাসদ হলো '৮০ সালের নভেম্বরে। এটা মে মাস বা তার পরপরই হবে, হয়তোবা। হাসিবের কাছেই আমি প্রথম শুনি যে সিরাজ ভাই ফোর্স করে তাকে দিয়ে এটা করিয়েছে। কিন্তু ওরা এটা অ্যাগ্রি করল কেন?

মান্না: আমি দেখেছি অনেকেই বড় বড় কথা বলে। জোরে কথা বলে, কিন্তু ভেতরে ওই রকম দৃঢ়তা নেই। চাপের মুখে এরা বলতে পারে না—সিরাজ ভাই, এটা করতে পারব না। কী হতো? আমি তো বলেছি কোনো অঙ্গীকারনামায় সই করব না। হাসিবরা আমার এক্সপালশনে সই করেছে—হাউ ক্যান ইট হ্যাপেন? এরপরও তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। কিন্তু অনেক জায়গায় এ সম্পর্ক থাকে না। এটা যদি তারা না করত, তাহলে জাসদ হয়তো একভাবে রক্ষা পেত। বলতে পারত, আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, কিন্তু এ জন্য এক্সপেল করব না।

মহি: আপনি বলেছেন 'গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার' স্বাধীনতার পরপরই পারসু করা দরকার ছিল।

মান্না: এর কোনো ডিটেইলস করা হয়নি। গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার বলতে যা বোঝায়, আমরা মনে করি, স্বাধীনতার পরপরই এটা নিয়ে এগোনো উচিত ছিল।

মহি: আমি একটা লিটারেচার দেখলাম—কেন গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার। তারিখ লেখা আছে জুন ১৯৭৬।

মান্না: প্রশ্নই আসে না।

মহি: পরে শুনেছি, সিরাজ ভাই এটা জেল থেকে পাঠিয়েছে।

মান্না: হতে পারে। আমি জেল থেকে বেরোনোর পরেই এ বিতর্ক। সিরাজ ভাইয়ের মনে থাকতে পারে। উনি যদি '৬২ সালেই নিউক্লিয়াস করতে পারেন, তাহলে এটাও করতে পারেন। এটা অসম্ভব না।

বদিউল আলমের একটা কথা বলি। সে তখন কুমিল্লায় কমান্ডার বা ডেপুটি কমান্ডার। ওখানে তার এক্সপেরিয়েন্সটা ভালো হচ্ছে না। সিরাজ ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হচ্ছে?' বদিউল বলেছে, 'ভাই, এই

লোকই পরে আমার সামনে বলছে—যাও, এই এই করো। মানে অ্যাকশন করবা।'

মহি: আমরা তো চান্দিনাতে একটা মিটিং করে বদিউলকে কুমিল্লা জেলা গণবাহিনীর কমান্ডার বানালাম। মিটিংয়ে আমি ছিলাম। হাবিবুল্লাহ চৌধুরীকে করা হলো পলিটিক্যাল কমিসার। গণবাহিনীর কোনো অ্যাকটিভিটি কিন্তু কুমিল্লায় নাই, কুমিল্লা-চিটাগাং-সিলেট বেল্টে ছিল না। আমি তো চাঁদপুর থেকে সুনামগঞ্জ পুরো অঞ্চলটাই দেখেছি।

মান্না: সিরাজ ভাইকে যখন জেলে নিচ্ছে, উনি নাকি খালি কাঁদতেন। তাহের ভাইয়ের বড় ভাই ইউসুফ ভাই খুবই বিরক্ত। বলতেন, 'আপনাদের লিডার কান্দে।' কান্না কিসের? সবার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, কথাবার্তা বলবে, তাই না? আমরা কথাবার্তা বলছি না? সিরাজ ভাই কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতেন না। খালি কাঁদতেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগঠনে তাঁকে আমি এক নম্বর মনে করি। উনি যে টিমটা তৈরি করেছিলেন, এটা অসাধারণ। পরবর্তী সময়ে লিড করতে পারলে বাংলাদেশের চেহারা বদলে দিতে পারতেন। পরে কেন পারলেন না, এটা ওনার লিমিটেশন। এত বড় মানুষের এত ছোট ছোট বা বড় বড় মিথ্যাচার আমার কাছে বিস্ময়কর লাগে।

যেদিন আমাকে ছাত্রলীগ থেকে এক্সপেল করা হলো, তখনো তো জানি না। জাসদ অফিসে গেছি। তখন রাত আটটা হবে। রব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বললেন, 'আরে, কী খবর, বঙ্গশার্দূল, চট্টশার্দূল!' বললাম, আপনার সঙ্গে কথা আছে। দুজন একান্তে কথা বললাম। আমি বললাম, আমার বিরুদ্ধে তো এই সব হচ্ছে। রব ভাই বললেন, আরে, কিছু হবে না।

আপনিই তো আমাকে চিটাগাং থেকে ঢাকায় এনেছেন, ছাত্রলীগের সেক্রেটারি বানিয়েছেন। কিন্তু আমারও তো কিছু কাজ আছে। আমার বিরুদ্ধে কিছু করা হলে আমি তো চুপচাপ বসে থাকব না। আমি তো রাজনীতি করব। এটা তো জাসদের জন্য ভালো হবে না।

আরে, এসব কিছু হবে না। বাসায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাও।

আমি তখন রাজারবাগের কাছে একটা বাসায় থাকি। আখতারের সঙ্গে কথা হলো। বললাম, রব ভাই বলেছেন, চিন্তার কোনো কারণ নাই।

> পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল দরজা ধাক্কানোর আওয়াজে। দরজা খুলে দেখি আমার মেজ ভাই দাঁড়িয়ে। হাতে একটা পত্রিকা। বললেন, 'দেখো, খবর বেরিয়েছে, মান্না-আখতারকে বহিষ্কার করা হয়েছে।' সব কাগজেই এই সংবাদ, একটু পরে আখতার ফোন করে বলল, 'মান্না ভাই, আপনার কথা শুনে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে গেলাম, এখন এ কী শুনছি।' আমি তখন লা-জবাব। রব ভাই আমাকে এ রকম একটা ব্লাফ দিল?[২]

দলের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রবকে সিরাজুল আলম খানের শীর্ষ মুখপাত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা একে অপরকে চেনেন এবং একসঙ্গে রাজনীতি করেছেন প্রায় দুই দশক ধরে। দলে ভাঙন পর্বের একটি ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় ১৯৮০ সালে *বিচিত্রায়* ছাপা হওয়া এক সাক্ষাৎকারে। এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো :

> প্রশ্ন : প্রত্যেকটা সংগঠনেই ভিন্নমত থাকে। ভিন্নমতের ফলে দ্বন্দ্ব আসে, দ্বন্দ্বের ফলে বিকাশ হয়। কিন্তু এখনকার জাসদের যে দ্বন্দ্ব তা ভাঙন সৃষ্টি করল কেন?
>
> উত্তর : কিছু লোক কোনো সংগঠন থেকে চলে গেলে বা দ্বিমত পোষণ করে আলাপ কর্মসূচি করলেই তাকে ভাঙন বলা যায় না। তারা আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে।
>
> প্রশ্ন : এই বিরোধ যদি কেবলমাত্র ডাকসু-ছাত্রলীগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে আমরা তা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন তো ভাঙন দেখা গেল কেন্দ্রীয় কমিটিতেও।
>
> উত্তর : আমাদের চারটি সহযোগী সংগঠনের মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। কাজেই বিরোধ এক জায়গায় দেখা দিলে স্বাভাবিকভাবেই তা অন্য ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।
>
> প্রশ্ন : যে দলিল জোর করে ওদের ওপর চাপিয়ে দেবার অভিযোগ তারা আপনাদের বিরুদ্ধে এনেছে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?
>
> উত্তর : বাকশালের সঙ্গে ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু জাসদ বা তার কোনো সংগঠন আজ পর্যন্ত বলেনি যে আমরা বাকশালের সঙ্গে ঐক্য করতে চাই। বাকশালের কনসেপ্টের সঙ্গে আমাদের কোনো ঐক্য হতে পারে না। অথচ এই প্রশ্নটি নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে চমকপ্রদ স্লোগান দিয়ে আমাদের নিপীড়িত কর্মী বাহিনীর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
>
> প্রশ্ন : তাহলে আপনি বলতে চান যে এই মতবিরোধ বা ভিন্নমত

সংগঠনের মধ্যে আগে থেকেই ছিল?

উত্তর : মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধ থাকবেই। যারা চিন্তা করে তাদের মতপার্থক্য হওয়া ভালো। কিন্তু আমাদের দেশে সংগঠনগুলোতে মতপার্থক্যের নামে অন্য কিছু হচ্ছে। আমরা মতপার্থক্য করি মতৈক্যে পৌঁছবার জন্য। কিন্তু মতপার্থক্যকে যদি নোংরামি দিয়ে সাজানো হয়, তাহলে তা সংগঠনের বৃহৎ স্বার্থে আঘাত হানে।

প্রশ্ন : তাদের বিরুদ্ধে আপনার সুস্পষ্ট অভিযোগ কী?

উত্তর : এরা আমাদের বর্তমান কর্মসূচির বিরোধিতা করেছে। সেটাই হলো আসল কারণ। আর অন্য যেগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো সবই ধূম্রজাল। এ মুহূর্তে ঐক্যই আমাদের কাছে বড় নয়। আন্দোলনই বড়। অথচ ঐক্যের প্রশ্নটাকে বড় করে তুলে চমক সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : তারা যদি ভুল স্বীকার করে আপনারা কি তাদের গ্রহণ করবেন?

উত্তর : আমরা ইতিমধ্যেই এ ধরনের বিবৃতি দিয়েছি। তারা যদি ভুল স্বীকার করে এবং যে শর্ত দিয়েছি তা মেনে নিতে তৈরি থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের গ্রহণ করা হবে।

প্রশ্ন : চূড়ান্তভাবে বিবৃতি দিয়ে আপনারা একতরফাভাবে তাদের বহিষ্কার করলেন কেন?

উত্তর : আমার মনে হয় এটা সঠিক নয়। কারণ, আমাদের সংগঠন দেশের অন্য সংগঠনগুলোর চাইতে একটু আলাদা। এ রকম করলে আমরা সবাই যখন একসঙ্গে জেলে ছিলাম, তখন সংগঠন টিকে থাকত না।[৩]

বিপ্লবী পার্টি তৈরির পরিক্রমাটি বন্ধ করে দেওয়ায় যে শূন্যতা তৈরি হলো, তা কীভাবে পূরণ হবে, এ প্রশ্ন উঠল। ভিন্নমতাবলম্বীরা পরে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর তাত্ত্বিক নেতৃত্বে একজোট হয়েছিলেন। তাঁদের চিন্তা থেকেই পরে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)। তাঁদের বক্তব্য ছিল, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি (সিওসি) ভেঙে দেওয়ার পর কোনো প্রকার পার্টি প্রক্রিয়া বা পার্টি বিবেচনায় কোনো সাংগঠনিক কাঠামো রাখা হয়নি। ফলে থেকে গেল শুধু গণসংগঠনগুলো, যার মাধ্যমে বিপ্লবী রাজনীতি গড়ে তোলার নামে প্রকারান্তরে 'বিলোপবাদী স্বতঃস্ফূর্ততা'র হাতে কর্মী বাহিনীকে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং এভাবে পার্টির অগ্রণী ভূমিকাকে অস্বীকার করা হলো।[৪]

## ২

পয়লা মে ১৯৮০ ময়মনসিংহ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সিরাজুল আলম খান ঢাকায় আসেন। কয়েক দিন হাসপাতালে ছিলেন। *গণকণ্ঠ* পত্রিকা আবার বের করার উদ্যোগ নিলেন তিনি। পুরোনো সাংবাদিক-কর্মীদের অনেককেই জড়ো করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মোস্তাফা জব্বার, আতিয়ার রহমান, আবু করিম, আহমদ ছফা, মাশুক চৌধুরী। দলের ভেতরের এবং বাইরের অনেকেই এ সময় *গণকণ্ঠ*-এ যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বদিউল আলম, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান। সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন বাহাউদ্দিন চৌধুরী। তিনি একসময় সরকারের ভারপ্রাপ্ত তথ্যসচিব ছিলেন। বাহাউদ্দিন চৌধুরী তাঁর বন্ধু ওয়াহিদুল হককে নিয়ে এলেন সম্পাদকীয় বিভাগটি দেখভাল করার জন্য। ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে চুক্তি ছিল অনানুষ্ঠানিক।

সিরাজুল আলম খান টিপু সুলতান রোডের *গণকণ্ঠ* অফিসে একটা কামরায় নিয়মিত বসতেন। পত্রিকার মান দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। পত্রিকা চালাতে অনেক টাকা লাগে, বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ দিন *গণকণ্ঠ* বেরোত ছয় পাতার। রোববারে আট পাতা। ওই সময় মাস তিনেক আমি সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছি। সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লেখা ছাড়াও আমাকে 'অর্থনীতি'র একটা সাপ্তাহিক পাতা বের করতে হতো। কয়েক বছর জেলে থেকেও জাসদের নেতাদের রাজনীতিতে চেতনাগত পরিবর্তন যে হয়নি, তার একটি প্রমাণ পেলাম খুব শিগগির। এ নিয়ে একটি মজার ঘটনা হয়েছিল।

একদিন বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনের চত্বরে জাসদের এক জনসভায় আ স ম আবদুর রব বক্তৃতা দিলেন। তখন জিয়াউর রহমানের সরকার। জাসদের ভাষায় 'ফ্যাসিবাদী' সরকার। কিন্তু রবের বক্তৃতায় আগাগোড়া ছিল আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আক্রমণ। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এ নিয়ে একটি উপসম্পাদকীয় লিখব।

রবের বক্তৃতার সারমর্ম ছিল—আমরা স্বাধীনতার আগে শেখ মুজিবকে সমর্থন করেছি। তখন তিনি ভালো ছিলেন। পরে তিনি খারাপ হয়ে গেছেন। এ জন্য আমরা তাঁর বিরোধিতা করি। আমি এই যুক্তিটাকেই খণ্ডন করার চেষ্টা করলাম। লেখাটা বেশ বড় ছিল, পৃষ্ঠাজুড়ে চার কলাম। তার শেষ অনুচ্ছেদটা এ রকম :

> মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত-ভারত জোটের প্রভাবের কারণে হোক বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে হোক অথবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

সদ্য কারামুক্ত সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আখলাকুর রহমান (বাঁয়ে) ও শাজাহান সিরাজ (ডানে), মে ১৯৮০

> সঙ্গে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের একটা বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আওয়ামী লীগ সরকারকে খুব একটা সুনজরে দেখেনি এবং এ বিরোধ চাপা ছিল না। একপর্যায়ে শেখ মুজিবকে প্রাণ দিয়ে এ বিরোধের মীমাংসা করতে হয়েছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর এই ভূমিকা কি ইতিবাচক ছিল না? তাঁর রাজনীতি যদি একান্তই দুই পর্যায়ে ভাগ করে দেখতে হয়, তাহলে আমরা কোন পর্যায়ের রাজনীতিটাকে তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল বলব?[৫]

লেখাটা দেখালাম ওয়াহিদুল হককে। শিরোনাম ছিল 'শেখ মুজিবের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে'। তিনি বললেন, 'আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এটা ছাপানো যাবে না। তবে আমি চাই এটা ছাপা হোক।' আমি দেখলাম, এ লেখা জাসদের নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এবং জাসদের মালিকানাধীন পত্রিকায় এটা ছাপানো কঠিন। যাহোক, ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে একটু ষড়যন্ত্র করলাম। উনি রোববার অফিসে আসেন না। আমি রোববারে লেখাটা প্রেসে দিয়ে দিলাম। যিনি কম্পোজের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি আমাকে চেনেন বাহাত্তর সাল থেকে। তিনি এটা রেখে দিলেন। যথারীতি দুদিন পর এটা একমাত্র উপসম্পাদকীয় হিসেবে মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০) ছাপা হলো। ওয়াহিদুল হকের জন্য প্রতিরক্ষাব্যবস্থা করা হলো। তিনি বলতে পারবেন,

তিনি ওই দিন অফিসে ছিলেন না। অর্থাৎ তাঁর হাত দিয়ে এটা প্রেসে যায়নি।

মঙ্গলবার সকালে অফিসে গিয়ে বুঝলাম, রীতিমতো একটা বোমা ফেটেছে। এ লেখা কীভাবে ছাপা হলো? সিরাজুল আলম খান খোঁজ নেন বাহাউদ্দিন চৌধুরীর কাছে। বাহাউদ্দিন চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন ওয়াহিদুল হককে। বেলা ১১টার দিকে আমাকে ডেকে নিলেন সিরাজুল আলম খান। অনেক কথাবার্তা হলো। তিনি ঘুণাক্ষরেও আমার লেখার প্রসঙ্গ তুললেন না। আমাকে প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা আটকে রাখলেন। সম্পাদকীয় রুমে ফিরে এসে দেখি আহমদ ছফা কী যেন লিখছেন। পরদিন আহমদ ছফার লেখা 'শেখ মুজিব প্রসঙ্গে' ছাপা হলো সম্পাদকীয় পাতায়। আমার লেখায় যা বলতে চেয়েছি, তিনি লিখলেন তার উল্টো, একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে। বুঝতে পারলাম, ছফাকে দিয়ে এটা লিখিয়েছেন সিরাজুল আলম খান। ছফা তল্পিবাহকের মতো কাজটি করলেন। একসময় আখলাকুর রহমান ছিলেন জাসদ ঘরানার প্রধান বুদ্ধিজীবী। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। আহমদ ছফা তখন জাসদের প্রধান বুদ্ধিজীবী হওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন। এ জন্য তাঁর দরকার সিরাজুল আলম খানের পৃষ্ঠপোষকতা!

## ৩

১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরবেলায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার অতর্কিত হামলায় নিহত হন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার। ওই বছর ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি পদে নতুন নির্বাচন হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সিরাজুল আলম খান চেয়েছিলেন আতাউল গনি ওসমানীকে ১০-দলীয় জোটের প্রার্থী করতে। জোটের বড় শরিক আওয়ামী লীগ রাজি হয়নি। তারা চেয়েছিল তাদের নিজস্ব লোক ড. কামাল হোসেন জোটের প্রার্থী হবেন। এ প্রশ্নে জোটের শরিকেরা একমত হয়নি। কামাল হোসেন আওয়ামী লীগ থেকে প্রার্থী হন। ওসমানীকে 'নাগরিক কমিটি'র পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়। এ সময় জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি এবং শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল মিলে একটি ত্রিদলীয় জোট হয়। এই জোটের প্রার্থী হন মেজর জলিল। নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন ৮৩ জন। শেষ পর্যন্ত ২২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ৩৩ জন নির্বাচনী দৌড়ে টিকে থাকেন। বেশির ভাগই ছিলেন 'ডামি' প্রার্থী।

নির্বাচনে শতকরা ৬৬ ভাগ ভোট পেয়ে বিচারপতি সাত্তার জয়ী হন। কামাল হোসেন পেয়েছিলেন শতকরা ২৬ ভাগ ভোট। জলিলের স্থান ছিল ৫ নম্বরে। তিনি আড়াই লাখের মতো (১.১৫%) ভোট পান।[৬]

এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ২৪ মার্চ ভোরবেলায় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে হটিয়ে ক্ষমতা নেন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করেন। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর একযোগে শিক্ষা দিবস পালন করার জন্য ১৪টি ছাত্রসংগঠন তৈরি করে 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। পরে আরও পাঁচটি ছাত্রসংগঠন যোগ দিলে এটি হয় ১৯ দলের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এতে আওয়ামী লীগ, জাসদ, বাসদসহ অনেক দলের সহযোগী ছাত্রসংগঠন ছিল। তারা একটা ১০ দফা দাবিও দেয়। বিএনপিপন্থী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই জোটে যোগ দেয়নি। তত দিনে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে ১৫-দলীয় জোট তৈরি হয়ে গেছে। এর পাল্টাপাল্টি বিএনপিকে কেন্দ্র করে সমমনা দলগুলোর একটি ৭-দলীয় জোট তৈরি হয়।

১৯৮৩ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। কমপক্ষে পাঁচজন ছাত্র নিহত ও শতাধিক আহত হয়। নিহত ছাত্রদের মধ্যে ছিল জয়নাল, কাঞ্চন, মোজাম্মেল, জাফর ও দিপালী সাহা। এই আন্দোলনে জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

সিরাজুল আলম খান তত দিনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, পুরোনো ধারার জাসদীয় রাজনীতিতে ছেদ ঘটাবেন। ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া সহিংসতাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশকের নামধাম ছাড়া ম্যাগাজিন সাইজের একটা বুলেটিন বের হতো। নামও ছিল *বুলেটিন*। এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৮৩ সংখ্যায় 'ষড়যন্ত্র সন্ত্রাস ও হঠকারিতা মোকাবেলা করে আন্দোলনের শক্তিকে সংহত করুন' শিরোনামে মূল প্রতিবেদনে 'মহল বিশেষের উসকানিতে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনে ব্যত্যয় ঘটল' বলে মন্তব্য করা হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় :

> ছাত্ররা কেন শান্তিপূর্ণভাবে তাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালন করতে পারলেন না? ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মূল পরিকল্পনার পরিপন্থী ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা কেন ঘটল? জাতীয় নেতৃত্ব কর্তৃক পরিকল্পিত আন্দোলনের কর্মসূচির পরিপূরক ও সম্পূরক কর্মসূচি ছাত্ররা কেন রক্ষা করতে পারল না? ছাত্র আন্দোলন কেন এ অনভিপ্রেত সংঘর্ষ ও আঘাতের সম্মুখীন হলো? আচমকা জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ

> আন্দোলনের শক্তি কেন আপাতভাবে হলেও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হলো? এ জন্য সরকারের দমননীতি, গণবিরোধী ও হঠকারী পদক্ষেপ যেমন দায়ী, তেমনি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মূল পরিকল্পনার পরিপন্থী ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রমও কম দায়ী নয়। আন্দোলনকারীদের এই আত্মোপলব্ধি অবশ্যই অর্জন করতে হবে।[৭]

১৯৮৩ সালের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে জাসদে দুই মত ছিল। মধ্য ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর সিরাজুল আলম খান এখান থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। আন্দোলন অবশ্য বেশি দিন জারি থাকেনি। আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা ছিল জাসদ-সমর্থিত মুনীর-হাসিবের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগ এবং বাকশাল-সমর্থিত ফজলু-চুন্নুর নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগ। ওই সময় জেনারেল এরশাদ টাকাপয়সা দিয়ে দুই দলের দুই নেতাকে 'ম্যানেজ' করেন বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে বাকশালের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা এস এম ইউসুফ চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়েছেন :

> জিল্লুর রহিম দুলাল বাকশালের প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন আহমেদের মেয়ের জামাই, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৫ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর দুলাল একজনকে নিয়ে আমার বাসায় এল। পরিচয় হলো, মেজর মুন্না (মুনীরুল ইসলাম চৌধুরী), তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ের জামাই। সে জেনারেল চিশতির দালাল। বলল, 'পনেরোটা দিনের জন্য ইউনিভার্সিটি ঠান্ডা করেন। মুনীর-হাসিব, ফজলু-চুন্নু এদের ইউনিভার্সিটি এলাকা থেকে অ্যাবসেন্ট করে দেন।' বললাম, মুনীর-হাসিব তো আমার কমান্ডে না। তারা হাসানুল হক ইনুর কমান্ডে। সে বলল, 'আপনার কমান্ডে ফজলু-চুন্নু, তাদেরকে বের করে দেন। আপনার জন্য পনেরো লাখ টাকা নিয়ে এসেছি।' মুন্না একটু বেয়াদব টাইপের, অ্যাগ্রেসিভ। ব্রিফকেস খুলে দেখাল, নোটের বান্ডিল। বললাম, এইটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তারা রাজ্জাক ভাইয়ের কমান্ডে। দুলাল বলল, 'আমি জানি আপনিই কমান্ড করেন। রাজ্জাক ভাই তো নেতা আছেনই। আপনি চাইলেই এটা হয়ে যায়। ওদেরকে কিছু টাকা দিয়া দেন, ঢাকার বাইরে চলে যাক।' মুন্না বলল, 'টাকা কি কম হইছে? আপনি বললে আরও পাঁচ লাখ নিয়া আসতে পারি।' আমি দেখলাম মিলিটারির লোক, কখন ধরে নিয়ে যায়, মেরে ফেলবে। বললাম, দেখি ভাই, একটু চিন্তা করি। সিগারেট আনার কথা বলে ভেতরের ঘরে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লাফ দিয়ে একটা রিকশায় উঠে চলে গেলাম পিন্টুর বাসায়।

১০-১৫ দিন পরে যখন নরমাল হইছি, দুলালের বাসায় গেলাম। দুলাল বলল, 'ইউসুফ ভাই, আপনি নিজে তো লস করলেন, আমারেও লস করাইলেন। চাইলেই ২০ লাখ টাকা পাইতেন। আমিও কিছু পাইতাম। কোনোটাই হইতে দিলেন না। আপনি করেন নাই। আমরা তো করায়া আনছি। তিন লাখ বাঁচছে। ছাত্রনেতাদের উস্তাদদের একজনকে দিলাম সাত লাখ, আরেকজন নিল পাঁচ লাখ। কোথায় পেমেন্ট হইল? এসবির ডিআইজি মোরশেদের বাড়িতে। এরশাদের খুব কনফিডেন্সের লোক। তার বাড়িতে পলিটিশিয়ানদের গোপন বৈঠক-টৈঠক হইত।[৮]

এ ধরনের সহিংস ছাত্রবিক্ষোভে সিরাজুল আলম খানের আপত্তি ছিল। তখন তিনি ১৫-দলীয় জোটকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করার কথা ভাবছেন। একই সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে এগোনোর চেষ্টা করছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি বিবৃতি দেন, যা তাঁর স্বাক্ষরসহ *বুলেটিন*-এ ছাপা হয়েছিল। বিবৃতিটি ছিল এ রকম :

বর্তমান পরিস্থিতিতে সিরাজুল আলম খানের বক্তব্য :

বিরাজমান সামাজিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক স্থবিরতা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা শূন্যতা বিরাজ করিতেছে, তাহার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দিয়াছে। যার পরিণতিতে আজ স্বাধীনতাসংগ্রামের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ হওয়ার পথে এবং জাতি ও জনগণ চরমভাবে হতাশার শিকার।

এই সংকটজনক অবস্থা হইতে উত্তরণের একমাত্র পথ সমাজজীবনের সকল মহল ও অংশের যৌথ উদ্যোগ। তাহার জন্য প্রয়োজন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও সহনশীলতার মনোভাব। ইহা সম্ভব একমাত্র গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। জাতীয় ও সমাজজীবনে আপেক্ষিক স্থিতিশীল পরিস্থিতি সুস্থ রাজনীতির জন্য অপরিহার্য। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাহিরের সকল মহলের জন্য এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সামনে রাখিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক ১৫টি দলের ঐক্য। অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের কোনো বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ যেন এই ঐক্যকে দুর্বল ও বিনষ্ট করিতে না পারে, তাহার প্রতি সজাগ থাকিতে হইবে। কারণ, গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে হঠকারী ও

বুলেটিন ১৪

# রাজনীতি আন্দোলন ও সংগঠনের খবর

## বর্তমান পরিস্থিতিতে সিরাজুল আলম খাঁনের বক্তব্য ঃ

বিরাজমান সামাজিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক স্থবিরতা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা-শূন্যতা বিরাজ করিতেছে, তাহার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দিয়াছে। যার পরিণতিতে আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ হওয়ার পথে এবং জাতি ও জনগণ চরমভাবে

সরকারকে একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, মামলা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সুযোগ প্রদান।

স্বাক্ষর—

সিরাজুল আলম খাঁন

( সিরাজুল আলম খাঁন )
১৮.৩.৮৩

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারির ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে সিরাজুল আলম খানের বিবৃতি

নৈরাজ্যবাদীরাই উপকৃত হইবে এবং উহা ডাকিয়া আনিবে দেশ ও জাতির জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার প্রয়োজনীয়তা ক্ষমতাসীন সরকার বাস্তবে মানিয়া লইলে জাতীয় জীবনের বহু সংকট নিরসন সহজতর হইবে।

এই প্রেক্ষিতে পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে যেকোনো রাজনৈতিক উদ্যোগকে অর্থবহ করিতে হইলে সরকারকে একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার, ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারির ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সুযোগ প্রদান।

স্বাক্ষর<br>
সিরাজুল আলম খান<br>
১৮/৩/৮৩[৯]

## ৪

ছাত্রলীগ-জাসদের অনেক কর্মী তখন ভবঘুরের মতো জীবন যাপন করছে। আবার কারও কারও মনে রয়ে গেছে বিপ্লবের স্বপ্ন। ওই সময় কর্মীদের

দেশের বাইরে পাঠানোর উদ্যোগ নেন মেজর জলিল। আহমেদ আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ঢাকায় প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) আবাসিক প্রতিনিধি। তাঁর সঙ্গে মেজর জলিলের সখ্য ছিল। জলিল তাঁর মাধ্যমে ১৯৮১ সালে ফিলিস্তিনে কিছু স্বেচ্ছাসেবক পাঠান। এদের জন্য কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, সেখানে গিয়ে তাঁরা প্রয়োজনে যুদ্ধ করবেন। বেশ কয়েক মাস সেখানে থেকে অনেকেই কপর্দকশূন্য অবস্থায় হতাশ হয়ে ফিরে আসেন।

জলিল লিবিয়ার সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তোলেন। লিবিয়ার শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে লিবিয়ার ত্রিপোলিতে একটি আন্তর্জাতিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গাদ্দাফি। ১৯৮১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে তিনি সেখানে একটি সংহতি সম্মেলন ডাকেন। জলিলকে তিনি ওই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান। আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মালেক উকিলও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জলিল সেখানে প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলেন।

ঢাকায় জলিলের বিশ্বস্ত সহচর হলেন বিমানবাহিনীর সাবেক করপোরাল মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। জলিলের অধীনে তিনি মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টরে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে জলিল যাঁদের নিয়ে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন, মজিদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ত্রিপোলি থেকে জলিল তাঁকে একটি চিঠি পাঠান।

> ৩/৯/৮১
> ত্রিপোলি
> মজিদ,
>
> শুভাশীষ নিস। আশা করি কুশলেই আছিস। আসার দিন অনেক বিলম্ব হয়েছে। বম্বেতে ৩ ঘণ্টা এবং দুবাই এয়ারপোর্টে ৬ ঘণ্টা বিলম্ব করে যার ফলে ২৬ তারিখ সকাল ৭টায় এসে পৌঁছতে হয়।
>
> ভূমধ্যসাগরের তীরে ত্রিপোলি শহর। ভালোই লাগছে সবকিছু। কনফারেন্স ২৮/৮ থেকেই শুরু হয়েছে। গাদ্দাফি ২৮/৮ তারিখে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছে; আমি ৩১/৮ তারিখ রাত ৮-৩০ মিনিটে ভাষণ দিয়েছি। এখানকার রেডিও টেলিভিশন ভালো Coverage দিয়েছে।

লিবিয়ায় থাকাকালে গাদ্দাফির সঙ্গে জলিলের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পঁচাত্তরের আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতদের কয়েকজন তখন লিবিয়ায় ছিলেন। তাঁদের অন্যতম খন্দকার আবদুর রশিদ, সৈয়দ ফারুক রহমান ও


www.amarboi.com

THE INTERNATIONAL SECRETARIAT
OF SOLIDARITY WITH THE ARAB
PEOPLE AND THEIR CENTRAL
CAUSE PALESTINE

P.O. BOX : 1905

PHONE : 32491 / 32492
TELEX : 20616

Tripoli — Jamahiriya

DATE : ..........

CORRISPONDING TO : ..........

الامانـــة الـــدولية
للتضامن مـــع الشعب العربي وقضيته
المركزيـــة فلسطيـــن

صندوق بريد : ١٩٠٥
هاتف : ٣٢٤٩١ / ٣٢٤٩٢
تيلكس : ٢٠٦١٦
طرابلس — الجماهيرية
التاريخ : ৩/৯/৮১
الموافق : জলিল

প্রিয়,

শুভাশীষ নিও। আমরা [illegible] পৌঁছেছি। আমাদের [illegible] দিন [illegible] বিলম্ব হয়েছে। [illegible] ৩ ঘণ্টা এবং [illegible] ৬ ঘণ্টা বিলম্ব [illegible] ফলে ২৭ তারিখ সকাল ৭ টার [illegible] পৌঁছাতে হয়।

[illegible] জলিল [illegible] এসেছে। ইন্টারন্যাশনাল ২৮/৮ থেকে শুরু হয়েছে। [illegible] ২৮/৮ তারিখে [illegible] দিয়েছে। আমি ৩১/৮ তারিখে প্রায় ৮-১০ মিনিটের ভাষণ দিয়েছি। বাংলাদেশের [illegible] Conference দিয়েছে।

১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর লিবিয়ার ত্রিপোলি থেকে লেখা মেজর জলিলের চিঠি

বজলুল হুদা গাদ্দাফির পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। নাম দেন ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্প। সেখানে বাংলাদেশ থেকে আসা তরুণদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক উচ্চাশা থেকেই তাঁরা এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিলেন। জলিল ত্রিপোলিতে ছিলেন প্রায় দুই সপ্তাহ। ফেরার আগে তিনি মজিদকে আরেকটি চিঠি দেন।

৮/৯
মজিদ

আমি আগামীকাল কুয়েত এয়ারলাইনসে বৈরুতের পথে রওনা হচ্ছি। এখান থেকে কোনো লাইন পাওয়া কঠিন। মালেক ভাই যাচ্ছেন। রবের জন্য তার কাছে চিঠি পাঠালাম। আমার একটা Box unaccompanied luggage হিসেবে পাঠালাম। এখানকার বড় সাহেবের সাথে আমার দেখা হয়েছে। আজ আবার হবে।

লেবাননে গিয়ে যোগাযোগ করব। বাসার সবাই কেমন আছে। সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি মোটামুটি ভালোই আছি। আনোয়ার, বেলাল ও ইউসুফ ভাইকে শুভেচ্ছা দিস। খোদা হাফেজ।

জলিল ভাই

ত্রিপোলি থাকাকালে ফারুক-রশিদদের সঙ্গে জলিলের কথাবার্তা হয়। তাঁদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পে কিছু তরুণকে পাঠানোর ব্যাপারে জলিলের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতা হয়। ত্রিপোলিতে পাঠানোর জন্য ঢাকায় লোকজন বাছাইয়ের কাজে কর্নেল তাহেরের ভাইয়েরা যুক্ত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ ফারুকের বনানী ডিওএইচএসের বাসায় গিয়ে সলাপরামর্শ করতেন। ফারুক ঢাকা-ত্রিপোলি আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন।

১৯৮২ সালে বেশ কিছু লোককে লিবিয়ায় পাঠানো হয়। রিক্রুটমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তাহেরের বড় ভাই সার্জেন্ট (অব.) আবু ইউসুফ। কয়েকটি ব্যাচে জাসদের কয়েক শ তরুণকে লিবিয়ায় পাঠানো হয়। তাঁদের বলা হয়, সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এসবের পাশাপাশি চলত রাজনৈতিক ক্লাস। লিবিয়ার নেতা কর্নেল গাদ্দাফির *গ্রিন বুক* পড়ানো হতো তাঁদের। লিবিয়া থেকে ফিরে এসে পরে তাঁদের কেউ কেউ ফারুক-রশিদের তৈরি 'ফ্রিডম পার্টি'তে যোগ দিয়েছিলেন।[১০]

মেজর জলিলের সঙ্গে অন্য জাসদ নেতাদের বিরোধ শুরু হয়। সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব, কাজী আরেফ আহমদ, হাসানুল হক ইনু, শাজাহান সিরাজ, শরীফ নুরুল আম্বিয়াসহ প্রায় সব নেতাই তখন জলিলের বিরুদ্ধে এককাট্টা। ১৯৮৩ সালের প্রায় পুরোটাই এ নিয়ে জাসদে তোলপাড় চলে।

মেজর জলিলের বিরুদ্ধে পিএলও ও লিবিয়ায় লোক পাঠিয়ে চাঁদা আদায় ও 'আদম ব্যবসা' করার অভিযোগ উঠলে জলিল নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, তিনি যা কিছু করেছেন, দলের স্বার্থেই করেছেন। জাসদের জাতীয় কমিটির সদস্যদের উদ্দেশে লিখিত এক বক্তব্যে তিনি বলেন, 'দলীয়

আহমদ ছফা

কার্যাবলি পরিচালনা, বড় বড় জনসভা অনুষ্ঠান, *গণকণ্ঠ* পত্রিকার জন্য টাকা ইত্যাদির প্রয়োজনে আমার ওপর অর্থ সংগ্রহের চাপ আসে।...যখন যা পেরেছি, তা *গণকণ্ঠ* পত্রিকার জন্য সিরাজ ভাই বা রাজা ভাই (মির্জা সুলতান রাজা), দলীয় কার্যক্রমের জন্য শাজাহান সিরাজ এবং জনসভার জন্য জিকু ভাইয়ের (নূর আলম জিকু) হাতে তুলে দিয়েছি।' লিবিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাসদ 'সবকিছু বিবেচনা করে লিবিয়ার সাথে একটা ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের সূচনা করি আমি, রব ও শাজাহান সিরাজ।...এ নিয়েও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু আপনারাই তো ধারাবাহিকভাবে দলীয়ভাবে পরিচালিত *গণকণ্ঠ* পত্রিকায় গাদ্দাফির *গ্রিন বুক* পর্যন্ত ছাপিয়েছেন।'[১১]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে লেখক আহমদ ছফাকে ঢাকায় লিবীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন জলিল। ছফা তখন *গণকণ্ঠ* পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন। পরে জলিলকে এড়িয়ে ছফা নিজেই লিবীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। বাংলায় *গ্রিন বুক* অনুবাদ করার জন্য তিনি লিবীয় দূতাবাস থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন। তিনি কয়েকজনকে লিবিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন ঢাকা নগর গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিসার রফিকুল ইসলাম।

একটা পর্যায়ে এসে জাসদের কয়েকজন শীর্ষ নেতা মেজর জলিলকে দল থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিষয়টির একটি সম্মানজনক নিষ্পত্তি হতে পারত। কিন্তু জাসদ নেতারা ওই পথে গেলেন না। তাঁরা জলিলের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনলেন, তাতে তাঁর চরিত্রহনন হলো। জলিলও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। দলের জাতীয় কমিটির সদস্যদের প্রতি এক খোলা চিঠিতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর বিরোধিতাকারীদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। তাঁর কথায় কোনো রাখঢাক ছিল না। ফলে যা ছিল এত দিন কানাঘুষা, তা একেবারে উদোম হয়ে পড়ল। জলিলের বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

> আমরা কে কীভাবে চলি, তার খোঁজ সংগঠন রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না বা রাখে না। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা

একদল তরুণকে মাঝপথে এসে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি। দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সংগ্রামে আজও তারা কী করে টিকে আছে, সেটাই একটা তাজ্জব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমরা দিব্যি সুখে আছি। কেন এই সংগঠনের কর্মীদের অবস্থা দিন দিন মানবেতর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আর আমরা, নেতাদের অবস্থা খোদার ষাঁড়ের মতো বাড়ছে। আমরা কি কর্মীদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফসলকে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের কাজে লাগাচ্ছি না?...

এরপর আপনারা আমার বিরুদ্ধে দলীয় অর্থ আত্মসাৎ ও সরকারি আনুকূল্যের অভিযোগ আনতে পারেন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন, দলের চাঁদা তুলে আমি গ্রহণ করেছি না তা আপনারা করেন। আর সরকার থেকে আর্থিক সহযোগিতা কখনো কি আমার হাত দিয়ে এসেছে, না আপনারাই এনেছেন এবং খরচও করেছেন। হয়তো বলবেন, আপনার নির্দেশে করা হয়েছে। তাহলে আমি কি জেলে থেকেও '৭৯ সংসদ নির্বাচনের সময় সরকারের অর্থ আনতে নির্দেশ দিয়েছিলাম? একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। আসুন দলের স্বার্থে আমরা এখনো সংযত হই।

আমার বিরুদ্ধে জনশক্তি রপ্তানির সাথে জড়িত থাকার মিথ্যা অপবাদ এনে বলা হচ্ছে আমাদের রাজনীতি এটা অনুমোদন করে কি না। অবশ্যই আমাদের রাজনীতি প্রতারণামূলক কাজকে অনুমোদন করে না। মাননীয় বিচারকমণ্ডলী, আজ আপনাদের রায় দিতে হবে, আমাদের রাজনীতি বিদেশের ব্যাংকে টাকা রাখা অনুমোদন করে কি না? বহু নারীর সাথে রাত্রিযাপন করার স্বপক্ষে বিপ্লবী রাজনীতির কোনো অভিধানে লেখা আছে কি না? আন্দোলনের সময় শত্রুপক্ষের কাছে আশ্রয়গ্রহণ অনুমোদন করে কি না? স্ত্রীর কাছ থেকে এক দিনের জন্য বাইরে গেলে অন্যের বাসার কাজের মেয়েকে ধর্ষণ অনুমোদন করে কি না? আমাদের রাজনীতি সমকামিতা সমর্থন করে কি না? এমনকি অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে কোনো মহিলাকে অন্তঃসত্ত্বা বানানো অনুমোদন করে কি না? আমাদের রাজনীতি যখন-তখন বিদেশে যাওয়া, বিশেষত ভারতে যাওয়া অনুমোদন করে কি না? চাঁদা তোলা অর্থ দিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন সমর্থন করে কি না? শুনতে বিষয়গুলো অত্যন্ত কদর্য ঠেকলেও আজ প্রয়োজন এসেছে এগুলোর উপরও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করার।[১২]

## ৫

জাসদ নেতারা রাজনীতির খেলায় থাকলেও ক্ষমতার রসায়নটি বুঝতে তাঁদের দেরি হয়েছিল। একসময় তাঁদের উপলব্ধি হলো, সেনাবাহিনী নতুন শক্তি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। সুতরাং উদীয়মান এই শক্তির সঙ্গে সমঝোতায় এসে কিংবা দর-কষাকষি করে যতটুকু এগোনো যায়, সেই চেষ্টা করা দরকার। তাঁদের এই চেষ্টায় নাটকীয়তা যেমন ছিল, তেমনি ছিল দলের মধ্যে সুবিধাবাদ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এ সময় তাঁদের কেউ কেউ এমন সব পদক্ষেপ নেন, যার মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল। এটা ছিল অনেকটা জুয়া খেলার মতো। পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয় খুবই গোপনে। জাসদের ওপর দিকের কয়েকজন ছাড়া অন্যরা এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁদের চোখে নেতারা সবাই ফেরেশতাতুল্য।

করপোরাল মোহাম্মদ আবদুল মজিদ জাসদ রাজনীতির ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে ছিলেন না। এই প্রক্রিয়ায় তিনি আসেন মেজর জলিলের হাত ধরে। মুক্তিযুদ্ধে ৯ নম্বর সেক্টরে থাকাকালে জলিলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর তিনি গ্রেপ্তার হন এবং জলিল ও অন্যদের সঙ্গে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৮০ সালের মার্চে জলিল জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে তিনি তাঁর ছায়াসঙ্গী। এক সাক্ষাৎকারে তিনি অনেক লুকানো তথ্য উন্মোচন করেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

মহিউদ্দিন আহমদ : জাসদের অনেকেই লিবিয়া গিয়েছিল?

আবদুল মজিদ : হ্যাঁ, গেছে তো। ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পে।

মহি : আপনাদের সঙ্গে তো কর্নেল ফারুকদের ভালো সম্পর্ক ছিল? ক্যাম্পটা হয়েছিল কী জন্য?

মজিদ : টু ট্রেইন আপ বাংলাদেশি বয়েজ, পলিটিক্যাল মোটিভেশন।

মহি : ফর?

মজিদ : পলিটিকস।

মহি : মানে, তারা ফিরে এসে একটা পার্টি করবে। এ জন্য?

মজিদ : পার্টি তো অলরেডি করছে?

মহি : ফ্রিডম পার্টি?

মজিদ : হ্যাঁ। ওইটারই মোটিভেশন।

মহি : ওখানে জাসদের তো অনেকেই ট্রেনিং নিয়েছে?

মজিদ : প্রায় দেড় শ থেকে দুই শ।

মহি : আহমদ ছফা কি লিবিয়া গিয়েছিল?

মজিদ : তাকে লিবিয়ান এমবাসিতে আমিই নিয়া গেছিলাম।

মহি : ঢাকা এমবাসিতে?

মজিদ : হ্যাঁ। পরিচয় করাইছি—আমাদের পার্টির ইন্টেলেকচুয়াল। জলিল ভাই খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করছে।

মহি : মেজর জলিল আপনাকে দিয়ে পাঠিয়েছে? নিজে যায়নি?

মজিদ : আমি নিয়া গেছি। তারপর সে গাদ্দাফির ওপর বইটই লিখল। এমবাসিতে একটা সম্পর্ক হইল। তারপর সে মেজর জলিলকে বাইপাস কইরা...কিছু ছেলেপিলেকে সে নিজেই লিবিয়া পাঠাইল।

মহি : তাদের কি ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল?

মজিদ : কোথায় পাঠাইছে আই ডোন্ট নো। লিবিয়ায় পাঠাইছে।

মহি : কয়জনকে পাঠিয়েছে?

মজিদ : নাম্বার জানি না।

মহি : এলসি (লিটল কমরেড—রফিকুল ইসলাম) তো আমাকে বলেছে, সে গিয়েছিল।

মজিদ : হ্যাঁ, আহমদ ছফার মাধ্যমে।

মহি : আহমদ ছফা কি এ জন্য টাকাপয়সা পেয়েছে? লোক পাঠিয়ে?

মজিদ : লোক পাঠায়া না, টাকা পাইছে বই লেইখা।

মহি : বই আর কী লিখেছে? *গ্রিন বুক* ট্রানস্লেট করেছে।

মজিদ : *গ্রিন বুক* ট্রানস্লেট করছে, আর গাদ্দাফির ওপর একটা বই লিখছে।

মহি : আর কে গিয়েছিল?

মজিদ : বেলাল লেড দ্য টিম।

মহি : কর্নেল তাহেরের ভাই ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল?

মজিদ : হ্যাঁ।

মহি : সে কয়জনকে নিয়ে গিয়েছিল?

মজিদ : সঠিক নাম্বারটা জানি না।

মহি : তারপর বলেন।

মজিদ : মেইনলি আবু ইউসুফ খান। কর্নেল তাহেরের বড় ভাই। জলিল ভাই আবু ইউসুফ খানের সঙ্গে আলাপ করছে। আবু ইউসুফ খান রিক্রুট করছে বেলালের মাধ্যমে। সাঈদ ভাই (কর্নেল তাহেরের

আরেক ছোট ভাই) আমাকে বলল, ইনফরমেশন পাইলাম যে সামবডি ইজ টেকিং সাম বাকস্। যাদের রিক্রুট করা হইতেছে, তাদের কাছ থেকে। কিন্তু তারা তো যাবে ফ্রি? এভরিথিং ফ্রি। তারা টাকা নিতেছে। তখন আমি জলিল ভাইকে বললাম, এই যে ছেলেগুলা যাবে, আপনি তাদের ব্রিফ করবেন। কী কারণে যাচ্ছে, এখানে টাকার কোনো প্রবলেম নাই, ভলান্টারিলি যাচ্ছে, ওখানে বেতনও নাই। হয়তো একটা পকেট খরচ পাবে। এইভাবে ব্রিফ করবেন। এর আগে আপনি প্যালেস্টাইনে লোক পাঠাইছেন বিভিন্নজনের মাধ্যমে। আপনার কিন্তু অনেক প্রবলেম হইছে। অনেকে অনেক কোশ্চেন করছে।

তো সে আবু ইউসুফ খানকে বলছে। আবু ইউসুফ খান বলছে, ঠিক আছে জলিল ভাই। পরে ইউসুফ ভাইকে মোটিভেট করা হয়েছে—এই ছেলেগুলোর সামনে মেজর জলিলকে ফেস করাবেন না। ফেস করাইলে টাকাপয়সার কথা তো এক্সপোজ হইয়া যাবে।

ইউসুফ ভাই জলিল ভাইকে বলল, এইটা তো একটা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিকস। এইটা নিয়া তো কেইস হবে। কেইস হইলে—এই ছেলেগুলা তো আপনাকে চেনে। তারা ডাইরেক্ট আপনাকে আইডেন্টিফাই করবে। আপনি লিডার। আপনি পিছনে থাকেন। এদেরকে ফেস কইরেন না।

আমি বললাম, জলিল ভাই, আপনি এইটা বিশ্বাস কইরা চইলা আসলেন?

কয়, দ্যাখ, আবু ইউসুফ খানকে যদি বিশ্বাস করতে না পারি, তাইলে কারে বিশ্বাস করব? কেমনে পার্টি করব? এই সব সিরিয়াস কাজ কেমনে করব?

আমি তো আর বেশি কথা তাঁকে বলতে পারি না।

পরে লিবিয়ায় ক্যাম্পে গন্ডগোল লাগছে। টাকা নিছে, চাকরি দেওয়ার কথা বলছে। কারও কাছ থেকে ২০ হাজার, কারও কাছ থেকে ৩০ হাজার, কারও কাছ থেকে ১০-১৫, এই রকম। ক্যাম্পে ট্রেনিংয়ের সময় এই গন্ডগোল লাগছে।

পরে ওইটার একটা চিঠি আসছে সাঈদ ভাইয়ের কাছে। আপনাকে বলছিলাম, মজিদ। দ্যাখেন এই। জলিল ভাইকে দেখাইলাম।

মহি : চিঠিটা কার?

মজিদ : ওই ছেলেদের। কেউ হয়তো সাঈদ ভাইয়ের পরিচিত, তাকে লেখছে।

ওইখানে একটা স্পেশাল টিম যাবে ১০ জনের। গাদ্দাফির গেস্ট হিসেবে। আমাকে যেতে ইনসিস্ট করা হচ্ছে। আমি বলছি, নো। হোয়াই শুড আই গো দেয়ার? জলিল ভাইকে বললাম, আপনাকে তো আগে বলছি। আপনি শোনেন নাই। এখন প্রবলেম হইছে। কী করবেন?

জলিল ভাই লেখছে—সে এক চিঠি! ব্রিফলি, হোয়াট হ্যাপেন্ড। তখন তাদেরকে রশিদ জিজ্ঞেস করেছে, হোয়াই ডিড ইউ টেক মানি? কয়, হাইকমান্ডের নির্দেশে। হাইকমান্ড মানে জলিল ভাই।

জলিল ভাই রশিদকে একটা চিঠি লেইখা আমাকে বলল, ইউ আর টু টেক দিস লেটার অ্যান্ড গিভ ইট টু রশিদ। হি শুড বি ক্লিয়ার।

মহি : চিঠিটা আপনাকে দিল?

মজিদ : হ্যাঁ। জলিল ভাই বলল, দ্যাটস হোয়াই ইউ আর টু গো। তোমার আর কোনো কাজ নাই।

লিবিয়া যাওয়ার পর আমাদের একটা গেস্টহাউসে রাখল। ওখানে আমরাই ছিলাম। আর কেউ না।

রশিদ আসল। কথাটথা হইল। তারপর আমাদের ক্যাম্প দেখাইতে নিয়া গেল, ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্প। আমরা গেলাম। আসার সময় অন্যরা ক্যাম্পে রয়ে গেল। তারা আমাকে বলল, 'আপনিও থাকেন।' বললাম, না, আমি গেস্টহাউসে যাব।

রশিদ গাড়ি ড্রাইভ কইরা আসতেছে। আমি পাশের সিটে বসা, তাকে চিঠিটা দিলাম। তারপর ১০ দিন ওই গেস্টহাউসে ডিসকাস হইছে। অন্যরা এইটা জানে না। গাদ্দাফির সেকেন্ডম্যান, ক্যাপ্টেন সালেম, সে আসছে। ইন্টারন্যাশনাল লিংকে যারা কাজ করে, তারা আসে, ফারুকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ হইছে। সকাল ১০টায় আসত। বেলা দুইটায় যাইত।

একদিন রশিদ আমারে ডাইকা বলে, 'দেখেন, এখন কী করা যায়? ওরে (বেলাল) দিয়া কাজ করানো যাবে কি না?'

আমি বলি, হি ইজ ভেরি ইফেকটিভ। যদি সে কাজ করতে চায়, আর আপনার কাছে যদি কনফেস করে। ইউ হ্যাভ গট অল দ্য ইনফরমেশন। তার লিংক আছে, হি ক্যান ওয়ার্ক।

এই পর্যন্ত কথা হইছে ডাইরেক্ট রশিদের সঙ্গে।

ইমরান, তাদের থার্ড ম্যান হবে হয়তো। বেলাল আমাকে বলছে, 'ওকে বইলেন, আমি এই গ্রুপের লিডার, আমি কাজকর্ম করতে পারব। ওকে এইটা বলে রিকোয়েস্ট কইরেন।'

মহি : লিবিয়ান?

মজিদ : লিবিয়ান।

পরে আমি জানতে পারি মহব্বতজান চৌধুরীর কাছ থিকা ক্লিয়ারেন্স নিয়া বেলাল এই কাজগুলো করছে। মহব্বতজান তখন ডিজিএফআইয়ের চিফ। তার সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক। লিবিয়া থেকে ফিরে আসার পর সে কী করছে জানেন? সে ওই ছেলেদের নিয়া একটা গেটটুগেদার করছে।

মহি : কোথায় করেছে?

মজিদ : মগবাজারে। সেখানে ডিজিএফআইয়ের লোকও ছিল। মোটামুটি আইডেন্টিফাই করা হইছে যে এরা লিবিয়ায় গেছে। এই কম্মটা সে করছে। সে যে কী জিনিস!

মহি : সে লিবিয়ায় কত দিন ছিল?

মজিদ : ওই গেছে। ট্রেনিং নেয় নাই সে। আমরা যখন আসি, আমাদের সঙ্গে চইলা আসছে।

মহি : আপনি কয় দিন ছিলেন?

মজিদ : ১০-১২ দিন। ওই গেস্টহাউসেই ছিলাম। ঘুরায়া ঘুরায়া সাইট দেখাইছে। গ্রিনহাউস, গ্রিন স্কয়ার।

মহি : আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, আমার বোঝার জন্য। তারা ওখানে ট্রেনিং নিয়ে একটা পার্টি করবে?

মজিদ : হ্যাঁ, পার্টিই তো। মোটিভেটেড পার্টি।

মহি : মেজর জলিল জাসদের প্রেসিডেন্ট হয়ে জাসদের বাইরে আরেকটা পার্টি করার জন্য লোকদের কেন ট্রেনিংয়ে পাঠাবে?

মজিদ : সে তো উইদিন পার্টি, তাদের সঙ্গে লিংকআপ হওয়ার জন্য। লিবিয়ার সঙ্গে তো জাসদের সম্পর্ক আছে।

মহি : সম্পর্কটা কি জলিলের ব্যক্তিগত?

মজিদ : না, পার্টির।

মহি : পার্টির? পার্টির কে কে জানে?

মজিদ : জানে শাজাহান সিরাজ, ইনু সাহেব—এরা সবাই। লিবিয়ার টাকায় *গণকণ্ঠ* বের হইছে। ওখানে *গ্রিন বুক*ও ছাপা হইছে। রাজা ভাই (মির্জা সুলতান রাজা) তখন চার্জে ছিল। ভূঁইয়া ভাই (রুহুল আমিন ভূঁইয়া) চার্জে ছিল।

মহি : সিরাজুল আলম খান জানে এটা?

মজিদ : না জানার তো কথা না? এখন ডিনাই করবে।

মহি : মেজর জলিল অবশ্য তাঁর খোলা চিঠির মধ্যে এটা লিখেছে যে লিবিয়ার টাকায় *গণকণ্ঠ* চলত। আপনি যখন ১০-১২ দিনের জন্য গেলেন, ওই টিমে আর কে কে ছিল?

মজিদ : বেলাল ছিল। শাজাহান ছিল, তেজগাঁওতে শ্রমিক জোট করত, কেইস শাজাহান বলত। এনাম ছিল। তারপর রায়েরবাজারের আনোয়ার। অনেক দিন আগের কথা তো। নাম ভুলে গেছি। আরেকজন ছিল, হোমিওপ্যাথিক কলেজ থেকে পাস করা।

মহি : যে নামগুলো বললেন, এরা ট্রেনিং নিয়ে দেশে এসে একটা কিছু করে ফেলবে—এমন মনে হয়?

মজিদ : এ রকমই তো হয়। রশিদ আর ফারুকের সঙ্গে কনফ্লিক্ট যদি না হইত, এ রকমই তো হইত। এ লোকগুলো তো ওয়ার্কার। দে আর নট লিডার। রশিদ-ফারুকের সঙ্গে সবার লিংক ছিল। সবাই গেছে তাদের কাছে।

মহি : আর কে কে গেছে?

মজিদ : রশিদ ছিল না, ছাত্রলীগের, এম এ রশিদ, সে তো তাদের লোক।

মহি : কী রকম?

মজিদ : তাদের লোক, হার্ডকোরের লোক।

মহি : আর?

মজিদ : চৌধুরী ফারুক, *মিল্লাত* পত্রিকা বাইর করত। বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তারা লোক রিক্রুট করত। যেমন আমাদের ছফা ভাইয়ের মাধ্যমে করছে, চৌধুরী ফারুকের মাধ্যমে করছে, এম এ রশিদের মাধ্যমে করছে। এ রকম বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে...

মহি : এম এ রশিদ যে তাদের লোক, এটা আপনি সিওর হলেন কীভাবে?

মজিদ : আমি জানি।

মহি : কীভাবে জানেন?

মজিদ : সিওরের কিছু না। আমি জানি এইটা।

মহি : আপনি তাদের লোক না?

মজিদ : না। আমি মেজর জলিলের লোক।

মহি : মেজর জলিলের সঙ্গে কি তাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল?

মজিদ : হুম।

মহি : এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি ১৫ আগস্টের আগে থেকেই?

মজিদ : না। এটা '৮০ সালের পরে।

মহি : জলিল জেল থেকে রিলিজ হওয়ার পরে?

মজিদ : জেল থিকা আইসা লিবিয়া যাওয়ার পরে ওইখানে গাদ্দাফির সঙ্গে কথাটথা হওয়ার পরে।

শোনেন, ঘটনা আরও আছে। জলিল ভাই যখন *গণকণ্ঠ*-র জন্য টাকা আইনা দেয়, তারা মনে করতেছে, বুঝি কোটি কোটি টাকা আনতেছে। তখন তারা বলতেছে, 'এই টাকায় চলবে না, আরও টাকা লাগবে, তাদের সঙ্গে আমাদের একটু...'।

জলিল ভাই বলছে, 'তারা যা দেয়, তা-ই দেই তোমাদের তোমরা এ রকম করলে...লেট আস ফেস ইট। তোমরা চলো তাদের কাছে। শাজাহান সিরাজ আর ইনু সাহেব লিবিয়ার...তখন তো অ্যাম্বাসাডর না, সেক্রেটারি। তার সঙ্গে মিটিং করছে।

মহি : তাদের অফিসে গিয়ে?

মজিদ : তাদের এমবাসিতে গিয়া।

মহি : শাজাহান সিরাজ আর হাসানুল হক ইনু?

মজিদ : ইয়েস।

মহি : আপনি ছিলেন ওই সময়?

মজিদ : নো।

মহি : মেজর জলিল নিয়ে গেছে তাদের?

মজিদ : হ্যাঁ, নিয়া গেছে। মিটিং-টিটিং...ফাইন। চা-কফি খাওয়া-টাওয়া হইছে। পরে ওই সেক্রেটারি মেজর জলিলকে বলছে, 'মেজর জলিল, উই বিলিভ ইউ। আওয়ার লিডার ইজ গাদ্দাফি অ্যান্ড উই হ্যাভ ফেইথ অন ইউ, হিয়ার। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসকাস উইথ দিস পিপল। সো, ক্লোজ দিস চ্যাপ্টার।'

মহি : তারপর কি সহযোগিতা বন্ধ?

মজিদ : হ্যাঁ।

মহি : এটা ইন্টারেস্টিং। আমি একটা বড় ক্যানভাসে চিন্তা করছি।

মজিদ : এরশাদের সঙ্গে জলিল ভাইয়ের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। গোলাম মোস্তফাকে তো সে মুক্ত করছে। এটা কেউ জানে না।

মহি : ঝিনাইদহের মোস্তফা?

মজিদ : হ্যাঁ। এরশাদ যখন পাওয়ারে গেছে, এরশাদ সিরিয়াসলি ওয়ান্টেড মেজর জলিল, তার সঙ্গে...। তাকে পাইলে জাসদকে পাবে। জাসদের এই গ্রুপটা। এই যে চার কুতুব আছে, তারা। প্লাস ছাত্রলীগ।

মহি : চার কুতুব মানে আরেফ, মার্শাল, ইনু, আম্বিয়া?

মজিদ : ইয়েস, অ্যান্ড এ বি এম শাহজাহান। দে হ্যাড আ মিটিং উইথ চিশতি, লতিফ, মান্নান সিদ্দিকী—এদের সঙ্গে তাদের মিটিং হইছে। আই ওয়াজ দেয়ার।

মহি : চিশতি?

মজিদ : ওই সময় মার্শাল লর যারা টপ নট ছিল, সবাই।

মহি : এই পাঁচ কুতুবের মিটিং? আপনি সেখানে ছিলেন?

মজিদ : আমি মিটিংয়ে পার্টিসিপেট করি নাই। আই টুক দেম দেয়ার।

মহি : মেজর জলিল পাঠিয়েছে আপনাকে? তো কী আলাপ হলো?

মজিদ : বলছে যে এরশাদ আমাদের নেতা। এখন আপনাদের নেতাকে কোন জায়গায় রাখবেন, রাখেন।

মহি : এটা কে বলছে?

মজিদ : ওরাই, জেনারেলরা। যারা ওই সময় সরকার চালাইত। মাহমুদুল হাসান ছিল মেজর জলিলের কোর্সমেট—ডিজিএফআইয়ের। উপজেলা কনসেপ্ট কিন্তু মাহমুদুল হাসানের। সে বলছে, 'তোমাদের পার্টির তো সব জায়গায় লোক আছে—নেটওয়ার্ক আছে, আই নো। প্রত্যেক থানায়-উপজেলায় চেয়ারম্যান হিসাবে যারা কাজ করতে পারবে, তাদের লিস্ট দাও।' তারা লিস্ট সাবমিট করছে। কথা ছিল, লিস্ট অনুযায়ী তাদেরকে বসায়া দিবে। এক-দেড় বছর তারা কাজ করবে। পরে ইলেকশন হবে। দে উইল বি ইলেক্টেড।

মহি : তারপর?

মজিদ : তারপর তো...সিরাজুল আলম খান আর আ স ম আবদুর রব বাগড়া দিয়া...দেখল যে সাবসাইড হইয়া যাচ্ছে, বলল—জাসদ যাবে না। গ্রুপিং তো এইখান থিকা শুরু।

মহি : তখন ওই পাঁচ কুতুব কী করল?

মজিদ : তাদের কাছ থেকে সরে গেল।

মহি : পরে তো সিরাজুল আলম খান আর আ স ম রবই গেল ওই দিকে?

মজিদ : রাইট।

মহি : এইটা কীভাবে হলো?

মজিদ : ছাত্রলীগের হাসিব খান অ্যান্ড মুনীরউদ্দিন হ্যাড আ মিটিং উইথ মাহমুদুল হাসান। ছাত্রলীগ ভাঙার আগে যে কনফারেন্স হইছিল, তার আগে তো মিটিং হইছে তাদের সঙ্গে। সেকেন্ড মিটিংয়ের পর কর্নেল শামস টেলিফোন করছে, 'স্যার, আপনার ফলোয়াররা তো আসছিল। ওরা মিটিংয়ের রেজাল্ট কী বলল? আর দে স্যাটিসফায়েড?'

মহি : কাকে ফোন করেছে?

মজিদ : মেজর জলিলকে।

মহি : তারপর?

মজিদ : মেজর জলিল ডাজ নট নো!

মহি : না জানিয়ে গেছে?

মজিদ : হ্যাঁ, উনি বলছে, 'ইট ইজ ফাইন।' উনি তো বলতে পারেন না যে 'আমি জানি না।'

মহি : তারপর কী হলো? মেজর জলিল কি ওদের এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছে?

মজিদ : না। সে বুঝে গেছে যে এদের সঙ্গে আর কাজ করা যাবে না। সো হি ডিসাইডেড হিস কোর্স।

মহি : ইন্টারেস্টিং! আমার কাছে তো এটা থ্রিলার মনে হচ্ছে!

মজিদ : তারা উপজেলা চেয়ারম্যানের জন্য লিস্ট দিছে। সেই লিস্ট ভেরিফাই করা হইছে।

মহি : লিস্ট বানাল কে?

মজিদ : এই চারজন-পাঁচজন মিলে।

মহি : আরেফ, ইনু, মার্শাল, আম্বিয়া, এ বি এম শাহজাহান?

মজিদ : হ্যাঁ।

মহি : শাজাহান সিরাজ এর মধ্যে ছিল না?

মজিদ : হি ওয়াজ নোহয়ার। সে রব সাহেবদের সঙ্গেও ছিল না।

মহি : জাসদের যে ভাঙাভাঙিটা, লোকে যেভাবে জানে, এটা তো তা না?

মজিদ : প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের সময় সিরাজুল আলম খান যখন আতাউল গনি ওসমানীকে ক্যান্ডিডেট করতে পারল না—পার্টি ডিসাইড করল আমাদের পার্টির প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট হবে। সে যদি

না হয়, শাজাহান সিরাজ হবে। সে যদি না হয়, মেনন হবে। মেনন না হলে নির্মল সেন হবে।

মহি : হ্যাঁ, তিন পার্টি মিলে তো একটা অ্যালায়েন্স হয়েছিল।

মজিদ : হ্যাঁ। যাহোক, ক্যান্ডিডেট হিসেবে মেজর জলিল অ্যাকসেপ্ট হইয়া গেছে। ইলেকশনের সময় সিরাজুল আলম খান চইলা গেল বাহিরে। বইলা গেল—এক্সপোজ মেজর জলিল অ্যান্ড আউট হিম।

মহি : উনি কোথায় গেল?

মজিদ : বাইরে কোথাও গেছে।

মহি : জলিলকে আউট করার সিদ্ধান্ত নিল?

মজিদ : হুম। ওরা জিজ্ঞেস করল—হোয়াই? বলল, দেয়ার ইজ নো হোয়াই। সে তো দেখতে পারছে কানেকশনগুলো সব মেজর জলিলের। সে কিছু না—নোবডি। লিবিয়ার কানেকশন, ইরাকের কানেকশন, ইন্ডিয়ান কানেকশন। সিরাজুল আলম খানের ইন্ডিয়ান কানেকশন চিত্তরঞ্জন সুতারের মাধ্যমে। আর দিল্লি থেকে ডাইরেক্ট মেজর জলিলের কাছে চলে আসে।

মহি : দিল্লিতে কানেকশন কার সঙ্গে?

মজিদ : মেজর জলিলের কানেকশন কংগ্রেসের সঙ্গে।

মহি : আপনি যেভাবে বলেছেন, ইট এক্সপোজেস দ্য হিস্ট্রি। আমি মনে করি, পিপল শুড নো হোয়াট হ্যাজ বিন হ্যাপেনিং। এখন আপনি যদি বলেন, ৪০ বছর পরও এগুলো বলা যাবে না...?

মজিদ : না না না, বলা যাবে না, আমাকে তো মাইরা ফেলবে।

মহি : কে মারবে?

মজিদ : আপনি দেখেন নাই, মাহবুবের বইতে?

মহি : নায়েব সুবেদার মাহবুব?

মজিদ : সে লেখছে এই কথা।

মহি : খেয়াল নাই কী লিখেছে।

মজিদ : এই কথা লেখছে যে হি ক্যান কিল।

মহি : কাউকে মারাইছে এভাবে?

মজিদ : তা জানি না। তবে যারা মরে গেছে, তাদের কারও জন্য তাদের ফিলিংস ছিল না। আমার তো ধারণা, দলের নেতারাই তাদের লোকদের মৃত্যুর কারণ।

মার্শাল মনি, কাজী আরেফ, ইনু ওয়াজ নট দ্যাট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাট দ্যাট টাইম। একটা গ্রুপ মেনটেইন করত মার্শাল মনি—ভাওয়ালের

ওহাব, আলী হোসেন—এরা ছিল তার ফলোয়ার। কাজী আরেফের ফলোয়ার ছিল ইমদু—তারে দিয়া কৃষক লীগ করাইত। থানার কনফারেন্স করছিল গরু জবাই দিয়া। এরা গণবাহিনীর মাধ্যমে টাকা কালেকশন কইরা তাদের কাছে ফান্ড প্লেস করত।

মহি : আলী হোসেনকে পরে ইমদু মারল না?

মজিদ : হ্যাঁ। আর ইমদুকে মারার চেষ্টা করছিল আজম, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ওখানে। মানে মধুর ক্যানটিনে।

মহি : আজম তাকে মারতে চাইল কেন?

মজিদ : গ্রুপের ইন্ধনে?

মহি : আপনি তো বেশ আছেন?

মজিদ : বেঁচে আছি, এইটা অ্যাকসিডেন্ট। আমাকে ওই কেইসে ফাঁসি দেয় নাই—নেতাদের সঙ্গে বাঁইধা গেছে, আমি চুনোপুঁটি ২ অক্টোবরের (১৯৭৭) ঘটনায় আমাকে কুত্তার মতো খুঁজছে।[১৩]

১৯৮৩ সালের শেষ দিকে জলিল জাসদের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' নামে নতুন একটা দল তৈরির ঘোষণা দেন তিনি। পরে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে ১১টি ইসলামি দলের একটি জোট তৈরি হলে তিনি ওই জোটে যোগ দেন। রাজনীতিতে যে নাটকীয়ভাবে জলিলের উত্থান হয়েছিল, মাত্র এক দশকেই তার বিয়োগান্ত পরিণতি হলো।

## ৬

১৯৮৪ সালে উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাসদ আবার ভাঙে। সিরাজুল আলম খান উপজেলা নির্বাচনের পক্ষে মত দেন। সঙ্গে পান নূর আলম জিকু ও আ স ম আবদুর রবকে। কাজী আরেফ আহমদ, মির্জা সুলতান রাজা, শাজাহান সিরাজ, মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া প্রমুখ নির্বাচন বর্জনের প্রস্তাব দেন। দলের একটি অংশ নিয়ে সিরাজুল আলম খান, রব, জিকু বেরিয়ে আসেন। আ স ম আবদুর রব ও নূর আলম জিকুকে দিয়ে জাসদের নতুন কমিটি বানান সিরাজুল আলম খান। বড় অংশটি রয়ে যায় এর বাইরে। এটাই ছিল জাসদে সিরাজুল আলম খানের শেষ অস্ত্রোপচার।

রাজনীতিতে হাসানুল হক ইনুর উত্থান সিরাজুল আলম খানের হাত ধরে। একসময় তিনি ঢাকার ফুটবল লিগে একটি ক্লাবের হয়ে খেলতেন গোলকিপার

হিসেবে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। জাসদ নেতাদের বেশির ভাগই ‘হ্যান্ড-পিকড’। ইনু তাঁদের অন্যতম। ১৯৭২ সালে তাঁকে প্রথমে জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক বানানো হয়। তখন থেকেই দলের নেতৃত্বে দ্রুতগতিতে তাঁর উত্থান ঘটে। একপর্যায়ে এসে ১৯৮৪ সালে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটে। একদা গুরু সম্পর্কে তাঁর চাঁছাছোলা মন্তব্য উঠে এসেছে *সমীক্ষণ*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে।

প্রশ্ন : সিরাজুল আলম খান সম্পর্কে আপনার এ মুহূর্তের মূল্যায়ন কী?

উত্তর : জাসদের রাজনীতিতে তাঁর কোনো স্থান নেই। উনি পদত্যাগ করেছেন এবং অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে স্বৈরাচারী এরশাদকে সমর্থন করেছেন।

প্রশ্ন : জাসদীয় ঐক্যের ব্যাপারে তাঁর কি কোনো ভূমিকা আছে? কোনো যোগাযোগ হয়েছে?

উত্তর : তাঁর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই, উচিতও না।

প্রশ্ন : উনি তো আপনাদের রাজনীতিরও স্রষ্টা?

উত্তর : ছিলেন, এখন উনি বুদ্ধিজীবী হয়েছেন, আইজি এখন ওসি হয়েছেন—ওসির সঙ্গে কী কথা বলব? রাজনৈতিক নেতা ছিলেন উনি, সে দায়িত্ব ছেড়ে এখন উনি বুদ্ধিজীবী হয়েছেন।

প্রশ্ন : এগুলো তো অভিমানের কথা?

উত্তর : অভিমানের কোনো ব্যাপার নাই। উনি একটা প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে কেবল দল ত্যাগই করেননি, যখন বাংলাদেশের রাজপথে ছাত্রদের রক্ত ঝরছে, তখন উনি প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে রক্তের অবমাননাই শুধু করেননি—স্বৈরাচারের পক্ষাবলম্বন করেছেন। আপনি যে আদর্শেই বিশ্বাস করেন না কেন, মানবিক মূল্যবোধ তো থাকতে হবে।[১৪]

## ৭

সিরাজুল আলম খান নতুন একটা পত্রিকা বের করলেন, পাক্ষিক *মশাল*। প্রকাশক-সম্পাদক ছিলেন আবুল হাসনাত (বাচ্চু)। তবে সবকিছু দেখতেন সিরাজুল আলম খান। তিনি *মশাল* অফিসেই বসতেন। পত্রিকাটি বের হতো দিলকুশার একটি অফিস থেকে। এটি একসময় একটি উর্দু পত্রিকার অফিস

ছিল। স্বাধীনতার পর ভবনটি 'পরিত্যক্ত সম্পত্তি' ঘোষণা করা হয়। এটি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) দিয়ে দেওয়া হয়। ভবনটি বাসসের প্রধান কার্যালয় হবে, এ রকম একটা চিন্তা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। বাসস ওটা ভাড়া দিয়ে দেয়। এখানেই ছিল *মশাল* অফিস। কয়েক বছর ভাড়া বাকি পড়েছিল। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে বাসসের প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে যোগ দেন আমানউল্লাহ। তিনি বকেয়া ভাড়া আদায় করতে তৎপর হলেন। নোটিশ পাঠালেন। আমানউল্লাহর ভাষ্যে জানা যায় :

> সিরাজুল আলম খান একদিন এলেন আমার অফিসে। আমি তাঁকে ভালো করেই চিনি। তিনি আমাকে যথেষ্ট রিগার্ডস দিলেন। চা-টা খেলেন। বললাম, পুরো ভাড়া না দিতে পারলেও অল্প কিছু দেন। কিছু না বলে উনি চলে গেলেন। মাঝরাতে হঠাৎ টেলিফোন। আমি তখন ঘুমানোর আয়োজন করছি। ফোন ধরলাম। অপর প্রান্তে প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ। বাড়িভাড়ার প্রসঙ্গ উঠল। উনি বললেন, 'এটা তো আমার কাগজ।' বললাম, 'তাহলে তো আমাকে আরও সিরিয়াসলি টাকাটা আদায় করতে হবে।' উনি তখন তথ্য মন্ত্রণালয়েরও দেখভাল করতেন। বললেন, এটা আর পারসু করার দরকার নাই। সবই বুঝলাম। সিরাজুল আলম খান আমাকে সরাসরি না বলে কাজী জাফরকে দিয়ে বলিয়েছেন।[১৫]

ওই সময় সিরাজুল আলম খান বেশ কয়েকটি চটি বই বের করেন। তাঁর মূল বিষয়বস্তু হলো, ৫০০ আসনের একটা পার্লামেন্ট হতে হবে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ আসনের, যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন। ২০০ আসনের একটা উচ্চকক্ষ হবে পেশাজীবীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে। তাঁর মতে, এ রকম একটা পার্লামেন্ট হলেই দেশের তাবৎ সমস্যার সমাধানের পথ খুলে যাবে। এটাকে তিনি বলছেন শ্রমজীবী-পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা। কীভাবে এটা হবে? সিরাজুল আলম খান ব্যাখ্যা করলেন তাঁর চিন্তাভাবনার কথা। এটাই হলো তাঁর সাম্প্রতিকতম দর্শন :

> আমরা যদি একটা রাজনৈতিক লাইন—পলিটিক্যাল থিসিস দাঁড় করাই—আমরা তো বলতামই, এটা একটা সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন হবে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব না। বুর্জোয়াদের থেকে ক্ষমতাটা নিতে হবে। তবে অনেক ডেমোক্রেটিক আসপেক্ট কভার করতে হবে। ইফ উই আর নট ইন দ্য পাওয়ার, তাহলে থ্রু পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম। এখন পলিটিক্যাল প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই ডেমোক্রেটিক কাজগুলোই কিন্তু করছি। ওই যে, শ্রমজীবী-পেশাজীবীদের কর্তৃত্বমূলক আধুনিক

রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি হয়। সোশ্যালিস্ট টেকওভার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কী করব? যদি ৪০ বছর লাগে, কী করব এই ৪০ বছর? ২০ বছর পরে কী করব? আমাকে তো বিয়ে করতে হবে, জমিজমা কিনতে হবে, আমার তো ফ্ল্যাট লাগবে, আমার ছেলেমেয়েকে তো লেখাপড়া শেখাতে হবে, আমার তো ব্যাংক ব্যালান্স লাগবে। আমি চাই সোশ্যালিস্ট টেকওভার, এখন হচ্ছে না। তাই বলে এগুলো আমি করব না? এগুলো লাগবে তো? এই হলো আমার চিন্তা। সোশ্যালিস্ট টেকওভার, কিন্তু ইন দ্য প্রসেস, ডেমোক্রেটিক আর্জ এবং ডেমোক্রেটিক আসপেক্টস অব দ্য পিপল লেফট আনকেয়ার্ড, আনঅ্যাড্রেসড। সেগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে থ্রু পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম। এর মধ্য দিয়ে ফোর্সেস অব সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন উইল ইমার্জ। সেখানে আমাকে আর সশস্ত্র ধারায় যেতে হবে না। আর্মড রেভল্যুশন লাগবে না। লিবারাল বুর্জোয়া সিস্টেমের মধ্য দিয়ে, লিবারাল ডেমোক্রেটিক সিস্টেমের মধ্য দিয়ে এটা গ্রো করে ফেলবে।

মার্ক্স সব সময় সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশনের কথা বলতেন। ১৮৭১ সালে উনি প্যারি কমিউনকে সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন করতে বলেছিলেন। যদি না করতে পারেন, তখন কী করবেন? বা ১৮৪৮ সালে পর সব টেকওভার কি সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন হবে? উত্তর হলো, না। তাহলে সেগুলো কী? সেগুলোর যে ডেমোক্রেটিক আসপেক্টস ডাইরেক্টেড টুওয়ার্ডস সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন—এখন তার ক্রিটিকরা এগুলো বলতে চান যে এগুলো উনি নেগলেক্ট করেছেন। অ্যাড্রেস করেননি। তাঁরাই আবার বলছেন, ইন দ্যাট কেস, এঙ্গেলস ওয়াজ শারপার দ্যান মার্ক্স। এঙ্গেলস কিন্তু বলছেন ডেমোক্রেটিক আসপেক্টস অ্যাড্রেস করতে হবে আনটিল সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন টেকস ওভার।

তখনকার যুগে মধ্যস্বত্বভোগীরা, বিটুইন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড বুর্জোয়া ভেরি লিটল। আর আজকের যুগে, দ্যাট ইজ রুলিং দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। এই মধ্যবিত্তরা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, শৌর্য-বীর্যের মধ্য দিয়ে, উৎপাদন-বন্টনের মধ্য দিয়ে, ইন এভরিথিং, এরাই কিন্তু মেইন ইকোনমিক মাইট হিসেবে কাজ করছে। বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটাও। তাদের সঙ্গে না রেখে তুমি শুধু শ্রমিকদের দিয়ে সোশ্যালিস্ট টেকওভারের কথা বলবা, তাহলে এরা কোন দিকে যাবে? তারা তো সংখ্যার দিক থেকেও বেশি, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকেও বেশি। এমনিতে তারা তো থাকবে বুর্জোয়ার সঙ্গে। তাহলে তো এক হাজার বছরের মধ্যেও

প্রিয় লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অক্সফোর্ডের বাড়িতে সিরাজুল আলম খান। সঙ্গে হাবিব বাবুল ও আমিনুল হক বাদশা। ছবি : সংগৃহীত

ওয়ার্কাররা বুর্জোয়াদের সরাতে পারবে না। বুর্জোয়াদের হলো বিত্তের দিকটা, আর মধ্যবিত্তের হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকটা, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা। ওয়ার্কাররা কিছু হতে পারবে না। যদি এমন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়, যেখানে মধ্যবিত্ত-পেশাজীবীরা ও শ্রমজীবীরা যুক্তভাবে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা নেয়। এদের রোল যদি তুমি ঠিকমতো পিনপয়েন্ট না করো, তাহলে কম্বোডিয়ার মতো অবস্থা হয়ে যাবে। পলপট সৃষ্টি হবে। সে ১৫ লাখ মধ্যবিত্তকে গ্রামে পাঠিয়ে দিল—ওয়ার্কার হয়ে যাও। অল ওয়ার অ্যানিহিলেটেড।

আমার এখানে এত ডাক্তার, এত ইঞ্জিনিয়ার, এত শিল্পী-সাহিত্যিক, এত বুদ্ধিজীবী, গুণীজ্ঞানীজন, শিক্ষা-সংস্কৃতির এত লোক—এদের কী করব আমি? তারা কি ওয়ার্কারদের আন্ডারে থাকবে? উইদাউট অ্যানি পলিটিক্যাল ফরমুলেশন? হোয়াট ইজ দ্য পলিটিক্যাল ফরমুলেশন? এখানে একটা পলিটিক্যাল টেকনোলজি ওয়ার্ক আউট করতে হবে।

সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশনে এরা কোথায় অবস্থান করে? ১ লাখ ৫০ হাজার চিকিৎসক, ১ লাখ প্রকৌশলী, সাড়ে ৩ লাখ ডিপ্লোমা, ১০ লাখ শিক্ষক, সাংবাদিক ১৮ হাজার, সংস্কৃতিসেবী সোয়া ২ লাখ, কৃষিবিদ ১ লাখ ৬০ হাজার, ব্যাংক কর্মকর্তা ২ লাখ, আইনজীবী ২ লাখ, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ১ লাখ, সরকারি কর্মচারী ১৪-১৫ লাখ, এনজিওরা

> ১ কোটি, দোকানমালিক, বিশেষজ্ঞ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, কোথায় রাখবা তাদের? তুমি তাদের বলবা... শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে আসেন! এটা একটা কথা হলো? এটা হয়? এখন তো বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা।
>
> বাট থিয়োটি স্ট্যান্ডস। ইভেন রিলিজিয়নকে নালিফাই করে তুমি সোশ্যালিস্ট টেকওভারে যেতে পারবে না। মানুষের মধ্যে যেটা আছে এবং থাকবে, সেটাকে তুমি তো ইগনোর করতে পারো না। যেটা হওয়া উচিত না, সেটা হয়ে গেছে। সেটাকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না।[১৬]

এই তত্ত্ব নিয়ে সিরাজুল আলম খান হলেন নিঃসঙ্গ পথের যাত্রী। অফিস নেই, দল নেই। মাঝেমধ্যে আ স ম আবদুর রবকে নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করেন। সেটা হালে পানি পায় না। এর মধ্যে তিনি কথা বলার একটা জায়গা খুঁজে পেলেন, হোটেল শেরাটনের (ইন্টারকন্টিনেন্টাল) লবি। বিকেলে সেখানে যান। নানা ধরনের লোকজন আসে তাঁর কাছে। টেবিল ঘুরে ঘুরে তিনি সবার সঙ্গে কথা বলেন। ওখানে চা-টা খাওয়া হয়। ভক্তরা দাম চুকিয়ে দেন। বাইরে অনেকেই কানাঘুষা করেন, গুজব ছড়ান, বাব্বা! শেরাটনে বসে রোজ মিটিং করে! কত না টাকা ওড়ায়! কোত্থেকে আসে এত টাকা?

এভাবেই চলছিল কয়েক বছর, বেগম খালেদা জিয়া তখন প্রধানমন্ত্রী। শেরাটনের যে কর্মচারী ইউনিয়ন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন সিরাজুল আলম খানের ভক্ত। একদিন তাঁরা 'না' করে দিলেন, এখানে আর বসা যাবে না, অসুবিধা আছে। বোঝা গেল, সরকারের লোকজন এটা পছন্দ করছে না। শেরাটনের আড্ডা বন্ধ হয়ে গেল।

সিরাজুল আলম খানের জীবনযাত্রা পাল্টে গেল। তিনি এখন শুধু লেখালেখি করেন। নিজে লেখেন না। ডিকটেশন দেন। বইপত্র ঘাঁটেন। বাঙালিদের মধ্যে নীরদ সি চৌধুরী তাঁর প্রিয় লেখক। ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কে অক্সফোর্ড স্কুলে সন্ধ্যার পর বসেন। ওখানে লোকজন আসে, কথাবার্তা হয়। প্রতিবছর কয়েক মাসের জন্য বিদেশে চলে যান। বিশেষ করে নিউইয়র্কে। খুব শীত পড়লে ফিরে আসেন। এটা এখন তাঁর রুটিন।

## তথ্যসূত্র

১. উল্লাহ, মাহফুজ (২০১৬), *পাঠকের চোখে জাসদ*, মধ্যমা, ঢাকা, পৃ. ১৩১-১৩৩

২. মাহমুদুর রহমান মান্না

৩. উল্লাহ (২০১৬), পৃ. ১২২-১২৪
৪. বাসদ, *সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*, ২০১১, পৃ. ৪
৫. 'শেখ মুজিবের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে', মহিউদ্দিন আহমদ, *গণকণ্ঠ*, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০
৬. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬), *বিএনপি : সময়-অসময়*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৭৯-৮১
৭. *বুলেটিন*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৮৩, পৃ. ৬
৮. এস এম ইউসুফ
৯. *বুলেটিন*, পৃ. ১৪
১০. আহমদ (২০১৪), পৃ. ২৫২-২৫৪
১১. জলিল, মেজর এম এ (১৯৮৩), *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জাতীয় কমিটির সদস্যদের প্রতি*, পৃ. ৮-১৩
১২. ওই, পৃ. ২৫-২৬
১৩. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
১৪. *সমীক্ষণ*, ১৯৯১
১৫. আমানউল্লাহ
১৬. সিরাজুল আলম খান

# হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা

এই কাহিনির তিনটি পর্ব, যা আমাদের নিকট অতীতের বাঁকবদলের আখ্যান। ১৯৬০-এর দশক ছিল আমাদের উত্থানপর্ব, যখন বাঙালি একটি ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র তৈরির স্বপ্ন দেখেছে। এই দশকে এ দেশের মানুষের মনোজগতে ঘটেছে বড় রকমের পরিবর্তন। এর চূড়ান্ত ফয়সালা দেখা যায় উনসত্তরের গণ-আন্দোলন এবং সত্তরের নির্বাচনে। এরপর আর পেছনে ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। ষাটের দশকের শেষ দিকে শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের প্রধান রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। তিনি হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। সত্তরের নির্বাচনের একতরফা ফলাফলেই সংকটের ইঙ্গিত ছিল। নিয়মতান্ত্রিক পথে এর মীমাংসা হয়নি। যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। ভূরাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায় শুরুতেই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ভারত। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে দেখতে হবে এই প্রেক্ষাপটে।

যুদ্ধ শেষ হয়েও শেষ হলো না। স্বাধীনতার পক্ষে সাধারণ ঐকমত্য ছিল। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান ছিল আক্রমণকারী, জনগণের চোখে বিদেশি। বাহাত্তরে প্রেক্ষাপট গেল পাল্টে। চোখের সামনে পাকিস্তান আর নেই। দেশ কীভাবে চলবে, তা নিয়ে মতভিন্নতা তৈরি হলো। এ নিয়ে বেধে গেল লড়াই। একদিকে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশীদারত্বের দাবি।

এই সময়ের আখ্যানে জড়িয়ে আছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁদের একজন হলেন সিরাজুল আলম খান। তাঁকে নিয়ে আছে অনেক আলোচনা-সমালোচনা, আছে কৌতূহল, আছে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি। একসময় তাঁর পরিচয় হয়ে গেল রাজনীতির রহস্যমানব।

রাজনীতির চরিত্রগুলো মঞ্চের উজ্জ্বল আলোয় দেখতে আমরা অভ্যস্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা ভালো ভালো কথা বলেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি। মঞ্চের পেছনে থাকে সাজঘর বা গ্রিনরুম। সেখানে গেলে তাঁদের আসল চেহারা দেখা যায়। সুন্দর পোশাক আর প্রসাধনচর্চিত মুখ দেখে আমরা ব্যক্তিত্ব বিচার করি। হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে সার্জন যখন কারও

শরীর কাটাকুটি করেন, তখন রক্ত-মাংস-অস্থি বেরিয়ে আসে। তাকে আর সুন্দর দেখায় না। কিন্তু ওটাই তো সত্যিকার মানবদেহ। বাইরে থেকে আমরা শুধু আবরণটাই দেখি।

সময় ও সময়ের চরিত্রগুলোর ব্যবচ্ছেদ করতে বসলে আমরা নির্মম ও স্থূল বাস্তবতার মুখোমুখি হই। সময় ও ব্যক্তিকে রঙিন মোড়কে উপস্থাপন করার যে রেওয়াজ চালু আছে, তার মধ্য থেকে সত্য ছেঁকে তোলা বেশ কঠিন। সত্য বেরিয়ে এলে আমরা অবাক হই।

আত্মস্মৃতি যাঁরা লেখেন, তাঁরা অনেক কিছুই উল্লেখ করেন না। একজন ব্যক্তি বা একটি সময়কে নানাভাবে দেখা বা বিচার করা যায়। জীবন তো বহুমাত্রিক। এর বিশেষ একটি দিককে গুরুত্ব দিয়ে এবং অন্য দিকগুলো পাশ কাটিয়ে গেলে ইতিহাসের ওপর সুবিচার হয় না। একপেশে বয়ান থেকে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সরল উপসংহার টানা যায়—তিনি নায়ক অথবা খলনায়ক, বিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী, যুগস্রষ্টা অথবা ষড়যন্ত্রকারী। ব্যক্তি কিন্তু একজনই। তার শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ দুই-ই আছে। অথচ আমরা কত অনায়াসে বলে দিই, তিনি দেবতা, নয়তো দানব।

রামায়ণের উদাহরণ দেওয়া যাক। রাক্ষসরাজ রাবণ একজন খলনায়ক। অথচ কী অপরূপ ছন্দে পরম মমতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সৃষ্টি করলেন *মেঘনাদবধ কাব্য*, যেখানে রাবণ আর মেঘনাদ হলেন বীর, রাম-লক্ষ্মণ হলেন হানাদার তস্কর।

সিরাজুল আলম খান এবং তাঁর 'নিউক্লিয়াস' নিয়ে একাডেমিক আলোচনা বেশি হয়নি। তাঁকে নিয়ে যেমন অতিরঞ্জন আছে, তেমনি আছে অস্বীকৃতি। 'আমিই সব করেছি'—এ রকম বাগাড়ম্বর কিংবা আস্ফালন যেমন আছে, আবার 'আমি এত গুরুত্বপূর্ণ অথচ কিছুই জানলাম না'—এ রকম আক্ষেপও আছে।

ষাটের দশকে সিরাজুল আলম খানের উত্থান ছাত্রনেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাত ধরে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছায়াতলে। এ সময় আরও কয়েকজন তরুণ ছাত্রনেতা মাঠ কাঁপিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের ফারাক এক জায়গায়—তিনি ধারাবাহিকভাবে লেগে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর মাথার ওপর ছায়াটি আর ছিল না। তখন তাঁকে পথ চলতে হয়েছে নিজ শক্তিতে ও বুদ্ধিতে। সঙ্গে পেয়েছেন অনেক উদ্যমী তরুণকে। সবাইকে ছাঁচে ঢেলে তিনিই তৈরি করেছেন, এমন নয়। সবার মনেই স্বপ্ন ছিল। সিরাজুল আলম খান হয়ে উঠলেন তরুণ মনের স্বপ্নের সওদাগর। তিনি নিজেই বলেছেন, শেখ মুজিবের ছয় দফা তাঁর বুকের মধ্যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। উনসত্তরে মুজিব যখন

জেল থেকে ছাড়া পান, দেখলেন তাঁর জন্য জমি তৈরি হয়ে আছে, যার ওপর ভরসা করে বীজ বোনা যায়। জমি তৈরির এ কাজটি করেছেন সিরাজুল আলম খান। শেখ মুজিবকে নেতা মেনেই তিনি এটি করেছেন। এখানে তিনি মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী নন। বরং বলা যায় 'প্রডিজে'। এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া ভার। কাছাকাছি শব্দ হলো 'আস্থাভাজন শিষ্য'। এ ধরনের একটি সম্পর্ক ও অবস্থান দাঁড় করালে শেখ মুজিব ছোট হয়ে যান না, সিরাজুল আলম খানকেও অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা করতে হয় না।

বাংলাদেশের উত্থান হলো একটি জনগোষ্ঠীর জেগে ওঠার মহাকাব্য। এর পরতে পরতে আছে যুগ যুগ ধরে মানুষের যূথবদ্ধ প্রয়াস। এখানে অনেক কারিগর, অনেক বীর। সিরাজুল আলম খান তেমনই একজন, একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যিনি শ্রম-ঘাম-মেধা দিয়ে বাংলাদেশের উত্থানপর্বে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধপর্বটি এখনো রয়ে গেছে অনেকটাই অজানা। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো মুজিববাহিনী। এ নিয়ে আছে অনেক ধোঁয়াশা। যুদ্ধ জয়ের প্রথম শর্ত হলো একতা। দরকার স্বাধীনতার পক্ষের সব শক্তির এককাট্টা হওয়া। সেটি কেন হলো না? রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের সঙ্গে থিয়েটার রোডের যোদ্ধাদের সমন্বয়ে ঘাটতি কেন ছিল? মুজিববাহিনীর আলাদা কমান্ড-কাঠোমো কেন গড়ে উঠল? কেন সরকারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ও টানাপোড়েন তৈরি হলো? আজ হোক কিংবা কাল, এর একটা ব্যাখ্যা তো পেতে হবে।

একাত্তর-পরবর্তী পর্বটি জটিল ও স্পর্শকাতর। প্রশ্ন উঠেছিল, দেশ কি প্রস্তুত হওয়ার আগেই স্বাধীন হয়ে গেছে? একটি স্বাধীন দেশ কীভাবে চলবে, তার জন্য কি কোনো রূপকল্প ছিল? এ তো মধ্যরাতে ক্ষমতার হাতবদল ছিল না। এত রক্ত, এত মৃত্যু, একটি জনযুদ্ধ—এসবের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রটির জন্ম হলো, তাকে গড়েপিটে তোলার কোনো ছক-নকশা তো ছিল না? অথচ আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকার চূড়ায় জায়গা পেল তড়িঘড়ি করে প্রচলিত নিয়মকানুন আর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ঝাড়পোঁছ দিয়ে রেখে দেওয়া। ইংরেজ আর পাকিস্তানি যুগের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো রয়ে গেল অবিচ্ছিন্ন, অবিকল।

জন্মক্ষণেই দেশ দুই পরাশক্তির শীতল লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে যায়। দেশের ভেতরে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতো। মুসলিম লীগের পুরোনো সংস্কৃতির পুনর্জন্ম হলো। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি, আমরাই দেশপ্রেমিক, আমরাই দেশ চালাব, অন্যরা সব ষড়যন্ত্রকারী, দেশদ্রোহী, দুষ্কৃতী—এ রকম ভাবনা জেঁকে বসল। একে অন্যকে বিদেশের দালাল বলার

মাতম শুরু হলো। ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ঘেরাটোপে বন্দী হলেন সবাই। ঠিক এ সময় মঞ্চে হাজির হলো জাসদ। দলটি তরুণদের একটি বড় অংশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যাদের বয়স পঁচিশের নিচে, তাদের কাছে জাসদ হয়ে উঠল একটা স্বপ্ন, রোমাঞ্চ, ক্রেজ। মধুসূদন দত্তের শব্দাবলি কী দারুণভাবে সত্য হয়ে উঠল :

আসিতেছে দ্রুতগতি চারিদিক হতে
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা—হায়, পুড়িয়া মরিতে।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত : *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*)

তারুণ্যের এ জোয়ার শুধু ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এ এক অভিনব উদ্ভাসন। এ ছিল যুদ্ধোত্তর প্রবণতা, যা ছিল অনিবার্য।

একটি প্রক্রিয়া বা দল যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা সবাই সক্রেটিস বা আলেকজান্ডার হন না। অথবা হন না একজন স্থপতি, যিনি মাপজোক করে নকশা এঁকে তারপর দালান তৈরির সিদ্ধান্ত দেবেন। সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্লু-প্রিন্ট বানিয়ে সমাজে ঝড় তোলা যায় না। করতে করতে শেখা—এ রকম একটি কথা চালু আছে। যখন আমরা শিখি না, শিখতে চাই না, তখনই তৈরি হয় সংকট। বাহাত্তরেই দেশ পড়ে গেল সংকটে।

রাজনীতিতে আদর্শ, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ—এসব আছে। এর পাশাপাশি আছে উগ্রতা, একগুঁয়েমি, শঠতা ও প্রতিহিংসা। যাঁরা নির্দিষ্ট একটি মত ও পথের যাত্রী, তাঁরা তাঁদের ওপর অন্যের চাপিয়ে দেওয়া নানান বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হবেন না। চে গুয়েভারা স্বজনদের কাছে বিপ্লবী, প্রতিপক্ষের চোখে সন্ত্রাসী। এ দেশে অনেকেই চে হতে চেয়েছেন। তাঁরা নিজেদের বীর, বিপ্লবী মনে করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিপক্ষের চোখে তাঁরা পথভ্রষ্ট, হঠকারী, দুষ্কৃতী। অথবা জুতসই কোনো শব্দ হাতের কাছে খুঁজে না পেলে অপছন্দের লোককে ট্রটস্কিবাদী বলে নাকচ করে দেওয়ার লোকের অভাব নেই।

সিরাজুল আলম খানের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ—তিনি তরুণ প্রজন্মকে ভুল পথে নিয়ে গেছেন। তিনি কি জেনেবুঝে এ কাজ করেছেন? তিনি কি উন্মাদ? নিজ হাতে একটি দল তৈরি করে সেটিই আবার ছিন্নভিন্ন করে দিলেন? এ রকম অভিযোগ উঠেছে দলের ভেতর থেকেই। সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা, হাজার হাজার তরুণ কিসের আশায় তাঁর সহযাত্রী হলেন? তিনি কি হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা? একসময় যাঁরা তাঁকে ব্যবহার করেছিলেন, তাঁরা তাঁকে ছুড়ে ফেলে দিলেন কেন? অসহিষ্ণু উঠতি মধ্যবিত্ত, যাঁরা একদিন তারুণ্যের এই উদ্ভাসনকে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে লড়তে দেখে পেছন থেকে হাততালি দিয়েছেন, তাঁরাই পরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন নতুন কুশীলবের দেখা পেয়ে। একসময় তাঁরা বলতে শুরু করলেন—এরা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি

২০০০ সালের ১৬ ডিসেম্বর নীলক্ষেতের আনোয়ারা রেস্টুরেন্টে এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে (বাঁ দিক থেকে) লে. ক. নূরন্নবী খান, লেখক, ফজলুর রহমান বাবুল, জহুরুল ইসলাম, শামসুদ্দিন পেয়ারা, মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিস প্রমুখ।
ছবি : গীতশ্রী চৌধুরী

করছে, নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে, নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু আন্দোলন, হরতাল, বোমাবাজি! আল মাহমুদ লিখলেন 'আমিও রাস্তায়' :

> দিল বাইন্ধা পথঘাট, বাস গাড়ি মোটর দোকান
> গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুরব্বির গায়।
> সাহস দেখো না মিয়া, বে-তমিজ বান্দীর পুতেরা
> মাইনষের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান উড়ায়।
>
> (আল মাহমুদ : *সোনালি কাবিন*)

রাজনীতি যেহেতু মানুষকে নিয়ে, রাজনীতিবিদেরা সব সময় জন-আলোচনায় থাকেন। তাঁরাও ভুল করেন। তখন সমালোচনা বা গালাগালের শিকার হন। এ থেকে কারও রেহাই নেই। এ জন্য তাঁরা নিজেরাও দায়ী। নিজের অবস্থানটি ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে না পারার কারণে তাঁরা প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ হন। কেউ কেউ ভুল স্বীকার করেন না। বরং ভুলের পক্ষে সাফাই গান। নিজেকে সবজান্তা মনে করেন, মনে করেন অভ্রান্ত। এই মানসিকতা একধরনের অহংকার বা ইগো থেকে আসে। সোজা কথায় এ হলো নিছক গোঁয়ার্তুমি। সিরাজুল আলম খানও এর ব্যতিক্রম নন।

সিরাজুল আলম খান ও জাসদের কথা মানুষ ভুলতে বসেছিল। দলটি এখন খণ্ড-বিখণ্ড, আগের তেজ নেই। আমি বলি, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাসদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, ৭ নভেম্বর এর মৃত্যু হয়। এরপর থেকে এর কঙ্কালটাই টেনে বেড়ানো হচ্ছে। একই সঙ্গে সিরাজুল আলম খানও গেছেন অস্তাচলে।

২০০০ সালে আমি একটি উদ্যোগ নিয়েছিলাম। একটি প্রীতিসম্মিলনীর আয়োজন করেছিলাম নীলক্ষেতে আনোয়ারা রেস্টুরেন্টে। নাম দিয়েছিলাম আনোয়ারা রেস্টুরেন্ট ককাস। ষাটের দশকের শেষ দিকে, বিশেষ করে ১৯৭০-৭১ সালের উত্তাল দিনগুলোতে আমরা অনেকেই সেখানে রাতে খেতে এবং আড্ডা দিতে যেতাম—রাজনৈতিক আড্ডা। আমাদের মধ্যমণি ছিলেন সিরাজুল আলম খান। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে একধরনের নস্টালজিয়া কাজ করে। এ অনুষ্ঠান আয়োজনে আমাকে সাহায্য করেছিল প্রয়াত বন্ধু একরামুল হক। আমন্ত্রিতদের তালিকা মূলত তাঁরই তৈরি। সেখানে যাঁদের আসতে বলেছিলাম, তাঁরা কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন :

হু ইজ সিরাজুল আলম খান?
এ মিটিং ডাকার উদ্দেশ্য কী?
এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো পলিটিকস আছে?
ও কার হয়ে কাজ করছে?

তারপরও ৫০ জনের মতো হাজির হয়েছিলেন। সিরাজুল আলম খানও এসেছিলেন। সেদিন বিজয় দিবস, রোজার দিন ছিল। আমরা একসঙ্গে ইফতার করলাম। সিরাজুল আলম খান বললেন, 'বুলবুল একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। এটা চালু থাকুক। ও হবে এর কো-অর্ডিনেটর।' পরদিন দৈনিক *জনকণ্ঠ*-এ বিশাল নিউজ ছাপা হয়েছিল। সম্ভবত তিনিই এটা করিয়েছিলেন।

তাঁকে নিয়ে একটি স্মারকগ্রন্থ বের করার উদ্যোগ নিলাম। আমার সহযোগী হলেন রেজাউল হক মুশতাক ও আবু করিম। আবু করিম আমাদের তিনজনের নামে যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টও খুললেন। লেখা চাইলাম অনেকের কাছে। প্রথম লেখাটি পাঠালেন আ স ম আবদুর রব। আমি বার দুয়েক শিবনারায়ণের বাসায় গিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটা লেখা নিয়ে এলাম। আর কেউ সাড়া দেননি। আর কারও আগ্রহ দেখলাম না। বিষয়টা ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

সিরাজুল আলম খানের নায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। মুজিবে মোহমুগ্ধ ছিলেন তিনি। একসময় তিনি বিদ্রোহ করলেন। সঙ্গীদের চোখে তিনি হলেন প্রতিনায়ক। তৈরি হলো তাঁর কাল্ট। অর্থশাস্ত্রে মার্জিনাল ভ্যালু বা প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব আছে। সঙ্গীরা একে একে তাঁকে ত্যাগ করায় তাঁর প্রান্তিক

লেখককে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন সিরাজুল আলম খান ছবি : সুমন মাহমুদ

মূল্যমান ঠেকে শূন্যের কোঠায়। তিনি এখন 'রেচিড অব পলিটিকস'—রিক্ত, পরিত্যক্ত। তাঁকে ঘিরে যাঁরা বিপ্লবের মন্ত্র জপেছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগ এখন দলীয় রাজনীতি থেকে অবসরে। বাকিরা নানান শিবিরে বিভক্ত। একদা স্বপ্নবাজ 'অ্যাংগ্রি ইয়াংম্যানরা' এখন ইতিহাসের জাবর কাটেন।

সিরাজুল আলম খান লেখালেখি করে সময় কাটান। তাঁর লেখা বিদ্বজ্জনের টেবিলে ঠাঁই পায় না। এ নিয়ে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁর গুরু ও ঘনিষ্ঠজনেরা অনেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। একদিন তিনিও চলে যাবেন। প্রকৃতির এটাই নিয়ম।

বেশ কিছুদিন আগে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন সুমন মাহমুদ। তিনি কিছু কথা বলার আগ্রহ দেখালেন। সুমনকে বললেন রেকর্ড করতে। যথারীতি এর ভিডিও হলো। তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা বললেন। 'আমার মৃত্যুর পর কোনো শোকসভা হবে না। শহীদ মিনারে ডিসপ্লে হবে না লাশ। যত দ্রুত সম্ভব নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে আমার গ্রামের বাড়িতে পাঠাতে হবে মরদেহ, যা ঢাকা থাকবে একটা কাঠের কফিনে। মায়ের একটা শাড়ি রেখে দিয়েছি। কফিনটা শাড়িতে মুড়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, মায়ের কবরে।'

মানুষ যেখান থেকে আসে, সেখানেই ফিরে যায়। কেউ কেউ জায়গা করে নেন ইতিহাসের পাতায়। কেউ নায়ক হন, কেউ হন প্রতিনায়ক। তাঁরা ইতিহাস তৈরি করেন।

# পরিশিষ্ট

www.amarboi.com

## পরিশিষ্ট ১

# জয় বাংলা

(কথিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের প্রচারপত্র)

[অক্টোবর ১৯৭০]

সাধারণ নির্বাচন অত্যাসন্ন।

এই নির্বাচন ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং বাংলার মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের একমাত্র পরীক্ষা। আর সে পরীক্ষার ভিত্তি হলো ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ১১ দফা।

এই নির্বাচনকে গণভোট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গণভোটের অর্থ কেবল ক্ষমতাসীন পরিষদের ৩০০ জনের মধ্যে ১৫০ জনের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নয়, তার সঙ্গে সারা দেশের মোট ভোটের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও বটে। তাহলেই সে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে জাতির পক্ষ থেকে রায় বলে গণ্য করা হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ তথা যুবসমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে অধিক, কারণ আমাদের মতো অনুন্নত দেশে ছাত্ররাই সবচেয়ে বেশি প্রগতিবাদী ও সংগ্রামী। সে জন্যই সাধারণ মানুষের কাছে ছাত্ররা শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ দায়িত্বে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।

প্রত্যেক ছাত্রের কর্তব্য নিম্নরূপ :

ক. প্রত্যেককে নিজ নিজ থানা কার্যক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিতে হবে।

খ. সমকক্ষ একাধিক ছাত্র এক থানার অধিবাসী হলে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একই থানায় কাজ করতে হবে।

গ. প্রতিটি সভা-সমিতি ও কর্মিসভায় যোগ দিয়ে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে হবে।

ঘ. কেবল বক্তৃতা বা বিবৃতির মধ্যে কাজকে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্দোলন-উৎসাহী কর্মী সৃষ্টি করতে হবে।

ঙ. উৎসাহী কর্মীদের নিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা, আন্দোলনের গতিধারা আপসমূলক মনোভাব সৃষ্টির পরিবর্তে সংগ্রামী মনোভাবের অনুপ্রেরণা, সর্বোপরি ভবিষ্যৎ আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য থানাভিত্তিক ও গ্রামভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক রূপ দিতে হবে। এই সংগঠন কেবল আন্দোলন পরিচালনার জন্যই গঠন করতে হবে।

চ. এই সংগঠন সর্বদা ঢাকা থেকে ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

**এই সংগঠনের দায়িত্ব নিম্নরূপ**

ক. ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতার দ্বারা আদর্শ ও আন্দোলনের প্রতি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবে।

খ. গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা, কৃষকদের সমস্যাভিত্তিক আলোচনা ও সমাধানের রূপরেখা নির্ধারণ করে এবং কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করবে।

গ. শ্রমিকদের মধ্যে অনুরূপভাবে আলোচনা করবে ও শ্রমিকদের সংগঠিত করবে।

ঘ. শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, অর্থাৎ শিক্ষক, বিভিন্ন অফিসের কর্মচারী, উকিল-মোক্তারদের মধ্যেও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করবে।

ঙ. প্রতিটি স্কুলের কমপক্ষে একজন শিক্ষককে আদর্শে অনুপ্রাণিত করে সে অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

চ. বেকার যুবকদের সংগঠিত করতে হবে।

ছ. প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র ও প্রাচীরপত্র বিলি করবে।

**সংগঠন নিম্নরূপভাবে গড়তে হবে**

ক. প্রতিটি থানায় ৫, ৭ বা ৯ সদস্যবিশিষ্ট যুবকদের নিয়ে কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি সমগ্র থানার দায়িত্বভার পালন করবে।

খ. থানা কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩, ৫ বা ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করতে হবে।

গ. থানা ও ইউনিয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক যুবককে গ্রামের দায়িত্ব দিতে হবে।

ঘ. এই কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের, অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বরের আগে অবশ্যই গঠিত হতে হবে।

### উল্লিখিত গঠিত কমিটির প্রতি নির্দেশ

ক. জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও যেকোনো কারণে ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত না হলে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনই হবে পরবর্তী কর্মসূচি এবং পশ্চিমা শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর সঙ্গে সেখানেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু।

খ. সে সংগ্রাম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে অসহযোগ, ট্যাক্স বন্ধ, পণ্য বর্জন ইত্যাদি আন্দোলনে পরিণত হবে এবং আরও পরে রক্ত দেওয়া ও রক্ত নেওয়ার পর্যায়ে উপনীত হবে। সে জন্য প্রত্যেককে মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

গ. ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হলেও বাংলা ও বাঙালির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরূপভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

ঘ. পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত না হলে বাংলা ও বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকবে না।

### কেন নির্বাচন চাই

ক. জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা প্রমাণ করতে হবে, বাংলার মানুষ একবাক্যে ৬ দফা ও ১১ দফার পক্ষে।

খ. সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ৬ দফা ও ১১ দফা পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী স্বীকার না করলে দেশবাসী জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হবে যে পশ্চিমারা বাঙালিকে গোলাম হিসেবে শাসন করতে চায় এবং দেশবাসী বুঝবে যে সে ক্ষেত্রে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামই একমাত্র খোলা পথ।

গ. বিশ্বের মানুষ ও বিদেশি রাষ্ট্রগুলো বুঝবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় না মানার অর্থ বাংলার সাত কোটি মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা। এবং সে ক্ষেত্রে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থনদান করতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো নীতিগতভাবে বাধ্য। বর্তমান বিশ্বে বিশ্বজনমতের সমর্থন ছাড়া মুক্তিসংগ্রাম প্রায় অসম্ভব।

ঘ. নির্বাচন অর্থ, জনমত অর্থ, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করা যায়। এ ক্ষেত্রে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর যে সমর্থন তা স্বপ্রমাণিত। আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে লিপ্ত, অর্থাৎ বাংলা ও বাঙালির সার্বিক মুক্তি আন্দোলন—এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল বক্তব্য চারটি :

   ১. বিশ্বের মানচিত্রে ৫৬ হাজার বর্গমাইলবিশিষ্ট একটি আবাসভূমির স্বীকৃতি।

২. সাত কোটি মানুষের বাঙালি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ।

৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির রূপরেখা নির্ণয়।

৪. প্রতিটি মানুষের জাগ্রত গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ওপরে বর্ণিত আদর্শ কর্মসূচি ও সংগঠন মোতাবেক সারা দেশে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এ দেশে বর্তমানে প্রতিটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন, ছাত্রসংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের নির্দেশে আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

জাতীয় নেতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সর্বোপরি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেক কর্মীকে 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

শত প্রতিবন্ধকতা, লোভ-লালসা, আত্মকলহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, 'জয় বাংলা' আমাদের ধ্যানধারণা, 'জয় বাংলা' কেবল একটি স্লোগান নয়, 'জয় বাংলা' একটি আদর্শ। 'জয় বাংলা' আমাদের মূল উৎস। 'জয় বাংলা' আমাদের চলার পথের শেষ প্রান্ত। জয় বাংলা।

পরিশিষ্ট ২

# বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবি

[নভেম্বর ১৯৭৫]

১. আমাদের বিপ্লব নেতা বদলানোর জন্য নয়। এই বিপ্লব গরিবের স্বার্থের জন্য। এত দিন আমরা ছিলাম ধনীদের বাহিনী। ধনীরা তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করেছে। ১৫ আগস্ট তার প্রমাণ। তাই এবার আমরা ধনীদের দ্বারা ধনীদের স্বার্থে অভ্যুত্থান করিনি। আমরা বিপ্লব করেছি। আমরা জনতার সঙ্গে এক হয়ে বিপ্লবে নেমেছি। আমরা জনতার সঙ্গে থাকতে চাই। আজ থেকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী হবে গরিবশ্রেণির স্বার্থরক্ষার একটি গণবাহিনী।

২. অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

৩. রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

৪. অফিসার ও জওয়ানদের ভেদাভেদ দূর করতে হবে, অফিসারদের আলাদাভাবে নিযুক্ত না করে সামরিক শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ণয় করতে হবে।

৫. অফিসার ও জওয়ানদের একই রেশন ও একই রকম থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অফিসারদের জন্য আর্মির কোনো জওয়ানকে ব্যাটম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা চলবে না।

৭. মুক্তিযুদ্ধ, গত অভ্যুত্থান ও আজকের বিপ্লবে যেসব দেশপ্রেমিক ভাই শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. ব্রিটিশ আমলের আইনকানুন বদলাতে হবে।

৯. সব দুর্নীতিবাজের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বিদেশে যারা টাকা জমিয়েছে, তাদের টাকা বাংলাদেশে ফেরত আনতে হবে।

১০. যেসব সামরিক অফিসার ও জওয়ানকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. জওয়ানদের বেতন সপ্তম গ্রেড হতে হবে এবং ফ্যামিলি অ্যাকমডেশন ফ্রি হতে হবে।

১২. পাকিস্তানফেরত সামরিক বাহিনীর লোকদের ১৮ মাসের বেতন দিতে হবে।

নিবেদক
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ

পরিশিষ্ট ৩

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত ২৬, ২৭, ২৮ ও ৩১ অক্টোবর ১৯৭৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির বর্ধিত সভায় আমাদের বিগত দিনের কার্যাবলির সফলতা বিফলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তির ওপর বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘ পর্যালোচনায় যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ :

১. আমাদের পার্টির সংগঠন (COC, SC, ECC) ও সর্বস্তরের ফোরাম ও গণসংগঠনের মধ্যে মারাত্মক ধরনের স্থবিরতা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। স্থবিরতার অর্থই হলো গতিহীনতা। গতিহীনতা সৃষ্টির মূল কারণ হলো সংগঠনের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের অভাব। অস্থিরতার মূল কারণ হলো সঠিক বিপ্লবী চেতনা ও উপলব্ধির কোনো বিমূর্ত রূপ নেই। তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় অর্থাৎ তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রয়োগ এবং প্রয়োগের ভিত্তিতে তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করা, অন্য কথায় 'বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণই' হলো বিপ্লবী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। বিপ্লবকে তার নিজস্ব গতিতে বিকশিত হতে না দিয়ে তাৎক্ষণিকতার দ্বারা অভিভূত ও পরিচালিত হয়ে বিপ্লব সাধনের মনোভাবই হলো অস্থিরতা। মনে রাখতে হবে, অন্ধবিশ্বাসপ্রবণতা (DOGMATISM) যেমন মার্ক্সবাদ নয়, ঠিক তেমনি শুধুমাত্র প্রয়োগও (PRACTICE) মার্ক্সবাদ নয়। যেকোনো বস্তুর মধ্যে 'বিকাশের শর্ত হিসাবে দ্বন্দ্ব' কাজ না করলে স্থবিরতা ও অস্থিরতা নেমে আসা খুবই স্বাভাবিক। পার্টি সংগঠন, গণসংগঠন এবং সেই সঙ্গে জনগণ প্রতিমুহূর্তেই একেকটি 'বস্তুরূপ' গ্রহণ করে। পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনসমূহের স্থবিরতা ও অস্থিরতা কাটিয়ে উঠে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে উভয়কে গতিশীল ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে আমাদেরকে নিম্নলিখিত মার্ক্সীয় পন্থাসমূহ অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে :

ক. পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনসমূহের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কথা স্মরণ রেখেই (উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক পরস্পর সম্পূরক) তাদের

মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহকে সঠিকভাবে পরিচর্যা ও পরিচালনা করতে হবে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যেতে পারে যে পার্টির অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সমগ্র সংগঠনের, নেতৃত্বের সঙ্গে নেতৃত্বের, নেতৃত্বের সঙ্গে কর্মীদের উঁচু স্তরের সঙ্গে নিম্নস্তরে; পার্টির সঙ্গে জনগণের, পার্টির সঙ্গে গণসংগঠনসমূহের এবং অনুরূপভাবে গণসংগঠনের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্বন্দ্বসমূহের স্বাভাবিক বিকাশধারাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যা ও পরিচালনার মাধ্যমেই কেবলমাত্র একটি সঠিক, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির সৃষ্টি হতে পারে। আর সেই গতিই হলো একটি সঠিক মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রাণ। সংগঠনের অভ্যন্তরে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা-আত্মসমালোচনা অর্থাৎ 'ঐক্য-সমালোচনা-ঐক্য' এবং 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য' এই নীতির ভিত্তিতেই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

খ. গণসংগঠনসমূহে স্থবিরতা নেমে আসার মূল কারণ হিসেবে আমরা লক্ষ করেছি গণসংগঠনসমূহের স্ব স্ব 'স্বাধীন অস্তিত্বের ক্রম বিলুপ্তি এবং ক্রমবর্ধমান হারে পার্টি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, পরস্পরের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অভাব, কর্মীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতা, গণসংগঠনসমূহের বাস্তব, স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত ভূমিকার অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় প্রতিটি গণসংগঠনকে সঠিক ভিত্তির ওপর, স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়াতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই পার্টি সংগঠনের লেজুড়সর্বস্ব হয়ে থাকা চলবে না। পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনের মধ্যে মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে মাত্র।

২. আমাদের রাজনৈতিক লাইন এবং কেন্দ্র কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও সিদ্ধান্তসমূহ মূলত সঠিক কিন্তু রাজনৈতিক লাইনের সঠিক উপলব্ধি ও প্রয়োগক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে ও বাহিরে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের অভাবে সংগঠনের মধ্যে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা গড়ে ওঠেনি এবং জনগণের মধ্যে আন্দোলনের বিস্তৃতির পরিবর্তে সংগঠন ও নেতৃত্ব ক্রমশ সংকুচিত হয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে সংগঠন বা সংগঠনসমূহে স্থবিরতা নেমে এসেছে এবং অস্থিরতা কাজ করছে। যার ফলে আমরা বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। এই ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের চরিত্র ও কারণ নিম্নরূপ :

ক. আমাদের রাজনৈতিক লাইন সঠিক হওয়া সত্ত্বেও এর সঠিক উপলব্ধির অভাবেই পার্টির নীতিমালা এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে

ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে। রাজনৈতিক লাইনের সঠিক উপলব্ধির অভাব কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সকল স্তরের নেতা, সংগঠক ও কর্মী বাহিনীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে বলে বৈঠক মনে করে। সঠিক জ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে মার্ক্সীয় বিজ্ঞান বলে: U+P+R। এখানে U হলো **UNDERSTANDING** (পড়া, শোনা, দেখা), P হলো **PRACTICE** (বাস্তব প্রয়োগ) এবং R হলো **REALISATION** (উপলব্ধি)। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে নিছক একটি সাধারণ ধারণা নিয়ে আমরা প্রয়োগক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। আমাদের দীর্ঘদিনের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা আমাদের সেই ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সাধারণ উপলব্ধির জন্ম নিয়েছে মাত্র।

খ. কমরেড মাও সেতুং আমাদের শিখিয়েছেন যে রাজনৈতিক লাইনের সঠিক উপলব্ধির ওপরই বিপ্লবের সফলতা নির্ভর করে। আর সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সঠিক আন্দোলন ও সঠিক সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের নির্ধারিত রাজনৈতিক লাইনের সঠিক উপলব্ধির অভাবহেতু আমাদের মতো অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতিতে পেটি-বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রাধান্য যে সবচেয়ে বেশি (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পৃথক দলিলে প্রকাশিত হবে) এ কথা আমরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছি। অর্থনীতিতে পেটি-বুর্জোয়া প্রাধান্যপূর্ণ একটি দেশে যে ধরনের সংগঠন ও আন্দোলন হওয়া উচিত, তা-ও আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। এমতাবস্থায় দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত সাংগঠনিক শক্তি গড়ে উঠেছে, তা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। এই একই কারণে বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনীরূপে শ্রমিকশ্রেণিকে (কারখানা শ্রমিক ও খেতমজুরদেরকে) মারাত্মকভাবে অবহেলার চোখে দেখা হয়েছে। কারখানা শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করা এবং আন্দোলনে টেনে আনার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অপরিহার্যতা অনুভব করা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সর্বহারা বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। শ্রমিক সংগঠন এবং ক্ষেতমজুর সমিতির মাধ্যমে শ্রমিক ও খেতমজুরদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা গড়ে তোলার বাস্তব প্রক্রিয়া (যা *সাম্যবাদ*-এর বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে) গ্রহণ করা হয়নি বলেই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সত্যিকার সম্পৃক্তি ঘটেনি।

গ. কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে এবং খেতমজুরসহ গরিব ও মাঝারি কৃষকদের (পেটি-বুর্জোয়া) নিয়ে সংগঠন গড়ার যে প্রক্রিয়া নির্দেশ করা হয়েছে (*সাম্যবাদ*-এর বিভিন্ন সংখ্যায় দ্রষ্টব্য), তা-ও আমরা

বাস্তব উপলব্ধির অভাবে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি। পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশকে যথোপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলনের সহযোগী করে তুলতেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

ঘ. সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ এবং সংশোধনবাদবিরোধী ব্যাপক জনগণের ঐক্য গড়ে তুলতেও আমরা সমর্থ হইনি।

ঙ. আমাদের রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী দ্বন্দ্বের মূল কথাই হলো 'পুঁজি বনাম শ্রম' অর্থাৎ 'বুর্জোয়া বনাম সর্বহারা-আধা সর্বহারা শিল্প শ্রমিক ও ক্ষেতমজুর-পেটি বুর্জোয়া'—এই রাজনৈতিক লাইনের আলোকে শত্রু-মিত্র সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সঠিক সংগঠন ও আন্দোলন রচনা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। বুর্জোয়ারা অর্থাৎ সরকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দখলদার ও তাদের সহযোগীরা আমাদের রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী আমাদের প্রধান শত্রু। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস, লিবারেল ডেমোক্র্যাটসরা ও সংশোধনবাদীরা আমাদের মতাদর্শগত সংগ্রামের লক্ষ্যস্থল (DIRECTION OF THE MAIN BLOW)। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের মতাদর্শগত সংগ্রাম সর্বদাই অব্যাহত রাখতে হবে। সমাজ ও জনমতের ওপর সর্বাধিক, তাদেরকে আমাদের মিত্র হিসাবে সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। লেনিন এ কারণেই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর (WORKERS PEASANTS ALLIANCE) ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদের পতন ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে যেহেতু বুর্জোয়ারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারে না, সেহেতু বুর্জোয়ারা কোনো না কোনো সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তি বা শক্তিসমূহের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য। এই কারণে আমাদের প্রতিটি আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার দিকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এমনকি এ কথাও কোনো সময় বিস্মৃত হলে চলবে না যে যেকোনো প্রকার বৈদেশিক অর্থাৎ ভারত-রুশ চক্রের আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণবাদী ও সংশোধনবাদী হামলা অথবা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী কালো হাত যখন আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে, তখন জাতীয় বুর্জোয়াদেরকে মিত্র হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও সংশোধনবাদবিরোধী সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই ঐক্যের ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য, আমাদের দেশের জন্য যার রূপ হবে 'জনগণের ঐক্য'। এই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিরোধ

আন্দোলনকে এমনভাবে রচনা করতে হবে, যেন অতীতের ন্যায় আন্দোলনের সুফল একচেটিয়াভাবে কেবল বুর্জোয়ারাই ভোগ না করে, বরং শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বেই বেশি শক্তিশালী হয়।

একককথায় বলতে গেলে আমাদের আন্দোলনের বর্তমান ধারাকে আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শক্তিভিত গড়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিটি আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শক্তিভিত গড়ে না তোলার চিন্তা 'সুবিধাবাদ', আবার সমাজতান্ত্রিক শক্তিভিত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাদ দেওয়া 'বাম হঠকারিতা'। লেনিনের মত অনুসারে এবং আমাদের দেশের বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ অংশ সম্পন্ন করার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষিত ও সুসংগঠিত হয় এবং তার অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক অনুভূতি, চেতনা ও শক্তিভিত গড়ে ওঠে এবং সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু উপরোক্ত সবগুলো দিক গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে আমাদের রাজনৈতিক লাইনকে আমরা আমাদের বিগত দিনের সংগঠন ও আন্দোলনের মধ্যে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছি। (এই বৈঠক বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধতর উপলব্ধির আলোকে সংগঠন ও আন্দোলনের যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, তা একটি পৃথক দলিলে প্রকাশ করা হবে)।

৩. এই বৈঠক আরও মনে করে যে আমাদের রাজনৈতিক লাইনের সমৃদ্ধতর উপলব্ধি কার্যকর করতে, এই উপলব্ধির আলোকে প্রণীত সঠিক আন্দোলন ও সংগঠনের রূপরেখাকে বাস্তবায়িত করতে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক গতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবস্থিত দ্বন্দ্বসমূহকে সঠিকভাবে পরিচর্যা ও পরিচালনা করতে নেতৃত্বের বর্তমান কাঠামো (সর্বস্তরের) যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নয়। তাই এই বৈঠক আগামী কাউন্সিল সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও জরুরি স্ট্যান্ডিং কমিটিকে বাতিল ঘোষণা করে। জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ফোরামসমূহও বাতিল ঘোষণা করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ফ্রন্টসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট থেক প্রতিনিধি নিয়ে সর্বস্তরে কেবলমাত্র একটি করে 'সমন্বয় কমিটি' গঠন করার সুপারিশ করা

হয়। এই বৈঠক বর্তমান স্থবিরতা ও অস্থিরতার হাত থেকে রক্ষা করে গতিশীল ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান উপলব্ধির ভিত্তিতে সংগঠনের একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে। তিনি এ ব্যাপারে পার্টির যেকোনো সদস্যের বা একাধিক সদস্যের সহযোগিতা নিতে পারবেন এবং যেকোনো দায়িত্ব যেকোনো সদস্য বা একাধিক সদস্যের ওপর অর্পণ করতে পারবেন। কোনো মার্ক্সবাদীই সমস্যাকে এড়িয়ে যায় না এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিতও নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাবাবলি সুপারিশ আকারে পেশ করা হলো :

১. উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনের ক্ষেত্রে গতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে :
   ক. পার্টি পরিচালনার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে একটি ক্ষুদ্র 'পরিচালনা পরিষদ' কাজ করবে। এই পরিচালনা পরিষদের উদ্দেশ্য হবে রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করা এবং বাংলাদেশের সর্বত্র তড়িৎগতিতে রাজনৈতিক লাইন এবং নীতি ও কৌশলসমূহকে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রতিফলিত করা।
      ১. ৩১ তারিখে (COC) বর্ধিত সভায় 'একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত'সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়। যে একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, তিনি ২৬, ২৭, ২৮ তারিখে (COC) বর্ধিত সভায় উপস্থিত থাকলেও ৩১ তারিখে অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি। সে কারণে খসড়া প্রস্তাবের তিন নং ধারার 'একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত'সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি তাঁর মত দিতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৩ সদস্যবিশিষ্ট এক সভায় তিনি নিজেই 'একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত'করণ বিষয়ে তাত্ত্বিক দিক উল্লেখ করে আপত্তি উত্থাপন করেন। উক্ত ২৩ জনের এই বৈঠক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে মনে করে যে 'একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত'করণ সংক্রান্ত বিষয়টি তাত্ত্বিক দিক থেকে অপর্যাপ্ত অর্থাৎ 'একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত'করণ সিদ্ধান্তটি প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত তাত্ত্বিক ভিত্তিহীন। এই সভা ৩১ তারিখের 'একজন সদস্যের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত'করণ প্রশ্নটিকে সংগঠনের সর্বস্তরের মতামতের জন্য খসড়া প্রস্তাবে উল্লেখ করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২. বর্তমান পরিস্থিতিতে 'পরিচালনা পরিষদ' গঠন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফ্রন্টসমূহের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও স্বকীয়তা বজায় রেখে ফ্রন্টসমূহের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা ও সমন্বয় সাধনের জন্য সকল ফ্রন্ট থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হবে।

খ. আমাদের সংগঠনসমূহের মধ্যে গতি সঞ্চার।

গ. জনগণের নিকট থেকে জনগণের নিকট (FROM MASS TO MASS) এই নীতির ভিত্তিতে পার্টিকে সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এবং জনগণ ও জনজীবনের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বকে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে পার্টির ভেতরের প্রতিটি নেতা ও সদস্যকে কোনো না কোনো ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নির্দিষ্ট কোনো না কোনো এলাকায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

২. আমাদের সমস্ত গণসংগঠন যেমন জাসদ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ (ক্ষেতমজুর সমিতিসহ) প্রভৃতি স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ভূমিকা ও স্বকীয়তা বজায় রাখবে। গণসংগঠনসমূহ যেন কোনো অবস্থাতেই রাজনৈতিক লাইন ভঙ্গ না করে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। স্বাধীন, স্বকীয় ও স্বায়ত্তশাসিত ভূমিকা বজায় রাখার জন্য গণসংগঠনসমূহকে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে :

ক. পার্টি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর সকল প্রকার নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে।

খ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করতে হবে। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিকতাকে বাদ দিয়ে যেমন মার্ক্সবাদ হয় না, তেমনি কেবলমাত্র জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেও মার্ক্সবাদ বলা যায় না। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের মূল কথা হলো, 'মর্ম হবে আন্তর্জাতিক, কিন্তু রূপ হবে জাতীয়' (THE CONTENT IS INTERNATIONAL, BUT FORM IS NATIONAL)

গ. গণসংগঠনসমূহকে স্বাধীনভাবে প্রতিটি বিষয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন রচনা ও পরিচালনা করতে হবে।

ঘ. গণসংগঠনসমূহকে নিজস্ব সাহিত্য ও প্রচারধর্মী কাজ যেমন স্ব স্ব ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, নীতিনির্ধারণী পুস্তিকা ও প্রচারপত্র, পোস্টার, দেয়ালপত্রিকা ইত্যাদি নিজ নিজ দায়িত্বে করতে হবে।

ঙ. নিজস্বভাবে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার কোনোক্রমেই পার্টি নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল হওয়া চলবে না।

৩. আমাদের নির্ধারিত রণনীতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সাহিত্য ও প্রকাশনার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি শক্তিশালী সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হবে। এই বোর্ড শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ভিত্তিমূলক সাহিত্য ও প্রকাশনার দায়িত্বেই নিয়োজিত থাকবে।

৪. অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ও ফ্রন্ট গড়ে তোলা হবে।

৫. যেকোনো প্রকার ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬. উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ তিন মাসের জন্য কার্যকরী থাকবে। এই সময়ের মধ্যে বা অনুরূপ কোনো সময়ের মধ্যে সংগঠন ও আন্দোলনের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বমূলক কাউন্সিল আহ্বান করা হবে এবং সামগ্রিক অবস্থার পূর্ণ পর্যালোচনা করে সমস্ত ব্যাপারে ব্যাপক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ওপরে বর্ণিত পর্যালোচনা থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে দেশ, জাতি ও সংগঠনের বর্তমান নাজুক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও সারা দেশ থেকে আগত সকল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়েই এ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও আমরা মনে করি যে এই সিদ্ধান্তসমূহের তাত্ত্বিক সঠিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও প্রায়োগিক বাস্তবতা বিচারের দায়িত্ব কেবল যাঁরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরই নয়, বরং সংশ্লিষ্ট সকলের। পার্টি, গণসংগঠন এবং সমস্ত সদস্যের সমষ্টিগত জ্ঞানই (COLLECTIVE KNOWLEDGE) হবে আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রাথমিক শর্ত। তা না হলে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ কোটারিগত সিদ্ধান্তে পরিণত হবে। সুতরাং আগামী ৩০শে নভেম্বর সকল সদস্য (থানা পর্যন্ত), কাউন্সিলের সকল সদস্য এবং গণসংগঠনের থানা পর্যায় পর্যন্ত সকল কমিটি ও সদস্য ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ওপরের সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে লিখিত মতামত স্ব স্ব সংগঠনের চ্যানেলের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে প্রেরণ করবেন। মৃত্যুজনিত বা মারাত্মক ধরনের অসুখ ছাড়া অন্য কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি বা কমিটি মতামত পাঠাতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কমিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মতামত প্রেরণের সময় মনে রাখত হবে যেন মতামত যথাযথ বাস্তব, সংক্ষিপ্ত এবং পরামর্শমূলক হয়।

পরিশিষ্ট ৪

# যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন

**আ স ম আবদুর রব** : ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি। জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। সাবেক মন্ত্রী। বর্তমানে জাসদের একটি অংশের সভাপতি। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪

**আখতার হুসেন** : শিশুসাহিত্যিক। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮

**আবদুর রাজ্জাক** : ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। সাবেক মন্ত্রী। অক্টোবর ১৯৮৩

**আবু আলম মো. শহীদ খান** : ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। সাবেক স্থানীয় সরকারসচিব। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

**আবু করিম** : ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। সাবেক তথ্যসচিব। ১৯ অক্টোবর ২০১৮

**আবু হেনা** : চিকিৎসক। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের একটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। ১৫ এপ্রিল ২০১৬

**আমানউল্লাহ** : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক। ১৬ অক্টোবর ২০১৯

**আমির হোসেন আমু** : ছাত্রলীগ ও আওয়ামী যুবলীগের সাবেক নেতা। সাবেক মন্ত্রী। জাতীয় সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য। ৪ জুন ২০১৯

**আশরাফ হোসেন** : ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের সংগঠক। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিটে জামালপুরের একটি আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০ নভেম্বর ২০১৮

**এম এ করিম** : ছাত্রলীগ, বিএলএফ ও জাসদের সংগঠক। পরমাণু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। ১১ মে ২০২০

**এস এম ইউসুফ** : ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি, আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সদস্য, আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, অধুনা লুপ্ত বাকশালের সাংগঠনিক সম্পাদক। ২১ অক্টোবর ২০১৫

**কামাল উদ্দিন আহমেদ** : ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি। বর্তমানে ব্যবসায়ী। ৯ জুন ২০১৯

**খায়ের এজাজ মাসুদ** : ছাত্রলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক। আইনজীবী। ১৬ জুলাই ২০১৯

**খোদা বখশ চৌধুরী** : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক। ২ অক্টোবর ২০১৮

**জাফরুল্লাহ চৌধুরী** : চিকিৎসক। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি। ১ আগস্ট ২০১৮

**তোফায়েল আহমেদ** : ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। সাবেক মন্ত্রী। জাতীয় সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য। ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

**বদিউল আলম** : ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। বর্তমানে সাংবাদিক। ৮ জুন ২০১৯

**মনিরুল ইসলাম** : ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি। জাতীয় শ্রমিক জোটের এক অংশের সাবেক সভাপতি। মে-জুন ২০১৪

**মনিরুল হক চৌধুরী** : ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। সাবেক সংসদ সদস্য। ১৩ অক্টোবর ২০১৮

**পংকজ ভট্টাচার্য** : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেতা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে ঐক্য ন্যাপ-এর সভাপতি এবং সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

**মানস পাল** : নির্বাহী সম্পাদক, *ত্রিপুরা টাইমস*, আগরতলা। প্রদায়ক, *টাইমস অব ইন্ডিয়া* এবং *দ্য লাইমস* (ইতালি)। *দ্য আই উইটনেস : টেলস ফ্রম ত্রিপুরা'স এথনিক কনফ্লিক্ট* বইয়ের লেখক। ১৬ জুন ২০২০

**মাহবুব তালুকদার** : বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব। নির্বাচন কমিশনার। ৪ মে ২০১৭

**মাহমুদুর রহমান মান্না** : ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি, আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক। ৬ জুন ২০১৯

**মাজহারুল হক টুলু** : জাসদের সাবেক দপ্তর সম্পাদক। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

**মুবিনুল হায়দার চৌধুরী** : জাসদের বিপ্লবী পার্টি গড়ার প্রক্রিয়ার সংগঠক। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে বাসদের (মার্ক্সবাদী) সাধারণ সম্পাদক। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

**মো. কামালউদ্দিন** : ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি, মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি। সাবেক রাষ্ট্রদূত। ২৮ এপ্রিল ২০২০

**মোস্তাফা জব্বার** : দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এর সাবেক স্টাফ রিপোর্টার। বর্তমানে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী। ১৬ নভেম্বর ২০১৯

**মোস্তফা মোহসীন মন্টু** : ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। আওয়ামী যুবলীগের সাবেক চেয়ারম্যান। গণফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। ১৭ অক্টোবর ২০১৮

**মোহাম্মদ আবদুল মজিদ** : বিমানবাহিনীর সাবেক করপোরাল। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সংগঠক। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

**রায়হান ফিরদাউস** : ছাত্রলীগের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক, জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য।

**রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ** : নরসিংদী কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি। বর্তমানে একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

**রেজাউল হক মুশতাক** : ছাত্রলীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক। বর্তমানে ব্যবসায়ী। ১৯ এপ্রিল ২০১৮

**শামসুজ্জামান খান** : বাংলা একাডেমির সভাপতি। ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক। ১৯ অক্টোবর ২০১৯

**শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন** : ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। প্রথম জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ। জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান। সাবেক মন্ত্রী। ৯ অক্টোবর ২০১৫

**শাহজাহান সিদ্দিকী** : ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের সংগঠক আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের সাবেক নেতা আবদুর রহমান সিদ্দিকীর সন্তান। ১৯ নভেম্বর ২০১৮

**শরীফ নুরুল আম্বিয়া** : ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। জাসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি। ১১ জানুয়ারি ২০১৯

**শেখ শহীদুল ইসলাম** : ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। সাবেক মন্ত্রী। জাতীয় পার্টির একটি অংশের সাধারণ সম্পাদক। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

**সলিল কাহালি** : জামালপুর হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক। ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের কর্মী। ১২ ডিসেম্বর ২০১৮

**সিরাজুল আলম খান** : ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, মুজিববাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়ক, জাসদের প্রতিষ্ঠাতা। ২০১৪-১৭, ২৮-৩০ এপ্রিল ও ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

**সুমন মাহমুদ** : ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। সাবেক সাংবাদিক। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭

**সৈয়দ রেজাউর রহমান** : ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি। আওয়ামী যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য। আইনজীবী। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬

**স্বাধীন আশরাফুজ্জামান** : ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের সংগঠক আখতারুজ্জামান মতি মিয়ার সন্তান। ভাষাসৈনিক মতি মিয়া ফাউন্ডেশনের (জামালপুর) উদ্যোক্তা। ১৮ নভেম্বর ২০১৮

পরিশিষ্ট ৫

# গ্রন্থপঞ্জি


আহমদ, কামরুদ্দীন (১৯৮২), *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর,* নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

আহমদ, কামরুদ্দীন (২০১৮), *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আহমদ, ফয়েজ (১৯৯৪), *'আগরতলা মামলা': শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪), *জাসদের উত্থান-পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬), *বিএনপি: সময়-অসময়,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬), *আওয়ামী লীগ: উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৭), *আওয়ামী লীগ: যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

*আহমদ শরীফকে লেখা নির্বাচিত পত্রাবলি* (২০১৭), সংকলন ও সম্পাদনা: নেহাল করিম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আহাদ, অলি (২০০৪), *জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ৭৫,* বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা

ইমাম, এইচ টি (২০১৪), *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১,* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

ইসলাম, মনিরুল (২০১৩), *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র,* জ্যা পাবলিকেশনস, ঢাকা

উবান, মেজর জেনারেল (অব.) এস এম (২০০৫), *ফ্যান্টামস অব চিটাগাং: দ্য 'ফিফথ আর্মি' ইন বাংলাদেশ,* ঘাস ফুল নদী, ঢাকা

উল্লাহ, মাহফুজ (২০১৮), *স্বাধীনতার প্রথম দশকে বাংলাদেশ*, দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা

উল্লাহ, মাহফুজ (২০১৬), *পাঠকের চোখে জাসদ*, মধ্যমা, ঢাকা

*খসড়া থিসিস* (পরিমার্জিত), জানুয়ারি ১৯৭৬

ঘোষ, শিবদাস (১৯৮৯), *কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই একমাত্র সাম্যবাদী দল*, এসইউসিআই, কলকাতা

জলিল, মেজর এম এ (১৯৮৩), *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জাতীয় কমিটির সদস্যদের প্রতি*

তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৫), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, ঢাকা

*ধ্রুবতারা*, সম্পাদনা : স্বাধীন আশরাফুজ্জামান, ভাষাসৈনিক মতি মিয়া ফাউন্ডেশন, জামালপুর

*বঙ্কিম রচনাবলী : উপন্যাসসমগ্র*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮

বাগমার, আবদুল আজিজ (২০০৬), *স্বাধীনতার স্বপ্ন : উন্মেষ ও অর্জন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (১৯৭২), *সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট*, শাজাহান সিরাজ

*বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিপ্লবের পর্যায়* (খসড়া থিসিসের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা), সম্পাদনা : রায়হান আলম, অক্টোবর ১৯৭৫

*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত : তথ্য ও দলিল, আসাম ও মেঘালয়* (২০১৭), গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : হারুন হাবীব, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

বেগম, সাহিদা (২০০০), *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বৈদ্য, ডা. কালিদাস (২০০৫), *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অন্তরালের শেখ মুজিব*, কর্মকার বুক স্টল, কলকাতা

মোহাম্মদ ফরহাদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ (২০০১), *আকণ্ঠ বিপ্লব পিপাসা*, ঢাকা

রহমান, আখলাকুর (১৯৭৪), *বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ*, সমীক্ষণ পুস্তিকা, ঢাকা

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২) *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা

রণো, হায়দার আকবর খান (২০০৫), *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা

রায়, খোকা (১৯৮৬), *সংগ্রামের তিন দশক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

শরীফ, আহমদ (১৯৭০), *স্বদেশ অন্বেষা*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা

শরীফ, আহমদ (১৯৯৮), *বিশ শতকে বাঙালী*, ঈক্ষণ, ঢাকা; ১৯৯৯, নবজাতক, কলকাতা; ২০০১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

শরীফ, আহমদ (২০১৩), *বাংলা বাঙালি বাংলাদেশ*, সংকলক : নেহাল করিম, মহাকাল, ঢাকা

*সাম্যবাদ-দুই, তিন, চার, ছয়*

*সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়ান, জঙ্গি জনতার ঐক্য গড়ে তুলুন*, জাসদ-ছাত্রলীগ-শ্রমিক লীগ-কৃষক লীগ-বিপ্লবী গণবাহিনী

*সিরাজ সিকদার রচনা সংগ্রহ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা

সেন, নির্মল (২০১২), *আমার জবানবন্দি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

হক, মুহাম্মদ শামসুল (২০১৮), *আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি*, ইতিহাসের খসড়া, চট্টগ্রাম

হাসান, মোরশেদ শফিউল (২০১৪), *স্বাধীনতার পটভূমি : ১৯৬০ দশক*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

Banerjee, Sashanka S. (2011), *India, Mujibur Rahman, Bangladesh Liberation and Pakistan*, Aparajta Sahitya Bhaban, Narayanganj

Blood, Archer K (2006), *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, UPL, Dhaka

Dalim, Shariful Haq (2015), *Bangladesh: Untold Facts*, Jumhoori Publications, Lahore

Government of Pakistan (1959), *Commission on National Education*, Karachi

Hossain, Kamal (2013), *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*, UPL, Dhaka

Karim S. A. (2009), Sheikh Mujib : *Triumph and Tragedy*, UPL, Dhaka

Raghavan, Sinha (2013), 1971: *A Global History of the Creation of Bangladesh*, Harvard University Press, Massacusetts

Raina, Ashoka (1981), *Inside Raw: The Story of India's Secrel Service*, Vikas Publishing House, New Delhi

Ramesh, Jairam (2018), *Interwined Lives: P. N. Haksar and Indira Gahdhi*, Simon & Schuster India, New Delhi

Rehman, I (2017), *Himalayan Challenges: India's Conventional Deterrant and the Role of Special Operations Forces along the Sino-Indian Border*, Naval War College Review, Winter 2017

Sinha, D & Balakrishnan, R (2016), *Employment of India's Special Operations Forces*, ORE Issue Brief, No. 150, June 2016

Sisson, Richard & Rose, Leo (1990), *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh*, University of California Press, California

Sobhan, Rehman (2016), *Untranqil Recollection: The Years of Fulfilment.* Sage, New Delhi

*The Untold Story of Dr. Abu Hena*, interview by Anwar Parvez Halim, *Probe,* Issue 5, Volume 13, December 2014